বিষয়ীভূত, ইহা বিশেষ রূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন যস্ত্বিত্যাদি।

ভাষ্য।—যস্তু সাংখ্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ আত্মরতি রাত্মন্যেব রতির্ন বিষয়েষু যস্য স আত্মরতি রেবস্যাত্ ভবেদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ আত্মনৈব হৃষ্টঃ ন রসাদিনা মানবো মনুষ্যঃ সন্ন্যাসী আত্মন্যেব সন্তুষ্টঃ সন্তোষোহি বাহ্যার্থলাভে সর্ব্বস্য ভবতি তমনপেক্ষ্য আত্মন্যেব সন্তুষ্টঃ সর্ব্বতো বীততৃষ্ণ ইত্যেতত্। য ঈদৃশ আত্মবিত্ তস্য কার্য্যং করণীয়ং নবিদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—সাংখ্য (অর্থাৎ) আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, যে ব্যক্তি আত্মরতি (হয় আত্মাতেই যাহার অনুরাগ আছে, কিন্তু (শব্দাদি) বিষয়ে (অনুরাগ) নাই, সেই ব্যক্তিই আত্মরতি হয়, আত্মতৃপ্ত (অর্থাৎ) আত্মা দ্বারাই যাহার তৃপ্তি হয়, অন্য রসাদি দ্বারা হয়না (তাহাকেই আত্মতৃপ্ত বলা যায়) এবং যে ব্যক্তি আত্মাতেই পরিতুষ্ট সেই সন্ন্যাসী মানব। সকললোকেরই বাহ্যার্থলাভে সন্তোষ হয়, সেই বাহ্যলাভের অপেক্ষা না করিয়া, আত্মাতেই সন্তুষ্ট ব্যক্তিই (যথার্থ) বীততৃষ্ণ, যে ব্যক্তি এই প্রকার বীততৃষ্ণ ও আত্মবিদ্, তাহার কোন কার্য্য (অর্থাৎ) করণীয় নাই। ইহাই অর্থ॥ ১৭॥

---

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
নচাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮॥

অন্বয়।—ইহ কৃতেন (কর্ম্মণা) তস্য (আত্মবিদঃ) কশ্চিৎ অর্থঃ (প্রয়োজনং) ন (অস্তি) অকৃতেন (বা কর্ম্মণা) কশ্চ (ন অর্থো) ন অস্য (আত্মবিদঃ) সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজনাপেক্ষা) নচ (অস্তি)॥ ১৮॥

অনুবাদ।—সেই আত্মবিদ্ ব্যক্তির কোন প্রকারকার্য্যের দ্বারা কোন প্রয়োজন নাই, কোন বিহিত কর্ম্মের অকরণেও কোন ফল নাই। এ জগতে সর্ব্ব ভূতের মধ্যে কাহার নিকটে তাহার কোন প্রকার প্রয়োজনাপেক্ষাও নাই॥ ১৮॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ নৈবেতি তস্য পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কর্ম্মণা অর্থঃপ্রয়োজন মস্তি, অস্তুতহি অকৃতেন অকরণেন প্রত্যবায়াখ্যোঽনর্থো ন অকৃতেন ইহলোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায় প্রাপ্তিরূপ আত্মহানিলক্ষণোবা নৈবাস্তি। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজননিমিত্ত ক্রিয়া-সাধ্যঃ ব্যপাশ্রয়ঃ ব্যপাশ্রয়ণং কঞ্চিদ্ ভূতবিশেষমাশ্রিত্য ন সাধ্যঃ

কশ্চিদর্থোঽস্তি। যেন তদর্থা ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়া স্যাৎ। ন ত্বমেতস্মিন্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক স্থানীয়ে সম্যগ্ দর্শনে বর্ত্তসে ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও নৈব ইত্যাদি। সেই পরমাত্মরত ব্যক্তির (কোন) অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা কোন প্রয়োজন (সিদ্ধ) হয় না। কোন কার্য্য করিলে যদি ফল লাভ না হয়, তাহা হইলে তাহার বিহিত কার্য্যের অকারণে পাপ-রূপ অনর্থ হউক্ না (এ প্রকার অশঙ্কার উপর বলা যাইতেছে যে) বিহিত কর্ম্মের অকরণ দ্বারা ইহলোকে তাহার কোন প্রকার প্রত্যবায় প্রাপ্তিরূপ বা আত্মহানিলক্ষণ অনর্থ হয় না। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত প্রাণিগণের মধ্যে তাহার কোন প্রকার অর্থের ব্যপাশ্রয় নাই। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন কর্ম্যের দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহাকেই ব্যপ শ্রয় বা ব্যপাশ্রয়ণ কহে (তাৎপর্য্য ইহা হই-তেছে যে) কোন প্রাণিবিশেষের অপেক্ষাসাধ্য তাহার কোন প্রয়োজনই নাই, যাহাতে তাহার জন্য কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (হে অর্জ্জুন) তুমি কিন্তু এই সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক স্থানীয় সম্যক্ দর্শনে এখনও অবস্থিত নহ ॥ ১৮ ॥

---

তস্মাদ সক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—তস্মাৎ (হেতোঃ) ত্বং অসক্তঃ সন্ সততং কার্য্যং (কর্ত্তব্যং) কর্ম্মসমাচর (অনুতিষ্ঠ) হি (যস্মাৎ) পুরুষঃ (জনঃ) অসক্তঃ (সন্) কর্ম্মাচ-রন্ (কুর্ব্বন্) পরং (প্রয়োজনং) আপ্নোতি (লভতে) ॥১৯॥

অনুবাদ।—সেই জন্য সক্ত হইয়া (হে অর্জ্জুন) তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান করিও যে হেতু পুরুষ অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে (কালে) পরম পুরুষার্থ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য।—যত এবং তস্মাদিতি। তস্মাদ সক্তঃ সঙ্গ বর্জ্জিতো সততং সর্ব্বদা কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কর্ম্ম সমাচর নির্ব্বর্ত্তয়। অসক্তো হি যস্মাৎ সমাচরন্ ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পরং মোক্ষং আপ্নোতি সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণে এই প্রকার, তস্মাদিত্যাদি। সেই কারণে অসক্ত (অর্থাৎ) সঙ্গ বর্জ্জিত (হইয়া) সর্ব্বদা কার্য্য (অর্থাৎ) কর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্মের সম্পাদন কর। যেহেতু সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্মের

অনুষ্ঠানকারী পুরু।,.পর (অর্থাৎ) মোক্ষ (পর্য্যন্ত), চিত্তশুদ্ধি দ্বারা লাভ করিতে পারে। ইহাই অর্থ॥ ১৯॥

---

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০॥

অন্বয়।—জনকাদয়ঃ কর্ম্মণৈব সংসিদ্ধি মাস্থিতাঃ (প্রাপ্তঃ) (ত্বং কর্ম্মণা) লোক সংগ্রহমেব পশ্যন অপি (কর্ম্ম) কর্ত্তুং অর্হসি॥ ২০॥

অনুবাদ।—জনক প্রভৃতি (রাজর্ষিগণ) বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তুমি কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা লোক সংগ্রহ হইতে পারে ইহা দেখিয়াও কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে যোগ্য হইতেছ॥ ২০॥

ভাষ্য।—যস্মাৎ কর্ম্মণৈবতি। কর্ম্মণৈবেহি যস্মাৎ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়া বিদ্বাংসঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষং গন্তুমাস্থিতা প্রবৃত্তা জনকাদয়ঃ জনকাশ্বপতি প্রভৃতয়ঃ। যদি তে প্রাপ্তসম্যগ্ দর্শনস্ততো লোক সংগ্রহার্থং প্রারব্ধকর্ম্মত্বাৎ কর্ম্মণা সহৈব অসংন্যস্যৈব কর্ম্ম সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইত্যর্থঃ। অথাপ্রাপ্ত সম্যগ্ দর্শনা জনকা দয়স্তদা কর্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধি সাধন ভূতেন ক্রমেণ সংসিদ্ধি মাস্থিতা ইতি ব্যাখ্যেয়ঃ শ্লোকঃ। অথ মন্যসে পূর্ব্বৈরপি জনকাদি ভিরপ্যজানদ্ভিরেব কর্ত্তব্যং কর্ম্মকৃতং তাবতা নাবশ্যমন্যেন কর্ত্তব্যং সম্যগ্দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি তথাপি প্রারব্ধ কর্ম্মায়ত্তস্ত্বং লোকসংগ্রহ মেবাপি লোকস্যোন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণং লোকসংগ্রহঃ তমেবাপি প্রয়োজনং সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণ কর্ম্মের দ্বারা ইত্যাদি) যে কারণ পূর্ব্বকালিক জনক অশ্বরথ প্রভৃতি বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়গণ মোক্ষ লাভ করিতে উদ্যত হইয়াও কর্ম্ম-মার্গের দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদি জনক অশ্বরথ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠগণ সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন (এই প্রকার বিবেচনা করা যায়) তাহা হইলে (ইহাই স্থির করিতে হইবে যে) তাহারা লোক সংগ্রহার্থই কর্ম্মের আরম্ভ করতঃ সন্ন্যাস মার্গ অবলম্বন না করিয়াই কর্ম্ম করিতে করিতেই সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই তাৎপর্য্য। আর যদি তাঁহারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই (এই প্রকার বিবেচনা করা যায়) তাহা হইলেও (ইহা স্থির করিতে হইবে যে) চিত্ত শুদ্ধির সাধন ভূত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে চিত্ত-শুদ্ধি ও পরে জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ রূপ সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অথবা যদি সম্ভাবনা কর যে "প্রাচীন জনক প্রভৃতি

# প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ।] [৩২৬ পৃষ্ঠার পর।

আর এক কথা বোঝ,—অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটে বলে, আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট। "যত দিন বাঁচি, তত দিন শিখি।" তবে দেখ, জিনিস্‌টে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এই মাত্র। আর, আসলটা সর্ব্বদা বাঁচিয়ে, বাকি জিনিস্ শিখ্‌তে হবে। বলি, খাওয়া ত সব দেশেই এক; তবে, আমরা পা গুটিয়ে ব'সে খাই, বিলিতিরা পা ঝুলিয়ে ব'সে খায়। এখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি; তা বলে কি এদের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকৃতে হবে? আমার পা যে যমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে— টনটনানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি? কাজেই পা গুটিয়ে এদের খাওয়া খাব বৈকি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখ্‌তে হবে, সেটা আমাদের মত করে,—পা গুটিয়ে, আসল জাতীয় চরিত্রটী বজায় রেখে। বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে? শক্তিমান পুরুষ যে পোষাকই পরুক না কেন, লোকে মানে; আর, আমার মত আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না।

এখন, গৌরচন্দ্রিকাটা বড্ড বড় হয়ে প'ড়্‌লো; তবে দুদেশ তুলনা করা সোজা হবে, এই ভণিতার পর। এরাও ভাল,—আমরাও ভাল, "কাকো বন্দি, কাকো নিন্দি, দুয়ো পাল্লা ভারি।" তবে, ভালর রকমারি আছে, এই মাত্র।

মানুষের মধ্যে আছেন, আমাদের মতে, তিনটা জিনিস্। শরীর আছেন, মন আছেন, আত্মা আছেন। প্রথম, শরীরের কথা দেখা যাক্, যা সকলকার চেয়ে বাইরের জিনিস্।

শরীরে শরীরে কত ভেদ, প্রথম দেখ। নাক, মুখ, গড়ন, লম্বা, চৌড়াই, রঙ্গ, চুল, কত রকমের তফাৎ।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রঙ্গের তফাৎ বর্ণসাঙ্কর্য্যে উপস্থিত হয়। গরম দেশ, ঠাণ্ডা দেশ ভেদে, কিছু পরিবর্ত্তন, অবশ্য, হয়; কিন্তু, কাল সাদার আসল কারণ, পৈতৃক। অতি শীতল দেশেও ময়লারঙ্গ-জাতি দেখা যাচ্ছে,

এবং, অতি উষ্ণ দেশেও ধপ্‌ধপে ফর্‌সা জাতি বাস করছে। কানড়ানিবাসী আমেরিকার আদিম মানুষ ও উত্তরমেরুসন্নিহিতদেশনিবাসী এস্কুইমো খুব ময়লা রঙ্গ, আবার মহাবিষুবরেখার উপরিস্থিত দ্বীপেও সাদারঙ্গ আদিম জাতির বাস; বোর্ণিও, সেলিবিস্ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ইহার নিদর্শন।

এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হিঁদুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাত, এবং চীন, হূন, দরদ্, পহ্লব, যবন এবং খশ, এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি, এরা হ'চ্ছেন আর্য্য। শাস্ত্রোক্ত চীনজাতি এ বর্ত্তমান 'চীনেমান' নয়; ওরা ত সে কালে নিজেদের 'চীনে' ব'লতই না। 'চীন' ব'লে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তরপূর্ব্বভাগে ছিল; দরদ্‌রাও যেখানে এখন ভারত আর আফগানের মধ্যে পাহাড়ি জাত সকল, ঐ খানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির দু দশটা বংশধর এখনও আছে। দরদিস্তান এখনও বিদ্যমান। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বারম্বার দরদ্‌রাজের প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। হূণ নামক প্রাচীন জাতি অনেক দিন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল। এখন টিবেটিরা নিজেদের হূণ বলে; কিন্তু, সেটা, বোধ হয়, "হিউন"। ফল,মনুক্ত হূণ আধুনিক তিব্বতীও নয়; তবে এমন হ'তে পারে যে, সেই আর্য্য হূণ এবং মধ্য-আসিয়া হ'তে সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে, বর্ত্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি এবং ডুাক্‌ড অর্‌লিয়াঁ নামক রুষ ও ফরাসী পর্য্যটকদের মতে, তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য্য-মুখ-চোখ-বিশিষ্ট জাতি দেখতে পাওয়া যায়। যবন হ'চ্ছে গ্রীকদের নাম। এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। অনেকের মতে, যবন এই নামটা 'য়োনিয়,' নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়; এজন্য মহারাজা অশোকের পালি লেখে 'যোন' নামে গ্রীকজাতি অভিহিত। পরে 'যোন' হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দিশি কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে যবনশব্দ গ্রীকবাচী নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল। যবন শব্দই আদি শব্দ, কারণ সুধু যে হিঁদুরাই গ্রীক্‌দের যবন বল্‌ত, তা নয়; প্রাচীন মিসরী ও বাবিলরাও গ্রীক্‌দের যবন নামে আখ্যাত করত। পহ্লব শব্দে পেহলবি ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। খশ শব্দে এখনও অর্দ্ধ সভ্য পার্ব্বত্য দেশবাসী আর্য্যজাতি; এখনও হিমালয়ে ঐ নাম ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীরাও এই অর্থে খশদের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আর্য্যজাতিরা প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্য্যদের লাল্‌চে সাদা রঙ্গ, কাল বা লাল চুল, সোজা নাক চোখ ইত্যাদি ; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ্গ ভেদে একটু তফাৎ। যেখানে রঙ্গ কাল, সেখানে অন্যান্য কাল জাতের সঙ্গে মিশে এইটি দাঁড়িয়েছে, এদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দু চার জাতি এখনও পূরো আর্য্য আছে, বাকি সমস্ত খিচুড়িজাত, নইলে কাল কেন হল? কিন্তু, ইউরোপী পণ্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশু লালচুল জন্মায়, কিন্তু দু চার বৎসরেই চুল ফের কাল হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।

এখন পণ্ডিতরা লড়ে মরুন। আর্য্য নাম হিঁদুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিঁদুদের নাম আর্য্য, বস্। কাল ব'লে ঘৃণা হয়, ইউরোপীরা অন্য নাম নিন্‌গে। আমাদের তায় কি?

কিন্তু কাল হোক, গোরা হোক, দুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী, সুন্দর। একথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে বলছি না, কিন্তু একথা জগৎ প্রসিদ্ধ। শতকরা সুশ্রী নরনারীর সংখ্যা এদেশের মত আর কোথায়? তার উপর ভেবে দেখ, অন্যান্য দেশে সুশ্রী হতে যা লাগে, আমাদের দেশে তার চেয়ে ঢের বেশী ; কেন না, আমাদের শরীর অধিকাংশই খোলা। অন্য দেশে কাপড় চোপড় ঢেকে, বিশ্রীকে ক্রমাগত সুশ্রী করবার চেষ্টা। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুখী। এ সব দেশে ৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে, ছোঁড়া বলে, ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোক যুবতী। অবশ্য এরা ভাল খায় ভাল পরে, দেশ ভাল, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আসল কথা হচ্ছে, অল্প বয়সে বে করে না। আমাদের যে দু একটা বলবান জাতি আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, কত বয়সে বে করে। গোর্‌খা পাঞ্জাবী, জাঠ আফ্রিদি প্রভৃতি পার্ব্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর, শাস্ত্র পড়ে দেখ,—৩০, ২৫, ২০,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বের বয়স। আয়ু বল বীর্য্য, এদের আর আমাদের, অনেক ভেদ ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা, তিন পেরুলেই ফরসা ; এরা তখন সবে গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে। আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে ; উদরভেঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। হৃদ্‌রোগে, ফুসফুস রোগে, এদের বুড় বুড়ী মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা কর-

ছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা প্রায়ই নিরুৎসাহ বৈরাগ্যবান হয়। হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে, আশা বিশ্বাস পূরো থাকে। ওলা-উঠা রুগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারুগী মর্‌বার সময় পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠ্‌বে। অতএব সেই জন্যেই কি, ভারতের লোক সর্ব্বদাই মরণ মরণ আর বৈরাগ্য বৈরাগ্য কর্‌ছে? আমি ত এখনও উত্তর দিতে পারি নাই; কিন্তু কথাটা ভাববার বটে। আমাদের দেশে দাঁতের রোগ, চুলের রোগ, খুব কম। এ সব দেশে অতি অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দাঁত, আর টাকের ছড়াছড়ি। আমরা নাক, ফুড়ছি, কান ফুড়ছি, গহনা পরবার জন্য। এরা এখন, ভদ্রলোকে বড়, নাক কাণ ফোড়ে না; কিন্তু কোমর বেঁধে বেঁধে, শির দাঁড়া বাঁকিয়ে, পীলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট ক'রে শরীরটাকে বিশ্রী করে গড়ন গড়ন করে এরা মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দি কাপড়ের উপর গড়ন রাখ্‌তে হবে। এদের পোষাক—কাজ কর্ম্ম করবার অত্যন্ত উপযোগী; ধনী লোকের স্ত্রীদের সামাজিক পোষাক ছাড়া মেয়েদের পোষাকও হতচ্ছাড়া। আমাদের মেয়েদের শাড়ী, আর পুরুষদের চোগা চাপকান পাগড়ীর সৌন্দর্য্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই। ভাঁজ ভাঁজ পোষাকে যত রূপ, তত আটাসাঁটায় হয় না। আমাদের পোষাক সমস্তই ভাঁজ ভাঁজ, কিন্তু আমাদের কাজ কর্ম্মের পোষাক নেই; কাজ কর্ত্তে গেলেই কাপড় চোপড় বিসর্জ্জন যায়। এদের ফ্যাসান্ কাপড়ে, আমাদের ফ্যাসান্ গয়নায়; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে। ফ্যাসান্‌টা কি, না—ঢঙ্গ; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ্গ—পারিস্ সহর থেকে বেরোয়, পুরুষদের—লণ্ডন থেকে। আগে পারিসের নর্ত্তকীরা এই ঢঙ্গ—ফেরাত। একজন বিখ্যাত নটী যা পোরলে, সকলে অমনি দৌড়ুল তাই কর্ত্তে। এখন দোকানিরা ঢঙ্গ করে। কত ক্রোর টাকা যে, এই পোষাক কর্ত্তে লাগে প্রতি বৎসর, তাহা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। এ পোষাক গড়া এক প্রকার বিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের, চুলের রঙ্গের সঙ্গে, কোন্ রঙ্গের, কাপড় মানস্ত হবে; কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্‌টা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি, অনেক মাথা ঘামিয়ে পোষাক তৈরি হয়। তারপর, দু চার জন উচ্চপদস্থ মহিলা যা করেন, বাকি সকলকে তাই পরতে হয়,—না পরলে জাত যায়!! এর নাম ফ্যাসন। আবার, এই ফ্যাসন ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে; বছরে চার ঋতুতে চার বার বদ্‌লাবেই ত, তা ছাড়া অন্য সময়েও আছে। যারা বড় মানুষ তারা দরজি

দিয়ে পোষাক করিয়ে নেয়; যারা মধ্যবিৎ ভদ্রলোক, তারা কতক নিজের হাতে, কতক ছুট্‌কো ছাট্‌কা মেয়ে দরজি দিয়ে, নূতন ধরণের পোষাক গড়িয়ে নেয়। পরবর্ত্তী ফ্যাসন যদি কাছাকাছি রকমের হয়, ত পুরাণ কাপড় বদ্‌লে সদ্‌লে নেয়, নতুবা নূতন কেনে। বড় মানুষরা কি ঋতুতে কাপড়গুলি চাকর বাকরদের দান করে। মধ্যবিত্তেরা বেচে ফেলে; তখন সে কাপড়গুলি ইয়োরোপী লোকেদের যে সমস্ত উপনিবেশ আছে,— আফ্রিকা, এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়ায়,—সেথায় গিয়ে হাজির হয় এবং তারা পরে। যারা খুব ধনী, তাদের কাপড় পারিস্ হতে তৈয়ার হয়ে আসে; বাকিরা নিজেদের দেশে সে গুলি নকল করে পরে। কিন্তু, মেয়েদের টুপিটী আসল ফরাসী হওয়া চাইই চাই। যার তা নয়, সে লেডি নয়। ইংরেজের মেয়েদের আর জর্ম্মাণ মেয়েদের পোষাক বড় খারাপ; ওরা বড় পারিস-ঢঙ্গে পোষাক পরে না,—দু দশ জন বড়মানুষ ছাড়া; এই জন্য অন্যান্য দেশের মেয়েরা ওদের ঠাট্টা করে। ইংরেজ পুরুষরা কিন্তু খুব ভাল পোষাক পরে,—অনেকেই। আমেরিকার মেয়ে পুরুষ সকলেই খুব ঢঙ্গসই পোষাক পরে। যদিও আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট পারিস্ বা লণ্ডনের আমদানী পোষাকের উপর খুব মাশুল বসায়, যাতে বিদেশী মাল এ দেশে না আসে—তথাপিও এরা মাশুল দিয়েও, মেয়েরা পারিস্ ও পুরুষরা লণ্ডনের তৈরি পোষাক পরে। নানা রকমের, নানা রঙ্গের, পশমিনা, বনাত, রেসমী কাপড় রোজ রোজ বেরুচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাইতে লেগে আছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাই কেটে ছেঁটে পোষাক ক'রছে। ঠিক ঢঙ্গের পোষাক না হলে, জেণ্টলম্যান্ বা লেডির রাস্তায় বেরুনই মুস্কিল। আমাদের দেশে এ ফ্যাসানের হাঙ্গাম কিছু কিছু গহনায় ঢুকছে। এ সব দেশের পশম-রেশম-তাঁতিদের নজর দিন রাত—কি বদ্‌লাচ্ছে বা না বদ্‌লাচ্ছে—লোকে কি রকম পসন্দ করছে—তার উপর, অথবা, নূতন একটা ক'রে লোকের মন আকর্ষণ ক'রবার চেষ্টা করছে। একবার আন্দাজ লেগে গেলেই, সে ব্যবসাদার বড়মানুস। যখন তৃতীয় নেপলেঅঁ ফরাসী দেশের বাদ্‌সা ছিলেন, তখন সাম্রাজ্ঞী অজেনি পাশ্চাত্য জগতের বেশ-ভূষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁর কাশ্মীরী শাল বড় পসন্দ ছিল। কাজেই লাখো টাকার শাল ইউরোপ প্রতি বৎসর কিনত। তাঁর পতন অবধি সে ঢঙ্গ বদ্‌লে গেছে। শাল আর বিক্রি হয় না। আর, আমাদের দেশের লোক দাগাই

বুলোয়; নূতন একটা কিছু ক'রে, সময় মত, বাজার দখল ক'র্ত্তে পারে না; কাশ্মীর বেজায় ধাক্কা খেলে; বড় বড় সদাগর গরীব হয়ে গেল। এ সংসার—দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর; কেউ কি কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দুশ হাত দিয়ে দেখ্‌ছে, খাট্‌ছে; আমরা—"গোঁসাইজি যা পুঁথিতে" লেখেন নি—তা কখনই ক'র্‌বো না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা ত অষ্টরম্ভা; খালি চীৎকার হ'চ্চে; বস্। কোণ্ থেকে বেরোও না দুনিয়াটা কি চেয়ে দেখ না। আপনা আপনি বুদ্ধি-শুদ্ধি আস্‌বে। দেবাসুরের গল্প ত জানই। দেবতারা আস্তিক—আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে, পরলোকে বিশ্বাস রাখে। অসুররা বলছে—ইহলোক এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকে সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সে কথা হ'চ্ছে না। বরং পুরাণের অসুর গুলোই ত দেখি, মনিষ্যির মত; দেবতাগুলো ত অনেকাংশে হীন। এখন যদি বোঝ যে, তোমরা দেবতার বাচ্ছা, আর পাশ্চাত্যরা অসুরবংশ, তা হ'লেই, দু দেশ বেশ বুঝতে পার্‌বে।

দেখ শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধি হচ্চে—পবিত্রতা। মাটি জল প্রভৃতির দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয়। উত্তম; দুনিয়ায় এমন জাত কোথাও নাই, যাদের শরীর হিঁদুদের মত সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোনও জাত জলশৌচাদি করে না। তবু পাশ্চাত্যদের, চীনেরা কাগজ ব্যবহার করাতে শিখিয়েছে,—কিছু বাঁচোয়া। স্নানও নেই বল্‌লেই হয়। এখন ইংরেজরা ভারতে এসে, স্নান ঢুকিয়েছে দেশে। তবুও যে সব ছেলেরা বিলেতে পড়ে এসেছে, তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, স্নানের কি কষ্ট। যারা স্নান করে—সে সপ্তায় এক দিন—সে দিন ভেতরের কাপড়. অণ্ডার-ওয়ার বদ্‌লায়। অবশ্য, এখন পয়সাওয়ালাদের ভেতর অনেকে নিত্যস্নায়ী। আমেরিকান্‌রা একটু বেশী। জর্ম্মান্—কালেভদ্রে; ফরাসী প্রভৃতি কস্মিন্‌কালেও না!!! স্পেন ইতালী অতি গরম দেশ, সে আরও নয়—রাশীকৃত লসুন খাওয়া, দিন রাত ঘর্ম্মাক্ত, আর ৭ জন্মে জলস্পর্শও না। সে গায়ের গন্ধে ভূতের চোদ্দ পুরুষ পালায়—ভূত ত ছেলে মানুষ। 'স্নান' মানে কি—মুখটি মাথাটি ধোয়া, হাত ধোওয়া—যা বাইরে দেখা যায়। আবার কি? পারিস্, সভ্যতার রাজধানী পারিস্, রঙ্গ ঢঙ্গ ভোগ বিলাসের ভূস্বর্গ পারিস্, বিদ্যা শিল্পের কেন্দ্র পারিস্, সেই পারিসে, এক বৎসর, এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আন্‌লেন। এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুল্‌লেন,—রাজভোগ খাওয়া দাওয়া; কিন্তু,—স্নানের নামটী নেই। দু দিন

ঠায় সহ্য ক'রে—শেষ আর পারা গেল না। শেষ, বন্ধুকে বল্‌তে হলো—দাদা তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন "ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি" হয়েছে। এই দারুণ গরমীকাল, তাতে স্নান করবার জো নাই; হন্যে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে চটে বল্‌লেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে না, চল ভাল যায়গা খুঁজে নিইগে। ১২টা প্রধান প্রধান হোটেলে খোঁজা হলো, স্নানের স্থান কোথাও নাই। আলাদা স্নানাগার সব আছে, সেথানে গিয়ে ৪।৫ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি! সে দিন বিকেলে কাগজে পড়া গেল—এক বুড়ি স্নান ক'র্ত্তে টবের মধ্যে বসেছিল, সেই খানেই মারা পড়েছে!! কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ির চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাৎ!! এর একটি কথা অতিরঞ্জিত নয়। রুষ রুস্ গুলো ত আসল ম্লেচ্ছ; তিব্বৎ থেকেই ও ঢং আরম্ভ। আমেরিকায় অবশ্য প্রত্যেক বাসাবাড়িতে একটা করে স্নানের ঘর ও জলের পাইপের বন্দোবস্ত আছে।

কিন্তু তফাৎ দেখ। আমরা স্নান করি কেন?—অধর্ম্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যরা হাত মুখ ধোয়—পরিষ্কার হবে ব'লে। আমাদের—জল ঢাললেই হলো, তা তেলই বেড় বেড় করুক, আর ময়লাই লেগে থাকুক। আবার, দক্ষিণি ভায়া স্নান করে এমন লম্বা চওড়া তেলক কাটলেন যে, ঝামারও সাধ্য নয় তাঁকে ঘ'সে তোলে। আবার আমাদের স্নান সোজা কথা, যেখানে হ'ক ডুব লাগালেই হ'ল। ওদের সে এক বস্তা কাপড় খুল্‌তে হবে, তার বন্ধনই বা কি! আমাদের গা দেখাতে লজ্জা নেই; ওদের বেজায়। তবে পুরুষে পুরুষে কিছুমাত্র নেই—বাপ বেটার সাম্‌নে উলঙ্গ হবে—দোষ নাই। মেয়ে ছেলের সাম্‌নে আপাদ মস্তক ঢাক্‌তে হবে।

'বহিরাচার' অর্থাৎ পরিষ্কার থাকাটা, অন্যান্য আচারের ন্যায়, কখন কখন অত্যাচার বা অনাচার হয়ে পড়ে। ইউরোপী বলে যে, শরীর সম্বন্ধি সমস্ত কার্য্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই শৌচাদি ত দূরের কথা; লোক মধ্যে থুথু ফেলা একটা মহা অভদ্রতা। খেয়ে আঁচান সকলের সাম্‌নে, অতি লজ্জার কথা, কেন না কুলকুচো করা তায় আছে। লোকলজ্জার ভয়ে, খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে;—ক্রমে দাঁতের সর্ব্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার। আমাদের আবার, দুনিয়ার লোকের সাম্‌নে, রাস্তায় বসে, বমির নকল কর্ত্তে কর্ত্তে মুখধোওয়া, দাঁত মাজা, আঁচান,—এটা অত্যাচার।

ও সমস্ত কার্য্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।

আবার, দেশ ভেদে যে সকল কার্য্যগুলো অনিবার্য্য, সে গুলো সমাজ সয়ে নেয়। আমাদের গরমদেশে খেতে বসে আদ ঘড়াই জল খেয়ে ফেলি—এখন ঢেঁকুর না তুলে যাই কোথা; কিন্তু, ঢেঁকুর তোলা পাশ্চাত্যদেশে অতি অভদ্রের কাজ। কিন্তু, খেতে খেতে রুমাল বার করে দিব্যি নাক ঝাড়—তত দোষের নয়; আমাদের দেশে ঘৃণার কথা। এ ঠাণ্ডা দেশে নাক না ঝেড়ে মধ্যে মধ্যে থাকা যায় না।

ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা ক'রে, আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে, ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচ্‌তে দিই। না ছুঁলেই হল। এদিকে যে, নরককুণ্ডে বাস হচ্ছে তার কি? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একটা গুরুতর পাপ কর্‌ছি। যার বাড়ীতে ময়লা, সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার সাজাও তাকে ম'রে পেতে হবে না,—অপেক্ষাও বড় বেশী কর্ত্তে হবে না।

আমাদের রান্নার মত পরিষ্কার রান্না কোথাও নেই। বিলেতি খাওয়ার শৃঙ্খলার মত পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নাই। আমাদের রাঁধুনি স্নান করেছে; কাপড় বদ্‌লেছে; হাঁড়ি পত্র, উনুন, সব ধুয়ে মেজে সাফ করেছে; নাকে, মুখে, গায়ে, হাত ঠেক্‌লে, তখনি হাত ধুয়ে, তবে আবার খাদ্যদ্রব্যে হাত দিচ্ছে। বিলিতি রাঁধুনীর চোদ্দ পুরুষে কেউ স্নান করেনি; রাঁধতে রাঁধতে চাখ্‌ছে, আবার সেই চাম্‌চে হাঁড়িতে ডোবাচ্ছে। রুমাল বার করে, ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লে, আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল—কাগজ ব্যবহার ক'রে, সে হাত ধোবার নামটিও নেই—সেই হাতে রাঁধতে লাগলো। কিন্তু, ধপ্‌ধপে কাপড়, আর টুপি পরেছে। হয়ত, একটা মস্ত কাঠের টবের মধ্যে দুটো মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে, রাশীকৃত ময়দার উপর নাচ্‌ছে,—কিনা ময়দা মাখা হচ্ছে। গরমীকাল দর-বিগলিত ঘাম, পা বেয়ে, সেই ময়দায় সেঁদুচ্ছে। তার পর, তার রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন দুগ্ধফেননিভ তোয়ালের উপর চীনের বাসনে সজ্জিত হয়ে, পরিষ্কার চাদর বিছানো টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড় পাতা, কনুই পর্য্যন্ত সাদা দস্তানা পরা চাকর, এনে সাম্‌নে ধর্‌লে। কোনও জিনিষ হাত দিয়ে পাছে ছুঁতে হয়, তাই কনুই পর্য্যন্ত দস্তানা।

আমাদের স্নান-করা বামুন, পরিষ্কার বাসনে, পরিষ্কার হাঁড়িতে, শুদ্ধ হয়ে রেঁধে, গোময়সিক্ত মাটির উপর থালশুদ্ধ অন্ন ব্যঞ্জন ঝাড়্‌লে; বামুনের কাপড়ে ঘাম্‌চে ময়লা উঠ্‌ছে। হয় ত, মাটি ময়লা গোবর আর ঝোল, কলাপাতা ছেঁড়ার দরুণ, একাকার হয়ে, এক অপূর্ব্ব আস্বাদ উপস্থিত কর্‌লে!!

আমরা দিব্যি স্নান ক'রে, এক খানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম; আর ইউরোপে, ময়লা গায়ে, না নেয়ে, একটি ধপ্‌ধপে পোষাক পর্‌লে। এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগা গোড়ার তফাৎ—হিঁদুর সেই যে অন্তর্দ্দৃষ্টি, তা আগা পাস্তলা সমস্ত কাজে। হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলিতী, সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হক্! বিলিতীর কাপড় সাফ থাক্‌লেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ্, তার বাইরে নরক-কুণ্ড থাকুক না কেন! বিলিতীর মেজে কারপেট মোড়া ঝক্‌ঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাক্‌লেই হল!! হিঁদুর পয়নালী রাস্তার উপর—দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না! বিলিতীর পয়নালী রাস্তার নীচে—টাইফয়ড্ ফিবারের বাসা!! হিঁদু কর্চ্ছেন ভেতর সাফ্! বিলিতী কর্চ্ছেন বাইরে সাফ্!

চাই কি?—পরিষ্কার শরীরে, পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখ ধোয়া, দাঁতমাজা, সব চাই—কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই, রাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনি, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই; আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে, পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই। আচারঃ প্রথমোধর্ম্ম; আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া, সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচারভ্রষ্টের কখন ধর্ম্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখ্‌ছো না, দেখেও শিখ্‌ব না। এত ওলাউঠো, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া; কার দোষ?—আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী!!!

---

# হীরক-তত্ত্ব।

বাবু অনুকূলচন্দ্র ঘোষ।]  [৩৩৩ পৃষ্ঠার পর।

**হীরকের রাসায়নিক গবেষণা।**

একখণ্ড কয়লার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কখন কি মনে হয় যে, ঐ সামান্য পদার্থ হইতেই, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে হীরকের উৎপত্তি হইয়াছে? বস্তুতঃ হীরক আর কিছুই নহে, ইহা বিশুদ্ধ কয়লার রূপান্তর মাত্র। এই অভিনব প্রকৃত তত্ত্ব কিরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা পর্য্যা-

লোচনা করিতে হইলে, রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসের এক বিশেষ পরিচ্ছেদের অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের বিজ্ঞানসভার পণ্ডিতেরা বিশেষরূপে নির্ম্মিত দর্পণের সাহায্যে সূর্য্যের উত্তাপ সংগৃহীত করিয়া, কিয়ৎখণ্ড হীরক ভস্মীভূত করেন। টেনাণ্ট সাহেব এক স্বর্ণনির্ম্মিত [illegible]লের মধ্যে সোরা গলাইয়া, তাহাতে একখণ্ড হীরক নিক্ষেপ করেন। [illegible] সোরার সংস্পর্শে হীরক উজ্জ্বলরূপে জ্বলিয়া অদৃশ্য হইল। কিন্তু, সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ পাত্রে যখন হীরক উত্তপ্ত করা হইল, তখন উহা পরিবর্ত্তিত হইল না। এই সকলের কারণ নির্ণয় করিতে, কেহই সমর্থ হইলেন না।

পটাসিয়ম্ ক্লোরেট্ নামক যৌগিকপদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে, অক্সিজেন গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস্ পরিষ্কার কাচনির্ম্মিত পাত্রে সংগ্রহ করিয়া, যদি তাহাতে একখণ্ড জলন্ত কয়লা রাখা যায়, তাহা হইলে কয়লাখানি অধিক দীপ্তিশালী হইবে। এক্ষণে ঐ পাত্রে কিঞ্চিৎ বর্ণহীন চূণের জল নিক্ষেপ করিলে, উহা দুগ্ধের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হইবে। ইহার কারণ কি? জলন্ত কয়লা ও অক্সিজেন পরস্পরের সংসর্গে আসিয়া রাসায়নিক আকর্ষণ প্রভাবে মিলিত হইয়া, এক নূতন গ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এই নূতন গ্যাসের নাম কার্ব্বণিক্ এসিড্ বা কার্বন্-ডাইঅক্সাইড্। আবার পাত্রে নিক্ষিপ্ত চূণের জলের সহিত, এই নূতন গ্যাস মিশ্রিত হইয়া, আর এক নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। এই নূতন পদার্থই চূণের জলের শ্বেতবর্ণের কারণ। ইহা আর কিছুই নহে, ইহা অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত খড়ি।

বর্ত্তমান রসায়নশাস্ত্রের স্থাপনকর্ত্তা, প্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত লাভোয়াসিয়ে একখণ্ড হীরক বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কাচপাত্রে স্থাপিত করিয়া, ঐ পাত্রটীকে পারদের উপর রাখিলেন। আতস-কাচের সাহায্যে সূর্য্যকিরণ হীরকের উপর নিক্ষিপ্ত হইলে, প্রচণ্ড উত্তাপে হীরকখণ্ড জ্বলিয়া উঠিল ও ভস্মে পরিণত হইল। এইরূপে কাচপাত্রে যে গ্যাস উৎপন্ন হইল, তাহা পরিষ্কার চূণের জল শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট করিল। কিন্তু, কেবল কার্বণিক এসিড্ গ্যাস এইরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট হওয়ায়, এই অনুমান করা গেল যে, কাচপাত্রস্থিত বিশুদ্ধ বায়ু হইতে উত্তপ্ত হীরকখণ্ড অক্সিজেন্ আকর্ষণ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া, কার্বণিক্ এসিড্ গ্যাসে পরিণত হইয়াছে। আবার পূর্ব্বের পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, জলন্ত কয়লা ও অক্সিজেন,

কার্বণিক এসিড্ গ্যাস্ উৎপন্ন করে। অতএব, এ স্থলে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, হীরকে কয়লা বর্ত্তমান। কিন্তু এই পরীক্ষা হইতে হীরক যে কয়লার রূপান্তর মাত্র, তাহা নিরূপিত হইতে পারে না।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক সার্ হাম্ফ্রিডেভি ইটালির অন্তর্গত ফ্লোরেন্সের গ্র্যাণ্ড ডিউকের বিশেষরূপে নির্ম্মিত আতস-কাচের সাহায্যে কয়েকখণ্ড হীরক দগ্ধ করেন। ল্যাভোয়াসিয়ে পূর্ব্বেই হীরকে কয়লার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ডেভি হীরকে হাইড্রোজেন আছে কি না, দেখিতে লাগিলেন। অগ্নিশিখার সংস্পর্শে হাইড্রোজেন গ্যাস্ প্রজ্বলিত হয়। প্রজ্বলিত হাইড্রোজেন্ অক্সিজনের সহিত মিলিত হইলে, জলের উৎপত্তি হয়। সেই জন্য ডেভি বিশুদ্ধ অক্সিজনে একখণ্ড হীরক দগ্ধ করিলেন। কিন্তু, বিন্দুমাত্র জল দেখিতে না পাইয়া, তিনি স্থির করিলেন যে হীরকে হাইড্রোজেন্ নাই।

কিন্তু এখনও রাসায়নবিদেরা স্থির হইলেন না। আরো অনেক পরীক্ষা হইতে লাগিল। অবশেষে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সমান ওজনের হীরক, কয়লা ও গ্রাফাইট্ (পেন্সিলের সিস্) দগ্ধ করিয়া দেখা গেল যে, প্রত্যেক পাত্রে একই ওজনের কার্বণিক এসিড্ গ্যাস্ উৎপন্ন হইয়াছে। তখন হীরক, কয়লা ও গ্রাফাইট্ যে পরস্পরের রূপান্তর মাত্র, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না।

এই খানেই যে হীরক সম্বন্ধে গবেষণা শেষ হইল তাহা নহে।

## কৃত্রিম হীরক।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিলাতের রয়াল ইন্ষ্টিটিউসনে প্রফেসার ম্যাস্কেলিন হীরকের বিষয় বক্তৃতা করেন; তিনি উপসংহারে বলিয়াছিলেন যে, হীরক প্রস্তুত করা মানবের সাধ্যাতীত। কিন্তু, হীরক প্রস্তুত করা এখন আর স্বপ্নকল্পিত'র বিষয় নহে; কারণ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সুবিখ্যাত ফরাসি রসায়নবেত্তা মোয়াসাঁ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সুমিষ্টতার জন্য চিনির বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু কয়লা, অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্ গ্যাস্, রাসায়নিক আকর্ষণ প্রভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া, ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট এই সুমিষ্ট বস্তু উৎপাদন করিয়াছে। চিনির মধ্যে যে কয়লা বর্ত্তমান,

তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। অল্প পরিমাণ চিনির সহিত, অর্দ্ধভাগ ক্লোরেট্-অফ্-পটাস্ মিশ্রিত করিয়া, তাহার উপর সাবধানে এক বিন্দু সল্-ফিউরিক এ্যসিড্ ফেলিয়া দিলে, ঐ মিশ্রিত দ্রব্য প্রজ্বলিত হইবে। তৎপরে দৃষ্ট হইবে যে, ঐ দুই দ্রব্যের স্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পদার্থ কয়লা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ক্লোরেট্ অফ্ পটাস্ নামক যৌগিক পদার্থ, পটাসিয়াম্ নামক ধাতু এবং ক্লোরিন্ ও অক্সিজেন্ গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত। সল্‌ফিউরিক্-এ্যসিড্, গন্ধক, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ হইতে উৎপন্ন। এই দুই পদার্থে কয়লার লেশ মাত্র নাই। অতএব, ঐ কয়লা যে চিনির অংশীভূত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সল্‌ফিউরিক এ্যসিডের সংযোগে যে রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রভাবে চিনি ও ক্লোরেট্-অফ্-পটাসের অন্তর্ভূত, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন ও ক্লোরিন্ পরস্পর মিলিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ, ঐ সকল বস্তু হইতে কয়লা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মোয়াসাঁ এই কয়লা বিশুদ্ধ করিয়া চাপের প্রভাবে হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মোয়াসাঁ ইলেক্ট্রিক ফার্নেস্ নামক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। তাড়িতের সাহায্যে, ইহাতে যে প্রচণ্ড উত্তাপ উৎপাদিত হয়, তদ্দ্বারা প্লাটিনাম্, ইস্পাৎ, লৌহ প্রভৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্রবীভূত হয়। হীরক প্রস্তুতের নিমিত্ত, বিশুদ্ধ কয়লা ও লৌহ এক কার্বন্-নির্ম্মিত পাত্রে মিশ্রিত করিয়া, পাত্রটী ইলেক্ট্রিক্ ফার্নেসে স্থাপিত হইলে, লৌহ শীঘ্র দ্রব হইয়া কয়লার সহিত মিলিত হয়। চারি সহস্র ডিগ্রি উত্তাপে কয়েক মিনিট রাখিয়া, পরে ঐ রক্তবর্ণ পাত্রটীকে শীতল জলে ডুবাইতে হয়। দ্রব লৌহ সহসা শীতল হইয়া কঠিন হইয়া যায়। কঠিন হইবার সময় লৌহ ভিতরের কয়লার উপর এরূপ চাপ প্রয়োগ করে যে, ঐ কয়লা হীরকে পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক সকল লৌহের সহিত এরূপ সংলগ্ন হইয়া যায় যে, তাহাদিগকে বিভিন্ন করা সহজ নহে। এই জন্য সাবধানে সল্‌ফিউরিক্, নাইট্রিক্, হাইড্রোক্লোরিক্ ও হাইড্রোফ্লুওরিক্ এ্যসিডের সাহায্যে লৌহাদি গলাইয়া ফেলিতে হয়, এবং পরে, জলে বারম্বার ধৌত করিয়া শুষ্ক করিলে, কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড পতিত থাকে। এই সকল হীরক এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহাদিগকে দেখিতে হইলে অনুবীক্ষণের সাহায্য

লইতে হয়। বহু চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ আনুবীক্ষণিক হীরক প্রস্তুত হইয়াছে। ক্রমে উৎকৃষ্ট যন্ত্র উদ্ভাবিত হইলে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুবৃহৎ হীরক প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে।

সমাপ্ত।

---

# কোন্ পথে যাই ?

( ভিক্ষু দেবী দাস লিখিত। )

ছেলেবেলা হইতেই আমার মনে উদয় হইত—ঈশ্বর কি, আমি কে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে কোন্‌টীতে কতদূর সত্য, ইত্যাদি। হয় ত স্কুলে যাইতেছি, মনে উদয় হইল, আমি কে,—সে যে কিরূপ ভাব, তাহা আমি মুখে বলিতে পারি না, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতাম। এক দিন স্কুলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'যথার্থ কি ঈশ্বর আছেন ?' মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিলাম—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। সেই সময়ে স্কুলের কোন রচনা লিখিতে হইলে, পদ্ধতিমত এইরূপে আরম্ভ করিতাম, 'ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে জগতে কত কি অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে।' 'ঈশ্বর নাই' এই সিদ্ধান্ত স্থির করিবার পর মনে মনে ভাবিলাম, আর ঈশ্বরের নাম এইরূপে লেখা হইবে না। কিন্তু, এইরূপ সিদ্ধান্তে স্থির হইতে পারিলাম না। সে দিন পড়া শুনা নামমাত্র হইল। সমস্ত দিন এই চিন্তা—যদি ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই, তবে ঈশ্বরচিন্তারই বা প্রয়োজনীয়তা কি ? সেই সময়ে একটী স্বাভাবিক বিশ্বাস এই ছিল যে, চরিত্র ভাল করা দরকার। স্কুল হইতে বাটী যাইতে যাইতে সিদ্ধান্ত করিলাম,—ঈশ্বর না থাকিলেও, ঈশ্বর চিন্তা করিবার কারণ এই,—সাধুসঙ্গ ব্যতীত চরিত্র উন্নত হয় না। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা দুর্লভ। সুতরাং, ঈশ্বর অর্থাৎ একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুরুষ কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহার চিন্তা করিলে, দিবারাত্রি সাধুসঙ্গের কার্য্য হয় ; সুতরাং চরিত্রেরই উন্নতি হইতে থাকে। এই সিদ্ধান্তেই তখন কতকটা মন স্থির হইল।

আর এক দিনের কথা—স্কুল হইতে রাস্তায় যাইতে যাইতে মনে হঠাৎ উদয় হইল, কালী নাম করা যাক্, কোন বিপদ্ হইবে না। এই মনে করিয়া 'কালী কালী' মনে মনে জপ করিতে লাগিলাম। এইরূপে খানিক দূর গিয়াছি,

একজন ঢিল খেলিতেছিল ; তার একটা ঢিল পায়ে এমন জোরে লাগিল যে, তাহাতে অনেক দিন ভুগিতে হইল। সেই অবধি কালী আদি দেবতাতে একেবারে অবিশ্বাস হইল।

এ সব বলিলাম, বালকের স্বপ্নের কথা—জগতের ভিতর নূতন আসিয়াছি—অপরিপক্কবুদ্ধি। ক্রমশঃ অল্প বয়সেই নানারূপ অবস্থার সংঘর্ষণে, পাপপুণ্যের ঘাতপ্রতিঘাতে, সদ্বন্ধুর পরামর্শ ফলে, ঈশ্বর, পরকাল ও আত্মার অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী হইলাম,—হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করিতে লাগিলাম—উপনিষৎ, বেদান্ত, গীতা, পাতঞ্জল, পঞ্চদশী, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ, চৈতন্যচরিতামৃত, বাইবেল, বুদ্ধচরিত, এবং আজকালকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা পুস্তক পত্রিকা পড়িতে লাগিলাম। ধার্ম্মিক লোক আসিলেই, তাহার সহিত আলাপ করিতাম। নিয়মিত সন্ধ্যা আহ্নিক ঈশ্বরোপাসনাদিও করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ চিত্তের মলিনতা অনেক দূর হইতে লাগিল।

এই সময়ে অনেকে, এমন কি, পিতা মাতা পর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দিতেন ; কিন্তু সকলেই ভিতরে ভিতরে আমাকে একটা শ্রদ্ধা করিত, বুঝিতাম। চিত্ত কতকটা নির্ম্মল হইলেও, চিত্তমধ্যে কখন কখন সদসৎ প্রবৃত্তির তুমুল সংগ্রাম বাধিত। আবার, ধর্ম্মে ও ঈশ্বরে একরূপ বিশ্বাস স্থির হইলেও, ধর্ম্মের ভিতরকার অন্যান্য অনেক বিষয় লইয়া নানাবিধ সংশয় আসিতে লাগিল। বেদান্তাদি পড়িয়া মনে হইত—জ্ঞানই প্রকৃত সত্য ও আমাদের লক্ষ্য, ভক্তি—নিকৃষ্টসাধনমাত্র, বিশেষতঃ, যোগবাশিষ্ঠে ত উহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতই রহিয়াছে। আবার চৈতন্যচরিতামৃত এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে, এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতেও ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তিত, এবং জ্ঞান অতি নিম্ন অবস্থা ও মুক্তি অতি তুচ্ছ লিখিত রহিয়াছে দেখিতাম। এই সব বিষয় লইয়া অনেকের সঙ্গে কথ বার্ত্তা কহিতাম। কিন্তু কেহই এ বিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিত না। বিষয়ী লোকে কি করিয়াই বা দিবে ?

যাহা হউক, ধর্ম্মে, বিশ্বাসের প্রথম অবস্থা হইতেই, এইরূপ একটা ধারণা দাঁড়াইয়াছিল যে, সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া কোন মহাপুরুষ যোগীর শিষ্য হওয়া ব্যতীত, দুর্লভ মুক্তিমার্গে আরোহণ, সাংসারিক অবস্থার মধ্যে একেবারে অসম্ভব। ক্রমশঃ এই ভাব বদ্ধমূল হইতে হইতে,একদিন বাটী হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া নিঃসম্বলে একবস্ত্রে প্রস্থান করিলাম। সময় হইলে পাঠক বর্গের নিকট সেই সকল ভ্রমণকাহিনী বর্ণিব। তাহাতে

সংসারের নানাবিধ বিষয় দেখিয়াছি ও শিখিয়াছি। এই ভ্রমণে অনেক কষ্টও পাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে যে এক স্থিরজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহা অনেক পুস্তক পড়িয়াও লাভ করি নাই। যাহা হউক, আমি একটী বিষয় আপনাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেইটী আমার পরম পূজনীয় গুরুদেবের বিষয়, আর তাঁহার কৃত জ্ঞান ভক্তির অদ্ভুত মীমাংসা। এই দুইটী বিষয় ভাল করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। আজকাল, বাঙ্গালায় ধর্ম্মের আন্দোলন বিশেষ দেখা যাইতেছে; কিন্তু এক আধটী সম্প্রদায় ও দুই চারিজন ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত মহাপুরুষ ব্যতীত, সকলেই কেহ জ্ঞান বড়, কেহ ভক্তি বড় বলিয়া, পরস্পরে বিবাদ করিতেছেন। এই বিবাদ যে একেবারেই একটী ভ্রমপ্রসূত, ইহা আমি গুরুদেবের কৃপায় প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি এবং আমার এই বিষয়ে যে ঘোর সন্দেহ ছিল, তাহা মিটিয়া গিয়াছে।

আমি প্রথমে নবদ্বীপ গেলাম। সেখানে অনেক শাস্ত্রবিৎ ভক্ত গোস্বামী ও অন্যান্য অনেক ভক্ত বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইল—সকলেই ভক্তির প্রাধান্য বর্ণনা করিলেন; কিন্তু আমি বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলাম এই দেখিয়া যে, এই সকল ভক্তগণ গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাঁহার প্রধান শিক্ষা যে বিনীতভাব, তাহার বিপরীত ভাবের পরিচয় দিলেন। আরও অনেকের চরিত্র বড় অনুকরণীয় দেখিলাম না। তাঁহারা জ্ঞানকে নিন্দা করিলেন, শুষ্ক তর্ক প্রধান বলিয়া; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই জ্ঞানকে খণ্ডন করিবার সময় শুষ্ক তর্কের উপর বিলক্ষণ অনুরাগ দেখিলাম। মোট কথা, দেখিয়া শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইল না। তার পর, জ্ঞানের কেন্দ্র, হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র বারাণসীধামে গমন করিলাম। এখানেও আমি ভগ্নাশ হইলাম। অধিকাংশ সাধুই এখানে জ্ঞানপ্রাধান্য কীর্ত্তন করিলেন এবং ভক্তিকে দুর্ব্বলতা, অথবা নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য বলিয়া বর্ণনা করিলেন; কিন্তু দেখিলাম, তাঁহাদের অনেকেরই বিলক্ষণ দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। এই সকল কথা বলিলাম বলিয়া, এমন কেহ বিবেচনা করিবেন না যে, নবদ্বীপ একেবারে ভক্তশূন্য,বা কাশী একেবারে জ্ঞানশূন্য,অথবা সকল সাধুর চরিত্রই আদর্শ হইতে অনেক নিম্নে। কিন্তু অনেক উন্নতচরিত্র সাধু থাকিলেও, জ্ঞান বা ভক্তি এই উভয়ের একের উপর গোঁড়ামী নাই, এমন একটীও সাধু দেখিলাম না।

বারম্বার এই সকল নৈরাশ্যের পর একদিন ভগ্নমনে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতেছি, এমন সময়ে একটী বেশ দিব্য লাবণ্যশালী সাধু উপযাচক হইয়া,

আমার সহিত আলাপ করিলেন। ইনি বাঙ্গালী- ইঁহার প্রকৃতি অতি মধুর দেখিলাম—একদিনেই মন কাড়িয়া লইলেন ; শুনিলাম,ইনি শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। এই সম্প্রদায়ের গুরু রামানুজ। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কাশীতে থাকিবে, না আর কোথাও যাইবে ? আমি বলিলাম, কাশীতে থাকিবার আর ইচ্ছা নাই। হিমালয়ের দিকে কোথাও যাইব, গিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পরমাত্মার চিন্তা করিব। দেখি, কিছু তত্ত্ব পাই কি না। মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, বেশ, আমারও ঐ দিকে যাইবার ইচ্ছা। বিশেষতঃ শীঘ্রই হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইবে, তাহাতে অনেক সাধু শাস্তের সমাগম হইবে, পূর্ব্ব পরিচিত অনেক সাধুও তথায় উপস্থিত হইবেন,তাঁহাদের সহিত মিলিত হইব, বড় ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা হয় ত, আমার সঙ্গে চল। আমি এই প্রস্তাবে বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমার আনন্দিত হইবার দুইটী কারণ ছিল। এক,—এতদিন ঘুরিয়া, বুঝিয়াছিলাম, একলা ঘোরা ঠিক নয়, তাহাতে নানারূপ প্রলোভন আছে ; দ্বিতীয়—ইনি শ্রীসম্প্রদায়ী.ইঁহার নিকট রামানুজের মতাদি বিশেষরূপে জানিতে পারিব। আমি রামানুজের নাম মাত্র শুনিয়াছিলাম। তাঁহার মতাদি বিশেষ কিছুই জানিতাম না, কারণ বঙ্গদেশে তাঁহার মত বা জীবন বিশেষ প্রচার নাই। এই উদ্বোধনেই, আমি প্রথম তাঁহার জীবনী ও তাঁহার দর্শন পড়িতেছি। আর, এ লোকটীর সহিত সামান্য কথাবার্ত্তায়ই বোধ হইল, ইনি কোন পণ্ডিত ; বিশেষ, বড় মধুর প্রকৃতি। মধুর প্রকৃতির কারণ এই বুঝিলাম, ইনি শুধু পণ্ডিত নন, ইঁহার সাধনার প্রতিও কিছু লক্ষ্য আছে। যাহা হউক, ইঁহার সহিত পদব্রজে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম। পথে রামানুজের মত দর্শনাদি সম্বন্ধে অনেক অবগত হইলাম। দেখিলাম, ইনিও বাগে পাইলে শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার মতের উপর কটাক্ষ করেন ; তবে অনেকটা গোঁড়ামী কম,বেশ সত্যানুসন্ধিৎসু, অপর সকলের মত নেয়েঅঁাকড়ে তর্ক করেন না ; আর ইঁহার ভগবানের প্রতি বেশ প্রেমও আছে। মধ্যে মধ্যে ভজন করিতেন, তাহাতে অনেক সময় প্রেমাশ্রু ঝরিত।

তিনি বলিতেন,দেখ,শঙ্করের মত শুষ্ক—'অহং ব্রহ্মাস্মি'একরূপ বাতুলতা, ইহাতে অহঙ্কারাদিই বৃদ্ধি পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি চুপ করিয়া থাকিতাম। কিন্তু মনে মনে ইঁহার ভাবে মুগ্ধ হইলেও, ইঁহার সব মতে সায় দিতে পারিতাম না।

হরিদ্বারে পঁহুছিলাম। হরিদ্বার বেশ জায়গা, নির্জ্জন, সাধন ভজনের বেশ অনুকূল। কুম্ভমেলার এখনও কিছু দেরি আছে। দিন কতক বেশ গঙ্গাস্নান,

বিল্বকেশর মহাদেব দর্শন, ও নিকটবর্ত্তী চারিদিকে ভ্রমণাদি করিলাম। গঙ্গা এখানে খুব সরু। আর একটী প্রীতিকর দৃশ্য—গঙ্গায় সব মাছ খেলিতেছে—নির্ভয়—এখানে হিংসার নিয়ম নাই। কত লোকে মাছগুলিকে ময়দার গুলি পাকিয়ে দিতেছে—মাছগুলি নির্ভয়ে তাহা খাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল। মনে হইল, যদি সকল মানুষ যথার্থ প্রাণে প্রাণে—মনে কোন কুটিলতা না রাখিয়া, অহিংসা অবলম্বন করিতে পারে, তবে এই সংসারই সত্বর কৈলাসপুরী রূপে পরিণত হয়—ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত মানুষের কাছে হিংসা ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে ; কিন্তু সে আশা এখনও বহু দূরে। এখনও মানুষ, বিনা কারণে বা সামান্য কারণে তাহার ভ্রাতা অপর মানুষের গলায় ছুরী দিতে কুণ্ঠিত হয় না,—সে আবার ইতর জন্তুর প্রতি হিংসাশূন্য হইবে ?

---

# আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে। ] [ ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর।

৩১ শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে তেজপুর হইতে জাহাজ ছাড়িল। আজ বৎসর শেষ হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটা শতাব্দিও চলিয়া গেল। এই একশত বৎসরে পৃথিবীতে কত প্রলয় বিপ্লব, কত মহামারী, কত খণ্ডপ্রলয় হইয়া গেল, কত কোটী কোটী নর নারী জন্মগ্রহণ করিল, কত কোটী কোটী মরিয়া গেল, তাহার ঠিকানা রাখে কে ? এই ভারতেই বা কত পরিবর্ত্তন ঘটিল। এই এক শত বৎসরে, ভারতে কত রাজনৈতিক, কত সামাজিক, অধিক কি, কত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহার হিসাব করিতে গেলে, রাশি রাশি পুস্তক হইলেও লিখিয়া শেষ করা যায় না! প্রবলপ্রতাপ মুসলমানসাম্রাজ্য কোথায় ভাসিয়া গেল,—সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণের আধিপত্য কোথায় লুক্কায়িত হইল—তাহা ভাবিয়া দেখুন! সাহিত্য, সংবাদপত্র প্রভৃতি নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে রেল-বিস্তার, টেলিগ্রাফ, প্রভৃতির সাহায্যে, দেশ মধ্যে কেবল যে বাণিজ্য ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নহে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত ধনবৃদ্ধিরও সহায়তা হইয়াছে—পুরাতন শিল্প অনেক লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সে স্থান আধুনিক অপরাপর শিল্প দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। বলিবার, লিখিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু আপনার "উদ্বোধনে" সে স্থান কোথা ? আর আমারই বা সে বিদ্যা কোথায় ?

কোকিলা-মুখে আসিতে দুই দিন লাগিল। কোকিলা-মুখের নাম শুনিয়াই সেই শুকরমনির নাম মনে পড়িল। ১৬।১৭ বৎসর পূর্ব্বে,নাকি এই খানের কোন বাগানে শুকরমনিনাম্নী কুলিনীর উপর অত্যাচার হয় এবং সেই হেতু তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। বাঙ্গালা দেশে সংবাদপত্র মহলে এই বিষয় লইয়া তখন বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়।—আজ এখানে আসিয়া বৃষ্টি পাইলাম—বৃষ্টি অবিশ্রান্ত। যাহা হউক, শীতকালের বৃষ্টিতে জর জর হইয়া, আরও দুই দিন জাহাজে কাটিল, পরে ডিব্রুগড়ে বেলা প্রায় দুইটার সময় আসিয়া পৌঁছিলাম। এটা সহর ডিব্রু নহে, ডিব্রুগড় ঘাটও নহে, কারণ, নদীর--ব্রহ্মপুত্র নদের—জল হটিয়া যাওয়াতে, ঘাট পর্য্যন্ত জাহাজ আসিতে পারে না,সুতরাং উক্ত ঘাট হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করিল। এইখানে আসিয়া বিষম বেগ পাইলাম। জাহাজ হইতে নামিয়া সহর প্রায় পাঁচ মাইল—সঙ্গে মাল পত্র—মুটে মজুর দুস্প্রাপ্য—ভাবনার কথা। যে কয়েক জন কুলি ছিল, তাহারা সাহেবদিগের মাল পত্র লইয়া চলিয়া গেল; আমি ও আরও কয়েকটী ভদ্রলোক কুলির অভাবে বিষম বিভ্রাটে পরিলাম। ৪।৫ মাইল পথের জন্য কিছুমাত্র ভীত হই নাই, কারণ ১০।১২ মাইল পথ হাঁটিতে কখন ক্লেশ অনুভব করি নাই; ভাবনা—মাল পত্র লইয়া। আমরা তিন চারিটী বাঙ্গালী বাবু ভিন্ন অপরাপর সকলে চলিয়া গেল। ক্রমে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। একে শীতকাল, তাহাতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; কাজেই শরীর হি হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সাত দিন ক্রমান্বয়ে জাহাজে থাকিয়া, শরীরটা যেন জাহাজওয়ালাদের বলিয়া মনে হইতে লাগিল.—মেজাজ খারাপ, শরীরও টলটলায়মান,—তাহার উপর এইরূপ অসুবিধাগ্রস্থ হওয়ায়, প্রাণটা ভারি চটিয়া গিয়াছে। এইরূপে একান্ত নিরুপায় ও বিচিন্তিতভাবে কিয়ৎ-ক্ষণ অতিবাহিত হইলে,ভগবান রাজি হইলেন; জাহাজের মেল-বাবু (ডাক-বাবু) আমার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, কিছু যেন ব্যথিত হইলেন, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং দুই একটা কুলির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কুলি পাওয়া গেল না। অবশেষে জাহাজের একজন জমাদার (ওরফে মেথর) সহরে আসিতেছিল,—ডাকবাবু তাহাকে বলিয়া কহিয়া এবং আর্থিক লাভের কথা বুঝাইয়া দিলে, সে কৃপা করিয়া (এস্থলে কৃপা ভিন্ন আর কি বলিব?) আমার বিছানা ও ট্রাঙ্কটি লইয়া চলিল; আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। চলিলাম, সাহারার উপর দিয়া:—ষ্টীমার হইতে ঘাট পর্য্যন্ত যে তিন মাইল

জমি, তাহা চড়া বা চর,—বালি ধূ ধূ করিতেছে। চরের উপর দিয়া চলিতে চলিতে, যে দিকে দেখি, সব বালি ধূ ধূ করিতেছে, এই জন্য উহাকে সাহারা বলিলাম। এই তিন মাইল বালি ভাঙ্গিতে যে কষ্ট হইয়াছিল, এক টানে দশ ক্রোশ সাদা রাস্তা চলিতে সে কষ্ট হয় না; প্রতি পদে পা বালিতে বসিয়া যায় এবং চেষ্টা করিয়া উঠাইতে হয়, এই জন্য এত কষ্ট!

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, এমন সময়ে ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে আসিয়া একটী ভদ্রলোকের বাসায় গিয়া উঠিলাম, তিনি বাসায় না থাকিলেও, তথায় মালপত্র গুলা রাখিয়া ডিব্রুগড় সহরের দিকে রওনা হইলাম। এখানকার দুইটী বাবুর নাম পূর্ব্বেই ভালরূপ জানিতাম; সাক্ষাৎ আলাপ না থাকিলেও, সংসারক্ষেত্রের বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে চিঠি পত্রাদিতে তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল, সুতরাং ভরসা করিয়া সেইখানেই গেলাম। এই স্থানে আসিবার কালে পথে নানারূপ চিন্তার উদ্রেক হইতে লাগিল। ভাবিতেছিলাম— রাত্রি হইয়া গেল, যদি ভদ্র লোকদিগের সহিত না সাক্ষাৎ হয়, তবেই বিষম গোলের কথা। একে বিদেশ—বাঙ্গালীর দেশ নহে যে, যেখানে হউক বাঙ্গালীর বাটী গিয়া অতিথি হইয়া পড়িব, ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতি, রাত্রিকাল, অন্ধকার, বৃষ্টি পড়িতেছে, শরীর অবসন্ন, তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আর কি চাহেন? আবার ইহাও ভাবিতেছি যে, সেই ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও, যদি তাঁহারা আশ্রয় দিতে স্বীকৃত না হন। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের বাসায় আসিয়া প্রথমে ল— বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং পরিচয় পাইয়া, তিনি আমায় চিনিলেন ও যথেষ্ট সমাদর করিয়া বসাইলেন। ক্ষণকাল পরে, অন্তঃপুর হইতে, ম— বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া আমার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। ল— বাবু ও ম— বাবু যে, এক বাসাতেই থাকিতেন, তাহা আমি জানিতাম না। সুতরাং উভয়কেই এক স্থানে পাইয়া, আমার সাতিশয় আহ্লাদ হইল। আমি যে তথায় আসিব, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কোন সংবাদ দিই নাই বলিয়া, উভয়েই অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহারা সংবাদ পাইলে, ষ্টেশন হইতে আসিবার সময় আমাকে এত ক্লেশ পাইতে হইত না।

ইঁহাদিগের উভয়ের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। বাঙ্গলাদেশের অনেক কথা হইল—আসামদেশেরও অনেক কথা হইল। তাঁহারা অনেক দিন বাঙ্গালা দেশ ছাড়া, সুতরাং বাঙ্গলাদেশের কথায়

তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ ছিল,—আর আমি নূতন ডিব্রুগড়ে গিয়াছি, সুতরাং স্থানীয় কথায় আমারও বিশেষ স্বার্থ ছিল,—এতন্নিবন্ধন তাবৎ কথা-বার্তাই বড় প্রীতিকর হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে প্রথম অভ্যর্থনা পান-তামাক,—আর এদেশটা বড় শীতপ্রধান বলিয়া, প্রথম অভ্যর্থনা চা,—পরে পান তামাক, সুতরাং তাঁহারা অতি যত্ন সংকারে আমাকে চা খাইতে দিলেন। চা পান করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম—শরীরে একটু বল পাইলাম,—হৃদয়ে উদ্যম ও উৎসাহ আসিল। কথায় কথায় কৃষি ও উদ্যান বিষয়ক প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। এতদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ সখ ও যত্ন,—আর আমার পেশা, সুতরাং আলাপ ও কথোপকথন শীঘ্র বড়ই ঘনী-ভূত হইয়া পড়িল। যথাক্রমে আহারের সময় হইল,—সকলে আহার করিয়া রাত্রের মত বিরামদায়িনীর শরণাগত হইলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া চা, বিস্কুট প্রভৃতি দ্বারা বাল্যভোগ বা ছোট হাজিরা (breakfast) করিয়া, ল—বাবুর সহিত সহর পরিদর্শনে বহির্গত হইলাম।

ডিব্রুগড় সহর বিস্তৃত, রাস্তা ঘাট বড় ও পরিষ্কার,—তবে কিছু বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ বাড়ী ঘর তত নিকট নিকট নহে—দূরে দূরে, সুতরাং গলি ঘুঁজি বেশী নাই। সাহেব-পল্লী—নদীর (ব্রহ্মপুত্র) কিনারায়; নদীর কিনারার রাস্তাটী কলিকাতার গড়ের মাঠের রেড রোডের (red road) ন্যায়, লাল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নিকটেই সাহেবদিগের ক্লব্—বৈকালে তথায় অনেক সাহেব-সুবার আগমন হয়, খেলাধুলা হয়, ইত্যাদি। স্থানীয় বাজার খুব সরগরম, বিস্তর দোকান পাঠ,—সকল জিনিষ পত্র পাওয়া যায়। মারবারদেশী বিস্তর কেঁয়ের দোকান আছে,—কতকগুলি মুসলমানের নানাবিধ সাহেবী জিনিষ পত্রের দোকান আছে। খাস বাঙ্গালীর কোন কার কারবার দেখিলাম না। নিজ্ ডিব্রুগড়ে দুইখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আছে—"ইষ্টার্ণ হেরল্ড" ও "টাইম্‌স্ অব্ আসাম।" প্রথমে ক্তখানি বাঙ্গালী-সম্পাদিত, এবং দ্বিতীয় খানি আসামী-সম্পাদিত। আমি নিজে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালী সম্পাদিত "ইষ্টার্ণ হেরল্ড" কাগজ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে গেলে, পাছে আত্মম্ভরিতা আসিয়া পড়ে, সেই ভয়ে তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলিব না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ইষ্টার্ণ হেরল্ডেরই সম্পাদকের উৎসাহ ও উদ্যোগে, এবং সম্পাদকীয়তায় আসাম টাইম্‌স্ প্রকাশিত হয়। আমি, যত দূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি যে, আসাম টাইম্‌স্ বাঙ্গালীর বড় বিরূপ—বাঙ্গলা ভাষার প্রতিও নারাজ।

"আসাম টাইমসের" এই যে বাঙ্গালীর প্রতি ঈর্ষা বা বিদ্বেষভাব স্বজাতি-প্রেমের ফল। আসামীদিগের মধ্যে শিক্ষা অতি অল্পই বিস্তারিত হইয়াছে এবং যে দুই পাঁচ জন শিক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাই স্বদেশ ও স্বজাতি বাৎসল্যবশতঃ, বাঙ্গালীদিগের প্রতি এত নারাজ। বাঙ্গালা ভাষাটাকে তাঁহারা একটা ভাষার মধ্যেই গণিতে চাহেন না। তাহাতে বাঙ্গালী জাতির বা বাঙ্গালা দেশের কিছু আসিয়া যায় না; যে জাতির একটা নিজের ভাষায় ইতিহাস নাই, ব্যাকরণ নাই, অধিক কি বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় শিশুবোধক, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, বা বিদ্যাসুন্দর পুস্তকও নাই, সে জাতির অবার ভাষা কি,—আর সে জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বই বা কোথায়? আসামীগণ বাঙ্গালী হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চেষ্টা করিলে,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গালীর কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই,—আসামীগণ নিজে ঠকিবেন। যদি কিছু মাত্র উন্নতি করিবার বাসনা থাকে, আসামীদিগকে এখনও অনেক দিন বাঙ্গালীর নিকট অনেক জিনিষ শিক্ষা করিতে হইবে। আর আসামী ভাষাও পরিপুষ্ট করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার অনুকরণ করিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় প্রথম হইতে অনুবাদ না করিলে, আসামী ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না। সেই জন্য বলি, যাহাদিগকে প্রতিপদে বাঙ্গালীর উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে এক্ষণে স্বাতন্ত্র্য-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে দেশের লোক প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সুসভ্য হইয়া দশজনের একজন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা ভাল নয় কি? বুদ্ধিমানের কাজ নহে কি? এই স্বাতন্ত্র্য-ভাবের জন্যই ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে। স্বাতন্ত্র্য-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, তাবৎ ভারতবাসীর ভাব যে দিন এক হইবে,—সকলের ধর্ম্ম ও সমাজে যখন এক ইতরেতর সহানুভূতি হইবে,—একের অভাব যখন সকলে অনুভব করিবে—তখনই ভারতবাসী এক জাতি হইতে পারিবে।

ডিব্রুগড়ে একটী লিমিটেড্ কোম্পানী আছে—তাহার নাম Assam Railways and Trading Co. Ld. উক্ত কোম্পানীর ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে,—১ম, রেলওয়ে লাইন ও অন্যান্য তদানুসঙ্গিক। উক্ত রেলওয়ে লাইন ডিব্রুগড় হইতে মাকুম পর্য্যন্ত গিয়া দুইদিকে গিয়াছে। ইহার এক দিকে 'টালপ'—অপর দিকে 'মার্গেরেটা'। টালপের সন্নিকটে 'সদিয়া',—এবং এইখানে ইংরেজের ভারতসম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমার শেষ (Frontier)। এই সদিয়াতে ইংরাজের একজন রেসিডেণ্ট থাকেন,—ইংরাজরাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং বর্ব্বর মিস্‌মী,

আবর প্রভৃতি জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য। সম্প্রতি যে মিস্‌মী অভিযান (Expedition) গিয়াছে, তাহা উল্লিখিত সদিয়া নামক সীমান্ত হইতে। মাকুম হইতে আর একটী শাখা গিয়াছে, মার্গেরেটা অবধি। এইখানে উক্ত কোম্পানীর কয়লার খনি ও তৈলের (Petroleum) কূপ আছে। এখানে যে কয়লা উৎপন্ন হয়, তাহা বিলাতী কয়লা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, সুতরাং সমুদ্রগামী জাহাজে ব্যবহারের উপযোগী। বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায় অল্প খরচায় এই কয়লা পাঠাইবার সুযোগ থাকিলে, এতদিনে রাণিগঞ্জ বরাকরের কয়লার কাটতি যে বিশেষ কমিয়া যাইত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আসামের রেলওয়ে কোম্পানীগণ এবং ষ্টিমার-কোম্পানীগণ ঐ কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশে বা অন্যত্র যেরূপ বিস্তর কোম্পানী ও বহুব্যক্তি কয়লার খনি ইজারা লইয়া ব্যবসা করিতেছেন, আসামে তাহা হইতে পায় নাই, তাহার কারণ, আসাম রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানীর সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত এই যে, গবর্ণমেণ্ট আর কোন ব্যক্তি বিশেষকে বা কোম্পানীকে ইহার জন্য অনুমতি বা ইজারা দিবেন না। বাস্তবিক উক্ত ট্রেডিং কোম্পানীর জন্যই এই রেলওয়ে লাইন সৃষ্টি হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন স্থানীয় যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

---

## সমালোচনা।

"হিন্দু থিইস্‌ম্‌"।—অর্থাৎ "হিন্দুধর্ম্ম ও আস্তিকা"; বাবু সীতানাথ তত্ত্বভূষণপ্রণীত, এবং ৩০নং গোয়াবাগান লেনস্থ "সোম ব্রাদার্স" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। একখানি ইংরাজী ক্ষুদ্র পুস্তক—১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; কিন্তু পড়িবার ও চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে। ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল এবং ভাব-প্রচারী,—তবে দার্শনিক শব্দ প্রয়োগে স্থানে স্থানে সাধারণের পক্ষে কিঞ্চিৎ নীরস হইয়া উঠে। যাহা হউক, দর্শনের ভাষা নভেল নাটকের ভাষার মত কখনই হইতে পারে না এবং দার্শনিক শব্দ সাহায্যে দর্শন লেখাই সহজ, কারণ অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করা যায়, এজন্য গ্রন্থকারকে আমরা বিশেষ দোষ দিতে পারি না। তবে পড়িতে পড়িতে এ কথাটি স্বতঃই প্রাণে উঠে যে, ইংরাজী পরিচ্ছদে না আসিয়া, সীতানাথ বাবু যদি ধুতি উড়ানি পরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, দেশীয় অনেক লোক তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে এবং ভাব বিনিময় করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিত। যাহা হউক, বিদেশীয় আবরণে দেশীয় ভাবের কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই, সেজন্য দেশীয়

পাঠকের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ—ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। ইহাতে স্বীয় ধর্ম্মের অনেক কূটবিষয় সুযুক্তিসহায়ে এবং নূতন আলোকে আলোকিত দেখিতে পাইবেন।

পুস্তকখানি একাদশটি প্রবন্ধে বিভক্ত। প্রত্যেকটি গভীর ভাবপূর্ণ। দ্বিতীয় প্রবন্ধের স্বাধীন এবং শাস্ত্রাধীন তর্কের প্রভেদ ও সমন্বয়, চতুর্থ প্রবন্ধের মায়াবাদী এবং পরিণামবাদীর চিরবিরোধের মূলীভূত নিজ নিজ সত্যালোক নির্ণয় এবং সপ্তম প্রবন্ধের পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধীয় যুক্তি সমূহ, আমাদের বিশেষ ভাল বোধ হইয়াছে।

'বন্ধন এবং মুক্তি' শীর্ষক দশম প্রবন্ধটিতে গ্রন্থকারের নিজমত বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে; ঔপনিষদ আস্তিক্যের চরম সীমায়, মানুষ প্রেমের সহায়ে ভগবানের সহিত একতা অনুভব করিলেও, কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিয়া যায়। শরীর এবং তদঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্বন্ধের ন্যায়, মস্তিষ্ক এবং তদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপাদক অংশ সকলের সম্বন্ধের ন্যায়, একত্বের ভিতরেও বহুত্ব থাকে—ইহাই উপনিষৎ সকলের অভিমত, গ্রন্থকার অনুমান করিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্করের প্রতিও কটাক্ষ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তবে গ্রন্থকার উদারভাবে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, উপনিষদের কোন কোন অংশ পূর্ণৈকতা প্রতিপাদক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, সে গুলির তাহাই উদ্দেশ্য কি না, এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই গ্রন্থকারের অভিমত।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, বেদের উপনিষদ্ভাগ নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে, তাহাতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং পূর্ণাদ্বৈত, এই তিন মতের প্রতিপাদক বাক্যসকল নয়নগোচর হয়। আবহমানকাল ধরিয়া, দেশীয় টীকা এবং ভাষ্যকারেরা ঐ সকল গুলিই একমত প্রতিপাদক বলিয়া, ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সকলেই নিজ নিজ মত হইতে ভিন্নার্থ প্রতিপাদক বচন গুলিকে, ধাত্বর্থসহায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আপনার দিকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে কাহারও চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। এই সন্দেহ কলহের বিষয়ে, শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অমৃতময়ী বাণী আমাদিগকে বিশেষালোক প্রদান করিয়াছে। তিনি বলিতেন, এ বিষয় বুদ্ধি সহায়ে বুঝিবার নয়, কিন্তু প্রেম, সাধন এবং জীবন সহায়ে বুঝিবার কথা। ধর্ম্ম জীবনের উন্নতির তারতম্যে, প্রত্যেক মানবেরই এই তিন মত বা অনুভব পর পর আসিয়া উপস্থিত

হয়। ধর্ম্মজীবনের প্রথম উন্মেষে দ্বৈত—যৌবনে বা মধ্যকালে বিশিষ্টাদ্বৈত—এবং সর্ব্বশেষে উন্নতির চরমসীমায়, পূর্ণাদ্বৈত অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব 'ইহা অবস্থার কথা'। সেই জন্যই বেদে এই তিন প্রকার অবস্থা সূচক বচনই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মতভেদ থাকিবেই এবং থাকিলেও হানি নাই—কারণ, অবস্থার উন্নতি অনুসারে, মানুষ সত্য বলিয়া স্বতঃই একটির পর আর একটি অবলম্বন করিবে। পূজ্যপাদ পরমহংসদেবের এই সুন্দর সামঞ্জস্য-মীমাংসা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আর কোন আচার্য্যের নিকট হইতেই শুনা যায় নাই।

পরিশেষে পরমহংসদেবের নিকট শ্রুত একটি গল্প বলিয়া, আমরা সমালোচনার উপসংহার করিব। এক গরিব কাঠুরিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, নিকটস্থ বনে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া, দিনান্তে সহরের বাজারে আসিয়া বিক্রয় করিত এবং সেই সামান্য আয়ে দিনপাত করিত। দৈবযোগে একদিন পথিমধ্যে এক দয়ালু সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুও তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলেন, "অগ্রসর হও, তোমার দুঃখ দূর হইবে।" কাঠুরিয়াও সাধুর কথায় বিশ্বাস করিয়া, অন্য দিবসাপেক্ষা বনমধ্যে কিছু বেশী দূর অগ্রসর হইল এবং চারিদিকে চন্দন বৃক্ষরাজি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, ভাবিল, 'দয়াল সাধু এই জন্যই আমায় অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন—এতদিনে আমার কষ্ট দূর হইল।' অন্য কাষ্ঠ অপেক্ষা চন্দন কাষ্ঠের মূল্য অধিক ; সেও সে দিন হইতে অনেক অধিক উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইল। কিছুদিন পরে তাহার মনে হইল, "সাধু ত আমায় চন্দন-বন অবধি আসিয়াই থামিতে বলেন নাই। 'অগ্রসর হও', খালি এই কথাই বলিয়াছিলেন। দেখি আরো অগ্রসর হইয়া—যদি অন্য কিছু পাই!" এইরূপে অগ্রসর হইয়া, সে ক্রমে ক্রমে তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ এবং হীরকের খনি সকল স্বল্পকালের মধ্যে আবিষ্কার করিল এবং চিরকালের মত, দারিদ্র্যদুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিল। সীতানাথ বাবুও বিশ্বস্তহৃদয়ে অগ্রসর হইয়া অনেক দূর আসিয়াছেন এবং ফলস্বরূপ, নূতন সত্যালোকে ভগবানের সহিত আংশিক একতা ও তজ্জনিত আনন্দানুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু, এখনও শেষ ভূমিকা দূরে আছে। আরো অগ্রসর হউন—পূর্ণৈকতার পরমানন্দ লাভে কৃতকৃতার্থ হইবেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি......তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বং আত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ······কেন কং বিজানীয়াৎ।"

---

রাজর্ষিগণ আত্মতত্ত্বজ্ঞ না হইয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেন, তাই বলিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞ অতএব কৃতার্থ অন্য কোন ব্যক্তি কোন কারণে কর্ত্তব্য কর্ম্মের পালন করিতে পারে না," তাহা হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের বশীভূত হইয়া তুমি লোক-সংগ্রহ-রূপ প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইতেছ। লোকগণের অসন্মার্গ হইতে প্রবৃত্তির নিবারণকে লোক-সংগ্রহ বলা যায় ॥ ২০ ॥

---

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরোজনঃ।
সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—শ্রেষ্ঠঃ জনঃ যদ্ যদ্ আচরতি ইতরো জনঃ তদ্ (আচরতি), সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকঃ তদ্ অনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করিয়া থাকে, প্রাকৃত লোক সকলও তাহারই আচরণ করে, সেই শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্থির করেন, সাধারণ লোকও তাহাকেই প্রমাণ বলিয়া অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

ভাষ্য।—লোকসংগ্রহং কঃ কর্ত্তুমর্হতি কথঞ্চেত্যুচ্যতে যদ্ যদিতি। যদ্ যত্ কর্ম্মাচরতি যেষু যেষু শ্রেষ্ঠঃ প্রধানঃ তত্তদেব কর্ম্মাচরতীতরোঽন্যঃ জনস্তদনুগতঃ। কিঞ্চ স শ্রেষ্ঠঃ যং প্রমাণং কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা লোক স্তদনুবর্ত্ততে তদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ। ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কোন্ ব্যক্তি কি প্রকারে লোক সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাই বলিতেছেন যে, যদাদিত্যাদি। যে যে লোকসম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যক্তি "শ্রেষ্ঠ" প্রধান, সে যে যে কর্ম্মের আচরণ করে, সেই সম্প্রদায়ানুগত জনও সেই সেই কর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে। আর সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, লৌকিক কিম্বা বৈদিক যে কোন বস্তুকে প্রমাণ স্বরূপ অঙ্গীকার করে, সাধারণ লোকও তাহারই অনুবর্ত্তন করে (অর্থাৎ) তাহাই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লয় ॥ ২১ ॥

---

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্ত মবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—(হে) পার্থ ত্রিষু লোকেষু মম কিঞ্চন কর্ত্তব্যং ন অস্তি (তথা কিঞ্চন) অনবাপ্তং অবাপ্তব্যং (অপি) ন (অস্তি) (তথাপি) অহং কর্ম্মণি বর্ত্তে এব ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।—হে পার্থ ত্রিলোকে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই, আমার ইদানীং

অপ্রাপ্ত অতএব ভবিষ্যৎ কালে অবাপ্তব্য এমন কোন বস্তুও নাই, তথাপি আমি কর্ম্মেতেই বর্ত্তমান আছি ॥ ২২ ॥

ভাষ্য।—যদাত্র তে লোকসংগ্রহকর্ত্তব্যতায়াং বিপ্রতিপত্তি স্তর্হি মাং কিং ন পশ্যসি। নমে ইতি। ন মে মম পার্থ নাস্তি ন বিদ্যতে কর্ত্তব্যং ত্রিষপি লোকেষু কিঞ্চন কিঞ্চিদপি কস্মাৎ? নানবাপ্তং অপ্রাপ্তমবাপ্তব্যং প্রাপণীয়ং তথাপি বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি অহং ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই জগতে লোক সংগ্রহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে তোমার কোন বিপ্রতিপত্তি থাকে, তবে আমাকেই কেন দেখিতেছ না? নমে ইত্যাদি। হে পার্থ, লোকত্রয়েও আমার কোন কর্ত্তব্য নাই, কারণ এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমার অপ্রাপ্ত, এই জন্য অবাপ্তব্য, অথচ আমি (লোক-সংগ্রহের জন্যই) কার্য্যেতে বর্ত্তমান রহিয়াছি ॥ ২২ ॥

---

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয় জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—জাতু (কদাচিদপি) যদি অহং অতন্দ্রিতঃ সন্ কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয় (হে) পার্থ মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—কোন সময়েই যদি আমি অনলস হইয়া কার্য্য করিতে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে, হে পার্থ, সকল লোকেই আমার অনুসৃত মার্গেরই সকল প্রকারেই অনুসরণ করিবে (এই জন্য) ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য।—যদি পুনরহং ন বর্ত্তেয় জাতু কদাচিৎ কর্ম্মণি অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ সন্ মম শ্রেষ্ঠস্য সতঃ বর্ত্ম মার্গ মনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ হে পার্থ সর্ব্বশঃ সর্ব্ব-প্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কোন সময়ে আমি যদি অনলস হইয়া কার্য্যে বর্ত্তমান না থাকি (তাহা হইলে), হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার অবলম্বিত পথের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

---

উৎসীদেয়ুরিমেলোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যা মিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—(তথা সতি) অহং চেৎ (যদি) কর্ম্ম ন কুর্য্যাং (তদা) ইমে লোকা উৎসীদেয়ুঃ, (অহং) সঙ্করস্য কর্ত্তা স্যাম্ (তথা) ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ —( সুতরাং ) আমি যদি কার্য্য না করি, তাহা হইলে এই সকল লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্করেরও কারণ হইব (এবং তদ্দ্বারা) সকল প্রজার ধ্বংসকারীও হইব ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য।—তথা চ কো দোষ ইত্যাহ উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ বিনশ্যেয়ুঃ ইমে সর্ব্বে লোকাঃ লোকস্থিতিনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাত্ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং। কিঞ্চ সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্। তেন কারণেন উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্ত উপহতিমুপহননং কুর্য্যামিত্যর্থঃ। মম ঈশ্বরস্য অননুরূপমাপদ্যেত ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—তাহা হইলে কি দোষ? তাহাই বলিতেছেন যে উৎসীদেয়ু ইত্যাদি। উৎসন্ন যাইবে ( অর্থাৎ ) বিনাশ পাইবে, ( কে ? ) এই সকল লোক; আমি যদি কার্য্য না করি ( তাহা হইলে ), লোক-স্থিতির প্রতি কারণ কর্ম্মের অভাব হইবে, এই কারণ লোকস্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়িবে ); আমি ( এই প্রকারে ) সঙ্করেরও কর্ত্তা হইব ও সেই কারণে এই সকল প্রজার অনুগ্রহার্থ প্রবৃত্ত হইয়াও, ইহাদের বিনাশের প্রতি কারণ হইয়া উঠি। ইহাই অর্থ ( বাস্তবপক্ষে ), এই প্রকার ঈশ্বরের অননুরূপ কার্য্য আমাতে ( তাহা হইলে ) প্রসক্ত হইবে ॥ ২৪ ॥

---

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—হে ভারত!—অবিদ্বাংসঃ কর্ম্মণি সক্তাঃ ( ফলতৃষ্ণাবন্তঃ) যথা ( কর্ম্ম ) কুর্ব্বন্তি, তথা লোক সংগ্রহং চিকীর্ষুঃ বিদ্বান্ অসক্তঃ ( সন্ ) কুর্য্যাৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।—হে ভারত! অবিদ্বানগণ কর্ম্মের ফললাভে স্পৃহাবান্ হইয়া যে প্রকারে (বিহিত) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই প্রকারেই লোকসংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক বিদ্বান্ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২৫ ॥

ভাষ্য।—যদি পুনরহমিব ত্বং কৃতার্থবুদ্ধিরাত্মবিদন্যো বা তস্যাপ্যাত্মনঃ কর্ত্তব্যাভাবেঽপি পরানুগ্রহ এব কর্ত্তব্য মিত্যাহ সক্তা ইতি। সক্তাঃ কর্ম্মণি অস্য কর্ম্মণঃ ফলং মম ভবিষ্যতীতি কেচিদবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত, কুর্য্যাদ্ বিদ্বান্ আত্মবিৎ তথা অসক্তঃ সন্ তদ্বৎ, কিমর্থং করোতি তচ্ছৃণু চিকীর্ষুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুঃ লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—তুমি যদি আমার ন্যায় কৃতার্থ বুদ্ধি হও, কিম্বা অন্য কোন

নিরভিমান আত্মতত্ত্বজ্ঞ হও, তাহা হইলেও সেই তোমার নিজ কর্ত্তব্য না থাকিলেও পরের উপর অনুগ্রহ প্রযুক্ত কর্ম্ম করিতেই হইবে, ইহাই বলিতেছেন, সক্তা ইত্যাদি। কর্ম্মেতে সক্ত, (অর্থাৎ) কর্ম্মের ফল আমার হইবে এই প্রকার বুদ্ধিশালী অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ, যে প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে, হে ভারত, বিদ্বান্ আত্মতত্ত্বজ্ঞও তাহারই ন্যায় কার্য্য করিবে। (কিন্তু) অনাসক্ত ভাবে। কেন কার্য্য করিবে, তাহা শুন। লোক-সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় ॥ ২৫ ॥

---

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—কর্ম্মসঙ্গিনাং অজ্ঞানাং ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ, বিদ্বান্ যুক্তঃ সন্ (স্বয়ং) সমাচরন্ সর্ব্বকর্ম্মাণি যোজয়েৎ (কারয়েৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ।—কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞগণের কর্ম্ম-বিষয়ে বিশ্বাসকে শিথিল করিবে না, বিদ্বান্ স্বয়ং অভিনিবিষ্ট হইয়া অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অজ্ঞানগণকেও বিহিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবে ॥ ২৬ ॥

ভাষ্য।—এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষোর্ন মমাত্মবিদঃ কর্ত্তব্যমস্ত্যন্যস্য বা লোকসংগ্রহং মুক্ত্বা ততস্তস্যাত্মবিদ ইদমুপদিশ্যতে নেতি। বুদ্ধের্ভেদো বুদ্ধিভেদো ময়েদং কর্ত্তব্যং ভোক্তব্যং চাস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিশ্চয়রূপায়া বুদ্ধের্ভেদনং চালনং তং ন জনয়েৎ নোৎপাদয়েৎ অজ্ঞানামবিবেকিনাং কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মণি আসক্তানাং আসঙ্গবতাং, কিন্তু কুর্য্যাৎ যোজয়েৎ কারয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ং তদেবাবিদুষাং কর্ম্ম যুক্তঃ অভিযুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকার লোক-সংগ্রহের ইচ্ছায় প্রবৃত্ত, আমি কিম্বা অন্য কোন আত্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির লোকসংগ্রহরূপ কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ত্তব্য বিদ্যমান নাই, এই কারণ সেই (লোক-সংগ্রহে প্রবৃত্ত) আত্ম-বিদের পক্ষে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, ন ইত্যাদি। আমি এই কার্য্য করিব এবং ইহার ফল আমিই ভোগ করিব, এই প্রকার নিশ্চয়রূপা বুদ্ধির ভেদ, ভেদন (অর্থাৎ) পরিচালনই বুদ্ধিভেদ (শব্দের অর্থ), কর্ম্মসঙ্গী (অর্থাৎ) কর্ম্মেতে আসক্তিযুক্ত অবিবেকিব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ করিবে না। কিন্তু সেই অবিদ্বানের পক্ষে বিহিত কার্য্য স্বয়ং করিবে, (এই প্রকার)

অভিনিবিষ্ট হইয়া কার্য্যের আচরণ করিয়া অজ্ঞগণকেও সেই কার্য্যে নিয়োজিত করিবে ॥ ২৬ ॥

---

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সর্ব্বশঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি অহংকারবিমূঢ়াত্মা অহং (এব) কর্ত্তা ইতি মন্যতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরিণামের দ্বারাই সকল কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে, সকল প্রকারে অহঙ্কারবিমূঢ়চেতা পুরুষ সেই সকল কর্ম্মের, আমিই কর্ত্তা, এই প্রকার অভিমান করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য।—অবিদ্বানজ্ঞঃ কথং কর্ম্মসু সজ্জত ইত্যাহ প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতেঃ প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা তস্যাঃ প্রকৃতে গুণৈঃ বিকারৈঃ কার্য্যকারণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়ানিচ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাত্মপ্রত্যয়ঃ অহঙ্কারস্তেন বিবিধং নানাবিধং মূঢ় আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোহয়ং কার্য্যকরণধর্ম্মা কার্য্যকরণাভিমানী অবিদ্যয়া কর্ম্মাণি আত্মনি মন্যমানঃ তত্তত্ কর্ম্মণা মহং কর্ত্তেতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনাত্মজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি কি প্রকারে কর্ম্মনিবহে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন যে, প্রকৃতেরিত্যাদি। প্রকৃতি (শব্দের অর্থ) প্রধান, (সকল কার্য্যের উপাদান) সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের বৈষম্যহীন অবস্থাই (প্রধান শব্দের তাৎপর্য্যার্থ)। সেই প্রকৃতির গুণ (অর্থাৎ) কার্য্যকারণরূপ বিকার, সেই বিকার সমূহ দ্বারা সকল প্রকার লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সকল সম্পাদিত হইয়া থাকে। (কিন্তু) অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা জীব, কার্য্য ও করণ সমষ্টির উপর যে আত্মপ্রত্যয় তাহাই অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের দ্বারা নানাবিধ ভাবে যাহার অন্তঃকরণ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা, সেই কার্য্য ও করণের ধর্ম্ম আপনার উপরে আরোপ করিয়া কার্য্যকরণাভিমানী জীব, সেই প্রকৃতিকৃত কর্ম্মনিবহকে অবিদ্যা-বশে আপনার বোধ করিয়া, আমিই কর্ত্তা এই প্রকার অভিমান করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

---

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়ো স্তত্ত্ববিত্, গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা (বিভাব্য) (গুণেষু) ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।—গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান যাহার আছে সেই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি, ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত প্রকৃতিগুণ, বিষয়রূপে পরিণত প্রকৃতিগুণে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাতে আসক্ত হয়েন্ না ॥ ২৮ ॥

ভাষ্য।—যঃ পুনর্বিদ্বান্ তত্ত্ববিদিতি। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো কস্য তত্ত্ববিৎ? গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদ্ ইত্যর্থঃ গুণাঃ করণাত্মকা গুণেষু বিষয়াত্মকেষু বর্ত্তন্তে ন আত্মা ইতি মত্বা ন সজ্জতে সক্তিং ন করোতি ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি বিদ্বান্ (সে কি প্রকার করে? তাহাই দেখান হইতেছে যে) তত্ত্ববিদ্ ইত্যাদি। হে মহাবাহো, কিন্তু (যে) তত্ত্ববিত্, কোন্ বস্তুর তত্ত্ববিৎ? (তাহাই বলিতেছেন যে) গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ, এই বিভাগ-দ্বয়ের যথার্থ জ্ঞান যাহার আছে সেই তত্ত্ববিৎ, ইন্দ্রিয়াত্মক গুণ বিষয়রূপ গুণেতে ব্যাপৃত হইতেছে, কিন্তু আত্মা ব্যাপৃত হয় না, ইহা বুঝিয়া (কোন কার্য্যেতেই) আসক্ত হন না ॥ ২৮ ॥

---

প্রকৃতে গুর্ণসম্মূঢ় সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদোমন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—প্রকৃতেঃ গুণসম্মূঢ়া (অনাত্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে কৃৎস্নবিদ্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞঃ) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (প্রকৃতিগুণমূঢ়ান্) ন বিচালয়েৎ (বুদ্ধিভেদবতো ন কুর্য্যাৎ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।—প্রকৃতির গুণনিবহের দ্বারা বিমূঢ়চেতা পুরুষ, গুণজনিত কর্ম্মে আত্মীয় বুদ্ধিতে সংসক্ত হয়। কিন্তু সকলার্থবেত্তা আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, সেই সকল অল্পজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তির কর্ম্মের প্রতি যে বিশ্বাস আছে, তাহাকে বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য।—যে পুনঃ প্রকৃতেরিতি প্রকৃতে গুর্ণৈঃ সম্যক্ মূঢ়া সন্তঃ সজ্জন্তে, গুণানাং কর্ম্মসু গুণকর্ম্মসু বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্মঃ ফলায়েতি তান্ কর্ম্মসঙ্গিনোঽ

কৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনো মন্দান মন্দপ্রজ্ঞান্ কৃৎস্নবিৎ আত্মবিৎ স্বয়ং ন বিচালয়েৎ বুদ্ধিভেদকরণ মেব চালনং তন্নকুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ —যাহারা কিন্তু প্রকৃতির গুণে ইত্যাদি। প্রকৃতির গুণ সমূহের দ্বারা মূঢ় ( অর্থাত্ ) সম্মোহিত হইয়া যাহারা গুণবিহিত কর্ম্মনিকরে সক্ত হয় ( অর্থাত্ অভিমান করে )—"আমরাই ফল লাভের জন্য কার্য্য করিয়া থাকি", সেই সকল কর্ম্মসঙ্গী অল্পজ্ঞ, কর্ম্মফলমাত্রদর্শী ও মন্দপ্রজ্ঞ ব্যক্তি-গণকে, আত্মবিত্ স্বয়ং বিচালিত করিবেন না, বুদ্ধিভেদ করণই চালন, তাহা করিবেন না ইহাই অর্থ॥ ২৯॥

---

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—অধ্যাত্মচেতসা ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য, বিগতজ্বরঃ নিরাশীঃ নির্ম্মমশ্চ (ভূত্বা) যুধ্যস্ব ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে সকল কর্ম্মের স্বরূপ আমার উপর সম-র্পণ করিয়া আশা ও মমতা পরিত্যগপূর্ব্বক বিগতসন্তাপ হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

ভাষ্য।—কথং পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেন মুমুক্ষুণা কর্ম্ম কর্ত্তব্য মিত্যুচ্যতে ময়ীতি। ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বাত্মকে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য নিঃক্ষিপ্য অধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা। "অহং কর্ত্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্য-নয়া বুদ্ধ্যা"। কিঞ্চ নিরাশীঃ ত্যক্তাশীঃ নির্ম্মমঃ মমভাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স ত্বং নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ বিগতসন্তাপঃ বিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কর্ম্মেতে অধিকারী (অথচ) মুমুক্ষু ব্যক্তির কি প্রকারে কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে যে ময়ি ইত্যাদি।

সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর, সর্ব্বাত্মা ও বাসুদেব ( এই সকল শব্দের প্রতিপাদ্য ) আমাতে সকল কর্ম্ম, অধ্যাত্মবুদ্ধিতে (অর্থাৎ), "আমি কর্ত্তা, কিন্তু পরমেশ্বরের জন্য, তাঁহার ভৃত্যের ন্যায়ই কার্য্য করিতেছি", এই প্রকার বিবেকবুদ্ধিতে, নিক্ষেপ করিয়া, তুমি নিরাশী ও মমভাবশূন্য ও বিগতসন্তাপ হইয়া যুদ্ধ কর, ইহাই অর্থ॥ ৩০ ॥

---

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ ( চ সন্তঃ ) মম ইদংমতং অনুবর্ত্তন্তে, তেঽপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।—যে সকল মানব শ্রদ্ধা সহকারে ও অসূয়া পরিহার পূর্ব্বক আমার এই মতের অনুবর্ত্তন করে, তাহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ৩১ ॥

ভাষ্য।—যদেতন্মতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি সপ্রমাণ মুক্তং তত্তথা যে ম ইতি। যে মে মদীয় মিদং মত মনুতিষ্ঠন্তি অনুবর্ত্তন্তে মানবাঃ মনুষ্যাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ শ্রদ্দধানা অনসূয়ন্তো ঽসূয়াং চ ময়ি গুরৌ বাসুদেবেঽকুর্ব্বন্তো মুচ্যন্তে তেঽপ্যেবং ভূতাঃ কর্ম্মভির্ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যৈঃ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই যে অভিমত কর্ম্ম কর্ত্তব্য ইহা সপ্রমাণ উক্ত হইল, তাহা সেই প্রকারই, যে মে ইত্যাদি। যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাপরায়ণ, ও (সকলের) গুরু বাসুদেব আমার প্রতি অসূয়াপরবশ নহে এবং আমার এই প্রকার সম্মত কার্য্যের নিত্য অনুবর্ত্তন (অর্থাৎ) অনুষ্ঠান করে, তাহারাও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

---

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টান চেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—যে তু (মানবাঃ) এতত্ মে (মম) মতং অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ অচেতসঃ নষ্টান্ বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে সকল মানব, অসূয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুবর্ত্তন করে না, সেই সকল সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ় বিগতচেতা ব্যক্তিগণকে নষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৩০ ॥

ভাষ্য।—যে ত্বিতি। যে তু তদ্বিপরীতা এতন্মম মতং অভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি নানুবর্ত্তন্তে মে মতং। সর্ব্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মূঢ়াঃ তে সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ়াস্তান্ বিদ্ধি নষ্টান্ নাশং গতান্ অচেতসঃ অবিবেকিনঃ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে তু ইত্যাদি। যাহারা কিন্তু ইহার বিপরীতস্বভাব, (অর্থাৎ) আমার এই মতের উপর অসূয়াপরবশ হইয়া ইহার অনুবর্ত্তন করে না, তাহারা সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়, (অর্থাৎ) সকল প্রকার জ্ঞানেতেই তাহাদের বিবিধ মূঢ়তা আছে, সেই অবিবেকিব্যক্তিগণকে নষ্ট (অর্থাৎ) নাশ-প্রাপ্ত বলিয়াই জানিবে ॥ ৩২ ॥

# কোন্ পথে যাই ?

[ভিক্ষু দেবীদাস লিখিত।] [৩৬৯ পৃষ্ঠার পর।

ক্রমশঃ এই শান্তিসুখ ভাঙ্গিতে লাগিল, তৎপরিবর্ত্তে আর এক আনন্দে মন মাতিতে লাগিল। দলে দলে যাত্রী আসিতেছে, সাধু দলে দলে আসিতেছেন—কত সম্প্রদায়,—শৈব, শাক্ত, বৈদান্তিক, উদাসী, রামাৎ, নিমাৎ, দশনামী—কত নাম করিব ? সব মনে নাই, আর মনে রাখিয়াই বা কি হবে ? সব দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। সাধুগণের বিরাট সম্মিলন—কত বিভিন্ন ভাব, তবু একত্র সম্মিলন। পরিচিত সাধুতে সাধুতে দেখা হইতেছে—আনন্দতরঙ্গ উথলিতেছে। ভক্তে ভক্তে মিলিত হইয়া প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন—জ্ঞানীতে জ্ঞানীতে দিবানিশি উন্মত্ত বিচার—কোথাও কোন শান্ত মহাপুরুষ ধ্যানে মগ্ন। কোথাও কোন সাধু অপর সাধু সকলকে, কেহ বা কাঙ্গালিগণকেও খাওয়াইতেছেন—মহাসমারোহে ভাণ্ডারা চলিতেছে। দর্শকবৃন্দ কেহ যাইয়া সাধুগণের চরণবন্দনা করিতেছেন, কেহ বা তাঁহাদের নিকট গিয়া তাঁহাদের প্রশস্ত উপদেশ বা শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতেছেন। আমি ও যোগেন্দ্র (রামানুজী সাধুটী আমার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া, আমাকে পিতৃদত্ত নামেই পরিচয় দিয়াছিলেন) ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যোগেন্দ্রের অনেকের সঙ্গে মিলন হইল। যোগেন্দ্র অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। আমিও আজ এ সাধু,কাল ও সাধুর সঙ্গে আনন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলাম।

একদিন আমরা দুই জনে বেড়াইতেছি, এমন সময় হঠাৎ একজন বাঙ্গালী-সাধু আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "কি যোগেন, এটী সঙ্গে কে ? চেলা বানাইয়াছ না কি ? যোগেন্দ্র পশ্চাৎ চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,"কে ও, শিবোঽহং ভায়া যে। তা বেশ হইয়াছে, তোমার সঙ্গে মিলন হইল—অনেক দিন পরে। চল, আমার সঙ্গে থাকিতে হইবে।" শুনিলাম, দুজনে পুরাতন বন্ধু। আমরা তিন জন তার পর এক সঙ্গে রহিলাম। কিন্তু, একটী বড় নূতন ব্যাপার দেখিলাম। আমার যোগেন্দ্র-ভায়ার আর সে ভাব নাই। তিনি 'শিবোঽহং' ভায়ার সহিত (যোগেন্দ্র এই নামেই সর্ব্বদা তাঁহাকে সম্বোধন করিত, আমিও তাঁহাকে এই নামে আখ্যাত করিলাম) রাত্রিদিন জ্ঞান ভক্তি লইয়া বিচার করিতেন—সে বিচারের বিরাম নাই। উহার আদি নাই, অন্ত নাই। আমারও এ বিষয়ে মহা কৌতূহল, আমিও দিনরাত্রি

জাগিয়া ঐ বিচার শুনিতাম। ঐ বিচারের স্থূল স্থূল বিষয় গুলি যতদূর স্মরণ হইতেছে, পাঠকবর্গকে দিতে ইচ্ছা করি।

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, জ্ঞানীরা বলেন, এক দ্রব্য ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, সবই মায়া ; তবে সাধন ভজন, উপাসনা, ক্রিয়াকাণ্ডের অবসর কোথায় ?

শিবোঽহং। জ্ঞানীরা বলেন, এক অদ্বিতীয় বস্তুই আছেন বটে, তবে যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ উপাস্য-উপাসক ভাব, সাধন-ভজন ইত্যাদি সবই থাকিতে পারে।

যো। কিন্তু জগৎ মায়া বলিলে এবং সাধন ভজনকে মায়া বলিয়া জানিলে, সাধন ভজনে প্রবৃত্তি থাকিবে না। বেদাদি শাস্ত্রও ত মায়া বলিতে হইবে।

শি। তা বই কি, শাস্ত্রাদি সবই অবিদ্যার অন্তর্গত।

যো। তবে আবার কি করিয়া বলা হয়, শ্রুতিবাক্য তত্ত্বমস্যাদি শ্রবণে জ্ঞানলাভ হইবে ? যাহা মায়া, তাহা দ্বারা জ্ঞান,—এ অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র। আরও, যে গুরু তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন, তিনিও মায়ার অন্তর্গত। তাঁহার যদি মায়া চলিয়া গিয়া থাকে, তবে শিষ্যে উপদেশ অসম্ভব ; আর মায়া থাকিলে, সে উপদেশে জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

শি। জ্ঞানলাভ হইলেও, প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না, যেমন কুম্ভকারের চক্র একবার ঘুরাইয়া দিয়া নিরস্ত হইলেও, তাহার বেগ থাকে, অথবা যেমন ভয়জনক কোন স্বপ্ন দেখিয়া পরে জাগরিত হইলেও, তজ্জনিত কম্পনাদি বিলক্ষণ থাকে।

যো। জ্ঞান যদি প্রারব্ধ কর্ম্ম নিবারণে সমর্থ না হইল, তবে আর সে জ্ঞানের শক্তি কি ? জ্ঞানই যদি পরম পুরুষার্থ হয়, তবে আর কোন্ জ্ঞান দ্বারা এই প্রারব্ধ ক্ষয় করিবে ?

শি। এই প্রারব্ধ, ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়। আর বাস্তবিক জ্ঞানী প্রারব্ধ ভোগ করেন না। অপরে তাঁহাকে দেখে—তিনি প্রারব্ধ ভোগ করিতেছেন ; তাঁহার জ্ঞানে কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই ব্রহ্মদর্শন করেন।

যো। তোমাদের ঐ এক কথা। এ সব প্রত্যক্ষের বিরোধী গাঁজাখুরীতে কে বিশ্বাস করিবে বল ? তোমাদের এ সব ফাঁকি দিবার যুক্তি। আচ্ছা বল দেখি, তা যেন হইল, কিন্তু অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান বাস্তবিক সম্ভব কি না ? গভীর ব্রহ্মানুভূতির সময়েও কি আমি ব্রহ্ম অনুভব করিতেছি বলিয়া, একটী সূক্ষ্ম বোধ

থাকে না। যতই অদ্বৈতজ্ঞান হউক না কেন, একটু দ্বৈতভাব তাহার মধ্যে থাকিয়াই যাইবে। অদ্বৈতও দ্বৈতবিজ্ঞান উভয়ই জড়িত থাকিবে। তা না হইলে, শুধু নিছাক অদ্বৈত জ্ঞান কি, তাহা ত কিছুই বুঝা যায় না, মানুষের ধারণা হয় না, হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। ভগবান ও মানুষে যে অনতিক্রমণীয় প্রভেদ আছে, তাহা ঘোচা একেবারে অসম্ভব।

শি। তোমার তর্ক আপাততঃ খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইলেও, অনায়াসেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। দেখ, যখন সাধনার গতি ক্রমশঃ অদ্বৈতের দিকে—তুমিও স্বীকার করিতেছ, তখন এই গতি যে এক সময়ে বন্ধ থাকিবে, তাহা কোন্ যুক্তিতে সিদ্ধান্ত করিবে?

যো। আচ্ছা, তোমরা যুক্তি যুক্তি করিয়াই ত পাগল, কিন্তু তোমরা জীবনের সারভাব যে প্রেমভক্তি, তাহার বিষয় কি করিয়া থাক?

শি। (হাস্য করিয়া) তোমার প্রেম, ভক্তি, কবিত্ব, সব অবিদ্যার অন্তর্গত। যতক্ষণ অবিদ্যা, ততক্ষণ সে সকল সত্য। অবিদ্যা চলিয়া গিয়া জ্ঞানোদয় হইলে, উহাদের প্রয়োজন নাই।

যো। ঐ কথায়ই ত তোমাদের উপর চটিয়া যাইতে হয়। ভক্তি প্রেম সবই অবিদ্যার অন্তর্গত, তবে বিদ্যার অন্তর্গত আর কি? যদি কিছু জ্ঞান থাকে, তাহা এই ভক্তি প্রেম। এই ভক্তিই সার জ্ঞান। তোমরা বাস্তবিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ব্যতীত কিছুই নও। তোমাদের মায়াবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত। আর, তোমরা একটা নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয় কিম্ভূতকিমাকার পুরুষ ব্রহ্মনামে খাড়া করিয়াছ, যাহার সহিত জীবের কোনরূপ সম্বন্ধ অসম্ভব। তোমাদের মতে জীব ক্রমশঃ নাস্তিকই হইয়া যাইতেছে; ও তোমাদের মত—একটা উঁচুদরের অহংকার মাত্র। আমিই সব,—এ আর কি?—মহাস্বার্থপরতা। জীব বাস্তবিক পরস্পর ভিন্ন, একজন আর একজনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে, একজন আর একজনের ভালবাসায় উন্মত্ত হইবে;—এসব ভেদভাব ব্যতীত অসম্ভব। তোমরা অসংখ্যকল্যাণগুণরাশির আধার সগুণ ঈশ্বরকে নিগুর্ণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ করিয়াছ, তোমরা ঈশ্বর জীবের অভেদ ভাব কল্পনা করিয়া, উপাসনা ও সাধনার ভিত্তি উঠাইয়া দিয়া মহা অহঙ্কারের প্ররোচক হইয়াছ; আর জীবে জীবে প্রভেদ উড়াইয়া মহা স্বার্থপরতার সৃষ্টি করিয়াছ; আর জগতের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া সকল ব্যক্তির পক্ষে নিরুদ্যম, অলস ও পাপরত হইবার প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছ।

শি। আর তোমরা কি করিয়াছ? তোমাদের সগুণ ঈশ্বর একটী তোমাদেরই মত মনবিশিষ্ট, তোমাদেরই মত গুণবিশিষ্ট, খুব না হয় একটী বড় জীবমাত্র। তোমরা তাঁহার পার্শ্বে জগৎ ও জীবকে স্থাপন করিয়া, তাঁহার অনন্তত্বের খণ্ডন করিয়াছ— তাঁহাকে একটী সাকার দেবতামাত্র করিয়া তুলিয়াছ। তোমরা জীবে জীবে ভেদ করিয়া জগতে দ্বেষবুদ্ধি,অভিমান, আত্মম্ভরিতার সূচনা করিয়া রাখিয়াছ। তোমাদের মতে অমুক অবতার—সকলে তাঁহার চরণে দাস হইয়া থাকুক। তোমাদের কেহ বা সাঙ্গোপাঙ্গ, অর্থাৎ সকলে তাঁহার চরণে পূজা দিক। আবার কাহারও কাহারও মতে এমত জীব আছে, যাহারা নিত্যবদ্ধ, তাহার আর কোন উপায় নাই। মোটকথা, তোমাদের মত—'আমাদের পদলেহন কর। আমাদের কৃপা হইলে তোমাদের কিছু উন্নতি হইবে। কিন্তু তোমরা কখন আমার সদৃশ হইতে পারিবে না।" তোমাদের ঈশ্বরও তাই বলেন—'আমায় পূজা কর, ভোগ দাও,আমার ইচ্ছা হইলে,আমি তোমাদিগকে কৃপা করিব, কিন্তু কেহই কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না; চিরকালই আমি তোমাদের শাস্তা।" আর জগৎকে সত্য বলিয়া, তোমরা বৈরাগ্যের পথ একেবারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। তোমাদের মতে বৈকুণ্ঠেও খাজাগজা আদি ভোগ আছে। তবে তোমরা এই ভোগটীকে একটু সূক্ষ্ম করিয়া চিন্ময় ভোগ নাম দিয়াছ। 'চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম।' যেখানে চিৎ, সেখানে আবার নাম ধাম কি? এ যে সোণার পাথর বাটী। মোট কথা, তোমাদের ভোগবাসনা প্রবল। সেইটী ছাড়িতে পারিবে না বলিয়াই, তোমাদের নির্ব্বাণে এত ভয়।

যো। আর, তোমাদের 'শিবোঽহং' বলিলেই বাস, সব হইয়া গেল—আর ভজনের কষ্ট নাই, যাহা ইচ্ছা করিলেই হৈল—যথেচ্ছাচার।

শি। আচ্ছা যাক্, আর কবির লড়ায়ে কায নাই। তুমি একটু ভাবিয়া দেখ দেখি, ভক্তিটী কি। তুমি তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ বা জ্ঞানের মাহাত্ম্য, বুঝিতে পারিবে। ভক্তি সাধনের প্রথম অবস্থায় এইরূপ ভাবে থাকে বটে—আমি হীন, জড়, পাপাত্মা, মন্দবুদ্ধি ও নিরানন্দ, আর আমার উপাস্য দেবতা মহান্, চেতন, পুণ্যময়, মহাজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ; তিনি আমায় কৃপা করুন। কিন্তু এইরূপ উপাসনা করিতে করিতে কি পরিবর্ত্তন হয় দেখ। তুমি কি এইরূপ হীন থাকিবার জন্যই উপাসনা কর, অথবা তোমার উপাস্য দেবতার মত মহান হইবার জন্য উপাসনা কর? উপাস্য দেবতার এই মহান্ গুণ

তোমায় আকর্ষণ করে কেন? না—তোমার ভিতর ঐরূপ হইবার আন্তরিক প্রার্থনা আছে বলিয়া। এই প্রার্থনা আবার হওয়া তখনি সম্ভব, যদি তোমার ভিতরে গূঢ়রূপে এই মহত্ত্বের ভাব নিহিত থাকে। ক্রমশঃ ভক্তের এইরূপ বুদ্ধির বিকাশ হয়—আমি প্রভুর দাস। ইহার অর্থ কি? অর্থ—আমি সংসারের দাস নহি। এখানে 'দাসত্বের ভাব' লক্ষ্য নহে। তোমারা এই খানেই ভুল কর। তোমরা মনে কর, দাসত্ব-ভাবই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবে, প্রভু একজন স্বাধীন মুক্তস্বভাব পুরুষ। তাঁহার দাস কে হইতে পারে?—যে কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন ও মুক্তস্বভাব। ক্রমশঃ সখা বাৎসল্য মধুরাদি ভাবরূপে এই ভাব উন্নত হইয়া হইয়া, শেষে সেই গোপীদের--যেমন ভাগবতে পাওয়া যায়—'আমি কৃষ্ণ' হইয়া যায়। এই শেষ পরিণতি। আর দেখ তোমাদের মতেও পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা না হইলে পূর্ণভক্তি—পরাভক্তি হয় না। তা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতাতে কি স্বতন্ত্র 'অহংভাব' থাকিতে পারে? 'আমি কিছু নই, তুমিই সব', এই ভাবই যাহাদের সাধন, তাহারা কিরূপে আবার অহং রাখিয়া দেয়, কিরূপেই বা জীবকে স্বতন্ত্র ভাবে,—ইহা আমার ধারণায়ই আসে না। আর তোমরা জগৎকে সত্য বল, কিন্তু বল দেখি, তোমরাই আবার জগৎ অনিত্য বলিয়া জগতের সুখদুঃখে উদাসীন হইয়া ভগবৎ প্রেমে মাতিতে উপদেশ দাও কি না? পূর্ণ বৈরাগ্যের অবস্থায় জগৎকে মায়া বলিতে বল দেখি, কি আপত্তি থাকিতে পারে? তোমাদের এই সকল বিরোধ হয়,—তোমরা একেবারে মস্তিষ্কের চালনা ছাড়িয়া দিয়া, ভাব সাগরে আত্মহারা হইয়া যাও বলিয়া। তাই তোমরা গুরুপূজার নিকট, তাঁহার অমূল্য উপদেশ রাশি বলিদান দিতেও কুণ্ঠিত হও না। কিন্তু এটী মনে রাখ না যে, অবতার বা গুরুর উপসনা অর্থে তাঁহার স্থূল জড় শরীরটির উপাসনা নহে, উপাসনা—সেই শরীরের ভিতর যে চৈতন্য খেলিতেছেন, যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য—তাঁর। তোমরা নিরাকার মানিতে চাও না, কিন্তু ভাবিয়া দেখ না, তোমাদের সাকারের মহাত্ম্য ততটুকু, যতটুকু উহা সেই নিরাকার সত্তার প্রকাশক। চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, প্রভৃতির নাম রূপ ধাম লক্ষ্য নহে, চিৎই লক্ষ্য। এই চিতের অনুপ্রাণনেই নাম ধাম উজ্জ্বল—নাম ধামের এত মাহাত্ম্য। নতুবা তাহারা জড়। অতএব দেখ ভাবিয়া দেখিলে, তোমাদের ভক্তি জ্ঞানে আরোহণ করিবার, একটী সোপানমাত্র।

যো। সব স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার অ মাকেও বলিতে দাও।

একদিক দেখিলে চলিবে কেন ? তোমাদের উপদেশ কি ? না,—প্রথমে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে হইবে ; তবে, জ্ঞানের অধিকারী হইবে। এই সাধন চতুষ্টয়ের ভিতর—সগুণোপাসনা ও শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস—দুইটী প্রধান অঙ্গ। বাস্তবিক সেই গুলির সাধনায় ভক্তিরই সাধনা করা হয়। কার্য্যতঃ কিন্তু, তোমরা প্রথম হইতেই তত্ত্বমস্যাদি অদ্বৈতভাবাত্মক শ্রুতির শ্রবণ ও বিচার করিয়া থাক—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। কিন্তু যতই তুমি তত্ত্বমসি বল ও অভেদ ভাবিবার চেষ্টা কর,তোমার ভিতরে দ্বৈতভাবাত্মক ভক্তি রহিয়া যায়! তুমি মনে কর, আমি অদ্বৈত সাধনা করিতেছি ; কিন্তু বাস্তবিক তুমি ঘোর দ্বৈতবাদী। সাধারণতঃ যাহাকে লোকে দ্বৈতবাদী বলে, তাহার অপেক্ষাও হয়ত তুমি ঘোর দ্বৈতবাদী। তোমার শঙ্করাচার্য্যও বেদান্তসূত্রের শারীরক ভাষ্যে অনেক স্থলে জীবব্রহ্মের ভেদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে তোমার সহিত ভক্তের প্রভেদ এই, তুমি লাফাইয়া যে জিনিষটা ধরিতে চাও,হয় ত যাকে ধরা একেবারেই অসম্ভব,ভক্ত তাহা ধীরে ধীরে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে লাভ করিতে যান। ভক্তও যে, একরূপ অদ্বৈত অবস্থা লাভ করে, তাহা আমি জানি. কিন্তু সে কিরূপ জান ?—একজন অনেক দিন মনিবের সেবা করিল। তাহার মনিব তাহার প্রতি এত প্রসন্ন হইলেন যে, তাহাকে তিনি নিজ সিংহাসনে জোর করিয়া বসাইয়া আর সকলকে বলিয়া দিলেন—'ইনি ও আমি এক, তোমরা ইহাঁকে ও আমাকে সমান দেখিবে।' তাই বলে, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান,—অভেদ। কিন্তু ভক্ত সঙ্কুচিত হয়, সে চিরকাল আপনাকে ভক্ত বলিয়াই জানে। যে, সে ভক্তিরস আস্বাদন করিয়াছে—সে কি মুক্তি আদি প্রার্থনা করিতে পারে ? তোমাদের যাহাকে সোঽহং অবস্থা বল, তাহাও ক্ষণিক তন্ময় অবস্থা বই আর কিছুই নয়। অনেকে সোঽহং অভ্যাস করিতে পারেন, কিন্তু নিত্য ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই প্রমাণাভাব। তোমাদের জ্ঞান, উচ্চদরের ভক্তি ব্যতীত, আর কিছুই নয়।

আমি ইহাঁদের তর্কের একটু নমুনা দিলাম। আরও কত বিষয় আলোচিত হইত, কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জটিল দার্শনিক বিচার উঠিত, তাহার সব কথা আমার মনেও নাই, আর বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার উপযোগিতাও নাই।

---

# হিন্দু-সভা।

"হিন্দুসভার" আনুষ্ঠানিক সমিতির প্রথম অধিবেশনের দিন পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

সভাপতি—মহারাজ দ্বারভাঙ্গা।

( প্রাপ্ত। )

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও মহোদয়গণ!

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ," স্বজাতি শ্রেয়ঃসাধনরূপ মহাধর্ম্মের সাধনার জন্য অভ্যুদ্যত ব্যক্তি মাত্রেরই, প্রথমে ঔৎসুক্য পরিহার-পূর্ব্বক, সঙ্কল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য ঐকান্তিক তৎপরতাই অবলম্বনীয়, এই মহান্ সত্য উপদেশবাক্যটী সর্ব্বদা মনে রাখিয়া গন্তব্য পথের অনুসরণ যত দিন আমরা করিতে পারিব, ততদিন আমাদের এই পবিত্র সম্মিলনের অভিপ্সিত ফললাভের আশা হইতে যে আমরা বঞ্চিত হইব না, ইহা স্থির।

আমাদের দেশের কেমন এক কুস্বভাব হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, কেহ কোন নূতন সৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে দেখিলেই, কতকগুলি বিজ্ঞতাভিমানী, বহু-প্রকার নিষ্ফল কার্য্যে হস্তক্ষেপ নিবন্ধন নৈরাশ্যক্লিষ্ট প্রাচীনকল্প ব্যক্তি, বলিয়া উঠেন যে—"এ কার্য্য কেন হইতেছে? ইহাতে কোন ফলের আশা নাই, বরঞ্চ ইহা দ্বারা প্রভূত অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে"। ইত্যাদি প্রস্তাবনাতেই যবনিকা পাত করিবার জন্য এই প্রকার বিসদৃশ চেষ্টায়, অনেক সময়ে সমাজের হিত সাধনার্থ সমুদ্যত অনেক উৎসাহশীল ব্যক্তির তীব্রকার্য্যকারী উৎসাহবহ্নিও নির্ব্বাণ হইয়া সমাজের উন্নতির পথের অন্ধকারকে যে আরও ঘনীভূত করে, তাহার সন্দেহ নাই।

সত্য বটে, আমাদের অভাগ্য-দোষে এবং অভীপ্সিত সামাজিক কেন্দ্র-শক্তির সম্যক্ পরিচালনার অভাবে, আমরা অনেকবার অনেক আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যের আরম্ভ করিয়া পশ্চাতে বিফলমনোরথ হইয়াছি; কিন্তু, তাই বলিয়া যে, আমরা নৈরাশ্যে সকল কার্য্য বন্ধ করিয়া, হৃদয়ে বৈরাগ্যের লেশের আস্বাদন না করিয়াও, নিবৃত্তিসাগরে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বনাশকর সংন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? । শাস্ত্রে বলে—

"ভূমৌ সঞ্জাতপাতানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।"

আরও দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত

হইয়া, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পরিমাণে নিরাশ হইয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন করিতে গিয়া, কি শিক্ষিত সম্প্রদায় কি অশিক্ষিত সম্প্রদায়, কেহই এ পর্যান্ত সে পরিমাণে নৈরাশ্য অনুভব করেন নাই। প্রত্যুত, এই প্রকার ধর্ম্মান্দোলনে প্রতিবারেই আমরা কিছু না কি আশাসঞ্চারক ফলও যে না পাইয়াছি, তাহাও বলিতে পারা যায় না। না যাইয়া, এই কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী, যাহা এই কলিকাতায় আমাদে নয়নের সম্মুখে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, আমাদের এই সিদ্ধান্তের সারবত্তা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

আমার বেশ স্মরণ হইতেছে যে, ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতের রাজধানীতে বহুতর শিক্ষিত হিন্দু সন্তান, সময় ও স্থান বিশেষে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে যেন একটু ইতস্ততঃ করিতেন; অনেক পশ্চাত্যশিক্ষিত হিন্দুসন্তান, সংবাদপত্র বা বক্তৃতার সাহায্যে, প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম্মের অসারতা, হিন্দুশিক্ষার অসম্পূর্ণতা, ও হিন্দু দর্শনাদির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদনে বিশেষ উদ্যম করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ বিবেচনা করিয়াছেন; এবং তাৎকালিক সমাজের চক্ষে বহুমানপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। এই ত গেল ২৫ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। এখানকার অবস্থা, কিন্তু, সে প্রকার নহে। প্রায়ই পথে ঘাটে বিচরণ কালে, সম্মুখে বা পার্শ্বেপতিত দেবমন্দির বিলোকন করিয়া অবনতমস্তকে, অঞ্জলিবদ্ধকরে ভক্তিভাবে নমস্কার করিতে করিতে, গন্তব্যপথের অনুসরণতৎপর শিক্ষিত হিন্দুযুবকবৃন্দকে বিলোকন করিয়া, বিমল আনন্দ অনুভব করেন নাই, এমন কোন ব্যক্তি বোধ হয় এ সভাতে উপস্থিত হন নাই।

সংবাদপত্র মহলে দৃষ্টিক্ষেপ করুন—একালকার দেশীয় পরিচালিত প্রায় সকল সংবাদপত্রই, হিন্দুর প্রাচীন সৌভাগ্যকথা জগৎকে প্রতিক্ষণ জানাইয়া, তাহার কল্পনাময় পুনরুদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া, একমুখে, এক প্রাণের আবেগে, হিন্দুর বেদ, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর জ্যোতিষ, হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদের সারবত্তার বিজয়দুন্দুভির ঘোরধ্বনিতে, হিন্দুসন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিতেছে। আমি গৌরবের সহিত বলিতে পারি, এক্ষণে এমন শিক্ষিত হিন্দুসন্তান অতি অল্পই আছেন, যিনি জগতের সমক্ষে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে, হৃদয়ে বিলক্ষণ শ্লাঘার অনুভব না করিয়া থাকেন। আজ কাল, রামকৃষ্ণের নাম শুনিলে, বড় একটা

কেহই অন্ধ সংস্কারের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ভ্রুকুটি করেন না। ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, কণাদ, পতঞ্জলি প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্ ঋষিগণের নাম শুনিলে, এক্ষণে শিক্ষিত হিন্দু সন্তান, সক্রেটিস্, কম্‌টি, প্লেটো, স্পেন্‌সার, মার্টিনো প্রভৃতির অবিসম্বাদিত মনোরাজ্যের একমাত্রদ্রষ্টৃ নিবন্ধন, অলৌকিক প্রতিভার প্রতি আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্মানপ্রদর্শন করিতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন না। এই সকল জাতীয় মঙ্গলের আশাপ্রদ সূচনা দেখিয়া, কোন্ হিন্দুসন্তানের শরীর রোমাঞ্চিত না হয়?—নয়নে চির আকাঙ্ক্ষিত আনন্দময় অশ্রুবিন্দুর আবির্ভাব না হয়?

এই সকল দেখিয়া আশার উদয় হয়। যেন বোধহয়, হিন্দু ধর্ম্মের 'সারাপে ভাঁটার' প্রথম স্রোতে, আবার জোয়ার দেখা দিয়াছে। যে ধর্ম্মের ঐকান্তিক অবলম্বনে, ভারত সভ্যজগতের একমাত্র তীর্থক্ষেত্র হইয়াছিল, যে ধর্ম্মের শীতল শান্তিময় ছায়ায় নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিতে করিতে মহনীয়চরিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চতুর্ব্বর্গফলের আস্বাদন করিয়া, জগতের জ্ঞানপিপাসী মহাত্মাগণকেও অকাতরে তাহার আস্বাদন করাইয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক অমর হইয়া গিয়াছেন, যাহার উন্নতি ও অবনতির সহিত একসূত্রে হিন্দুসমাজের উন্নতি ও অবনতি চিরদিনের জন্য বাঁধা আছে,—সেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পরম আদরের ধন, হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্ব, হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের এমন সুন্দর পূর্ব্বরূপ দেখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে, স্বজাতিদ্রোহের দুরপনেয় পাপভার যে মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

বহু শতাব্দী, বৈদেশিক শাসকসম্প্রদায়ের ক্রীড়ার পুত্তলি হইয়াও যে, এই হিন্দুসমাজ, এখনও পৃথিবীতে, এক মাত্র হিন্দুধর্ম্মের বলে আপনার সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, অদৃশ্য ভাবে নিজ জীবনী-শক্তিকে জাগাইয়া রাখিতে সমর্থ রহিয়াছে, ইহা কি দেখিবার, ভাবিবার ও শিখিবার বস্তু নহে? ইতিহাস কি বলিতে পারে যে, হিন্দুর ন্যায় হতভাগ্য কোন্ মনুষ্যসমাজ, এত শত বৎসরের বৈদেশিক আধিন্য বহিতে বহিতে, এমন করে আপনার জাতীয় সমাজের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতে পারিয়াছে? কখনই না। হিন্দু-স্থানের ইতিহাসের পত্র ব্যতিরেকে, অন্য কোন দেশের ঐতিহাসিক পত্রে, এই অলৌকিক রক্ষণশীল সমাজের বিস্ময়কর জীবনী শক্তির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বা হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমাদের বহুপুণ্যের বলে, আমরা ইংরাজ জাতির আশ্রয় পাইয়াছি। ইতিহাসে প্রথিত আছে, এবং বর্ত্তমান কালে প্রত্যক্ষও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজ ন্যায়পরায়ণ, আশ্রিতপ্রতিপালক, গুণের আদরকারী, দুর্ব্বলের রক্ষাকর্ত্তা এবং ন্যায়সঙ্গত স্বাতন্ত্র্যের অকপট পরিপোষক। এই প্রকার সর্ব্বগুণোপেত মহাপ্রতাপশালী রাজার ভুবনব্যাপিশান্তির ঐকান্তিক সংস্থাপক শাসনদণ্ডের ভীমপ্রতাপে, ভারতবর্ষ আজ শান্তির শীতল ছায়ায় বাস করিতে পাইয়া, ধীরে ধীরে নব জীবন লাভ করিয়া, অভ্যুদয়ের উচ্চতম শিখরের দিকে অতর্কিতভাবে অগ্রসর হইতেছে। শান্তি-বিমলবারি সেকেই ধর্ম্মের মহাদ্রুম জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। ভারতব্যাপী এই বিশাল শান্তির গৌরবের দিনে, হিন্দুধর্ম্ম আবার যে নব জীবন লাভ করিবে না—তাহা কে বলিতে পারে?

হিন্দুসন্তান! বৃথা রাজনৈতিক আন্দোলনের অসাময়িক কুহকে পড়িয়া, তোমাদের উপকারের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত মহাপ্রতাপশালী, ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের মনে অকারণ অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া, স্বজাতির অভ্যুদয়ের পথে, দুরপনেয় কণ্টকের আরোপ করিতেছ। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের একমাত্র নিদান, শাসিত ও শাসক সম্প্রদায়ের তুল্য উপকারক আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের, চিরাভিলষিত অভ্যুদয়ের এমন দুর্লভ সুযোগ হাতে পাইয়া, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক, কাল্পনিক অভ্যুদয়ের প্রয়াসে রাজনীতির কণ্টকাবৃত বর্ত্ম অবলম্বন করা, কোন প্রকারেই সমর্থন করা যাইতে পারে না।

এস, ভারতের সমগ্র হিন্দুসন্তান! এস, সাম্প্রাদায়িকতার বিদ্বেষ বহ্নিকে চিরকালের জন্য ভারতমহাসাগরের অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া, ভারতের অনুরক্ত এবং অনন্যশরণ প্রজাবৃন্দের জাতীয় ধর্ম্মের অপক্ষপাতে রক্ষাকারিণী মহারাণীর ধর্ম্মময় শাসনের অবশ্যম্ভাবিফলস্বরূপ এই মহা সুযোগে, হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্য, আবার আমরা সকলে এক হই। ভারতের সমগ্র হিন্দুসন্তানকে এক অচ্ছেদ্য ধর্ম্মময় একতাগুণে আবদ্ধ করিয়া, পাশব বলের প্রয়োগে যাহা পাওয়া যায় না সেই অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়সরূপ অমৃতময় মহাফলের আস্বাদন করিয়া, জীবন সার্থক করিবার জন্য, আমাদের পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সেবিত মহাধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে আমাদের পরাঙ্মুখতা আর ত ভাল দেখায় না।

কেন, বল দেখি, ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমরা বৃথা রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে

যাই! ভারতের সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাস কি সুস্পষ্টভাবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে না যে, হিন্দু জাতির ধর্ম্মই জীবন? হিন্দুধর্ম্মই হিন্দুসমাজ-শরীরের মেরুদণ্ড। এই ধর্ম্মের বল ভাঙ্গিয়া গেলে, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয়। যে জাতির ধর্ম্ম ব্যতিরেকে একটী কার্য্যও সুসম্পন্ন হয় না, ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইলে যাহাদের সামাজিক বিশৃঙ্খলতা সর্ব্বতোমুখী হইয়া পড়ে, তাহাদের সকল প্রকার জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও পোষণের উপরই একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে,—এই বিশ্বাসকে মূল ভিত্তি করিয়া, আমরা অদ্য এই হিন্দুধর্ম্ম সভা স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ভগবান হৃদয়ে বল দিবেন—আশা করি, সেই বলে কোন না কোন দিনে, আমাদের ধর্ম্মময় সমাজের ভাগ্যাকাশে সুখের শশধর আবার উদিত হইয়া, জগতের শান্তিসুধা বর্ষণ করিবে;—অমাবস্যা ঘোর রজনীর প্রভাত হইবে না, এ কথা কে বলিতে পারে?

এই "হিন্দু সভার" কার্য্যপ্রণালী ও রীতিনীতির বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, ইহার একমাত্র লক্ষ্য হিন্দুধর্ম্মের বিষয় একটু অনুশীলন আবশ্যক বিবেচনায়, আপাততঃ সেই দিকেই অগ্রসর হইতে হইতেছে।

আমার বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় দুরবগাহ অলৌকিক বিষয়ের সমালোচনা অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য আর নাই। এক্ষণে জগতে যে কয়টী প্রধান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহাদের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বৈসাদৃশ্য এত বেশী যে, তাহাতে ঐ সকল ধর্ম্মের সহিত মিলাইয়া ইহার অনুশীলন একান্ত অসম্ভব। ইতিহাসে যাহার আদির পরিচয় নাই, মনুষ্যজাতিবিশেষের অভ্যুদয় বা পতনের সহিত যে ধর্ম্ম উদিত বা বিলুপ্ত হয় না, বৌদ্ধ, জৈন, মহম্মদীয়, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ শত্রুতায় যাহা কম্পিত হয় না, অসংখ্য অসংখ্য অলৌকিক অনুষ্ঠান ও অচিন্ত্য অভাবনীয় বিস্ময়াবহ বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়ানিচয়রূপ শাখাপ্রশাখায় দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত, যে মহান্ ধর্ম্মদ্রুমের বিশাল ছায়ার আশ্রয় পাইয়া, সনক, সনন্দ, নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, কপিল, গৌতম প্রভৃতি ত্রিজগৎ-পূজ্য মণীষিশ্রেষ্ঠগণ, অবিচলিত বিশ্বাসে অলৌকিক কার্য্যনিবহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, আত্মার চরিতার্থতা অনুভব করিয়া গিয়াছেন,—সেই মহান্ বিরাট পুরুষের ন্যায় বিশ্বতোব্যাপী সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রণিধান করিলে, কোন্ চিন্তাশীল ভাবুকের হৃদয় অলৌকিক বিস্ময়রসে আপ্লুত না হয়? আজিকার কথা বলিব না,—জগতের অন্যান্য সভ্যদেশবাসী যে সময় সহজ অজ্ঞানান্ধ

কারে পতিত হইয়া, ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিত, সেই প্রাচীনতম কালে, এই ভারতের বিজ্ঞানসম্পন্ন মণীষিগণ, এই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কি প্রকার ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন এবং ইহার উপর কি প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেন, তাহা জানিতে কাহার উৎসুকতা না হয় ?

বৈশেষিকদর্শনসূত্রপ্রণেতা মহামুনি কণাদ হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে—

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিঃ সধর্ম্মঃ।"

পরমাণুবাদের ন্যায় দুরবগাহ গম্ভীর দার্শনিক সিদ্ধান্তের অতুলনীয় ব্যবস্থাপয়িতা প্রাচীনতম মুনি কণাদের মুখে হিন্দুধর্ম্মের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সে কালের মনীষিবৃন্দের নিকট, এই হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় সর্ব্বসিদ্ধিকর উপায় হিন্দুর পক্ষে অপর আর কিছুই হইতে পারে না। এই কণাদসূত্রের ভাবার্থ এই হইতেছে যে,—অধিকারানুসারে অনুষ্ঠিত হইলে, যে উপায়ের দ্বারা আমরা সংসারে সকল প্রকার অভ্যুদয় এবং নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারি, তাহাই ধর্ম্ম। এই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির একমাত্র সাধন হিন্দুর ধর্ম্ম জানিবার জন্য, কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই বুঝাইবার জন্য মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমেই প্রকাশ করিয়াছেন যে—

"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।"

অর্থাৎ এই চতুর্ব্বর্গসাধন ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব জানিতে হইলে, বেদরূপ প্রমাণের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হইবে। নব্যশিক্ষিতাভিমানী, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তীব্র আলোকচ্ছটায় উদ্‌ভ্রান্তপ্রকৃতি যুবকের নেত্রে, পশ্চিমদেশীয় সুচতুর ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ, নবনির্ম্মিত বিচিত্র ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ঋগ্‌বেদ-সংহিতার শব্দগুলির নূতন ছাঁচের অর্থ করিয়া, বৈদিক মন্ত্রগুলিকে প্রাচীন হিন্দু কৃষকগণের হৃদয়ের অকপট সারল্যব্যঞ্জক হলচালনার গীতি বলিয়া ঘোষণা করত, ধর্ম্মবিশ্বাসের আবরণকে যত পারেন নিবিড়তর করুন না; কিন্তু, হিন্দুর বেদ যাঁহারা জানিতেন, বেদের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যাবজ্জীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যই যাঁহাদের আদরণীয় ব্রত ছিল, তাঁহারা এই সনাতন ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া, সেই অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞানের আধার বেদকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন; এবং বেদের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য সকল প্রকার বিষয় বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া, নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি

লাভের প্রত্যাশায় জীবন অতিবাহিত করিতেন; এই ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিবার শক্তি যে কাহারও নাই, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি।

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তে, যাহা আর্য্যকৃষকের গান ছাড়া আর কিছুই নহে, সেই বেদের পরিচয় আমরা বৈদিক ঋষিগণের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা এ ক্ষেত্রে না শুনাইয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

"স ঐক্ষত প্রজাপতিঃ ত্রয্যাংবাব বিদ্যায়াং সর্ব্বাণি ভূতানি হন্ত ত্রয়ী মেব বিদ্যাং আত্মানমভিসংস্করবা ইতি।"

ইহার তাৎপর্য্য এই হইতেছে যে, সেই প্রজাপতি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ঋক্ যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়বিদ্যার উপর সকল জীবগণের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে; ইহা বুঝিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, আমি আত্মার সংস্কারসাধনের জন্য এই ত্রয়ীবিদ্যাকেই অবলম্বন করিব। এই ত্রয়ী বিদ্যা কোথা হইতে এ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উত্তর বেদই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে—

"অস্য বৈ মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতৎ ঋগ্ বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদশ্চেতি।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই এই আদি পুরুষ বিরাটের নিশ্বাসের সহিত, এই সনাতন বেদচতুষ্টয় এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়াছে। একমাত্র বেদ-রূপ মহামূলের অবলম্বনেই যে, এই বিরাটবৎ বিশ্বতোমুখ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিরাজমান আছে, তাহা আমরা ধর্ম্মসংহিতার ঋষিগণের নিকটেও সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারি। ভগবান মনু বলিয়াছেন যে—

"বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেবচ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সমগ্র বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার একমাত্র প্রধান বর্ত্ম—বেদ। বেদ—আদি ও অন্ত রহিত, অসংখ্য শাখায় প্রবিভক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত প্রভৃতি দুরবগাহ গভীর বিষয় পরিপূর্ণ অঙ্গনিচয় পরি-পুষ্ট; মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্ম পুস্তকের প্রপিতামহ-স্থানীয়, প্রজাপতির বহুবর্ষব্যাপিতপস্যার বলে জগতে প্রকাশিত

বেদই, এই সর্ব্বপ্রকারে অলৌকিক সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ও সর্ব্বসুখনিদান হিন্দুর ধর্ম্মের একমাত্র মূল। সেই বেদ, রীতিমত আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিয়া দীর্ঘকাল আদরনিরন্তরসৎকারপূর্ব্বক অনুশীলন করিয়া, যাঁহারা বেদের মর্ম্মার্থ অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অভ্যন্তরীণ স্বভাবও অনেক স্থলে হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণরূপ পরিগৃহীত হয়। রাগদ্বেষবর্জ্জিত বেদার্থানুষ্ঠায়ী সাধুগণের আচারও কোন কোন স্থলে ধর্ম্মের প্রমাণ হইতে পারে। গৌতম বলিয়াছেন যে—

"বেদোধর্ম্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে।"

কালবশে বেদের বহুতর শাখা লুপ্ত হওয়া নিবন্ধন, অনেক প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাক্ষাৎ প্রমাণ স্বরূপ বেদ যে স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না, এই রূপ স্থলে মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির সাহায্য অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মের তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে হইবে। অধুনা এই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম নানা সম্প্রদায় ভেদে নানা আকারে পরিদৃশ্যমান হইলেও, বাস্তব পক্ষে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মূলে বেদের প্রামাণ্য সর্ব্ব প্রকারে অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান আছে। এবং সেই বেদেরই তাৎপর্য্য প্রকাশের জন্য বিরচিত মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যাসাদিপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্রও যে, সকল সম্প্রদায়ের উপজীব্য, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

যদিচ হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানই বেদমূলক, তাহা হইলেও ঐ সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে পরস্পর আপেক্ষিক বৈলক্ষণ্য থাকা নিবন্ধন, উহাদের মধ্যে অবান্তর বিভাগ আসিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যেমন, শ্রৌতধর্ম্ম, স্মার্ত্তধর্ম্ম, পৌরাণিক ধর্ম্ম এবং তান্ত্রিক ধর্ম্ম। এখন প্রচলিত কোন বেদাংশে যে সকল অনুষ্ঠানগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই শ্রৌতধর্ম্ম কহা যায়। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগ ও উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারকে শ্রৌতধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। তর্পণ, শ্রাদ্ধ, অতিথিসৎকার, বলিবৈশ্বদেব প্রভৃতি ক্রিয়ানিচয়কে স্মার্ত্তধর্ম্ম কহা যায়। দুর্গোৎসব, তীর্থযাত্রা, গয়াশ্রাদ্ধ, মঠাদিপ্রতিষ্ঠা, দেবতা স্থাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে পৌরাণিক ধর্ম্ম বলা যায়। পুরশ্চরণ,অভিষেক,দীক্ষা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, প্রভৃতিকে তান্ত্রিক ধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এ প্রকারে চতুর্দ্ধা প্রবিভক্ত হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণের একমাত্র প্রধান

উপায়—বর্ণাশ্রমাচার-সংরক্ষণ। বর্ণ ও আশ্রম বিহিত সদাচারের সম্যক্ অনুশীলন ব্যতিরেকে, হিন্দুধর্ম্ম ঈপ্সিত ফলদানে অসমর্থ হইয়া পড়ে। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে—

"আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতিনিশ্চয়ঃ।
হীনাচারপরীতাত্মা প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি॥
নৈনং তপাংসি ন ব্রহ্ম নাগ্নিহোত্রং ন দক্ষিণা।
হীনাচারাশ্রিতং ভ্রষ্টং তারয়ন্তি কথঞ্চন॥

এই সকল প্রাচীন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিবৃন্দের অভিপ্রায়ের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণ একমাত্র সদাচারের অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান ভারতের হিন্দুসন্তানের এই পুনরুজ্জীবনোন্মুখ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসদাচারসমূহের উপদেশ প্রতিপালন ও সংবর্দ্ধন বিষয়ে, এই হিন্দুধর্ম্ম সভার আন্তরিক চেষ্টা কোন সময় যাহাতে শৈথিল্য না পায়, সেই জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে।

এই "হিন্দুসভার" পরিচালনাবিষয়ে নিয়মপ্রণালী বিশেষরূপে এখনও প্রকাশিত না হইলেও, ইহার সামান্য ভাবে লক্ষ্যনির্দ্দেশ যে প্রকার করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া সাধারণ হিন্দুমাত্রই সন্তোষ অনুভব করিবেন—ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। একেবারে এই সকল গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান আপাততঃ এই সভাদ্বারা সম্পাদিত হইবে, এই প্রকার আশা আমাদের হৃদয়ে এইক্ষণে উদিত না হইলেও, কালে এই সভা নিজ গন্তব্য পথে অনায়াসে অগ্রসর হইয়া, শ্রৌত, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক এই চতুর্ব্বিধ হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণের অনুকূল বল সঞ্চয় করিয়া হিন্দুহৃদয়ের অনেক বিলুপ্ত-প্রায় আশানিচয়কে যে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবে, এ প্রকার আশা যে নিতান্ত অসমীচীন, ইহা আমার বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণের উদ্দেশে অদ্যাবধি যত সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,সর্ব্বাপেক্ষা এই হিন্দুসভার সৌভাগ্য অধিকতর, তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের দেশের সুযোগ্য নেতা, ব্রাহ্মণকুলচূড়ামণি, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, এবং সম্পদে কুবের সদৃশ, পরম উৎসাহী মহারাজ মিথিলেশকে, উৎসাহসহকারে এই সভার সভাপতিপদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া, বল দেখি কোন্ হিন্দুসন্তানের হৃদয় আজ গৌরবের উল্লাসে পরিপূরিত না হয়। ভারতবর্ষের রাজধানীতে

গণ্য মান্য শিক্ষিত ধনী হিন্দুসন্তানগণের জাতীয় ধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্য, মহারাজ মিথিলেশকে অগ্রসর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণের এই প্রথম দিন স্মরণ করিয়া, কে বলিতে পারে, যে ভবিষ্যৎ হিন্দুসন্তানগণ ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠে এই দিনটীকে জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রথম উদ্বোধনের দিন বলিয়া আন্তরিক সম্মান করিবে না?

---

# আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।] [ ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর।

যে পিট্রোলিয়ম—সহজ কথায়,কেরোসিন তৈল—মার্গেরিটায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও বিশেষ লাভজনক; উক্ত তৈল রেল কোম্পানী নিজে ব্যবহার করিতেছেন এবং জেলার মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছে। তবে, এই তেল এখন সাধারণ ভাবে বাজারে প্রচলিত হয় নাই, কারণ উহাতে অধিকতর ধুম উৎপন্ন হয়। যাহাতে অধিক ধুম উৎপন্ন না হইতে পারে, তাহার জন্য তৈল রিফাইন্ করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে। অপরাপর বিদেশী কেরোসীন তৈলের ন্যায়, যখন ইহার ধূম কমিয়া যাইবে, তখন বিলাতি তৈলের সহিত ইহার প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দিতা চলিবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ইহাও রেল কোম্পানীর এক চেটিয়া ব্যবসায়।

ডিব্রুগড় সহরে রেলওয়ে কোম্পানীর একটী কারখানা ( work-shop ) আছে,—ইহা একটী ছোটখাট জামালপুর। রেলকোম্পানীর যাবতীয় সম্ভবপর কার্য্যই এখানে হইয়া থাকে। লোহার ঢালাই, পেটাই, কাটাই এবং নানাবিধ কাষ্ঠ ও লোহার জিনিষ পত্র নির্ম্মাণ ও মেরামত হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত, স্থানীয় চা বাগীচার লোহার কাজও এই স্থানে হয়। এখানে অনেক লোক খাটে। তাবৎ লোকই—কারিকরই—বাঙ্গালা দেশের; ডিব্রুগড় সহর নর্থ বা উত্তর-লখিমপুর জেলার সদর ষ্টেশন, সুতরাং এইখানেই কাছারি আদালত প্রভৃতি সব অবস্থিত। অনেক সাহেব সুবা যেমন আছে, অনেক বাঙ্গালীও আছে। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে পরস্পরে বেশ সদ্ভাব দেখা যায়। কোন কোন বাঙ্গালীবাবু,—এ দেশে অনেক দিন থাকায়, দেশের মায়া মমতা কাটাইয়া, স্থায়ীরূপে বাস করিতেছেন; এই প্রকারে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাঙ্গালী গিয়া বাস করিতেছেন। অনেক দিন একস্থানে থাকিলে, বিষয় কর্ম্ম-

সূত্রে সচরাচর দেশে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না, কাজেই বিদেশে থাকিয়া যাইতে হয়। আজ কালের দিনে, বিষয় কর্ম্মের যে প্রকার বিচ্ছিন্ন ভাব, তাহাতে দেশে বসিয়া থাকা চলে না, সুতরাং কর্ম্মসূত্রে যাহার যেখানে অন্নজল, তাহাকেই সেইখানে—দূরাদূর নির্ব্বিশেষে,—যাইতে হয় এবং অবশেষে সেইখানে থাকিয়া যাইতে হয়। বাঙ্গালা দেশের লোক যে দিন দিন দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা এক পক্ষে সুলক্ষণ বলিতে হইবে, কেন না মানুষ বিদেশে গিয়া না পড়িলে, স্বীয় অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না, নিজের শক্তি ও কৃতিত্বও উপলব্ধি করিতে পারে না। এ দেশের সাধারণ লোকের মত এই যে, দেশ মধ্যে থাকিয়া শাকান্নে দিনযাপনও ভাল, কিন্তু বিদেশের রাজভোগও স্পৃহণীয় নহে। আমার কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ মতে মন উঠে না, কারণ দেশে বসিয়া থাকিলে প্রাণও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়,—"আমি ও আমার পুত্র" কলত্র ভিন্ন কিছুই জানিতে পারে না, জানিবার বা দেখিবার শুনিবার অবকাশ পায় না।

ডিব্রুগড় হইতে ২০।২৫ ক্রোশ দূরে 'হিল্‌কা-টী-ষ্টেট' নামে একটী চা-বাগিচা আছে। একদিন তথায় গিয়াছিলাম। বাগিচার ম্যানেজার মিষ্টার হ্যানকক্ ও তাঁহার পত্নী উভয়েই বড় উদার ও সহৃদয় প্রকৃতির লোক। মেম সাহেবের ফুলবাগানের উপর বড় সখ, সুতরাং আমার সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল এবং তিনিও অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাকে তাঁহার বাগান ও তাঁহার সখের ভাল ভাল যাবতীয় গাছ গাছড়া দেখাইলেন; আমিও বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। গাছে কমলালেবু ফলিয়া থাকিতে ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই, সেখানে তাহা দেখিলাম। গাছের শাখা প্রশাখায় সুপক্ক কমলালেবু ঝুলিতেছে দেখিয়া বড়ই আহ্লাদ হইল—অধিক কথা লিখিতে ভরসা হয় না, পাছে শ্রদ্ধেয় পাঠক মহাশয়ের রসনা সরস হইয়া পড়ে এবং 'উদ্বোধন' ভুলিয়া গিয়া রসনা-রঞ্জন করিবার জন্য কমলালেবু কিনিতে বাজারে ছুটিয়া যান! সে যাহা হউক, তেমন গাছপাকা লেবু কেবল যে দেখিয়া নয়ন জুড়ায় তাহা নহে, খাইলেও রসনা পরিতৃপ্ত হয়,—অধিক কি, বোধ করি পরমায়ুঃও বাড়িয়া যায়। আমি যে ইতি পূর্ব্বে কখনও গাছে কমলা ফলিয়া থাকিতে দেখি নাই এবং দেখিয়া যে বড় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি, তাহা মেম সাহেবকে বলিবামাত্র, তিনি যেন বিস্মিতা হইয়া গেলেন এবং আমি যতগুলি ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারি, ইত্যাদি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি আমার প্রতি যেরূপ ভদ্রতা করিলেন, আমি কিন্তু ততটা অভদ্রতা করিয়া, সব বা অর্দ্ধেকও আনিতে পারিলাম না—

মোট ৪।৫টী আনিলাম। পথে আসিতে আসিতে সব কয়টী খাইয়া ফেলিলাম —এবং মনে হইতে লাগিল, এমন টাট্‌কা লেবু আমরা কলিকাতায় বা বাঙ্গালা দেশে কোথায় পাইব? পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, কমলা বুঝি কেবল শ্রীহট্ট ও নাগপুর জেলাতেই জন্মে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, যে ডিব্রুগড় ও তৎসন্নিকটস্থিত অনেক স্থানেই উহা ভাল রকমই জন্মিয়া থাকে। জেলার নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া রীতিমত আবাদ দেখিতে পাইলাম না। তাহারও একটা কারণ এই যে, এক্ষণে বাজারে যে পরিমাণ লেবু আমদানী হইয়া থাকে, তাহাই স্থানীয় অভাব পূরণের পক্ষে যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক। বাজারে বড় বড় ও সুপক্ক লেবু দুইটা এক পয়সায় পাওয়া যায়।

কমলা লেবুর গাছগুলি ১০।১২ ফুট উচ্চ হয় কিন্তু যেরূপ ঝাড় বাঁধিয়া উঠে, তাদৃশ বলিষ্ঠ হইতে পারে না; তাহার কারণ এদেশে পোকা মাকড়ের যেরূপ উপদ্রব, তাহাতে সেরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ডিব্রুগড় সহর হইতে ২৫।২৬ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে, ডুমডুমা নামক রেলওয়ে ষ্টেশন, তথা হইতে দুই ক্রোশ দূরে 'তারা' অবস্থিত। এই পথটুকু যাতায়াত করিবার জন্য কোন যানের সুবিধা নাই এবং রাস্তাও কাঁচা,— বর্ষাকালে চলাচলের বড় অসুবিধা; তাহা ছাড়া উক্ত রাস্তাটীর উভয় পার্শ্বে জঙ্গল এবং কোন লোক-জনের বসতি নাই। তারা-বাগানে কয়েক দিবস ছিলাম। উক্ত বাগিচার ডাক্তার, বাবু সত্য প্রসাদ সেন মহাশয়, আমাকে অনেক যত্নের সহিত রাখিয়াছিলেন; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ এ কথা বলাই বাহুল্য, তবে সংসার-ক্ষেত্রে না বলা অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ। তারায় প্রথম প্রথম বড় অসুখ হইয়াছিল, কিন্তু রোজার কাছে ভূত থাকিতে পারে না—হাকিম দেখিলে চোর পালায়, ডাক্তার দেখিলে রোগ টিকিতে পারে না। ডাক্তার বাবুর যত্নে রোগ সারিয়া গেল। যে কয়েক দিবস থাকিলাম, তাহা বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল।

সমগ্র আসাম দেশটায় দুইটা জিনিষের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথম—জঙ্গল, ২য়—চা-বাগান। চা-বাগানের কথা এক রকম মোটা মোটা বলিয়াছি। এবার জঙ্গলসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। সমগ্র আসামে তাবৎ জঙ্গলই যে এক রকমের, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বারি-পাতের যেমন বিভিন্নতা আছে, আবহাওয়ারও সেইরূপ বিভিন্নতা আছে। সুতরাং জঙ্গলের গাছ পালা সব জেলাতে এক রকমের নহে এবং যে সকল গাছ পালা সকল

জেলাতেই দেখা যায়, তাহাদিগের বৃদ্ধির মধ্যে কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায়। আসাম প্রদেশ মধ্যে কাছাড়, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, ডারাঙ্গ, নওগাঁ, শিবসাগর ও লখিমপুর, এই যে আটটী জেলা আছে, তাহাতে বিগত ইং ১৮৯৩ সাল হইতে ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত—পাঁচ বৎসরে, যে জেলায় যত গড় বারিপাত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে জেলা পরস্পর মধ্যে আবহাওয়ায় কত তারতম্য। নিম্নে বারিপাতের একটা তালিকা দিলাম :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| জেলা | কাছাড় | পাঁচ সালের গড় | ১৩২.৪৬ ; | ১৮৯৮ সালের | ৭৬.৩৪ । |
| " | শ্রীহট্ট | " | ১৫৭.২৮ ; | " | ১০৬.৪৭ । |
| " | গোয়ালপাড়া | " | ৯৮.১৯ ; | " | ৯২.১০ । |
| " | কামরূপ | " | ৬৩.৭১ ; | " | ৭১.৭৭ । |
| " | দারাঙ্গ | " | ৬৮.০৮ ; | " | ৭৫.৫৬ । |
| " | নওগাঁও | " | ৬০.৬৬ ; | " | ৬২.৭২ । |
| " | শিবসাগর | " | ১১০.৩২ ; | " | ৮৯.২০ । |
| " | লখিমপুর | " | ১০৮.৫০ ; | " | ১৪৪.১৫ |

উল্লিখিত তালিকার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বাঙ্গালা দেশ হইতে যতই আসামের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, ততই বার্ষিক বারিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং উদ্ভিজ্জগতেও একটা বৈষম্য দেখা যায়। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বহু পরিমাণে জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বারিপাতের পরিমাণও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। বারিপাতের সহিত আবহাওয়ার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, আবহাওয়ার সহিত চা'র উৎপত্তি ও গুণের সেইরূপ সম্বন্ধ। অনেকের মতে, এবং সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় যে, পূর্ব্বাপেক্ষা উৎপন্ন চা'র পরিমাণ যেমন হ্রাস হইয়াছে, সেই সঙ্গে উহার গুণবত্তারও কিছু লাঘব হইয়াছে।

তেজপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানে নাহোর (নাগেশ্বর চাঁপা—Mesua Feria or Iron wood tree), কুরচী (Writia antidysentrica) বৃহতি, প্রভৃতি গাছের যেরূপ প্রাচুর্য্য দেখা গিয়াছে, এখানে সব গাছ তত দেখা যায় না এবং এখানে যে সব গাছ দেখি তাহার অধিকাংশই নূতন বলিয়া মনে হয়। এখানে শিমুল গাছ (শাল্মলী) প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গাছগুলা ৮০।৯০ফুট উচ্চ হয় এত শিমুল গাছ—কিন্তু দেশে শিমুল তুলা পাওয়া দুষ্কর। "নামে তাল-পুকুর—কিন্তু ঘটী ডুবে না।"

শিমুল গাছের নাম করিতে, সম্পাদক মহাশয়! আপনাদিগের মঠের শিমুল আলুর কথা মনে পড়িল। মঠের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ বা ময়দানে যে রূপ যত্ন করিয়া, আপনারা শিমুল-আলুর গাছ পুতিয়াছেন, আসামে তাহা স্বভাবজাত উদ্ভিদ এবং স্থানীয় লোকেরা উহার দ্বারা বাগান বাগিচার বেড়া দিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় আপনারা যেরূপ বিভীষিকা দেখিতেছেন এবং তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, যেরূপ আগ্রহসহকারে শিমুল গাছ কয়টী রোপণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অদূরদর্শী সংসারী বা গৃহী ব্যক্তির পক্ষে অনুকরণীয়। যদি শিমুল আলুতেই দুর্ভিক্ষ নিবারণ হওয়া সম্ভব হয়, তবে স্বভাবজাত শিমুল-আলুপূর্ণ আসামদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলে ক্ষতি কি?

অর্কিড (orchid) অনুসন্ধান করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জঙ্গলে যাইতাম। জঙ্গল বা ফরেষ্ট (forest) নানাবিধ গাছ আছে—তাহার অধিকাংশই অপূর্বদৃষ্ট। বাগিচা পার হইলেই জঙ্গল আরম্ভ। জঙ্গল সমূহ অতিশয় গম্ভীর—সূর্য্যালোক প্রবেশের পথ রুদ্ধ। সেই অসূর্য্যম্পশ্য গভীর জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিতে সর্ব্বদাই গা ছমছম্ করে,—কি জানি যদি সুন্দর রেখাযুক্ত সুদীর্ঘ-লাঙ্গুলবিশিষ্ট ব্যাঘ্ররাজ হর্ষোৎফুল্লমনে 'হালুম' শব্দে ঘাড়ে পড়িয়া যত্ন সহকারে গভীরতর বনমধ্যে প্রবিষ্ট হন এবং নররক্ত পীয়ূষপানে দীর্ঘকালের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেন,—অথবা বনমাতঙ্গদল বিধিনির্দিষ্ট স্বীয় আবাসভূমে নর-লোকের অনধিকার প্রবেশ দেখিয়া, শুণ্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিয়া আক্রমণ করেন। যাহা হউক, এ সকল বিপদ আপদ কিন্তু কিছুই ঘটে নাই। বন মধ্যে রাস্তা ঘাটের ত কোন বন্দোবস্ত নাই, কাজেই অতি কষ্টে ও অনেক সময়ে যতটুকু পারিলাম যাইলাম। গাছের উপরে নানা রকমের অর্কিড ও ফার্ণ (fern) দেখিলাম—কিছু কিছু সংগ্রহ করিলাম। অপরাহ্ণে প্রত্যাগমন কালে অন্য পথ দিয়া আসিলাম— আসামীদিগের গ্রাম দেখিবার জন্য।

গ্রাম শব্দে বাঙ্গলা দেশের ন্যায় ঘন বসতীপূর্ণ স্থান বুঝিবেন না; যে গ্রামে যাইলাম, তাহা ১০।১২ বিঘা জমি মাত্র। কয়েকখানি কুটীর,—উলুখড় আচ্ছাদিত,—আছে। কয়েকটী স্ত্রীলোক, কয়েকটী বালক বালিকা ও দুই একটা বুড়া দেখিলাম। সেই জঙ্গল,—গভীর জঙ্গল পরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যে, তাহারা যেন বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছে বলিয়া মনে হইল। মনে হইল যেন ইহাদিগের জগৎ সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। একটা

ঘরে দেখি, একটা বুড়া সম্মুখে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড জ্বালিয়া বসিয়া আছে। বুড়া মৌতাতের সময় দেখিয়া আফিম সেবনের উদ্যোগ করিতেছে। সাধারণতঃ এ দেশের লোক কিছু আফিমপ্রিয়। আফিমকে এ দেশের ভাষায় 'কাণি' কহে। কাণির সংস্থান থাকিলে ইহাদিগের আর পয়সা কড়ির দরকার হয় না। কেবল উহারই সংস্থান করিবার জন্য বোধ হয় যেন, ইহারা যাহা কিছু শাক-পাতা সপ্তাহান্তে রবিবারে নিকটস্থিত হাটে আসিয়া বিক্রয় করে,—কেহ বা নিজের তাঁতজাত কাপড় গামছাও আনিয়া থাকে,—অপর কেহ বা হাঁস মুরগী ও তাহার ডিম্ব আনিয়া বাণিজ্য করিয়া যায়। ইহাদিগের প্রায় সকলের ঘরে একখানা করিয়া তাঁত আছে এবং স্ত্রীলোকগণ তাঁত বুনিয়া থাকে। তাঁতে যে কাপড় তৈয়ার হয়, তাহা নিজেরা ব্যবহার করে,—অতিরিক্ত হইলে বিক্রয় করে। ঘরের সন্নিকটে ও সম্মুখে একটু জায়গা থাকে, তাহাতেই অল্প পরিমাণে শাক পাতা তৈয়ার করিয়া, কতক নিজ খরচের জন্য রাখে, আর কতক বিক্রয় করে। মুরগী প্রায় সকলেই পুষিয়া থাকে।

প্রকৃত আসামীদিগকে অনেকটা ব্রহ্ম বা শ্যাম দেশীয় লোকের ন্যায় দেখায়,—মুখমণ্ডল গোল, চিবুক চাপা ও চক্ষু ছোট। বর্ণ তত উজ্জ্বল গৌর না হইলেও, ইহারা কৃষ্ণকায় নহে। পুরুষেরা কাপড় বা লেংটি পরে,—স্ত্রীলোকেরা একটা বালিশের খোলের ন্যায় একটা সায়া পরিধান করিয়া থাকে, আর বুকে একখণ্ড কাপড় বাঁধিয়া রাখে এবং মস্তকোপরি এক টুকরা পাতলা চাদর ফেলিয়া দেয়। উহার মধ্যে বিত্তসম্পন্ন স্ত্রীলোকেরা কোথাও যাইতে হইলে, রেশমের সায়া ও বুকঢাকা ব্যবহার করে। তাবৎ চীনেম্যানকে যেমন 'জন্' বলিয়া অভিধান করা যায়, আসামী পুরুষ মাত্রই 'মিতা" ও স্ত্রীলোক 'মিতালী" শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ভাষা ও বর্ণমালায় 'স' ও 'ত" বর্গের উচ্চারণ নাই বলিয়া বোধ হয়, কেন না তাহারা 'মিতা' স্থলে 'মিটা', 'কোথা' স্থলে 'কোট', 'মানুষ' স্থলে 'মনুঃ' ইত্যাদি উচ্চারণ করে। ইহাদিগের ভাষায় কথোপকথন শুনিতে বড় মিষ্ট বোধ হয়, আর মনে হয় যেন বালকের ন্যায় আধ আধ বুলিতে ইহারা কথা কহিতেছে। স্বভাবতঃ ইহারা বড় ভাল মানুষ, ও প্রফুল্লচিত্ত। বাঙ্গালী মাত্রকেই ইহারা 'বাঙ্গাল' বলে এবং বাঙ্গাল তাহাদিগের ঘরে প্রবেশ করিলে তাহাদিগের পানাহারীয় দ্রব্যাদি নষ্ট হয়। সুতরাং 'টেহেলে যা—টেহেলে যা' অর্থাৎ দূর দূর করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থাকে। সকল জাতির মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার আছে, সুতরাং

এজন্য তাহাদিগকে নিন্দা করা যায় না। একদিন দ্বিপ্রহরের সময় কোন স্থান হইতে আসিতে আসিতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়ি। সন্নিকটে একটী আসামী ভদ্রলোকের আশ্রয়ে যাইয়া কিঞ্চিৎ পানীয় জল চাহিলাম। বাবুটী বিশেষ ভদ্রতা সহকারে আমাকে আহ্বান করিয়া বসিতে কহিলেন এবং ঘর্ম্মাক্তকলেবরে জল পান করা উচিত নহে বলিয়া, ত্বরিত গমনে গৃহ হইতে 'চা' প্রস্তুত করিয়া আনিয়া আমাকে পান করাইলেন। সেই ক্লান্তির পর 'চা' পান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম এবং তাঁহার আতিথেয়তার জন্য তাঁহাকে বারম্বার ধন্যবাদ দিয়া, তথা হইতে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলাম। আরও দুই একবার এরূপ আতিথেয়তার পরিচয় পাইয়াছি, সুতরাং আসামবাসীগণ যে বিশেষ অতিথিপরায়ণ, তদ্বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই।

প্রথম প্রথম এদেশে আসিয়া আসাম ভাষায় কথোপকথন বুঝিতে পারা যায় না। যে সকল বাঙ্গালী অনেক দিন এ দেশে আছেন, তাঁহারা অনায়াসে আসামী ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া নূতন নূতন আমি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। এক্ষণে নিজেও দুই পাঁচটা কথা শিখিয়াছি—তাহার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| হাঁ ... | হাঁস। | মানু | ... | মানুষ। |
| কুনি ... | ডিম্ব। | কিমান | ... | কি পরিমাণ, কত। |
| ডিংলা ... | বিলাতি কুমড়া। | ধন দিম | ... | টাকা দিব। |
| ঝালিকা | লঙ্কা। | বাড়ো | ... | ভাল, যে আজ্ঞা। |
| টেঙ্গা ... | টক্, অম্বল। | ভাল | ... | ভাল। |
| মিঠে টেঙ্গা | কমলালেবু। | গুটি | ... | বীজ। |
| ডাঙ্গরিয়া | বড়। | নি ডিম | ... | দিব না। |
| নিটা ... | বাঙ্গালা ভাই শব্দ সূচক অর্থে ব্যবহার হয়। | | | |
| লোড়া ... | ছেলে। | | | |
| ছোয়ালি ... | যুবতী। | | | |

কিছু দিন পরে হইলে আরও কতকগুলি কথা দিতে পারিতাম কেন না ততদিনে আরও কিছু শিখিবার সম্ভাবনা আছে। আসামে ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম না একটী জিনিষ—চোর, যাহা কলিকাতায় বহুৎ বহুৎ। এদেশে লোকের অভাব অল্প ; সুতরাং চোর বাটপাড়ও দেখা যায় না। চোর, জুয়াচোর, সুরা, বেশ্যা প্রভৃতি সভ্যতার অঙ্গ ; সুতরাং কলিকাতার ন্যায়

রাজধানীতে তাহার প্রাচুর্য্য না থাকিলে সহর গুলজার থাকে না। আসামে এতদূর সভ্যতা এখনও আসিতে পারে নাই—এজন্য আসামীগণ ধন্য!

---

## রামকৃষ্ণ মিশন।

রামকৃষ্ণমিশন-ভুক্ত কিষণগড়-অনাথাশ্রমের মার্চ্চ মাস অবধি আয়-ব্যয়-তালিকা পূর্ব্বে সাধারণসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে, উক্ত আশ্রমের ও খাণ্ডোয়া আশ্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এপ্রিল ও মে মাসের মোট আয়-ব্যয় জানাইতেছি।—

বিগত মে মাস হইতে, মধ্য-প্রদেশান্তর্গত খাণ্ডোয়া নামক স্থানে আর একটি দুর্ভিক্ষমোচন-আশ্রম খোলা হইয়াছে। তাহারও মোট আয়-ব্যয় এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।

উক্ত দুই স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছুমাত্র না কমিয়া, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিষণগড়ের অনাথ বালকবালিকার সংখ্যা এখন ১২৫। খাণ্ডোয়াতে ১৮৫ জন সাহায্য পাইতেছে। দুই স্থানেই অতিশয় জলকষ্ট এবং বৃষ্টির নাম গন্ধ পর্য্যন্ত এখনও নাই।

কিষণগড়ের অনাথাশ্রম ও খাণ্ডোয়া দুর্ভিক্ষমোচনাশ্রমের কার্য্যের নিমিত্ত যাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া গত এপ্রিল ও মে মাসে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ধাম ও প্রেরিত সাহায্য ইতি পূর্ব্বেই ইণ্ডিয়ান্ মিরার পত্রিকায় স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব তাহার আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেবল হালিসহরস্থ জনৈক বন্ধু "এক দীন-ব্যক্তি প্রেরিত" বলিয়া ৫৲ টাকা প্রেরণ করেন। উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে ভুল হইয়াছিল। তজ্জন্য এই সূত্রে উহা ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিতেছি। জুন মাসের সাহায্যকারীদের নাম ধাম পরে প্রকাশিত হইবে। জয়পুরের রেসিডেণ্ট মিঃ জি, আর, আরউইন মহোদয় কিষণগড় আশ্রমের সাহায্যার্থ এককালে ১০০৲ টাকা প্রেরণ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখিয়া অনুমান হয়—আগামী নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত উক্তস্থানে আশ্রম রাখিতেই হইবে, এবং উক্ত সাহায্য না পাইলে বোধ হয় এত দিন আশ্রম রাখা অর্থাভাবে দুষ্কর হইয়া উঠিত।

## কিষণগড়-অনাথাশ্রম

| | |
|---|---|
| গত এপ্রিল ও মে মাসের মোট আয়— | ৮:৫ ।০ |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,, ব্যয়— | ৭৩৷ ॥/০ |
| হস্তে বাকি— | ৭৭ ॥√০ |

## খাণ্ডোয়া-দুর্ভিক্ষ মোচনাশ্রম

| | |
|---|---|
| গত মে মাসের মেট আয়— | ৬৪৩ ॥০ |
| ,, ,, ,, ,, ব্যয়— | ১৭২ √১০ |
| হস্তে বাকি | ৪৭১ ৵১০ |

আয়-ব্যয়ের সবিশেষ বিবরণ বসুমতী, প্রতিবাসী, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রভৃতি সংবাদ পত্রাদিতে এবং পৃথক প্যাম্‌ফ্লেট আকারে, ছাপা হইয়া থাকে।

স্থানীয় কমিশনার সাহেবের পরামর্শে শীঘ্রই ৩০০৲ টাকার কাপড় গরিব-দিগকে প্রদত্ত হইবে।

মঠ,
বেলুড়, হাওড়া
২, ৬, ০০,

(স্বাক্ষর) সারদানন্দ।

# সমালোচনা।

**ঋষি।** মাসিক পত্র। আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্ম বিষয়ক। ১ম বর্ষ, ৯ম ও ১১শ সংখ্যা। ইহাতে বেশ সুপাঠ্য ও সাধারণের উপকারী প্রবন্ধ থাকে। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সরল ভাষায় সাধারণে যত প্রবন্ধ প্রচার করা যায়, ততই দেশের মঙ্গল। কেন না, আয়ুর্ব্বেদ আমাদের দেশের; সুতরাং ইহার ব্যবস্থাগুলি এ দেশের বিশেষ উপযোগী হইবার কথা। ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলিও উপাদেয়। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর 'আদর্শ' নামক প্রবন্ধে একঘেয়ে ভক্তির পরিচয় অর্থাৎ গোঁড়ামী আছে। প্রবন্ধ-রচয়িত্রী অন্যান্য অবতার মহাপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত বিশেষরূপে আলোচনা করিবেন, এই প্রার্থনা।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—জ্ঞানবানপি (জনঃ) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ।—জ্ঞানবান্ হইয়াও (মনুষ্য) নিজপ্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, (সুতরাং) নিগ্রহ (প্রতিষেধবিধি) কি করিবে? ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য।—কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ত্বদীয়ং মতং নানুতিষ্ঠন্তি পরধর্ম্মান্ অনুতিষ্ঠন্তি স্বধর্ম্মং চ নানুবর্ত্তন্তে ত্বৎপ্রতিকূলাঃ কথং ন বিভ্যতি ত্বচ্ছাসনাতিক্রমদোষাৎ। তত্রাহ সদৃশমিতি। সদৃশমনুরূপং চেষ্টতে কস্যাঃ? স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারঃ বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিঃ তস্যাঃ সদৃশমেব সর্ব্বো জন্তুর্জ্ঞানবানপি কিং পুনর্মূর্খঃ। তস্মাৎ প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি মম বান্যস্য বা। ৩৩।

ভাষ্যানুবাদ।—কি কারণে তোমার মতের অনুবর্ত্তন করে না, পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং স্বধর্ম্মের প্রতিপালন করে না? তোমার প্রতিকূল হইয়া তোমার আজ্ঞালঙ্ঘনরূপ দোষেও ভয় পায় না কেন? এই প্রকার অর্জ্জুনের প্রশ্ন সম্ভাবনা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন যে সদৃশমিত্যাদি। সদৃশ (অর্থাৎ) অনুরূপ চেষ্টাই করিয়া থাকে। কাহার? নিজ প্রকৃতির। পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদি সংস্কার বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভে অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই প্রকৃতি বলা যায়। মূর্খের ত কথাই নাই, সকল জীব জ্ঞানবান হইয়াও নিজ নিজ প্রকৃতির অনুগমন করে, (বিধিনিষেধশাস্ত্ররূপ) নিগ্রহ, (আমারই হউক বা অন্যেরই হউক না কেন) তাহার কি করিবে? ॥ ৩৩ ॥

---

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং) অর্থে—(ইষ্টে দ্বিষ্টে বা) রাগদ্বেষৌ (যথাক্রমং) ব্যবস্থিতৌ। তয়োর্বশং ন আগচ্ছেৎ হি (যস্মাৎ) তৌ (রাগদ্বেষৌ) অস্য (পুরুষস্য) পরিপন্থিনৌ (শ্রেয়োমার্গবিঘ্নকরৌ) ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—সকল ইন্দ্রিয়েরই ভোগ্য শব্দাদি বিষয় ইষ্ট বা দ্বিষ্ট হইলে তাহাতে যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষ ব্যবস্থিত আছে, পুরুষ এই রাগ ও দ্বেষের

বশীভূত হইবে না, কারণ এই রাগ ও দ্বেষ, পুরুষের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য।—যদি সর্ব্বো জন্তুঃ আত্মনঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে ইন্দ্রিয়স্যেতি।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে শব্দাদিবিষয়ে ইষ্টে রাগঃ অনিষ্টে দ্বেষঃ ইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থে রাগদ্বেষাববশ্যম্ভাবিনৌ। তত্র যঃ পুরুষকারস্য শাস্ত্রার্থস্য চ বিষয় উচ্যতে। শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্তঃ পূর্ব্বমেব রাগদ্বেষয়োর্বশং নাগচ্ছেৎ যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগদ্বেষপুরঃসরৈব স্বকার্য্যে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি তদা স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ পরধর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ ভবতি। যদা পুনঃ রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্ত্রার্থদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি ন প্রকৃতিবশঃ। তস্মাৎ তয়োরাগদ্বেষয়োর্বশং ন গচ্ছেৎ তৌ হি অস্য পুরুষস্য পরিপন্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ তস্করাবিবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যদি সকল জীবই নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টাই করে এবং প্রকৃতিশূন্য কেহ না থাকে, তাহা হইলে পুরুষকারের বিষয় অনুপপন্ন হওয়াতে শাস্ত্রের নিরর্থকতার আপত্তি হইতেছে, এইপ্রকার শঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য বলা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়স্যেত্যাদি। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ) সকল ইন্দ্রিয়েরই অর্থ শব্দাদি বিষয় ; সেই শব্দাদি বিষয় ইষ্ট হইলে তাহাতে রাগ এবং অনিষ্ট হইলে তাহাতে দ্বেষ, এই প্রকার প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ ও দ্বেষ। এই প্রকার বস্তু বিভাগ হইলেও পুরুষকার ও শাস্ত্রার্থের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, শাস্ত্রীয় অর্থে প্রবৃত্ত পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই রাগ কিম্বা দ্বেষের বশীভূত হইবে না। পুরুষের যে প্রকৃতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা রাগ ও দ্বেষকে দ্বারস্বরূপ করিয়া পুরুষকে স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, সেই সময়ই স্বধর্ম্মপরিত্যাগও পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান ঘটিয়া থাকে। যে সময় পুরুষ প্রতিকূল ভাবে রাগ ও দ্বেষকে নিয়মিত করিতে পারে, তখন তাহার শাস্ত্রেতেই দৃষ্টি হয়, এবং সে প্রকৃতির বশীভূত হয় না। এই কারণে সেই রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইবে না, কারণ সেই রাগ ও দ্বেষ পুরুষের পরিপন্থী ( অর্থাৎ ) তাহার শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকর্ত্তা ঠিক দস্যুর ন্যায় ॥ ৩৪ ॥

---

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ (অপি) স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ (ভবতি)॥ ৩৫॥

মূলানুবাদ।—সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে অসম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত নিজ ধর্ম্ম শ্রেয়ান্। স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম (মরণের পরও) নরকাদি-লক্ষণ ভয়ের হেতু॥ ৩৫॥

ভাষ্য। তত্র রাগদ্বেষপ্রযুক্তো মন্যতে শাস্ত্রার্থমপ্যন্যথা পরধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মত্বাদনুষ্ঠেয় এব ইতি তদসৎ শ্রেয়ানিতি।

শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বোধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ বিগুণোঽপি বিগতগুণোপি অনুষ্ঠীয়মানঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাদ্গুণ্যেন সম্পাদিতাদপি স্বধর্ম্মে স্থিতস্য নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ কস্মাৎ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ নরকাদিলক্ষণং ভয়ং আবহতি যতঃ॥ ৩৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—রাগ ও দ্বেষ প্রযুক্ত হইয়া (লোক) ধর্ম্মকেও অধর্ম্ম বলিয়া বোধ করে, এবং বিবেচনা করে যে, যে কারণ ইহাও ধর্ম্ম, এইজন্য পরধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। (লোকের) এ প্রকার জ্ঞান অসৎ (তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে) শ্রেয়ানিত্যাদি। শ্রেয়ান্ (এই শব্দের অর্থ) প্রশস্যতর, (কাহা হইতে?) সকল অঙ্গের সহিত সম্পাদিত পরধর্ম্ম হইতে (কি প্রশস্য-তর) অঙ্গবৈগুণ্যের সহিত অনুষ্ঠীয়মান "স্বধর্ম্ম" আত্মধর্ম্ম। স্বধর্ম্মে স্থিত ব্যক্তির নিধন (অর্থাৎ) মরণও পরধর্ম্মে স্থিত জীবনের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কেন? (যে কারণ) পরধর্ম্ম ভয়াবহ (অর্থাৎ) নরকাদিরূপ ভয়কে উৎপন্ন করিয়া থাকে॥ ৩৫॥

---

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

অন্বয়।—হে বার্ষ্ণেয় অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (সন্) বলাৎ নিয়োজিত ইব পাপং চরতি (অনুতিষ্ঠতি)॥ ৩৬॥

মূলানুবাদ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে বৃষ্ণিনন্দন! এই পরিদৃশ্যমান পুরুষ, অভিলাষ না থাকিলেও কাহার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া বলের দ্বারা প্রেরিতের ন্যায় পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে?॥ ৩৬॥

ভাষ্য।—যস্তাপনর্থমূলং ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসো রাগদ্বেষৌ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনাবিতি চোক্তং বিক্ষিপ্তমনধারিতং চ তদুক্তং তৎ সংক্ষিপ্তং নিশ্চিতং চেদমেবেতি জ্ঞাতুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ, জ্ঞাতে হি তস্মিন্ তদুচ্ছেদায় যত্নং কুর্য্যামিতি অথেতি।

অথ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ সন্ রাজ্ঞেব ভৃত্যোঽয়ং পাপং কর্ম্ম চরত্যাচরতি পুরুষঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিকুলপ্রসূত! বলাদিব নিয়োজিতো রাজ্ঞেবেত্যুক্তো দৃষ্টান্তঃ॥ ৩৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ", "তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা, যাহা অনর্থের মূল তাহা যদিও উক্ত হইয়াছে (তথাপি) তাহা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত এবং অনবধারিত রূপেই উক্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে "ইহাই নিশ্চিত অনর্থের মূল" ইহা জানিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (কারণ) নিশ্চিতরূপে তাহাকে জানিলে, তাহার উচ্ছেদের জন্য যত্ন করিতে পারা যাইবে অথ ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করি, রাজার দ্বারা প্রেরিত ভৃত্যের ন্যায় কোন হেতুর দ্বারা প্রেরিত পুরুষ স্বয়ং ইচ্ছা না করিয়াও বলের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। হে বৃষ্ণিকুলপ্রসূত, রাজার দ্বারা প্রেরিত ভৃত্যের ন্যায় এই দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে॥ ৩৬॥

---

শ্রীভগবানুবাচ।—

কাম এষ ক্রোধএষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনোমহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭॥

অন্বয়।—মহাশনো মহাপাপ্মা রজোগুণসমুদ্ভবঃ এষ কামঃ এষ এব ক্রোধঃ (চ) এনমিহ বৈরিণং বিদ্ধি (জানীহি)॥ ৩৭॥

মূলানুবাদ।—যাহা রজোগুণসমুদ্ভব, যাহার পূর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং যাহা হইতে মহাপাপ সমুৎপাদিত হয়, সেই কাম এবং তাহার পরিণাম ক্রোধকে এই সংসারে (পুরুষের) মহাবৈরী বলিয়া জানিও॥ ৩৭॥

ভাষ্য।—শৃণু ত্বং তং বৈরিণং সর্ব্বানর্থকরং যং ত্বং পৃচ্ছসি শ্রীভগবানুবাচ,——"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।

বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

ঐশ্বর্য্যাদিষট্কং যস্মিন্ বাসুদেবে নিত্যমপ্রতিবদ্ধত্বেন সামস্ত্যেন চ বর্ত্ততে।

"উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ সজ্ঞেয়ো ভগবানিতি॥

উৎপত্ত্যাদিবিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানং যস্য স বাসুদেবো বাচ্যো ভগবান্ ইতি। কাম ইতি।

কাম এষ সর্ব্বলোকশত্রুর্যন্নিমিত্তা সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাং স এব কামঃ প্রতিহতঃ কেনচিৎ ক্রোধত্বেন পরিণমতে। অতঃ ক্রোধোঽপ্যেষ এব, রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ রজশ্চ তদ্‌গুণশ্চ স রজোগুণঃ স সমুদ্ভবো যস্য স কামো রজোগুণ-সমুদ্ভবো রজোগুণস্য বা সমুদ্ভবঃ। কামোহি উদ্‌ভূতঃ রজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি তৃষ্ণয়া হ্যহংকারিত ইতি দুঃখিতানাং রজঃকার্য্যে সেবাদৌ প্রবৃত্তানাং প্রলাপঃ শ্রূয়তে মহাশনো মহদশনমস্যেতি মহাশনোঽতএব মহাপাপ্মা কামেন হি প্রেরিতো জন্তুঃ পাপঃ করোতি, অতো বিদ্ধ্যেনং কামমিহ সংসারে বৈরিণম্॥ ৩৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাহার বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিতেছ, সেই সর্ব্বানর্থকারী বৈরীকে, তাহা তুমি শ্রবণ কর (ইহা) ভগবান বলিতেছেন।

("সমগ্র ঐশ্বর্য্য ধর্ম্ম যশঃ শ্রী বৈরাগ্য এবং মোক্ষ এই ছয়টী পদার্থের নাম ভগ, এই ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টী পদার্থ যে বাসুদেবে নিয়ত অপ্রতিবদ্ধভাবে বিদ্যমান আছে।" এবং "প্রাণিগণের উৎপত্তি ও প্রলয়, গমন ও আগমন, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা এই কয়টী পদার্থকে যিনি জানেন, তাঁহাকেই ভগবান্ বলিয়া জানিবে" (ইত্যাদি প্রমাণে) উৎপত্তি প্রভৃতি ছয়টী বস্তুর বিশেষ জ্ঞান যাঁহার নিত্য আছে, সেই বাসুদেব ভগবান্ এই শব্দের বাচ্য) কাম ইত্যাদি।

যাহার জন্যই জীবগণের সকল প্রকার অনর্থপ্রাপ্তি হয়, যাহা প্রাণি-নিবহের (একমাত্র প্রধান) শত্রু, সেই কামই কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়, এইজন্য এই কামই ক্রোধ (ইহা মূলে উক্ত হইয়াছে) (এই কাম) রজোগুণসমুদ্ভব। (অর্থাৎ) রজোরূপ যে গুণ, তাহাই যাহার উদ্ভবের কারণ, তাহাকেই রজোগুণসমুদ্ভব বলা যায়, কিম্বা রজোগুণের সমুদ্ভব যাহা হইতে হয়, তাহাই (রজোগুণসমুদ্ভব), কারণ কামই প্রথমে উৎপন্ন হইয়া রজোগুণের পরিণাম দ্বারা পুরুষকে (কার্য্যমাত্রে) প্রবৃত্ত করিয়া থাকে॥ "তৃষ্ণাই আমাকে এই কার্য্য করাইয়াছে", রাজকার্য্য সেবা প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত দুঃখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই প্রকার প্রলাপ (প্রায়ই) শুনিতে

পাওয়া যায়। (এই কাম) মহাশন (অর্থাৎ) ইহার অশন (বিষয়) মহৎ, অতএব ইহা মহাপাপ্মা। কামের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই প্রাণী পাপাচরণ করে। এই কারণে এই সংসারে তুমি এই কামকেই (জীবগণের) শত্রু বলিয়া জানিও ॥ ৩৭ ॥

---

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—বহ্নির্যথা ধূমেন আব্রিয়তে যথা আদর্শো মলেন (আব্রিয়তে) যথা উল্বেন (জরায়ুণা) গর্ভঃ (আব্রিয়তে) তথা তেন কামেন ইদং (জ্ঞানং আবৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ।—যেমন অগ্নি ধূমের দ্বারা আবৃত হয়, যে প্রকার দর্পণ মলের দ্বারা আবৃত হয়, যেমন কুক্ষিস্থজীব জরায়ু দ্বারা আবৃত হয়, সেই প্রকার কামের দ্বারা এই (জ্ঞান) আবৃত হয় ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্য।—কথং বৈরীতি দৃষ্টান্তৈঃ প্রত্যায়য়তি ধূমেনেতি ॥ ধূমেন সহজেন আব্রিয়তে বহ্নিঃ প্রকাশাত্মকঃ অপ্রকাশাত্মকেন যথা বা আদর্শো মলেন চ যথা উল্বেন গর্ভবেষ্টনেন জরায়ুণা আবৃত আচ্ছাদিতো গর্ভস্তথ তেনেদং আবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কাম কি প্রকার শত্রু, তাহা দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন, "ধূমেনেতি"। যেমন সহজ অপ্রকাশাত্মা ধূমের দ্বারা প্রকাশাত্মক অগ্নি আবৃত হইয়া থাকে, যেমন আদর্শ, মলের দ্বারা (আবৃত হয়), যেমন জঠরস্থ জীব উল্ব (অর্থাৎ) গর্ভবেষ্টন জরায়ু দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, সেই প্রকার কামের দ্বারা ইহাও আবৃত হয় ॥ ৩৮ ॥

---

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ॥
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয় জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন জ্ঞানং (নিত্য) মাবৃতং ॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদ।—হে কুন্তীনন্দন, এই জ্ঞানিপুরুষের নিত্য বৈরী কামরূপ দুষ্পূর অনলের দ্বারা জ্ঞান (সর্ব্বদা) আবৃত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্য।—কিং পুনস্তদিদংশব্দবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতমিত্যুচ্যতে আবৃতমিতি।

আবৃতমেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনো নিত্য বৈরিণা। জ্ঞানী হি জানতি অনেন অহ-মনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্ব্বমেবেতি। দুঃখী চ ভবতি নিত্যমেব। অতোহসৌ জ্ঞানিনোনিত্য বৈরী ন তু মূর্খস্য। স হি কামং প্রিয়মিব তৃষ্ণাকালে পশ্যন্ তৎকার্য্যে দুঃখে প্রাপ্তে জানাতি তৃষ্ণয়া অহং দুঃখিত্বমাপাদিত ইতি ন পূর্ব্বমেব অতো জ্ঞানিনো নিত্যবৈরী। কিংরূপেণ কামরূপেণ কামইচ্ছৈব রূপমস্যেতি কামরূপস্তেন দুষ্পূরেণ দুঃখেন পূরণমস্যেতি দুষ্পূরঃ তেনানলেন ন অস্য অলং পর্য্যাপ্তির্বিদ্যতে ইত্যনলস্তেন ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাহা কামের দ্বারা আবৃত হয়, সেই ইদং শব্দবাচ্য বস্তু কি, তাহাই বলা যাইতেছে যে, আবৃতমিত্যাদি। জ্ঞানীর নিত্যবৈরী এই কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত (হইয়া থাকে)। জ্ঞানী পূর্ব্ব হইতেই জানে যে, এই কামের দ্বারা আমি অনর্থে প্রেরিত (হইয়া এই কার্য্য করিতেছি) এবং (সেই কার্য্যের দ্বারা) দুঃখও সর্ব্বদা প্রাপ্ত হয়। এই কারণ এই কাম, জ্ঞানীর নিকট সর্ব্বদাই বৈরী বলিয়া প্রতিপন্ন থাকে, কিন্তু মূর্খের নহে। কারণ মূর্খ ব্যক্তি তৃষ্ণা কালে কামকে প্রিয়বস্তুর ন্যায় পরিদর্শন করে এবং পরে তাহার পরিণাম দুঃখ প্রাপ্ত হইলে বুঝিয়া থাকে যে, আমি তৃষ্ণার দ্বারাই এই দুঃখ পাইলাম। এবিষয় কিন্তু (দুঃখ পাইবার পূর্ব্বে) সে বুঝিতে পারে না। এই কারণেই কাম জ্ঞানীরই নিত্যবৈরী। কি স্বরূপ? কামরূপ (অর্থাৎ) 'কাম' ইচ্ছাই যাহার স্বরূপ, তাহাকে কামরূপ বলা যায়, সেই কামরূপ দুষ্পূর অনল (দ্বারাই জ্ঞানই আবৃত হয়), দুঃখের সহিত যাহার পূরণ করিতে হয়, তাহাকে দুষ্পূর কহে। যাহার অলংভাব অর্থাৎ পর্য্যাপ্তি সম্ভবপর নহে, তাহাকে অনল কহা যয় ॥ ৩৯ ॥

---

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—অস্য (কামস্য) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদীনি) মনঃ (অন্তঃকরণং) বুদ্ধিঃ (চ) অধিষ্ঠানং (আশ্রয়ঃ) উচ্যতে। এভিরিন্দ্রিয়াদিভিঃ এষঃ জ্ঞানমাবৃত্য এনং দেহিনং (জীবং) বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

মূলানুবাদ।—ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি এই কামের অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এই কাম ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

ভাষ্য।—কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামো জ্ঞানস্যাবরণত্বেন বৈরী সর্ব্বলোকস্যেত্যপেক্ষায়ামাহ জ্ঞাতে হি শত্রোরধিষ্ঠানে সুখেন শত্রুনিবর্হণং কর্ত্তুং শক্যতে ইতি ইন্দ্রিয়াণীতি।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চাস্য কামস্যাধিষ্ঠানমাশ্রয় উচ্যতে এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ আশ্রয়ৈঃ বিমোহয়তি বিবিধং মোহয়তি এষ কামো জ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য দেহিনং শরীরিণং॥ ৪০॥

ভাষ্যানুবাদ।—কাহাকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানের আবরণদ্বারা কাম সকলের বৈরী হইয়া থাকে, এই প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ (ভগবান্) বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়াণীত্যাদি শত্রুর আশ্রয় জানিতে পারিলে, অনায়াসে তাহার সমুচ্ছেদ করিতে পারা যায়।

ইন্দ্রিয়নিচয়, অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি কামের "অধিষ্ঠান" আশ্রয়, (ইহা শাস্ত্রে) কথিত হইয়াছে। এই ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আশ্রয়সমূহের সাহায্যে কাম জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া দেহী (অর্থাৎ) শরীরাভিমানী জীবকে নানাপ্রকারে মূঢ় করিয়া থাকে॥ ৪০॥

---

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ॥
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১॥

অন্বয়।—হে ভরতর্ষভ (ভরতকুলপ্রধান) তস্মাৎ ত্বং আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং এনং পাপ্মানং (কামং) প্রজহিহি (পরিত্যজ)॥ ৪১॥

মূলানুবাদ।—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, সেই কারণে তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশন এইপাপ কামকে পরিহৃত কর॥ ৪১॥

ভাষ্য।—যত এবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণি আদৌ পূর্ব্বং নিয়ম্য বশীকৃত্য ভরতর্ষভ পাপ্মানং পাপাচারং প্রজহিহি পরিত্যজ এনং প্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চ আত্মাদীনামবরোধঃ বিজ্ঞানং বিশেষতঃ তদনুভবঃ তয়োর্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোঃ প্রজহিহি আত্মনঃ পরিত্যজ ইত্যর্থঃ॥ ৪১॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণ এইরূপ হয় তস্মাদিত্যাদি। সেই কারণ তুমি পূর্ব্ব হইতেই ইন্দ্রিয়নিচয়কে বশীভূত করিয়া হে ভরতর্ষভ! পাপাচার কামকে পরিত্যাগ কর। এই কাম জ্ঞানবিজ্ঞাননাশন, শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট আত্মাদি পদার্থের (পরোক্ষ) বোধকে জ্ঞান কহা যায় এবং সেই

# পরলোকবাদ



( স্বামী সারদানন্দ লিখিত। )

অনন্তকাল জগৎ সংসার সৃষ্ট হইয়াছে। অনন্তকাল ইহা ক্রমবিকাশ ও অন্তর্লীনতার তরঙ্গ-ভঙ্গে স্পন্দিত হইয়া সিন্ধুবিচারী ফেনরাশির ন্যায় কখন প্রসারিত, কখন বা আকুঞ্চিত হইতেছে। কিরূপে, কোথায়, কি উদ্দেশ্যে ধাবিত ? – কে বলিতে পারে ! আস্তিক্য, নাস্তিক্য উভয় বুদ্ধিই স্তম্ভিত। বিজ্ঞানের উন্নত শীর্ষ দেশকালের স্তরে স্তরে অনন্ত বিচিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ ও অবনত। কিন্তু অন্তর্নিহিত, মানবের অদম্য, অজ্ঞাত শক্তিও কার্য্য কারণের সূত্র ধরিয়া জল্পনা করিতে ক্ষান্ত হয় না—প্রত্যক্ষ ও অনুমান সহায়ে ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, উর্দ্ধমূল সংসারাশ্বত্থের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মনুষ্যভিন্ন দেবসমাজে এ চিরজল্পনা প্রসিদ্ধ কি ? জানিবার অধিকার নাই—তবে পৃথিবীগত কার্য্যকলাপ ও জীবশ্রেণী এক নিয়মে, এক প্রথায় নিবদ্ধ দেখিয়া কল্পনা সহায়ে এই প্রথার প্রকারান্তর সেখানেও অনুমান করিতে পার—ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অথবা যদি যোগসহায়ে তোমার দৃষ্টি নিবিড় ইন্দ্রিয়বন্ধন অতিক্রম করিয়া সৃষ্টির উচ্চ স্তরে উঠিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে নিজেই কিঞ্চিৎ জানিতে ও বুঝিতে পারিবে—কিন্তু সেই জ্ঞানালোক কামকাঞ্চনময়ী পৃথিবীনিবদ্ধদৃষ্টির পক্ষে অত্যধিক হওয়ায় সাধারণ মানবের নিকট দুর্ভেদ্য নিশার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে।

বেদ পুরাণ ও ইতিহাস সহায়ে কালের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া মানব-সৃষ্টির যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করি, ততদূর কতই না এ বিষয়ে যুক্তিজল্পনা ধ্যান দেখিতে পাই ! দর্শনালোকের আদি পিতা সাংখ্য বলিলেন—ভ্রমমুগ্ধ চেতন পুরুষের মুক্তস্বভাব অনুভব করাইবার নিমিত্তই জড়া প্রকৃতির এ বিচিত্র উদাম। যতদিন না চেতন, জড় ও জড়ধর্ম্ম হইতে আপনাকে নিত্যভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিবে, ততদিন এ সংসার তরঙ্গের আক্রমণ হইতে শান্তিলাভ অসম্ভব। যোগাচার্য্য মহামুনি পতঞ্জলিও প্রায় একথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়া, সমাধিলাভে কি প্রকারে মানব এই জন্মজরাগ্রস্ত সংসারের পরপারে উপনীত হইতে পারে, তাহার উপায় প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। আচার্য্যপাদ ব্যাস এবং

শঙ্কর প্রভৃতি আবার জগতের অন্তস্তলে ইচ্ছাময় মহান্ পুরুষের লীলাবিলাস দেখিয়া 'তাঁহাতেই সব এবং তিনিই সব' এই মতে বেদান্ত প্রচার করিলেন। বলিবার, লিখিবার সময় বিশেষ বিশেষ পুরুষেরই নামে উল্লেখ হয়। তাঁহাদেরই চিন্তাসকল কালের প্রবল আঘাতে বহুকাল অবিকম্পিত থাকিয়া ভূমধ্যস্থ স্তর সমূহের ন্যায় তৎকালীন মানবমনের গঠনেতিহাস সপ্রমাণ করে। নতুবা অবতার, সিদ্ধপুরুষ, আচার্য্য প্রভৃতির মত ভিন্ন এ বিষয়ে আরও কত মতামত বুদ্বুদ-রাশির ন্যায় কিছুকাল ক্রীড়া করিয়া, অনন্ত মনে লীন হইয়াছে, তাহার নির্ণয় কে করিতে পারে ?

সর্ব্বোপনিষৎ মন্থন করিয়া পুরাণকার গাহিলেন, 'জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য্য এবং মরিলে আবার জন্ম সুনিশ্চয়।' অর্দ্ধেকটা মানুষ নিঃসন্দেহে বুঝে— 'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।' কিন্তু অপরার্দ্ধটা বোঝাই গোল। মানুষ মরিলে কি আবার কিছু থাকে ? পরলোক কি বাস্তবিক কল্পনারাজ্যের ছায়াময় কুসুম নহে ? চিরকাল ব্যাপিয়া মানুষের এই সন্দেহস্রোত প্রবাহিত। বেদেও পড়িয়া দেখি, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা—অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে"—এই যে মৃত্যুর পর সন্দেহ উপস্থিত হয় কেহ বলে মানুষ থাকে, কেহ বলে আদৌ থাকেনা।—দর্শনসমূহতো এই পরকালাস্তিত্বই সপ্রমাণে বদ্ধপরিকর। পুরাণ, ইতিহাস এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাসকলও মুখ্য বা গৌণভাবে এই বিষয় মীমাংসায় প্রযত্নশীল। বাস্তবিক ঈশ্বরবিশ্বাস যেমন মানবমনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার এক প্রধান উপায়, তেমনি পরলোকবিশ্বাসও নিঃসন্দেহ অপর এক উপায়।

কোথা হইতে এ বিশ্বাসের বীজ মানবমনে প্রবিষ্ট হইল ? কোথা হইতে সে এই সদাঃ-অনুভূত আপাতসুখজগতের রূপরসাদির মোহস্পর্শ হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পরকালের সুখের জন্য সংযম, স্বার্থত্যাগ, তপস্যাদি ক্লেশকর উপায় সকল উদ্ভাবন করিল ? কে শিখাইল ? কে বলিতে পারে ! কোন বিষয়ের শেষ কারণ স্পর্শ করিতে মানবমন এ পর্য্যন্ত পারে নাই এবং মনের গঠন এবং প্রচারাদি অনুধ্যান করিলে, কখন পারিবে কিনা, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। আকাশাদি সূক্ষ্ম জড় হইতেও সূক্ষ্মতর জড়-পদার্থে মন বা অন্তরেন্দ্রিয়ের গঠন ; প্রত্যেক জড়সমষ্টির ন্যায় ইহারও প্রচার দেশকালসীমাবদ্ধ। অতএব দেশকালের অতীত বস্তুকে ইহা কখনও সম্পূর্ণায়ত্ত করিতে পারিবে না। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আদিকারণ, এক হই-

য়াও অদ্ভুতবিচিত্রতাপ্রসবিনী মায়া এ সকল দেশ কালের সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে অবস্থিত। অতএব মনের জ্ঞেয় নহে। মনের এই প্রকার সসীম গঠন না জানাতেই, লোকের শাস্ত্র বুঝিবার বড় গোলযোগ হয়। ভাসা ভাসা শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া, অনেকে বলেন শুনিতে পাই—"বেদবেদান্তেও গলদ্ রহিয়াছে। ব্রহ্মকে নির্গুণ স্থির করা হইয়াছে, আবার বলা হইয়াছে 'স ঐক্ষত একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়'—তিনি জগৎ-সৃষ্টির জন্য অনুধ্যান করিলেন—এক আমি বহুরূপে বিভক্ত হইব। ইহা কি বিরুদ্ধ কল্পনা নহে? এক পদার্থ দুই স্বভাব বিশিষ্ট হয় কি করিয়া? তাহার পর মায়া তাঁর শক্তি, অথচ উহা সৎও নয়, অসৎও নয়, তাঁহা হইতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়—এ আবার কি কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার?" না—উহা বিরুদ্ধ কল্পনা নহে। এই যে চিৎ এবং জড়ের বিচিত্র বন্ধন, যাহা সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, উচ্চ নীচ, প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টি প্রসব করিতেছে, তাহার কারণ দেশকালের পারে বর্ত্তমান, অতএব বাক্যমনের অগোচর এবং অনন্ত। মন তাহাকে কখনই ধরিতে পারিবে না, কারণ সসীম। কিন্তু এই কারণধারার মূলও সেখানে, ইহা সুনিশ্চিত। এই জন্যই শাস্ত্র জগৎ-কারণকে নেতি নেতি, যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, চিন্তা করিতেছি, তাহা নয়, তাহারও পারে—বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াও, আবার 'তিনিই জগৎ-কারণ' এই তত্ত্বটি বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, "তিনি সৃষ্টির অনুধ্যান করিলেন।" এইরূপ মায়ার সম্বন্ধেও 'শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ', বলিয়া, আবার শক্তিমান্ হইতে উহাকে কিছু পৃথক্‌ভাবে বুঝিতে বলিলেন। নতুবা অনন্তে সান্তত্ব, পূর্ণস্বরূপে অপূর্ণতা, পক্ষপাতিতা এবং নিষ্ঠুরতাদি দোষস্বীকার অনিবার্য্য হয়। সকল দেশেই মনীষী লোকেরা দেখিয়াছেন যে, জগৎকারণে এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আরোপ করা হইয়াই পড়ে। ইহা জগৎ-কারণের দোষ বা স্বরূপ নহে, কিন্তু যে যন্ত্রসহায়ে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, সেই মনেরই গঠন ও প্রচারপ্রণালী অনুসারে আসিয়া পড়ে। মোট কথা, সংসারের কারণ-অনুসন্ধায়ীকে মন দেশকালের পারের দিকে নিয়ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত,—সে কারণের স্বরূপ কি, তাহা কখন বলিতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে এবং ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের রচিত "দর্শনের প্রথমতত্ত্ব" (First Principles) নামক পুস্তকের 'অজ্ঞেয় ভাগে' (Unknowable) এ বিষয়টীর বড় সুন্দর মীমাংসা ও যুক্তি প্রদর্শিত আছে।

আধুনিক পণ্ডিতগণ যুক্তিগবেষণা সহায়ে এ চিরপ্রবাহী বিশ্বাস-নদীর উৎপত্তিস্থান বলিয়া তিনটী শৃঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ বলেন:—জন্মাবধি মানব কার্য্যকারণশৃঙ্খলেই জগৎ নিবদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই বর্ণমালাতেই সে অদ্ভুতছন্দোবন্ধনিবদ্ধ আদিকবির প্রকৃতিপুস্তক পাঠের একমাত্র ধ্রুব উপায় দেখিতে পাইয়াছে। থাকিতে পারে আর কোন উপায়—উহা তাহার আয়ত্তাধীন নহে। মানব মানবিক ভাবেই জগৎ দেখিবে, শুনিবে, অনুভব করিবে। আপন মনঃপ্রচারের সহিতই তাহার চিরনৈকট্য-সম্বন্ধ এবং ভিতরে সে যাহা অনুভব করে, তাহাই বাহিরে আরোপ করিয়া থাকে। বাহিরের অজ্ঞেয় জগৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহার মনে আঘাত করিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক স্পন্দন বা তরঙ্গ উত্থাপিত করে, তাহাই সে প্রত্যক্ষ-অনুভব করে এবং তাহা হইতেই, সে দেশ, কাল, নিয়ম (Law), নাম, রূপ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকে। এককালীন উত্থিত ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল পরস্পর যে সম্বন্ধে অবস্থিত, তাহাই দেশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতীত ও আগামী ভাব সকল স্মৃতি ও প্রত্যক্ষে যে ভাবে গৃহীত ও সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাই কাল বলিয়া অনুভূত এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাসমূহ মন যে ভাবে শ্রেণী ও প্রণালীবদ্ধ করে, তাহাই নিয়ম বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে ভিতরের অন্যান্য ভাবসকলও বাহিরে আরোপিত হইয়া নামরূপাদির প্রত্যক্ষ করায়। পদার্থসমূহ সূর্য্যরশ্মির অন্যান্য সকলকে গ্রাস করিয়া কোন এক বিশেষ রশ্মির প্রতিভাস দ্বারা, যে মানসিক তরঙ্গের উত্থান করে, তাহাই বহির্জগতে পদার্থের রূপবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, ইহা বিজ্ঞানপ্রসিদ্ধ। এইরূপে আবার ভিতরের চেতনত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছাশক্তির অনুভবও ব্যক্তিগতজ্ঞানের তারতম্য অনুসারে অল্প বা অধিক পরিমাণে জাগতিক জড় শক্তির বিকাশসমূহে আমরা আরোপিত করিয়া থাকি। মনুষ্যভিন্ন গো অশ্বাদি প্রাণিসমূহে এবং মনুষ্যগত বালক এবং অজ্ঞেতেই ইহা বিশেষ লক্ষিত হয়। পথিমধ্যে কোন অদৃষ্ট বা অল্পদৃষ্ট জড়পদার্থের স্থিতি বা গতি দেখিয়া ঘোড়া ভড়কাইয়া থাকে। নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক-শকটের (Motor car) গতি দেখিয়া, অনেক ঘোড়া গাড়ি ভাঙ্গিয়া ছুটাছুটি করে। দ্রুতপদসঞ্চারী বাষ্পীয় শকটের নবাবির্ভাবে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে অজ্ঞ গ্রামবাসিগণের দেবতাবিশেষ জ্ঞানে পুষ্প চন্দন সিন্দূর নৈবেদ্যাদির দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজাও প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে তুঙ্গশৃঙ্গ হিমালয়ে গিরিরাজ ও তৎপত্নী মেনকার, পর্ব্বত-

বিদারী বজ্রের পশ্চাতে গজারূঢ় ক্রোধকম্পিত বজ্রধরের, অজ্ঞাততল সমুদ্র মধ্যে অনন্তরত্নাকর বরুণদেবতার এবং পাপপ্রচারী মোহনকারী কামাদি মনঃশক্তির পশ্চাতে মায়াবী মার এবং সর্পাকৃতি শয়তানের কল্পনারোপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে প্রসিদ্ধ।

স্ব স্ব ধর্ম্মে এইরূপ কল্পনাপ্রসূত দেব দেবীর উপাসনা ও পূজা-প্রচার দেখিয়া কাহারও লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মেতিহাস পর্য্যালোচনায় এইরূপ কল্পনা সকল ধর্ম্মভুক্তই দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং এই সকল অপূর্ণমতের সাহায্যেই মানবমন ধর্ম্মের উচ্চতর স্তরসমূহে উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া, উহাদিগকে মিথ্যা ভ্রমপ্রমাদ ইত্যাদি ঘৃণাসূচক শব্দে অভিহিত না করিয়া, বরং সত্যসোপানের নিম্নপদাবলী বলিয়া শ্রদ্ধাসহকারে তদনুশীলনে ধর্ম্মের আদি বিকাশ জানিতে প্রবৃত্তি হওয়াই উচিত। সত্যানুভবসম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সূত্র-স্বরূপ বাক্যসকল অদ্ভুত আলোক ও উদারতা আনিয়া দেয়। সর্ব্বধর্ম্মের সাধনপ্রণালী যিনি গভীর শ্রদ্ধার সহিত নিজ জীবনে আলোচনা এবং অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই অমিততেজা আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণের অতিবিরুদ্ধ ধর্ম্মমত সকলের সমন্বয়করী একটী কথাই ছিল—"তাও বটে—তাও বটে।" দেশকালের রাজত্বে মানুষ যত কিছু সত্য অনুভব করিয়াছে এবং করিবে, তাহার সমস্ত-গুলিই আংশিক সত্য বা অবস্থাবিশেষে অনুভূত সত্য। এবং সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে অনুভূত যে সত্য, তাহা দেশকালাতীত। সেই ভূমা সত্য যাঁহারা একবার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর আর বিরুদ্ধ মত থাকে না। এই কথাটীই তাঁহার সেই সুন্দর গ্রাম্য ভাষায় বলিতেন—'সেখানে সব শিয়ালের এক রা।'

তরঙ্গরূপী মানসিক ভাবসমূহের এইরূপ নিয়ত বাহ্যারোপ যুক্তিযুক্ত স্থির হইলে, পরলোকবিশ্বাসের উৎপত্তি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইন্দ্রাদি বিশেষ শক্তিশালী জীবসমূহের বিদ্যমানতা একবার মনুষ্যমনে স্থান পাইলে, তাহারা অতীতকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মানবগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এবং ভবিষ্যৎ মানবের উপরও তদ্রূপ করিবে, ইহা ঘটনাপ্রকারের অনুধ্যানে যুক্তিসহায়ে স্থিরীকৃত হইতে বিলম্ব হয় না। আবার চরিত্রবলে যে সকল মানব সেই সকল দেবতার বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে দেহান্তে একেবারে থাকিবেন না, ইহা মানুষ বিশ্বাসে অসমর্থ, কারণ সেই সেই

দেবতাবিশেষের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইতে হয়। অতএব পরলোকবিশ্বাসও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ( ক্রমশঃ )

---

# কোন্ পথে যাই ?

ভিক্ষু-দেবীদাস লিখিত। ] [৩৯০ পৃষ্ঠার পর।

দিন কতক এই ভাবে যায়, কুম্ভমেলা শেষ হইল। একদিন কথা প্রসঙ্গে উভয় বন্ধু বলিলেন, চল, উভয়ে একবার পাগলা বাবাকে দর্শন করিয়া আসি। আমাদের এই নূতন ভাইও তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম, তিনি কোথায় থাকেন? তাঁহারা কহিলেন, হৃষীকেশের পথে যাইতে একটী জঙ্গলে সামান্য এক কুটীরে থাকেন। তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইবে। আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, চলুন, শীঘ্র চলুন। তিন জনে এক শুভক্ষণে যাত্রা করা গেল। পথে হিমালয় শৃঙ্গের পর শৃঙ্গে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে দেখিলাম। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ প্রবাহিত, তাহাতে বর্ষাকালে খুব জল থাকে, অন্য সময়ে সামান্য। যাহা হউক, হরিদ্বার হইতে ৫।৬ মাইল অন্তরেই পাগলা বাবার আশ্রম পাইলাম। আশ্রমটীতে যত্নের কোন চিহ্ন নাই, অথচ তাহা অতি সুন্দর ও যেন এক মহৎপ্রভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গিয়া দেখিলাম, কুটীরাভ্যন্তরে পাগলা বাবা বসিয়া—বয়স অনুমান ৪০।৪৫ ; পরিধানে একটী ক্ষুদ্র শ্বেত বসন—তাহাও ভাল করিয়া পরা নাই—যেন সে দিকে ভ্রুক্ষেপই নাই। কোনরূপ মালা অথবা অন্য কোনরূপ ভেক্ নাই। বদন মহৎ-প্রভাব ও জ্যোতিঃসম্পন্ন। চক্ষু দুটী যেন বহির্জ্জগৎ দেখিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই—ঈষৎ নিমীলিত, ঢুলু ঢুলু—যেন কোন নেশায় বিভোর, অথচ তথায় কোন নেশার আয়োজন নাই। আমরা যাইতেই, যেন জোর ক'রে একটু বাহিরের দিকে চেয়ে আমাদের ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া প্রণাম করিলেন। আমি ত একেবারে মুগ্ধ। তারপর তিনি আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিন্তু সেই মুখ কোন বাক্য নিঃসরণ না করিলেও, যেন কোন অমানবী ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। ক্ষণিক পরে প্রেমাশ্রু ঝরিল। আমার সমস্ত শরীর লোমাঞ্চ হইল, যেন ঈশ্বর সাক্ষাৎকার অনুভব করিলাম। একি কোন দেবতা, না শাপভ্রষ্ট পুরুষ, না স্বয়ং ভগ-

বান্? খানিক পরে, একটু বাহ্যজ্ঞান হইলে আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, এসেছিস্?—আয়,—বলিয়া বুকে টানিয়া লইলেন। তখন আমি তাঁহার শক্তিতেই হউক, অথবা আনন্দেই হউক, মূর্চ্ছিত হইলাম। সেরূপ মূর্চ্ছা নহে, বিলক্ষণ জ্ঞান রহিয়াছে, অথচ এত আনন্দ যে জীবনে আর কখন অনুভব করি নাই। বোধ হইল, যেন সমুদয় জগৎ একটী বীণাযন্ত্র, আর ঐ যন্ত্র যেন সচেতন, আর উহার ভিতর হইতে যেন এক মহা সুন্দর নিনাদ উত্থিত হইতেছে—শুনিলাম স্পষ্টতঃ ওঙ্কারধ্বনি। তাহার পর এক মহান্ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ-সমুদ্রে যেন ভাসিতে লাগিলাম। অবশেষে একরূপ আতঙ্ক আসিল—চেতনা পাইলাম। দেখি—তখনও মহাপুরুষের কোলে—তখন ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা আসিল। গুরুদেব গুরুদেব বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম।

মহাপুরুষ মধ্যে মধ্যে দু একটী কথা কহিতেন। সেই এক একটী কথা ৫০ হাজার বেদের চেয়ে বেশী দামী। তিনি একদিন বলিলেন, 'শুদ্ধ জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তি এক।' ভাল কথা, একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি;—আমার মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি আমাদের তিনজনকে নানাবিধ খাদ্য খাইতে দিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রসাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে, তিনি সামান্য একটু আধটু খাইলেন। প্রত্যহ তাঁহার কাছে অনেক লোক আসিত—খাবার রাশীকৃত করিত। আমরাই খাইতাম—তিনি খাইতেন নাম মাত্র। রাত্রে তাঁহার নিদ্রা বড় দেখি নাই, জোর যদি ঘুমাইতেন দুই এক ঘণ্টা। তারপর অধিকাংশ সময়ে সমাধিতে থাকিতেন। এ জোর করিয়া বসিয়া সমাধি নয়—একটু ভগবানের নাম কেহ করিলে বা নিজে ভগবানের নাম করিতে করিতে একেবারে বাহ্যচৈতন্য হারাইতেন। আর যখন একটু চেতন থাকিতেন, মধুর গান গাইতেন বা স্তব পাঠ করিতেন, অথবা দুই চারিটী কথা কহিতেন। এই দুই চারিটী কথায় সব মীমাংসা হইয়া যাইত। কথাগুলি বড় নূতন নহে, বোধ হয় অনেকেই জানেন, এবং অনেক শাস্ত্রেই আছে। কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবার সময়, উহাদের ভিতরে কি একটী শক্তি মাখান থাকিত। তিনি বলিতেন,—মত পথ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া একই জায়গায় যাওয়া যায়, তদ্রূপ বিভিন্ন মতে সাধনা করিলেও লক্ষ্য একই। যতক্ষণ ময়দা ঘিয়ে ভাজা হইতেছে, ততক্ষণ শব্দ হয়। যখন ঠিক ভাজা হইয়া যায়, তখন আর শব্দ থাকে না, তদ্রূপ ঠিক ঠিক অনুভূতি না হইলে লোকে তর্ক বিতর্ক করে, অনুভব হ'লে কি জ্ঞানী, কি ভক্ত সবাই চুপ করে যায়; আর ঝগড়া থাকে

না। তিনি বলিতেন, বরফ না খেয়েই অনেকে বরফের কথা শুনে বরফের গুণ-গুণ নিয়ে ঝগড়া করে, তাই গোলমাল হয়। খেয়ে যারা বলে, তাদের আর মত-বিরোধ হয় না। তারা এক রকম কথাই বলে। অথবা সমুদ্রের কাছে যে দাঁড়াইয়া থাকে, সেই সমুদ্রের নানা ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারে, সমুদ্রে কত কি আছে, বুঝিতে পারে। আর একবার সমুদ্র দেখিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলে, সমুদ্র সম্বন্ধে আর কি সিদ্ধান্ত হইবে? অথবা বহুরূপী সম্বন্ধে যেমন দুইজনের লাল কি সবুজ বলিয়া ঝগড়া হইয়াছিল। তারপর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বহুরূপী সম্বন্ধে বিশেষ বুঝাইয়া দেন। অথবা অন্ধের হাতী দেখা যেমন।

এইরূপ ও এতদ্বিধ অনেক উদাহরণের দ্বারা তিনি আমার প্রাণে প্রাণে এই ভাব সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন যে, দ্বৈতবাদ ঠিক, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ঠিক অদ্বৈতবাদও ঠিক। মনের প্রকৃতি অধিকার ইত্যাদির তারতম্যে লোকের বিভিন্ন ভাব হয়।

ভাই সকল, তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, তোমরা বিবাদ দ্বেষবুদ্ধি ছাড়িয়া, জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় এ বিবাদ ছাড়িয়া, যে যে পথে আছ, সে সেই পথের কিছু করিবার চেষ্টা কর। করিলে সেয়ান হইবে, আর জানিবে, 'সব সেয়ানাকি এক বাত।' জ্ঞান ভক্তির তখন মর্ম্ম বুঝিবে। জয় গুরু মহারাজকি জয়। ইতি। (সমাপ্ত)

---

# স্ত্রী-শিক্ষা।

১০ই জুন রবিবার তালতলা মহাকালী পাঠশালার পারিতোষিক
বিতরণ উপলক্ষে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

[ প্রাপ্ত। ]

তালতলা মহাকালী পাঠশালা শাখা বালিকা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী ও পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে সম্মিলিত ছাত্রীগণের বিনয় নম্র ব্যবহারের সহিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত স্তব পাঠ শ্রবণ করিয়া অদ্য যে বিমল আনন্দের অনুভব হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা যে বিশেষ আদৃত ছিল এবং বহুলভাবে তাহার প্রচারও ছিল, তাহা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-পাঠকগণের নিকট

অবিদিত নাই। আমাদের উপনিষদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণের অনেক স্থলেই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বহুতর উপদেশ ও অনেক সদুদাহরণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পুরাকালে আমাদের অন্তঃপুর, বর্ত্তমান কালের ন্যায় অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত কলহ অভিমান ও অশান্তির নিকেতন ছিল না। উচ্চশিক্ষিত পুরুষগণের মধ্যে যাহা দুর্লভ, সেই সকল স্বর্গীয় সুবিমল সদ্গুণরত্নরাজিতে বিমণ্ডিত মহিলাকুলের পবিত্র সন্নিধানে আমাদের অন্তঃপুর সকলপ্রকার গার্হস্থ্য সুখের একমাত্র নিলয়নিকেতন ছিল। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি সতীকুলশিরোমণি দিব্য রমণীকুল, যে জাতির অন্তঃপুরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় বিরাজমানা থাকিতেন, তাহাদের ন্যায় নির্ম্মল গার্হস্থ্য সুখ, এই পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি কোন সময় অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে, এ বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে এখনও উদিত হইতে পারে নাই।

আমাদের বালিকাগণের, ধর্ম্ম ও সমাজানুমোদিত শিক্ষালাভের জন্য আমাদের দেশে যে মহাকার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সহিত দেশহিতৈষিগণের পবিত্র চেষ্টা যে ভাবে সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, কে বলিতে পারে যে এই বালিকাবিদ্যালয় সকলের অভীপ্সিত ফলের সহিত, এই বিশৃঙ্খল বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চিরাভিলষিত গার্হস্থ্যসুখ অদূরভবিষ্যতে এক সূত্রে গ্রথিত নাই?

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আমাদের বালিকাগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয় সকলের প্রভূত বিস্তার যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এক্ষণে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও স্বীকার করিয়া থাকেন। স্বীকার করিবার কারণও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কেন, তাহা বলি:—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসংহিতাকার ভগবান্ মনুর এই বচনটির প্রতি অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে যখন হিন্দু সমাজ, শিক্ষা, সভ্যতা ও অভ্যুদয়ের সমুন্নত শিখরে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির শিক্ষাগুরুর পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়াছিল, সেই সময় সেই পবিত্রশিক্ষালোকসমুদ্ভাসিত হিন্দু সমাজে গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ নারীজাতির প্রতি বিশেষসম্মান

পূর্ব্বক সদ্ব্যবহার করা হিন্দুসমাজের একটী অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

বাহিরের দুরন্ত জীবনসংগ্রামের অতিকঠোর পরিশ্রমে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া অন্তরাত্মা যখন শান্তির পিপাসায় শুষ্কপ্রাণ হইয়া উঠে, ব্যবহার-জগতে অপরিহরণীয় দ্বেষ, হিংসা ঈর্ষা, মদ, মান, মাৎসর্য্য, লোভ ও শঠতার সুতীক্ষ্ণ বৃশ্চিকদংশনের বিষময় জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, সংসারী জীব, যখন আশা, উৎকণ্ঠা ও প্রতীক্ষায় চারিদিক চাহিতে থাকে, সেই সময় পবিত্র অন্তঃপুরের শান্তিময় কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমরা যদি দয়াময়ী জননীর বাৎসল্যময় অমৃতসাগরে অবগাহন করিতে না পাই, সহোদরার অকপট স্নেহময় নির্ম্মল নির্ঝরের শীতল জলে বাহ্য ব্যবহার জগতের তীব্র সন্তাপকে প্রশমিত করিতে সমর্থ না হই, পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর ভক্তিময় অপার্থিব প্রীতির অমৃতময়ী জীবনী শক্তির উত্তেজনায় আবার নূতন বল ও নবীন উৎসাহ লাভ করিতে অসমর্থ হই, তাহা হইলে সেই শোক-তাপ-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্যময় বাহ্য ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমরা আবার কি প্রকারে সেই দুরন্ত জীবনসংগ্রামে নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিতে সমর্থ হইব ?

মানব চিরদিন দেবতারই পূজা করিয়া থাকে। পবিত্রস্নেহ অকপট প্রীতি ও অপার্থিব বাৎসল্যরূপ দেবসুলভ গুণরত্নরাজির যাহারা এক মাত্র অধিকারী, সেই নারীরূপধারী দেবতাগণ যে গৃহে পূজিত না হন, তাহা যে প্রকৃত পক্ষে দানবের গৃহ, অশান্তি, কলহ, কাপট্য, কার্পণ্য, ও পাপ সে গৃহকে কখন পরিত্যাগ করে না এবং সেই গৃহে যে সকল ক্রিয়াই পণ্ড হইয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

প্রাচীনরীতির অনুসারে দেবভাবসম্পাদিকা আবশ্যকীয় স্ত্রীশিক্ষার ঐকান্তিক অভাবই যে, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান গার্হস্থ্যধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতার একটী প্রধান কারণ, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকি। প্রায়ই অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের গৃহে এক্ষণে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দয়াময়ীমূর্ত্তি জননীর পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরহৃদয়া, উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তির অধিষ্ঠান; পতিপ্রাণা সততসংসারকর্ম্মপরা বিনয়নম্রমূর্ত্তি সহধর্ম্মিণীর পবিত্র আসনে এক্ষণে অনেক ভাগ্যবানের ভবনে অভিমানিনী বিলাসিনী মুখরা ভার্য্যার একাধিপত্য প্রতিক্ষণ বিকট কল কল ধ্বনিতে

ঘোষিত হইতেছে! যে হিন্দুর গৃহ লজ্জা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও আস্তিকতার বিশ্রামনিকেতন ছিল, আজ অধিকাংশ সেই হিন্দুর গৃহ নির্লজ্জতা, নাস্তিকতা, কপটস্নেহ ও কৃত্রিমব্যবহারের কলুষময় আবর্ত্তে পতিত হইয়া, বিষাদ ও পশ্চাত্তাপের ঐকান্তিক আশ্রয়নিবাস হইয়া উঠিতেছে! পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার তীব্র অনুচিকীর্ষার সাগরে নিমগ্ন হইয়া আমরা কেবল যে, বাহিরের জগতে সভ্য জাতির নিকট ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হইতে চলিয়াছি তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনন্ত তপস্যার প্রভাবে সঞ্চিত আমাদের গাহর্স্থ্যজীবনের সুখ ও শান্তিরও সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছি, আমাদের হতভাগ্যের দোষে ইহা দেখিয়াও আমরা অন্ধ দেখিতে চাহিতেছি না!—আমাদের চরিত্র কি বিষম! আমরা আমাদের কন্যা ভগিনী প্রভৃতিকে অন্য বিলাতী অনুকরণের বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া বা গৃহে ইউরোপীয় মহিলাকে শিক্ষাদায়িনীর উচ্চপদে স্থাপিত করিয়া শিক্ষার স্থলে যে তীব্র বিষপান করাইতেছি, তাহার পরিণামের ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের অনেক ভীষণ দৃষ্টান্ত নিত্য আমাদের নেত্রে পতিত হইলেও, আমরা এখনও বিহিতরূপে এই পাপের প্রতিবিধান করিতে ও অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতেছি না। উদরান্নের সংস্থান করিবার জন্য যাহাদিগকে মাথার ঘাম পায় ফেলিতে হয়, আবশ্যক দাসদাসীর সাহায্যে স্ত্রী কন্যা বা ভগিনীর সাংসারিক দুরন্ত শ্রমের লাঘব করিবার উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা যাহাদের মধ্যে শত করা ৯৫ জনের আছে কিনা সন্দেহ, তাহাদের গৃহের বালিকাগুলিকে কেবলমাত্র পিয়ানো বাজান, উল বুনান প্রভৃতি কার্য্যের শিক্ষা দিয়া এবং কতকগুলি পাশ্চাত্য মহিলার অনুপযোগী আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার জন্য নভেল নাটক বা ইতিহাস পড়াইয়া বিবাহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখার ন্যায় মূঢ়তার কার্য্য আর কি হইতে পারে? বিবাহের অল্পদিন পরেই সকল প্রকার গৃহকর্ম্মে যাহাকে শ্বশ্রূর সাহায্যকারিণী হইতে হইবে, জীবিকার্জ্জনের জন্য দিবসব্যাপিপরিশ্রমে ক্লান্ত পতির ক্লেশাপনয়ন ও চিত্তবিনোদনের জন্য সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, অপরিচিত শ্বশুরগৃহে প্রবেশের পর হইতেই দেবর, ননদ, দেবরজায়া প্রভৃতির সামাজিক রীতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ দ্বারা সাংসারিক ভবিষ্যৎ শান্তির পথকে প্রশস্ততর করিতে হইবে, সেই হিন্দু বালিকার পক্ষে পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণে স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয়ের অনুপযোগী শিক্ষা

যে, কি ভীষণ বিষময় ফল প্রসব করিতে পারে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অনেক হিন্দুপরিবার যে, অশ্রুসিক্তনেত্রে বিষাদময় দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বিলক্ষণরূপ অনুভব করিতেছেন, তাহা কে, প্রত্যাখ্যান করিবে? বিলাসশিক্ষার সুখময় নিকেতনস্বরূপ ঐ সকল পাশ্চাত্য প্রণালীর বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভপূর্ব্বক, যে সকল বালিকা আজ দরিদ্র হিন্দুর অন্তঃপুরে গৃহলক্ষ্মীর পদে আরূঢ় হইতেছেন, তাঁহাদের আদর সম্মান বা পূজা, আমাদের সমাজে যে যথেষ্ট পরিমাণে না হইতেছে তাহা নহে; কিন্তু, তাঁহাদের প্রতি সম্মান ও পূজার ফলস্বরূপ, যে যে দেবতাপ্রসাদের বিষয় মনুবচনে উক্ত হইয়াছে, আমাদের অনেকের ভাগ্যে যে তাহা একেবারেই ঘটিতেছে না, বরং বিপরীতই হইয়া দাঁড়াইতেছে, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কেন যে এমন হইতেছে, বোধ হয় এতদিনে তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। আবশ্যকশিক্ষার অভাবে এবং কুশিক্ষার বিপ্লবকর পরিণামে, আমাদের মহিলাগণ আর্য্যমহিলোচিত দেবভাব ভুলিয়া যাইতেছেন; নিষ্কাম কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিবর্ত্তে তীব্র বিলাসবাসনা, এক্ষণে পাশ্চাত্যরীতিতে শিক্ষিত মহিলানিচয়ের সংসারের সকল কার্য্যের একমাত্র পরিচালনা করিতেছে। নারী দেবতার পূজা না করিয়া, আমরা এক্ষণে বিলাসিনীর পূজা করিতেছি— এরূপ অবস্থায় আমাদের গৃহে দেবতাপ্রীতির সম্ভাবনা কোথায়? বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী জাতির পক্ষে গার্হস্থ্য-জীবনের উপযোগী শিক্ষালাভ করা যে একান্ত আবশ্যক, আমাদের শাস্ত্রকারগণ তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥"

অতি যত্নের সহিত কন্যার শিক্ষাদান করিতে হইবে বলিয়া, কি প্রকারশিক্ষা প্রধানতঃ দিতে হইবে তদ্বিষয়েও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সুন্দর উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—

"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাং অজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্"॥

এই বচনটীতে স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে যে, কি প্রকার শিক্ষাদান হিন্দুবালিকাগণের একান্ত প্রয়োজনীয়। যে শিক্ষাময় অমৃতের আস্বাদে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্ত্রীলোক দেবতার প্রকৃতি লাভ করে, ও সেই দেবতার প্রতি

সম্মান ও সদ্ব্যবহার করিলে, গৃহে নিরন্তর দেবতার প্রসাদময়ী শুভদৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে,—সেই শিক্ষার প্রসঙ্গে রামায়ণেও লিখিত আছে—

"নাতোঽবিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বৈ কুলস্ত্রিয়াঃ।
পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেব চ" ॥

শাতাতপ বলিয়াছেন—"পতিরেকোগুরুঃ স্ত্রীণাম্"। পতিগৃহে প্রবেশের পর হিন্দু মহিলার কি ভাবে দিন যাপন করা প্রাচীন কালের উন্নত হিন্দুসমাজের মধ্যে ঐকান্তিক স্পৃহার বিষয় ছিল, মহাকবি কালিদাস তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শকুন্তলা নাটকে তদ্বিষয়ে যে সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন, আমাদের বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন সেই উপদেশানুসারে বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করিতে সর্ব্বদা প্রযত্নপর হন। নিজের অতিস্নেহের পালিত-কন্যা শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার পূর্ব্বে, মহর্ষি কণ্বের উপদেশবাক্যটী শকুন্তলাতে এই ভাবে সন্নিবেশিত আছে—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতা২পি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ" ॥

পতিগৃহে প্রবেশের পর শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রূষা, ননদ, দেবর-পত্নী প্রভৃতির সহিত ঔদার্য্যপূর্ণ সখ্য, পরিজনবর্গের প্রতি দয়া ও স্নেহ, শ্বশুর কুলের চিরন্তন রীতি অনুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, দৃঢ়তর দেবতা-বিশ্বাস, নিজের সুখভোগের প্রতি সর্ব্বদা ঔদাসীন্য, অব্যাকুলশান্তভাবে সন্তানসন্ততির লালন পালন, সর্ব্বদা গৃহ কর্ম্মে তৎপরতা, এবং সর্ব্বপ্রকারে অকপট হৃদয়ে ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত পতির সেবা, এই সকল সদ্‌গুণরাশির সময়োপযোগী সঞ্চার, যে শিক্ষার প্রভাবে আমাদের বালিকাগণের হৃদয়ে হইতে পারে, কালে সেই শিক্ষা প্রদানকার্য্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়া এই মহাকালী পাঠশালা যাহাতে ভারতের আদর্শ হিন্দুবালিকা-শিক্ষামন্দির বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এই আশায় সম্পৃহহৃদয়ে উৎকণ্ঠারনেত্রে অনেক বঙ্গীয় হিন্দুসন্তান এক্ষণে চাহিয়া আছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, হিন্দুর জাতীয় উন্নতির মুখ্যতম উপায়—সর্ব্বাগ্রে হিন্দুরমণীগণের চরিত্রোৎকর্ষ দ্বারা, হিন্দু সমাজের আন্তরিক বলের উৎকর্ষ সাধন। এই মহাকার্য্যের সাধনার জন্য মহাকালী পাঠশালা কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এই মহাকার্য্যসাধন এক বা দশ জন ব্যক্তির অধ্যবসায় বা

পরিশ্রমে কিম্বা অর্থব্যয়ে হইবার সম্ভাবনা নাই। সমগ্র বঙ্গদেশের ধর্ম্মানুরাগী ও দেশহিতৈষী হিন্দুসন্তান মাত্রেরই অবস্থানুসারে এই গুরুতর ও অবশ্যকর্ত্তব্য মহাকার্য্যের পবিত্র সাধনায় যোগ দিতে হইবে। কি উপায়ে, কি ভাবে কার্য্য করিলে, এই মহাকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, সে বিষয়ে কিছু বলা এ ক্ষেত্রে সম্ভব-পর নহে। মহাকালী পাঠশালার উপযুক্ত নেতৃগণের উপর দেশের বিশ্বাস এখনও স্থির আছে। অবস্থানুসারে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কার্য্য করিবার শক্তিও তাঁহাদের বিলক্ষণ আছে। প্রগাঢ় ধৈর্য্য, অকৃত্রিম দেশ হিতৈষণা ও হিন্দুসমাজের প্রকৃত অবস্থাজ্ঞান ও পরিণাম-চিন্তা,—এই সকল মহাকার্য্য সাধনোপযোগী গুণের আশ্রয় বলিয়া যাঁহারা আমাদের দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদেরই হস্তে যখন মহাকালী পাঠশালার পরিচালনা ও শুভচিন্তার গুরুভার ন্যস্ত আছে, তখন মহাকালী পাঠশালার কর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষ বলিবার আবশ্যকতা আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী শ্রীমতী মাতাজী, উদারহৃদয় ধার্ম্মিকশিরোমণি মহাপ্রভাব অগাধসত্ত্ব মহারাজ দ্বারভাঙ্গা, মাননীয় স্বদেশহিতৈষী কার্য্যবীর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, ব্যবহারনিপুণ উদারহৃদয় পরমশ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীল-মণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশের বহুতর গণ্যমান্য ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সাহায্য ও পরামর্শে ও বিলক্ষণ কার্য্যকুশলতায় যে, মহাকালী পাঠশালা পরি-চালিত হইয়া ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সহিত অভ্যুদয়ের দিকেই অগ্রসর হইবে এবং হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকারসাধনে সমর্থ হইবে, বঙ্গের অনেক হিন্দু সন্তান এই প্রকার আশাকে হৃদয়ে যত্নের সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অদ্য তালতলা লাইব্রেরী ও তালতলা মহাকালী পাঠশালার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আহুত এই কলিকাতার গণ্য মান্য শিক্ষিত সভ্য মহাশয়গণ এই প্রকারে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে এই সভার কার্য্য-বিবরণ শ্রবণ ও দর্শন করিয়া, এই লাইব্রেরী ও মহাকালী পাঠশালার হিতৈষী-গণের হৃদয়ে উৎসাহের অমৃতধারা নিষেক করিয়াছেন; সেই জন্য তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমি উপস্থিত সভামণ্ডলীকে তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

# আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।] [ ৪০৭ পৃষ্ঠার পর।

চা-বাগিচায় কুলিদিগের জন্য বাঙ্গালা দেশের অনেক সংবাদ-পত্র-সম্পাদক মহাশয় চিন্তিত, ভীত, স্তম্ভিত; এক একটা অত্যাচার বা অবিচার পীড়নের কথা লইয়া তিন ফুট স্তম্ভপ্রমাণ প্রবন্ধ দ্বারা সাপ্তাহিকের কলেবর পূর্ণ করেন এবং তাহা পাঠ করিয়া সমগ্র বাঙ্গলা দেশ—সমুদায় বাঙ্গালী—সমুদায় সংবাদ-পত্র-পাঠকগণও ভীতিবিস্মিতলোচনে বারি সম্বরণ করিতে পারেন না। যে সকল কথা লইয়া এত আন্দোলন হয়, তাহা কতদূর সত্য, তাহার প্রকৃত অনুসন্ধান না করিয়া, কেবলমাত্র অদূরদর্শী বিদ্বেষভাবী সংবাদ-দাতার কথায় নির্ভর করিয়া, অকথ্য কথন দ্বারা জাতিবিদ্বেষ ভাব উদ্দীপিত করিয়া তোলা অবিচক্ষণতার কার্য্য বলিয়া মনে হয়। বলিতে কি, যাহাদিগকে নিরন্তর এই নিরক্ষর কুলি লইয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে সর্ব্বদা মেজাজ বজায় রাখিয়া কার্য্য করা একবারেই অসম্ভব। তাহা ছাড়া কুলিগণ যে নিরপরাধী, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি স্বয়ং অনেক কুলির রীত চরিত্র পরিজ্ঞাত আছি; তাহাতে তাহারা যে কেন চাবুক বা ঘুষা খাইবে না, তাহা বলিতে পারি না। তাহার পর ইহাও মনে রাখা উচিত যে, যাহাদিগকে সহস্র সহস্র বর্ব্বর লইয়া সর্ব্বদা বাস করিতে হয়, তাহাদিগকে সুশাসনে রাখিতে হইলে কঠিন ভাব ধারণ না করিলে সাহেবেরা আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-বিবর্জ্জিত সুদূর জঙ্গলে নিরাপদে বাস করিতে পারেন না। বর্ব্বর ও মূর্খদিগকে নিরন্তর কঠিন রূপে শাসন করিতে পারিলে, তবেই তাহারা নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করিবে, নচেৎ নহে। মানব-প্রকৃতি-সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তিনি নিশ্চিৎ জানেন যে, মানব-হৃদয় সর্ব্বস্থলে সহৃদয়তার আধার। মানুষে যে সময়ে সময়ে নির্ম্মমতার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহার মধ্যেও যে দয়া দাক্ষিণ্য নাই, তাহা কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না। চা-বাগানের দুই একটা গোলমাল আমরা শুনিতে পাই বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিলে কিন্তু দেখিতে পাই, তাহা আকস্মিক। তবে সাহেব লোক দ্বারা তাহা সংঘটিত হয় বলিয়া, আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে যদি বিচার করি, এবং সরল ভাবে দেখি, তাহা হইলে চা-বাগানের সাহেবদিগের আকস্মিক ঘটনা হইতে অধিকতর শোচনীয় ঘটনা অধিক পরিমাণ

দেশীয় অনেক জমিদার মহাশয়ের জমিদারীতে নিরন্তরই ঘটিয়া থাকে। সকল দেশেই দরিদ্রের মা বাপ নাই, সুতরাং জমিদারীর প্রজাগণ নীরবে সেই সমুদায় অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করিয়া থাকে। চা-বাগানে কুলি আনয়ন করিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়, সুতরাং সাহেবেরা কুলিদিগের নিকট হইতে নিয়মিত কাজ চাহে। নিয়মিত কাজ করিলে কুলিদিগের প্রতি কোন অত্যাচার হইবার কারণ নাই ও এরূপ কোন অত্যাচার দেখি নাই। কুলিদিগকে অপরিমিত খাটাইলে, তাহারা হীনবল ও রুগ্ন হইতে পারে, ইহা সাহেবেরা জানেন; পুনরপি এই সকল কুলিদিগকে আবার শাসন না করিলে চলে না। কুলিদিগের সচ্ছন্দের জন্য প্রত্যেক বাগানেই একজন বা দুইজন কুলি সংখ্যার পরিমাণানুসারে ডাক্তার আছেন, হাঁসপাতাল আছে। তাহা ব্যতীত অকর্ম্মঠ ও রুগ্ন কুলিদিগের জন্য হাঁসপাতালের সংলগ্ন একটী করিয়া হোটেল আছে; যে সকল কুলি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ নিজে রাঁধিয়া খাইতে পারে না, তাহারা হাঁসপাতালে খাইয়া থাকে এবং খোরাকী হিসাবে ইহাদের বেতন হইতে তিন টাকা হিসাবে যে দাম পাওনা হয়, তাহা সরকারে জমা হয়। আমি প্রত্যক্ষ জানিয়াছি, ইহাতে কোম্পানীর কোন আর্থিক লাভ নাই, বরং প্রতি মাসেই হোটেলের খরচের সঙ্কুলানার্থ কোম্পানীকে কিছু মুদ্রা ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। হাঁসপাতালের সুশৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্তের জন্য বাগানের ডাক্তারই দায়িক। তিনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ হইলে রোগীদিগের পথ্য, ঔষধ ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত হইয়া থাকে। হাঁসপাতালের বন্দোবস্তের জন্য সাহেবগণ নিজে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। তেজপুর মহকুমা বড়জুলি বাগানে হাঁসপাতালের সুবন্দোবস্ত দেখিয়াছিলাম; উত্তর-লখীমপুর জেলায় যে কয়টী বাগানে গেলাম, তাহার মধ্যে দুমদুমা কোংর বাগানগুলিতে হাঁসপাতালের অতি সুবন্দোবস্ত। উক্ত কোম্পানীর বিষাকুপি বাগানের মধ্যে যে হাঁসপাতাল আছে, তাহা পাকা বাঙ্গালা, বিস্তৃতপ্রাঙ্গন-বিশিষ্ট,—ঘর দুয়ার উচ্চ, প্রশস্ত এবং চারিদিক পরিষ্কার ও ঝরঝরে। এই বাগানের কুলি সংখ্যা ৩০০০; বাগানের আয়তন—আবাদী আয়তন প্রায় ১২০০ একার,—বাঙ্গালা হিসাবে মোটামোটী ৩৬০০ বিঘার উপর। সকল বাগানের হাসপাতাল যে উল্লিখিত প্রকারের সুবন্দোবস্ত মত তাহা নহে। অনেক বাগানে এমনও দেখিয়াছি যে, একটা অতি জঘন্য সেঁতসেঁতে বায়ু-প্রবেশ-পথ-রুদ্ধ গৃহ-মধ্যে হাসপাতাল স্থাপিত। কুলিদিগের অর্থাৎ রুগ্ন কুলিদিগের পরিধেয় বস্ত্রাদি, বিছানাপত্র অতি-

শর মলিন, দুর্গন্ধবিশিষ্ট ;—তাহাদিগের অবয়বও রুক্ষ। হাঁসপাতালে কদাচ ঝাড়ু পড়িয়া থাকে,—চারিদিক দুর্গন্ধযুক্ত। প্রাতঃকালে কামজারির দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিলে অর্থাৎ সাত ঘটিকার সময়, দলে দলে রোগিগণ লাইন হইতে আসিয়া হাঁসপাতালের প্রাঙ্গণে বা সম্মুখে কাতার দিয়া হাজির হয়। ইহার মধ্যে অনেক মিথ্যা রোগী থাকে, অর্থাৎ ছুটি পাইবার জন্য পীড়ার ভান করিয়া আইসে। যাহা হউক, সুচতুর ডাক্তার মহাশয় শ্রেণীবদ্ধ কুলিদিগকে একদিক হইতে হু-হু করিয়া চিকিৎসা করিয়া চলিয়া যান এবং প্রত্যেক রোগীকে যে যে ঔষধ দিতে হইবে, তাহা কম্পাউণ্ডার বাবুকে বলিয়া যান, আর যেখানে স্বতন্ত্র কম্পাউণ্ডার না আছে, একজন স্থায়ী কুলি তাহার কার্য্য করে। হাঁসপাতালে কতকগুলি কফ মিক্‌শ্চার, ফিবার মিক্‌শ্চার, প্রভৃতি কয়েকটী ঔষধ বড় বড় কাচের জার (Jar) মধ্যে প্রস্তুত থাকে। প্রত্যেক জারে ১০।১৫ সের ঔষধ থাকে। ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলেই ঔষধ পান করিয়া চলিয়া যায়। যে সকল রোগীকে ডাক্তার বাবু হাঁসপাতালে থাকিবার উপযোগী মনে করেন, তাহারা তথায় স্থান পায়—অবশিষ্টাংশ হা-হুতাশ করিয়া চলিয়া যায়, আবার অনেকে—ছুটী না পাওয়ায়—ডাক্তার বাবু যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য—অধিক কি, খাড়া মূর্খ—জাল ডাক্তার ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। যে সকল রোগী হাঁসপাতালের উপযোগী নহে, অথচ কঠিন পরিশ্রম করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে সহজ কাজ (light work) দিবার জন্য ডাক্তার বাবু সাহেবকে বলিতে পারেন—এবং বলেন।

হাঁসপাতালের কুলিগণ প্রাতঃকালে ঔষধ পান বা সেবন করিবার পরে খাদ্য ভোগ পায়। খাদ্য—ভোগ চা-রুটী। অনেক রোগী বজ্জাতি করিয়া ঔষধ পান ভয়ে সাড়া দেয় না, কিন্তু চা রুটী খাইবার কালে, কেহ সুবৃহৎ কাঁশি, কেহ ঘটী, কেহ বাটি ইত্যাদি লইয়া ভাণ্ডারীকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলে। বেলা প্রায় ১১টার সময় সকলের আহার প্রস্তুত হয়, কেহ সাগু, কেহ দুগ্ধ, কেহ ভাত, কেহ সুপ প্রভৃতি খাইতে পায়। উত্থান-শক্তিহীন ব্যতীত সকল রোগীই আহার-কালে যথাস্থানে আসিয়া আহার কার্য্য সমাধা করে। রোগীদিগের শরীরে বল আনিবার জন্য সপ্তাহে এক দিবস মাংস দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাদিগের মাংসের ব্যবস্থা দেখিয়া, কলিকাতার পাল্কীবাহী উড়িয়াদিগের দুগ্ধ পানের কথা মনে পড়িল! পাল্কী বহন করিতে হইলে শরীরে বল থাকা আবশ্যক, সুতরাং উড়ে

বেহারাগণ এক পোয়া দুগ্ধ কিনিয়া—কলিকাতায়, এক পোয়া দুগ্ধ কিনিয়া—৩০।৪০ জন তাহা পান করে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, আড়ার তাবৎ লোককে এক পোয়া দুগ্ধ পান করিতে হইলে, উহাতে ১০।১৫ সের খাঁটি কলের জল মিশাইয়া লইতে হয়। বাস্তবিক ত সারাদিন "পানকী কন্ধা মারি"তে হইলে একটু দুগ্ধ পান না করিলে চলিবে কেন? যাহা হউক, শুক্রবার বৈকালে হাঁসপাতালে একখানা রাঙ্গ (leg), বা শির-দাঁড়া আসিল। সেখানা রন্ধন হইলে, পাচককে উহা পরিবেষণ, করিতে হইবে—৩০ ৪০ বা তদোধিক লোকের মধ্যে! ইহা পাচকের পক্ষে কার্য্য-কুশলতার—হস্ত কুশলতার পরিচায়ক, সে বিষয়ে কি আর কিছু সংশয় আছে? এই রক্ষিত মাংসে ঝালিকার (সিংহল দ্বীপের) শ্রাদ্ধ,—মায় সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত হইয়াছে জানিবেন, কেন না তাহা না করিলে উহাতে আর কোন আস্বাদন পাওয়া যে যায়, তাহা আমার ত অনুধাবন-শক্তির বহির্দ্দেশে। প্রায় সকল বাগানের ডাক্তারেরা বলিয়া থাকেন কুলিদিগের মধ্যে যে নানাবিধ পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণ "insufficient আহার", "sufficient food" পাইলে কোন ঔষধ প্রয়োগেরই আবশ্যক হয় না। কথাটা খুব ঠিক। ডাক্তার বাবুগণ অনুগ্রহ করিয়া লেখকের বেয়াদবী ক্ষমা করিবেন—উল্লিখিত প্রণালী বা পরিমাণে রোগীদিগকে মাংস খাওয়াইলে, ঔষধ দিবার আবশ্যক ত হইবেই না, প্রতিদিনের ভাতবন্ধ করিলেও চলিবে এবং প্রতিনিয়ত হস্তটিপ্পনীর দায় হইতে আপনারা নিষ্কৃতি পাইবেন।

চা বাগানের কুলিগণ যে এক অপূর্ব্ব অন্নরন্ধন করে, তাহার নাম 'কুলি ভাত'। কুলিভাতের চাউল লাল বর্ণের অর্থাৎ আছাটা। ইহার রন্ধনকালে হরিদ্রা ও লবণ এবং কেহ কেহ আলু দিয়া থাকে। ভাতের ফেন ভাতেই শোষিত হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়া অল্প সময়ের মধ্যে রন্ধন করিয়া আহার করিতে হয়, এই জন্য এই সহজ প্রণালীতে কুলিগণ অন্নরন্ধন করিয়া থাকে,—এই জন্যই ইহার নাম 'কুলিভাত'।

সুদূর ও দুর্গম চা বাগানের মধ্যে প্রায়ই চাকরীর উমেদার দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল উমেদারগণ হয় বাঙ্গালী—পূর্ব্ববঙ্গের, না হয় আসামী। বাগানে, কেরাণীর মোহরী অনেক স্থলেই বাঙ্গালী; কিন্তু সাহেবেরা আসামী পাইলে বাঙ্গালী রাখিতে নারাজ। বাঙ্গালীকে অপেক্ষাকৃত অধিক মাহিয়ানা দিতে হয়,—সাহেবের পদানত হইয়া থাকিতে নারাজ।

আসামীগণ ৮১০ টাকায় মোহরীগিরী করিতে রাজি; সাহেবের দুইটা কড়া কথা শুনিতে রাজি। বাগানের মোহরিগণের ভিন্ন ভিন্ন পদ আছে—গুদাম-মোহরী, হাজিরা-মোহরী, জমাদার-মোহরী। গুদাম-মোহরী অর্থাৎ Store-keeper যিনি, তাঁহার কাজ,—বাগানের মাল পত্রের আমদানী রপ্তানীর হিসাব পত্র রাখা। কুলিদিগের চাউল, দাল হইতে কারখানার পেরেক, স্চটী অবধির হিসাব রাখা। হাজিরা-মোহরীর কার্য্য কুলিদিগের হিসাব রাখা, কত কুলি কোন্ কাজে রহিল, কোন কুলি কোন কাজে গেল কি না ইত্যাদি যাবৎ বিষয় তাঁহার কার্য্যান্তাভূর্ত। কুলিদিগের হাজিরা রাখিবার প্রণালী স্বতন্ত্র। সমগ্র বাগান খুঁজিয়া, কোথায় কোন কুলি কাজ করিতেছে, তাহা দেখিয়া হাজিরা বহিতে লিখিতে হয়। যে সকল কুলিকে কাজে হাজির না পাওয়া গেল, তাহাদিগের সন্ধানের জন্য তাঁহাকে বই হাতে করিয়া হাঁসপাতালে ডাক্তার বাবুর কাছে যাইতে হয়। হাঁসপাতালের বহিতে প্রতিদিনের রক্ষিত কুলিদিগের নাম থাকে। তাহা হইতে হাজিরা-মোহরী স্বীয় রেজিষ্টারিতে পীড়িত ব্যক্তিদিগের নাম লিখিয়া লয়েন। তাহার পরে, অর্থাৎ কাজে কিম্বা হাঁসপাতালের বহিতে যাহাদিগকে না পাওয়া গেল, তাহাদিগকে অন্বেষণ হয় এবং তাহাদিগের প্রায় অনেককেই নিজ নিজ ঘরে পাওয়া যায়। তখন চৌকীদার গিয়া তাহদিগকে ধরিয়া আনিয়া সাহেবের নিকট হাজির করে; সাহেব তাহাদিগকে ধমক দিয়া কোন কাজে পাঠাইয়া দেন। রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য কুলিদিগের জন্য হাল্কা (light work) কাজের ব্যবস্থা আছে। কেহ চা গাছ হইতে ফড়িং বা পোকা ধরে, কেহ সাহেবের ফুলবাগানের কার্য্য করে ইত্যাদি।

ডিব্রুগড় ঘাট হইতে তালাপ পর্য্যন্ত ডিব্রু সদিয়া রেলওয়ে লাইন গিয়াছে। এই উভয় ষ্টেশনের মধ্যস্থানে মাকুম জংসন। মাকুম হইতে মার্গেরেটা পর্য্যন্ত একটী শাখা লাইন আছে। এই তাবৎ রেলওয়েই Assam Railways & Trading Co.'র। ইঁহাদিগের আশি লক্ষ টাকা মূল ধন। উক্ত রেল কোম্পানির কারকারবারের বিষয় ইতি পূর্ব্বে সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছি—বিস্তৃতভাবে বলিবারও অনেক আছে, ক্রমে বলিব। মার্গেরেটা সহরে সচরাচর বরাবর গাড়ী না আসিয়া ডিহিং নদীর অপর পারে (Dihing Bridge) ষ্টেশন অবধি গাড়ী আসিয়া থাকে। সেই ষ্টেশনে গাড়ি হইতে নামিয়া পুল্ পার হইয়া আসিলেই মার্গেরেটা পৌছান যায়।

ডিহিংব্রিজ সেতুটী প্রায় ৭০০ ফুট লম্বা হইবে। উহারই নিম্নদেশ বহিয়া ডিহিং নদী প্রবাহিত। শীতকাল হইতে নদীর জল অনেক কমিয়া যায়—গভীরস্থানে ছয় হাত পর্য্যন্ত জল পাওয়া যায়। নদীর উভয় পার্শ্বে জঙ্গল—কেবল মার্গেরেটা সহর টুকু বাদ। যে স্থানে মার্গেরেটা সহর, উহা ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে নাগাদের দেশ ছিল। রেল কোম্পানী এ পারে হেড কোয়াটার বা প্রধান আড্ডা স্থাপন করতঃ, অনেক স্থান অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং নাগাকুল ক্রমে কোণঠাসা অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। মার্গেরেটার কোন বাসিন্দা (inhabitant) নাই,—যাহারা আছে, সাহেব, বাঙ্গালী, বা কুলি—সকলেই বিদেশী, কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করিতে বাধ্য। নদী ও রেলওয়ে লাইনের মধ্যে ৪০।৫০ বিঘা জমির উপরে কতকগুলি টিনের ঘর আছে, সেখানে হাট-বাজার ও দোকান পাট আছে, কতকগুলি কুলিও তথায় বাস করে। এই জমি টুকু সমতল। রেলের অপর পার্শ্বে ও কিছুদূর পর্য্যন্ত সমতল বটে, কিন্তু তাহাতে রেল কোম্পানীর কারখানা—করাতের কল ( Saw-mill ), রিফাইনারি (তেল রিফাইন করিবার স্থান)। তাহার পরে, পাহাড়ের উপর, সাহেবদিগের ও বাবুদিগের—'বাঙ্গালা' (bunglow)। তাবৎ বাঙ্গালা হইতেই চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, ও পশ্চিম দিক্ ব্যাপিয়া সুবিস্তৃত জঙ্গল এবং তাহার জের ক্রমে পশ্চাদ্ভাগস্থিত ক্রমোন্নত গিরিরাজিতে গিয়া মিশিয়াছে—আবার শৈলশ্রেণী আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। পশ্চিমদিকে তিন চারি শত ফুট্ নিম্ন দিয়া ডিহিংনদী সর্পাকারে আঁকা বাঁকা ভাবে বহিয়া গিয়া যেন উভয়পার্শ্বস্থ বনমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছে। সুন্দর দৃশ্য! আবার সেই দ্রুতগামিনী স্রোতস্বিনীর কলেবরে চন্দ্রমার বিমল কিরণ পতিত হইলে যখন রাশিরাশি জ্যোৎস্না মাখা হইয়া ঢল ঢল করিতে থাকে, তখন প্রাণের উপর যেন নিজের আর কোন আধিপত্য থাকে না। অন্ধকার রজনীতে শান্ত প্রকৃতির যে সুগম্ভীর ভাব দেখি, তাহাও কি ভুলিবার? কতকগুলা রং আছে, তাদের জ্যোতিঃ দিনমানে উজ্জ্বল হয়, রজনীতে ম্রিয়মাণ হয়,—তেমনি কতকগুলা রং দিনে মিড় মিড় করে, রাত্রিতে সুন্দর হয়। দিনই বল, আর রাত্রিই বল, নক্ষত্ররাজি চতুর্বিংশতি প্রহরই আকাশময় পরিব্যাপ্ত—দিনমণি অস্তাচলে যাইবার প্রাক্কাল হইতেই সেই ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র-কলেবর তারকারাজি বায়ুমণ্ডলাবরণ মধ্য হইতে নববিবাহিতা শরমলাজবিরহিতা কনে বৌয়ের ন্যায় ফুট ফুট করিয়া মুখ বাহির করিতে থাকে, আবার পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে

যেন মধ্যে মধ্যে অবগুণ্ঠন মধ্যে মুখ লুকায়। যেই অন্ধকারে চারিদিক ডুবিয়া গেল, অমনি আকাশপানে চাহিয়া দেখ—লক্ষ লক্ষ তারা,—এক, এক, দুই, চারি,—শত শত—দলে দলে, আ মরি মরি—আকাশ-ভরা হীরার টুক্‌রা!! আবার সৃষ্টির কি বৈচিত্র্য—একজনের যাহাতে উল্লাস, অপরের তাহাতে নিরাশ;—একজন হাসে অন্য কান্দে। কোকিলের কুহুতে শুনিয়াছি দম্পতী-কুল আনন্দে দিশাহারা হয়েন,—আর বিরহী বিরহিনী কাঁদিয়া আকুল। চাঁদ উঠিলে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু এমন আঁধারের মাণিক হীরার টুক্‌রা তারার মালা মলিন হইয়া যায়। ইহাই সংসার—ইহাই সংসারের নিয়ম।

অন্ধকার রজনীতে যখন বাঙ্গালায় বসিয়া থাকি, দেখি দুইশত ফুট্‌ নিম্নদেশ দিয়া ডিহিংনদী একই রবে—কল কল শব্দে—হু হু করিয়া চলিয়াছে;—পৃথিবীর পানে চাহিলে, চারিদিক নীরব—আর পাহাড় জঙ্গলগুলা যেন নিজের নিজের বাড়ীতে ঘুমাইতে গিয়াছে বলিয়া মনে হয়,—আকাশপানে সেই জল জল তারা! বৃষ্টির সময় ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া যখন বৃষ্টি হইতে থাকে, মুহুর্মুহু কড় কড় শব্দে বজ্রনাদ হইতে থাকে, ঘন মেঘরাশি 'বাঙ্গালায়' প্রায় সংলগ্ন হইয়া আইসে, প্রকৃতির সেই ভাব, সেই দৃশ্য, সেই অবস্থা যে নিন্দার—তাহা নহে। প্রাকৃতিক ও ভৌতিক কারণ বশতঃ, এদেশে আকাশের বজ্রনাদ, ও জমাটি মেঘগর্জ্জন অবিরল নহে—তাহাতেও কিছু নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কোন আবদ্ধ স্থানে শব্দ করিলে, যেমন সেই শব্দ তাহারই মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া একটা গম্ভীর আওয়াজ নির্গত করে, সেইরূপ পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত স্থানে মেঘগর্জ্জনেরও শব্দ অপেক্ষাকৃত সমধিক হইয়া থাকে। বৃষ্টির পূর্ব্বে বা সময়ে পাহাড়ের দিকে মেঘের বর্ণ এত ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে যে, মনে হয় উহা কালান্তক যমের প্রতিমূর্ত্তি। এমন কাল মেঘ বাঙ্গলা দেশে দেখি নাই।

স্থানীয় কয়েকটী ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠিত কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হই। উক্ত কৃষিক্ষেত্র মার্গেরিটা হইতে বড় বেশী দূর নহে,—সহর হইতে একক্রোশ হইবে, কিন্তু মধ্যে ডিহিং নদী ব্যবধান আছে—একা নদী বিশ ক্রোশ। একদিন একটী বন্ধুর সহিত আহারান্তে চলিলাম। ডিহিং ব্রিজ পার হইয়া নদীর কিনারা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া কিয়দ্দূর গেলে একটী ক্ষুদ্র নদী (Streamlet) পাইলাম। উহা আন্দাজ ৫০ হাত চওড়া এবং তদনুরূপ গভীর, কিন্তু জল ২।৩ ফুটের অধিক নহে। উহাতে পারাপার হইবার জন্য স্থানীয় লোকেরা একটী সুদীর্ঘ

বৃক্ষের কাণ্ড ফেলিয়া রাখিয়াছে—তাহার উপর দিয়া লোকে যাতায়াত করে। কাণ্ডটীযে বিশেষ স্থূল তাহাও নহে,—মধ্যস্থলে গেলে দুলিতে থাকে। পদস্থাপনার জন্য যেমন কাণ্ডটী পড়িয়া আছে, হস্তদ্বারা ধরিবার কোন জিনিষ থাকিলে, উহার উপর দিয়া পার হইবার জন্য বিশেষ ভাবিত হইতে হইত না। আমার সাথি বন্ধুটী ছত্রহস্তে অতি ধীরে ধীরে পার হইয়া গেলেন, আর আমি নিজের পার হইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার বাঁশ-বাজীকরদিগের ন্যায় পার হওয়া দেখিয়া, তাহাদিগের 'হায়রে পয়না' আমার মনে হইতে লাগিল। আর তিনি ঝুপ্ করিয়া জলে পড়িয়া গেলে, একটা মজা দেখা যায়—ইহাও মনে হইতে লাগিল। তিনি সেই Ass's Bridge অতিক্রম করিয়া গিয়া আমাকে বারম্বার অভয়বাণী দিতে লাগিলেন, এবং তাহারই উপর দিয়া পার হইতে বলিলেন। আমি কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলাম, অবশেষে লজ্জা ভয়সাহসবিমিশ্রিতমনে দুই চারিপদ অগ্রসর হইয়া,"ম'শয়, আমার দ্বারা হবে না" বলিয়া ফিরিয়া কিনারায় গেলাম। অদূরে একটী বৃহৎ গাছ উৎপাটিত হইয়া নদীতে পড়িয়া আছে দেখিয়া, আমি অতি কষ্টে তাহার শাখা প্রশাখা অবলম্বন করিয়া পার হইলাম। খানিক দূর গিয়া আবার সেই নদীকে আর এক স্থানে পার হইতে হইবে; এখানে পারের ব্যবস্থা একটু সুবিধামত—কারণ নদীর উপর চলিবার জন্য যেমন একটা গাছ পড়িয়া আছে, ঠিক তাহার ৪।৫ ফুট উপরে আর একটা গাছ পড়িয়া আছে; সুতরাং নিম্নস্থিত গাছের উপরে পদস্থাপন করতঃ, উচ্চস্থিতকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বদিকে পা—পা—পদক্ষেপণে উহা পার হইলাম। ক্রমে জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম—গভীর হইতে গভীরতর জঙ্গল,—কোথায় সূর্য্যালোক কায়ক্লেশে আসিতে পারিয়াছে,—কোথাও একেবারে নাই। স্থানে স্থানে গাছকাটা গিয়াছে—সেই স্থানটা একটু সূর্য্যালোকের আস্বাদ পায়। গাছগুলা এত উচ্চ, যে আকাশ পানে মুখ না করিলে উহাদিগের শেষ দেখা যায় না। গাছে নানাবিধ ফর্ণ (Fern), অর্চিড (Orchid), আরও কত কি দেখিলাম, কত নাম করিব। জঙ্গলে শীতল-পাটীর গাছেরও অভাবনাই,—এদেশে তাহার কোন কাজ নাই। এই সকল বনে যে সমুদয় বৃহৎ বৃহৎ গাছ আছে, তাহা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট বিক্রয় করেন। রাজভাগ (Royalty) জমা দিলে, যে সে উহা কাটিয়া আনিতে পারে।

ফরেষ্ট মধ্যস্থিত যে সকল গাছ আছে, তাহা প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয়, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। নাহোর—যাহাকে বাঙ্গালা ভাষায় নাগেশ্বর বা

নাগকেশর এবং ইংরাজিতে Iron wood বা Mesua Feria কহে—প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল কাষ্ঠে রেলওয়ে স্লিপার হয়। উরিয়াম কাঠও বড় মজবুদ ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী, সুতরাং উল্লিখিত কার্য্যের উপযোগী। কত কাঠের নাম করিব? সেই সকল গাছ কাটাইয়া ব্যবহারিক কার্য্যে লাগাইলে যে বিশেষরূপে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সমগ্র আসাম প্রদেশ মধ্যে দুই চারিটি Saw mill বা করাতের কারখানা আছে। তাহার মধ্যে তেজপুরে ও মার্গেরিটায় যে এক একটী আছে তাহা জানি, কিন্তু তত্তাবৎই সাহেবদিগের। সাহেবেরা জঙ্গল হইতে গাছ কাটিয়া আনিয়া, কলে চিরাই করতঃ নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহার করেন। চা-বাগিচার চা প্যাক্ করিবার জন্য যত বাক্সের দরকার, তাহার জন্য তাবৎ কাঠই ঐ সকল কারিখানাওয়ালারা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কার্য্যোপযোগী কাষ্ঠ বাহির করিয়া লইবার পরে, যে সকল খালি কাষ্ঠ থাকে তাহা জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অল্প মূলধনে সেই সমুদয় বাতিল কাষ্ঠ খরিদ করিয়া, পুনরায় যদি তাহাকে অন্যান্য কার্য্যের উপযোগী করিয়া লওয়া যায়, তাহাও বিশেষ লাভের ব্যবসায়। এদেশে ধনী লোক নাই, এবং মজুরের বড় অভাব, কাজেই বনের কাঠ বনেই থাকে—বনেই নষ্ট হয়।

বাঙ্গালা দেশের ও আসামের বাঁশগাছ মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। প্রথমোক্ত স্থানের বাঁশ গাছের শিরোদেশ উর্দ্ধমুখী থাকে। কিন্তু এখানকার বাঁশ গাছের ডগা সমুদয় অবনতমুখী ও ঘনপত্রবিন্যস্ত, সুতরাং দেখিতে বড় সুন্দর—প্রায় সকল সাহেবের 'বাঙ্গালায়' দুই এক ঝাড় বাঁশগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত স্থানের বাঁশগাছ যে কেন অবনতমুখী, তাহার দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রথম, অপর্য্যাপ্ত বারিপাত বশতঃ গাছে সমধিক পাতা জন্মে, সুতরাং উর্দ্ধাগ্রভাগ তাহা বহন করিতে না পারায় নত হইয়া পড়ে; দ্বিতীয়তঃ, শীতের প্রাদুর্ভাব বশতঃ সূক্ষ্মভাগ মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। বাঁশগুলি খুব লম্বা ও স্থূল হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সারভাগ বড় অল্প। সাধারণতঃ দেখা যায়, এখানকার তাবৎ উদ্ভিদেরই বৃদ্ধি অতি দ্রুত; এজন্য গাছ কিম্বা তাহার ফলে সারাংশও অল্প।

---

## দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে প্রাপ্ত স্বীকার।

রামকৃষ্ণ-মিশন ভুক্ত দুর্ভিক্ষ-মোচনাশ্রমে "কলিকাতা শ্যামবাজার ডিবেটিং সোসাইটী" গত ১৭ই জুন তারিখে ১৫৲ টাকা, এবং গত ৮ই জুলাই তারিখে ৩৯৲ টাকা দান করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।

# শ্মশান কালী।

( বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত। )

একি ! পথে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্ধকার গভীর গহন।
অমানিশা, ঘোর বিভীষিকা, দিগ্ দেশ আঁধারে মগন ॥ ১ ॥
থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকে, বজ্রনাদে দিগন্ত কম্পিত।
দিগ্ভ্রান্ত হ'য়ে জীব-পান্থ, অসহায়, ভয়ে সন্ত্রাসিত ॥ ২ ॥
ঝটিকার ঘোর হুহুঙ্কার, মিশি তাহে কর্ণে দেয় তালি।
লোল জিহ্বি, হাসে হিহি হিহি, নাচে তাহে মৃত্যুরূপা কালী ॥ ৩ ॥
বিগলিত শব অগণিত, চারিদিকে বিকট দর্শন।
রক্তমাংসঅস্থিমেদগন্ধে দুর্নিরীক্ষ্য শ্মশান ভীষণ ॥ ৪ ॥
ভীমজ্বাল, প্রলয়করাল, অগ্নিশিখা ব্যাপিছে আকাশ।
চিতাধূম আবরিছে ব্যোম—দেবতা-দানব মহাত্রাস ॥ ৫ ॥
কত নাচে থেই থেই নাচে, ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী।
মাঝে তার, ঘোর দুর্নিবার, নাচে হরহৃদিবিলাসিনী ॥ ৬ ॥
বিকরাল দৈত্যমুণ্ডমাল কণ্ঠভূষা—মুখে লোহ ঝরে।
দিগম্বরী করকাঞ্চী পরি, ভাসে খর রুধির সাগরে ॥ ৭ ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল নয়নে, শ্বাসে বহে প্রলয় পবন।
কেন্দ্রচ্যুত হুঙ্কারে চূর্ণিত, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ অগণন ॥ ৮ ॥
বিক্ষোভিত ভূলোক দ্যুলোক, তলাতল মুহুঃ কম্পমান্।
ভীম রোল, বারিধি কল্লোল, তুঙ্গগিরি চূর্ণ খান খান ॥ ৯ ॥
মূর্ত্তিমান্ জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, শোক, তাপ, নিরাশ, হুতাশ।
চারিধারে ভ্রূকুটি বিস্তারে, বিশ্বত্রাসী অট্ট অট্ট হাস ॥ ১০ ॥
বিকরাল ভীমকরবাল, চণ্ডমুণ্ড—মুণ্ড বাম করে।
বরাভয়, ভকতে নির্ভয়, সৌম্য রৌদ্র শোভা একাধারে ॥ ১১ ॥
বীর বিনে, এ তিন ভুবনে, কে সাহসে সে মূর্ত্তি-দর্শন।
কে কখন মৃত্যু-আলিঙ্গন চাহে, দেহ করিয়ে ধারণ ? ॥ ১২ ॥
মৃত্যুভয় করেছে যে জয়, শ্যামা তার নাচে হৃদি মাঝে।
সেই বীর, হৃদয়ে তাহার সুখ শান্তি সতত বিরাজে ॥ ১৩ ॥

সকল আত্মপ্রভৃতি বস্তুর অপরোক্ষ অনুভবকে বিজ্ঞান বলা যায়। সেই মোক্ষলাভের কারণ, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশ হেতু এই প্রকৃত শত্রু কামকে পরিত্যাগ কর, ইহাই অর্থ॥ ৪১॥

---

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২॥

অন্বয়।—ইন্দ্রিয়াণি (দেহাদিভ্যঃ) পরাণি (প্রকৃষ্টানি) আহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং (আহুঃ), বুদ্ধির্মনসস্তু পরা, যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ স এব (পরমাত্মা) ॥৪২॥

মূলানুবাদ।—দেহাদি স্থূল ও বাহ্য বস্তু হইতে সূক্ষ্ম ও আন্তর ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতেও যিনি আন্তর ও সূক্ষ্মতম, তাহাকেই পরমাত্মা বলা যায়॥ ৪২॥

ভাষ্য।—ইন্দ্রিয়াণি আদৌ নিয়ম্য কামং শত্রুং জহিহি ইত্যুক্তং, তত্র কিমাশ্রয়ঃ কামং জহ্যাদিত্যুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ, দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং চাপেক্ষ্য সৌক্ষ্মান্তরত্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য পরাণি প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ। তথা ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা। তথা যঃ সর্ব্বদৃশ্যেভ্যো বুদ্ধ্যন্তেভ্যোঽভ্যন্তরো যং দেহিনং ইন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামঃ জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তীত্যুক্তং স বুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা॥ ৪২॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া কামরূপ শত্রুকে পরিহার করিবে ইহা বলা হইয়াছে; এই প্রকার হইলে কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কামকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাই বলা হইতেছে যে ইন্দ্রিয়াণীতি।

স্থূল বাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন দেহ হইতে আন্তরত্ব সূক্ষ্মত্ব ও ব্যাপিত্ব নিবন্ধন শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয় পর (অর্থাৎ) প্রকৃষ্ট, এই প্রকার ইন্দ্রিয়গণ হইতে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন প্রকৃষ্ট, মন হইতে অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি প্রকৃষ্ট। এই প্রকারে, বুদ্ধিপর্য্যন্ত সকল দৃশ্য হইতেও যাহা অভ্যন্তর এবং যাহাতে দেহাভিমান আসিলে, ইন্দ্রিয়াদি আশ্রয়ের সহিত যুক্ত হইয়া কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মোহ উৎপাদন করে, সেই বুদ্ধিরও দ্রষ্টা আন্তর পদার্থকেই পরমাত্মা বলা যায়॥ ৪২॥

---

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—এবং বুদ্ধেঃ পর (মাত্মানং) বুদ্ধা আত্মনা (সংস্কৃতেন) মনসা সংস্তভ্য (সম্যক্‌সমাধায়) হে মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি (বিনাশয়) ॥ ৪৩ ॥

মূলানুবাদ।—এই প্রকারে বুদ্ধি হইতে প্রকৃষ্ট আত্মার স্বরূপ বোধ পূর্ব্বক সংস্কৃত হৃদয়ের দ্বারা সম্যক্ সমাধি অবলম্বন করিয়া, হে মহাবাহো, কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনাশ কর ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্য।—এবমিতি বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধ্বা জ্ঞাত্বা সংস্তভ্য সম্যক্ স্তম্ভনং কৃত্বা স্বেনৈব মনসা সম্যক্ সমাধায় ইত্যর্থঃ। জহি এনং শত্রুং হে মহাবাহো কামরূপং দুঃখেন আসদ আসদনং প্রাপ্তির্যস্য তং দুর্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি ॥৪৩॥

এবমিত্যাদি। এই প্রকারে বুদ্ধি হইতে প্রকৃষ্ট আত্মার স্বরূপ জানিয়া সম্যক্‌প্রকারস্তম্ভনপূর্ব্বক নিজ সংস্কৃত আত্মা (অর্থাৎ) মনের দ্বারা সম্যক্‌প্রকার সমাধি অবলম্বন করতঃ (ইহাই তাৎপর্য্য) হে মহাবাহো, কামরূপ শত্রুকে বিনাশ কর, (এই কামরূপ শত্রু) দুরাসদ, দুঃখের সহিত যাহার আসদন হয়, তাহাকেই দুরাসদ বলা যায়, অর্থাৎ কামের অনেক বিশেষ দুর্বিজ্ঞেয়, (সুতরাং ইহা দুরাসদ) ইতি ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবতঃ কৃতৌ শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাভাষ্যে কর্ম্মপ্রশংসাযোগোনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত গীতাভাষ্যে কর্ম্ম প্রশংসাযোগনামক তৃতীয় অধ্যায়।

# অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

## কর্ম্মব্রহ্মার্পণযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥

অন্বয়।—অহং ইমং অব্যয়ং যোগং বিবস্বতে প্রোক্তবান্, বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি এই অবিনাশী যোগ (প্রথমে) সূর্য্যকে উপদেশ দিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে ইহা বলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেন ॥ ১ ॥

ভাষ্য।—যোঽয়ং যোগোঽধ্যায়দ্বয়েনোক্তঃ জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণঃ স সন্ন্যাসঃ কর্ম্ম-যোগোপায়ঃ যস্মিন্ বেদার্থঃ পরিসমাপ্তঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ গীতাসুচ সর্ব্বাসু অয়মেব যোগঃ বিবক্ষিতো ভগবতা, অতঃ পরিসমাপ্তং বেদার্থং মন্বানঃ তং বংশকথনেন স্তৌতি শ্রীভগবান্। ইমং অধ্যায়দ্বয়েন উক্তং যোগং বিবস্বতে আদিত্যায় সর্গাদৌ প্রোক্তবানহং। জগৎপরিপালয়িতৃণাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানায়, তেন যোগবলেন যুক্তাঃ সমর্থাভবন্তি ব্রহ্ম পরিরক্ষিতুং, ব্রহ্ম ক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎপরিপালয়িতুমলং, অব্যয়মব্যয়ফলকত্বাৎ নহ্যস্য সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠালক্ষণস্য মোক্ষাখ্যং ফলং ব্যেতি সচ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায় আদিরাজায় অব্রবীৎ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই যে যোগ অধ্যায়দ্বয়ে উক্ত হইয়াছে, সন্ন্যাসের সহিত জ্ঞাননিষ্ঠাই যাহার স্বরূপ, কর্ম্মযোগের দ্বারা যাহাকে লাভ করা যায়, এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ বেদোক্ত ধর্ম্ম যাহাতে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে, সেই যোগই সকল গীতাতে ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশ করিতে অভিলাষী ছিলেন, (সেই যোগ বিষয়ে উপদেশ দ্বারা) সকল প্রকার

বেদার্থই ( সংক্ষেপে ) বলা হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া, ভগবান্ সেই যোগের আচার্য্যপরম্পরার উল্লেখ দ্বারা তাহারই প্রশংসা করিতেছেন। এই ( পূর্ব্ব ) অধ্যায়দ্বয়ে উক্ত যোগ আমি, বিবস্বান্ ( অর্থাৎ ) আদিত্যকে সৃষ্টির পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, জগৎপালক ক্ষত্রিয়গণের বলাধান করিবার জন্যই ( আমি এই যোগের বিষয় তাহাকে বলিয়াছিলাম ), সেই যোগবলে যুক্ত হইয়াই ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরের দ্বারা পরিরক্ষিত হইলে সকল সংসারকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই যোগ অব্যয়, ( কারণ ) ইহার ফল ( মোক্ষ ) অব্যয়, এই সম্যক্জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যোগের ফল মোক্ষ কখনও বিনাশী হইতে পারে না। সেই বিবস্বান্ এই যোগ বিষয়ে মনুকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং মনুও নিজ পুত্র আদিরাজ ইক্ষ্বাকুকে এই যোগের উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

---

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়োবিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং ( যোগং ) রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ, হে পরন্তপ, স যোগঃ মহতা কালেন ইহ নষ্টঃ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—হে পরন্তপ, এই প্রকার ক্ষত্রিয় পরম্পরার দ্বারা প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন, এই ভারতে এক্ষণে এই দীর্ঘ কালের বশে ঐ যোগ নষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

ভাষ্য।—এবমিতি, এবং ক্ষত্রিয়পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ রাজর্ষয়ঃ বিদুরিমং যোগম্। সযোগঃ কালেনেহ মহতা দীর্ঘেণ নষ্টঃ বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ সম্বৃত্তঃ হে পরন্তপ, আত্মনোবিপক্ষভূতাঃ পরা উচ্যন্তে, তান্ শৌর্য্যতেজোগভস্তিভির্ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ শত্রুতাপন ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকারে ক্ষত্রিয়পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগকে রাজর্ষিগণ ( যাঁহারা রাজা হইয়াও বাস্তবপক্ষে ঋষি ছিলেন, তাঁহাদিগকেই রাজর্ষি কহা যায় ) জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই যোগ এই দেশে দীর্ঘকালে নষ্ট ( অর্থাৎ ) বিচ্ছিন্নসম্প্রদায় হইয়াছে, হে পরন্তপ! আপনার বিপক্ষগণকেই পর কহে, যে ব্যক্তি স্বীয় শৌর্য্য, তেজঃ ও প্রতাপ

দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় সেই পরকে তাপিত করেন, তাহাকেই পরন্তপ কহা যায়, পরন্তপ শব্দের অর্থ শত্রুতাপন ॥ ২ ॥

---

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ

ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—অদ্য ময়া সএবায়ং পুরাতনো যোগঃ তে প্রোক্তঃ হি ( যস্মাৎ ) ত্বং মে ভক্তঃ সখা চ অসি, এতৎ ( চ ) উত্তমং রহস্যং ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—অদ্য আমি তোমাকে সেই এই পুরাতন যোগ বিষয়ে উপদেশ দিলাম। কারণ তুমি আমার ভক্ত এবং সখা এবং এই যোগ-রূপবিষয়ও একটী পরম উৎকৃষ্ট রহস্য ॥ ৩ ॥

ভাষ্য।—দুর্ব্বলানজিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য নষ্টং যোগমিমমুপলভ্য লোকং চ অপুরুষার্থসম্বন্ধিনং সএবায়মিতি।

সত্রবায়ং ময়া তে তুভ্যং অদ্য ইদানীং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ভক্তোঽসি মে সখা চাসীতি রহস্যং হি যস্মাদেতদুত্তমং যোগোজ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অজিতেন্দ্রিয় ও দুর্ব্বল পুরুষগণকে প্রাপ্ত হইয়া এই যোগ নষ্ট হইয়াছে এবং এক্ষণে সকল ব্যক্তিই ( প্রায় ) অপুরুষার্থতেই নিযুক্ত হইতেছে দেখিয়া আমি সেই এই যোগ ইত্যাদি। অদ্য ( ইদানীং ) সেই এই পুরাতন যোগ বিষয়ে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিলাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত এবং সখা এবং এই জ্ঞানরূপ যোগও উৎকৃষ্ট রহস্য ॥ ৩॥

---

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতোজন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—ভবতো জন্ম অপরং (পশ্চাদ্ভূতং), বিবস্বতঃ জন্ম পরং ( পূর্ব্বভূতং ), ত্বমাদৌ প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—অর্জ্জুন কহিলেন, আপনার জন্ম পরে হইয়াছে, 'বিবস্বান্' সূর্য্যের জন্ম ( তাহার বহু ) পূর্ব্বে হইয়াছে, আমি কি প্রকারে বুঝিব যে আপনি সূর্য্যকে এই যোগ বিষয়ে পূর্ব্বে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ? ॥ ৪ ॥

ভাষ্য।—ভগবতা বিপ্রতিষিদ্ধমুক্তং ইতি মা ভূৎ কস্যচিৎ বুদ্ধিরিতি চোদ্য-মিব কুর্ব্বন্ ( অর্জ্জুন উবাচ ) অপরমিতি। অপরমর্ব্বাগ্ বসুদেবগৃহে ভবতো

জন্ম, পরং পূর্ব্বং সর্গাদৌ জন্ম উৎপত্তিবি বস্বত আদিত্যস্য তৎ কথমেতদ্বিজানীয়াং অবিরুদ্ধার্থতয়া যস্ত্বমেবাদৌ প্রোক্তবান্ ইমং যোগং স এব ত্বমিদানীং মহ্যং প্রোক্তবানসীতি ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ভগবান্ যাহা বলিলেন তাহা মিথ্যা এই প্রকার বুদ্ধি কাহারও না হউক, এই কারণ ঐ প্রকার (বৃথা বুদ্ধির) পরিহারার্থ অর্জ্জুন আশঙ্কার ছলে বলিতেছেন, অপরমিত্যাদি।

তোমার জন্ম বসুদেবের গৃহে হইয়াছে, (সুতরাং উহা) অপর (অর্থাৎ) পরবর্ত্তী এবং বিবস্বান্ (অর্থাৎ) আদিত্যের জন্ম পর (অর্থাৎ) পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রথম সময়ে হইয়াছে, সুতরাং আমি কি প্রকারে ইহা অবিরুদ্ধার্থ বলিয়া বুঝিব যে, যে তুমি পূর্ব্বে এই যোগ বিষয়ে (আদিত্যকে) উপদেশ দিয়াছিলে, সেই তুমিই অদ্য আমাকেও (সেই যোগবিষয়ে) উপদেশ প্রদান করিতেছ ॥ ৪ ॥

---

শ্রী ভগবান্ উবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন! তব মে (মম) চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি (অতিক্রান্তানি), অহং তানি সর্ব্বাণি (জন্মানি) বেদ (জানামি), হে পরন্তপ, ত্বং ন বেত্থ (জানাসি) ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন, তোমার এবং আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সকল জন্মের বিষয় অবগত আছি, কিন্তু হে পরন্তপ, তুমি তাহা জানিতে পারিতেছ না ॥ ৫ ॥

ভাষ্য।—যা বাসুদেবে অনীশ্বরাসর্ব্বজ্ঞাশঙ্কা মূর্খাণাং তাং পরিহরন্ শ্রীভগবানুবাচ যদর্থো হ্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ বহূনীতি।

বহূনি মে মম ব্যতীতানি অতিক্রান্তানি জন্মানি তবচ হে অর্জ্জুন, তান্যহং বেদ জানে সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ জানীষে, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিপ্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ, অহং পুনর্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাৎ অনাবরণজ্ঞানশক্তিরিতি বেদাহং, হে পরন্তপ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—মূর্খগণের, বাসুদেবের উপর যে অনীশ্বর ও অসর্ব্বজ্ঞ, এই প্রকার (বিপরীত) বুদ্ধি আছে, তাহাকে নিরাকরণ করিবার জন্য

ভগবান্ বলিতেছেন যে, বহূনীত্যাদি। এই জন্যই অর্জ্জুনেরও প্রশ্ন হইয়াছিল। আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত ( অতিক্রান্ত ) হইয়াছে, হে অর্জ্জুন, আমি সেই সকল জন্ম বিষয়ে অবগত আছি, তুমি ( কিন্তু ) হে পরন্তপ, তাহা জানিতেছ না। তাহার কারণ এই যে, তোমার জ্ঞান-শক্তি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা প্রতিবদ্ধ; নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব নিবন্ধন আমার জ্ঞানশক্তিতে কোন প্রকার আবরণ নাই, এই কারণ আমি সকল বিষয়ই জানিতেছি। হে পরন্তপ ॥ ৫ ॥

---

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—অজঃ ( জন্মরহিতঃ ) অব্যয়াত্মা ( অবিনাশিস্বভাবঃ ) ( তথা ) ভূতানাং ঈশ্বরঃ সন্ অপি স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—আমি জন্মহীন অবিনাশিস্বভাব ও প্রাণিনিবহের নিয়ন্তা হইয়াও নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আত্মমায়ার বশে জন্ম লাভ করিয়া থাকি ॥ ৬ ॥

ভাষ্য।—কথং তর্হি তব নিত্যেশ্বরস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবেঽপি জন্মেত্যুচ্যতে অজোঽপীতি। অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সন্, তথা অব্যয়াত্মা অক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবোঽপি সন্, তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং ঈশ্বরঃ ঈশনশীলোঽপি সন্, প্রকৃতিং স্বাং মম বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্ব্বং জগদ্বর্ত্ততে, যয়া মোহিতং সৎ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি, তাং প্রকৃতিং স্বাং অধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সংভবামি দেহবান্ ইব ভবামি জাতইব আত্মমায়য়া আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—তুমি নিত্যেশ্বর, তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলেও কি কারণে তবে জন্ম হইয়া থাকে? এই প্রকার আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন যে, অজোঽপীতি। অজ ( অর্থাৎ ) জন্মরহিত ( এবং ) 'অব্যয়াত্মা' অক্ষীণ-জ্ঞানশক্তিস্বভাব, ( অর্থাৎ যাহার বিজ্ঞানশক্তিস্বরূপস্বভাব কোন কালেই ক্ষীণ হইতে পারে না, তাহাকেই অব্যয়াত্মা বলা যায় ), এবং ব্রহ্ম হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতনিবহের ঈশ্বর ( অর্থাৎ ) নিয়মকারী হইয়াও, আমি নিজ বৈষ্ণবী শক্তিকে বশীভূত করিয়া আত্মমায়াবশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, ( অর্থাৎ ) জন্মগ্রহণানন্তর দেহাভিমানী জীবের ন্যায় ব্যবহার

করিয়া থাকি। বাস্তবপক্ষে জীবের ন্যায় আমার জন্ম সত্য নহে, যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, যাহার বশে সকল জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহার দ্বারা মোহিত হইয়া জীবজগৎ আত্মার স্বরূপ বাসুদেবকেও জানিতে পারে না, সেই বৈষ্ণবী মায়াই আমার প্রকৃতি॥ ৬॥

---

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭॥

অন্বয়।—হে ভারত! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি (তথা) অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং ভবতি, তদা অহং আত্মানং সৃজামি॥ ৭॥

মূলানুবাদ।—হে ভারত! যে যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়েই আমি (মায়াবশে) আত্ম-দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকি॥ ৭॥

ভাষ্য।—তচ্চ জন্ম কদা কিমর্থঞ্চেতুচ্যতে যদেতি। যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্হানিঃ বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্য ভবতি, ভারত! অভ্যুত্থানং উদ্ভবোঽধর্ম্মস্য তদা আত্মানং সৃজাম্যহং মায়য়া॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই জন্ম, কোন্ সময়ে কি কার্য্যের জন্য হইয়া থাকে, তাহাই বলা হইতেছে যে যদা ইত্যাদি; যে যে সময় বর্ণ ও আশ্রমরূপ, প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও মোক্ষের সাধন ধর্ম্মের গ্লানি (অর্থাৎ) হানি হয়, হে ভারত, এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান (অর্থাৎ) উদ্ভব হয়, তখনই আমি মায়াবশে আত্মদেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকি॥ ৭॥

---



পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮॥

অন্বয়।—(অহং) সাধূনাং পরিত্রাণায় (তথা) দুষ্কৃতাং বিনাশায় চ (তথা) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে (প্রতিযুগং) সম্ভবামি (মায়য়া দেহবানিব ভবামি)॥ ৮॥

মূলানুবাদ।—সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্য আমি যুগে যুগে দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকি॥৮॥

ভাষ্য।—কিমর্থং পরিত্রাণায়েতি। পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায় সাধূনাং সন্মার্গস্থানাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং পাপকারিণাম্ কিঞ্চ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় ধর্ম্মস্য সম্যক্ স্থাপনং তদর্থং সংভবামি যুগে যুগে প্রতিযুগং॥ ৮॥

# পরলোকবাদ।

স্বামী সারদানন্দ লিখিত।] [৪২২ পৃষ্ঠার পর।

পরলোক বিশ্বাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের " আমরা দেখিয়া আসিলাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বক্তব্য কি তাদের এখন বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বলেন- ...ার আধিপত্য বিকাশের পশ্চাতে ইচ্ছাময় দেবতা সকলের কল্পনা। তখন বিজেতাদলের বিশ্বাস স্রোত পরিবর্দ্ধিত ও পূর্ণকায় হইতে পারে, ...র পূজনীয় হইতেন। নিমিত্ত স্থানান্তরে অন্বেষণ করিতে হইবে। মানবের অন্ত... স্পষ্টই প্রমাণিত ভালবাসাতেই উহার মূল নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ... বিশ্বাস কাল ব্যাপিয়া মানুষ বিশেষশক্তিসম্পন্ন মানবের পূজা ও উপা...তে করিয়া আসিতেছে। আবহমানকাল ব্যাপিয়া সংশয়াত্মার গর্ব্বিত মস্তক বীর...র ও বীরনারীর চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়াছে। নামরূপলোপকারী কালাম্বুধির সিকতাভূমিতে তাঁহাদের চরণচিহ্নই শ্রান্ত ভ্রান্ত মানবের একমাত্র জীবনাশ্রয়। এ বীরোপাসনার মূল কোথায়? কোথা হইতে মানুষ সমেন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমশক্তিক অপর এক মনুষ্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে এবং তাঁহার কথায় জীবন মরণ পণ করিতে শিখিল? বলিতে পার—জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি বা অন্য কোন এক বা অধিক মানসিক শক্তিতে মোহিত ও স্তম্ভিত হওয়াই ইহার কারণ। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, ভালবাসাই ইহার মূল। এই অনিত্য অসুখময় স্বার্থজীবন জগতে মানুষ ভালবাসারই কাঙ্গালী। কণমাত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসাতেই কষ্টপ্রদ দাসত্ব-শৃঙ্খলও সুখের বলিয়া পরিধান করে। ভালবাসার মন্দিরেই হৃদয় মন, প্রাণ, সর্ব্বস্ব ইচ্ছায় উৎসর্গীকৃত করে। সমাজসংস্কারক! তুমি ভাবিতেছ, কেন তোমার যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ বাক্য সকল সহস্র চেষ্টাতেও সমাজমনে প্রবিষ্ট হইতেছে না। ধর্ম্মনেতা! তোমার অশেষ উদ্যমেও সমাজে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইতেছে না দেখিয়া, তুমি রুষ্ট ও ভগ্নোদ্যম হইতেছ। রাজনীতিজ্ঞ! তোমার জিহ্বা ও লেখনী নীরব নহে, অথচ কোন ফলই পাও না। শিক্ষক! তোমার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যেও ছাত্রদিগের মন ভিজিতেছে না। কারণ কি? ইহা কি কালের বিপরীতগতি অথবা

অদৃষ্ট অথবা জগৎ উন্মত্ত হইয়াছে? অনুসন্ধান কর, দেখিবে জগৎ যেমন তেমনিই আছে; কিন্তু নিজের ভিতর এক বৃহৎ অভাব বর্ত্তমান। আর এই এক অভাবই সমস্ত শ্রম পণ্ড করিতেছে। সে অভাব আর কিছুই নহে; স্বার্থগন্ধহীন যথার্থ ভালবাসা, যাহা জগতের গুরুপদবাচ্য বীরনর ও বীরনারীর মানসিক গঠনের প্রধান উপাদান। এ কথা শুনিয়া হয়ত কেহ কেহ হাসিবেন। বলিবেন, তবে কি জগতে সত্যের উপাসক কেহ নাই, ছিল না, ে াকিবে না। ভালবাসার মোহনরবে মুগ্ধ হইয়া, তবে কি ভ্রম প্র সত্য সমূহকে সত্যামৃত বলিয়া গলাধঃকরণ করিতে হইবে? ক শুনিতে আপাততঃ অতীব মনোহর ও যুক্তিগর্ভ। কিন্তু .ের প্রধান সাধন অন্বেষণ করিয়া দেখিলে কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ভি পর কোথায় পাওয়া যায়? মাধ্যাকর্ষণ, ক্রমবিকাশ, জড় ও শক্তির বিনাশিতা এবং এক শক্তির শক্ত্যন্তরপরিণমন প্রভৃতি জড় বিজ্ঞানের তত্ত্ব সমূহ, দেশকালনিয়ততরঙ্গান্বিত চিত্তপ্রচার, এক চিত্তের চিত্তান্তরে শক্তিসংক্রামিতা, সংযমসহায়ে মানসিক এক শক্তির ভিন্নরূপে পর্য্যবসান, মনোনিরোধ বা সমাধিসাধনে দেশকালাতীত শুদ্ধসত্ত্বে বর্ত্তমানতা প্রভৃতি অন্তর্বিজ্ঞানের গভীরতর তত্ত্বনিচয়ও মানবমনের তত্তৎ বিষয়ে স্বার্থশূন্য অনুধ্যানেই কি আবিষ্কৃত হয় নাই? দেশকালের রাজত্বে যথার্থ অনুরাগই সত্যলাভের প্রধান সাধন। আবার দেশকালের পারে যদি তোমার দৃষ্টি ছুটিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে দেখিবে এবং বুঝিবে "সত্যম্ জ্ঞানমানন্দম্ ব্রহ্ম"—সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ তিনে এক এবং একে তিন। যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞান এবং তাহাই আবার আনন্দ; এবং দেশকালমধ্যগত সত্য, জ্ঞান এবং অনুরাগ সেই অপার আনন্দের আংশিক বিকাশমাত্র।

বীরনরনারীর পূজার কথা দূরে থাকুক। তাঁহাদের লোকাতীত প্রেম বজ্রের ন্যায় আপন বলে অভিমান-শৃঙ্গের মস্তক চূর্ণ করিয়া মানবহৃদয়ে ভক্তি ও পূজার প্রস্রবণ খুলিয়া দিবে—সমাজের স্রোত পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যদিকে প্রবাহিত করিবে—নাস্তিক অবিশ্বাসী ও দাম্ভিকের মস্তক তাহাদের ইচ্ছার বিপরীতেও নত করিয়া লইবে। থাকুক এখন সে সকল দেবাগ্রণী ভগবৎপ্রতীম নরনারীর কথা। ইতিহাস সহায়ে কালের নিবিড় যবনিকার অন্তরালে যতদূর দৃষ্টি করি, ততদূর মানব মানবের পূজা করিতেছে দেখিতে পাই। বহু প্রাচীন কালে মনুষ্য সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল-

বিভক্ত ছিল। আদিম দলপতি চন্দ্র সূর্য্য বা বিশেষ কোন শক্তিমান্ পদার্থের ঔরসজাত এ বিশ্বাস সকল দলে সকল দেশেই সমভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের চন্দ্রসূর্য্যবংশোদ্ভব রাজাগণ, ইংলণ্ডের সূর্য্যপুত্র ড্রুইদ-দল এবং মিশর, জাপান, নরওয়ে ও আমেরিকার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এ বিষয় সপ্রমাণ করে। প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য দেবতা ছিল। যখন এক দল অপর দলকে পরাভূত করিত, তখন বিজীত দলের নাম লোপ হইয়া বিজেতাদের দল পুষ্ট হইত। এইরূপে এক দল অন্য অনেক দলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতঃ, ক্রমে এক এক জাতির সৃজন। তখন বিজেতাদলের উপাস্য দেবতাও দেব-দেব উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সকলের পূজনীয় হইতেন। বাইবেল পাঠে এইরূপে য্যাভে দেবতার দেব-দেবত্ব-প্রাপ্তি স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। আর এক কথা, এই সকল ক্ষুদ্র দলের প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস ছিল যে, সে তাহার দলপতির বংশজাত। সকলে এক পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন ও এক পরিবার কেবল কালে বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছে মাত্র এই বিশ্বাসই আবার উক্ত দলের ভিতর গাঢ় একতাবন্ধন সহানুভূতি এবং দলপতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মাইবার হেতু হইত। ঐ শ্রদ্ধা ভক্তিই আবার দেহান্তে ঐ সকল দলপতির পূজার নিমিত্ত মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইত। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃলোকের উপাসনা সকল দেশে প্রচলিত। জাপানের সিণ্টো-ধর্ম্ম এইরূপেই উপস্থিত হয়। রাজা প্রজা সকলেই একবংশোদ্ভূত—রাজা কেবল তাহাদের দলপতি এবং আদিপিতার নিকট বংশধর, এই বিশ্বাসই জাপাননিবাসীদিগকে প্রত্যেক রাজার সমাধির উপর বিশাল মন্দির এবং ভোগরাগাদির বন্দোবস্তে প্ররোচনা জন্মায়। মিসরের বিস্ময়জনক পিরামিদ্ মন্দির এবং আমাদের পিতৃ পক্ষে তর্পণ শ্রাদ্ধাদি এবং সমাধিস্থলে শিবস্থাপনা প্রভৃতি এই পিতৃউপাসনার পরিচায়ক। বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দলপতি, জীবৎকালে যাহার দয়া দাক্ষিণ্য বলবীর্য্য প্রভৃতি গুণনিচয় হৃদয় মনকে আকর্ষিত করিয়া পূজা করাইত, দেহান্তে তিনি যে আদৌ থাকিলেন না, নিজদলের মঙ্গলামঙ্গলের সহায়তা করিতেছেন না, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা একথা মানবমনে কথনই স্থান দানে সমর্থ নয়। জগতের ধর্ম্মেতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতে কোনরূপ উপাসনা প্রচলনের পূর্ব্বে এই পিতৃউপাসনা বিশেষরূপে প্রচলিত। কোনরূপ দেব দেবীর উপাসনা শিখিবার পূর্ব্বেই, হৃদ্গত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মানবকে

তাহার পূর্ব্বপুরুষদের উপাসনা করিতে শিখিয়াছে। অতএব পরলোক-বিশ্বাস স্রোত যে এই পিতৃউপাসনা দ্বার দিয়া ভালবাসা হইতে সমুত্থিত, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

পিতৃউপাসনার উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া আমরা তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মতানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। পিতৃউপাসনার মূল যে কেবল এই আলোকাঁধারের সম্মিলনভূমি কল্পনারাজ্যে, এ কথা জগতের ধর্ম্মেতিহাস সপ্রমাণ করে না। মিসরের ইতিবৃত্তপাঠে অবগত হই, পিতৃপুরুষদের 'কা' নামক সূক্ষ্মশরীর জীবিতসম্মুখে আবির্ভূত হইতেছে, ভোগ-রাগ দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছে, সম্মান উপাসনা না করিলে 'ধ্বংস করিব' বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত সপ্তম ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্দালক আরুণি রাজা জনকের সভায় ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতেছেন, মদ্রনিবাসী পতঞ্চলপুত্র কাপ্যের বনিতাতে গন্ধর্ব্বের আবেশ হইয়াছিল এবং ঐ গন্ধর্ব্ব যাজ্ঞিকদিগকে গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্ন সকলের জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিয়া দিয়াছিল। অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থেও এইরূপ প্রেতাত্মার আবির্ভাব পাঠ করা যায়। অপবিত্র মনের নিকট যেমন দুষ্কৃতকারী অশুচি প্রেতাত্মা সম্মুখীন হয়, সেইরূপ পবিত্র মানবের সম্মুখে শুচি শুভকারী প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানপ্রধান ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমূহেও এ বিষয়ের অনেক অনুসন্ধান হইতেছে এবং অনেকে প্রেতাত্মার সন্দর্শনে পরলোকাস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হইতেছে। দেশীয় ও বিদেশীয় কয়েকজন ধীর বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রিয় বন্ধুও লেখককে বিশ্বস্তসূত্রে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রেতাত্মার সন্দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছেন। প্রেতাত্মার যথার্থ সন্দর্শনেই হউক, অথবা ভক্তি ভালবাসা প্রণোদিত ছায়াময়ী কল্পনা সহায়েই হউক, মানবমনে পরলোকবিশ্বাস-বীজ প্রথম উৎপন্ন হয়, ইহাই দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মত।

শেষ শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন, পুরাণেতিহাস অবলম্বনে মানবসৃষ্টির সর্ব্বাদিস্তর স্পর্শ করা কখনই সম্ভবপর নয়। যদি শিক্ষা ও কর্ম্ম সহায়ে মানবের উন্নতি ও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিনিচয়ের ধীর বিকাশ যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শত শত বর্ষ যে সে পিতৃউপাসনা বা জড় ও জড়শক্তিতে ইচ্ছাময় চৈতন্যারোপপূর্ব্বক তত্তৎ পদার্থের উপাসনা না করিয়া দিন যাপন করিয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। পরলোকবিশ্বাসবীজ

কি তৎসময়ে তাহার মনে বিন্দুমাত্রও ছিল না বা উক্ত বিশ্বাস থাকিবার কোনরূপ কারণ কি আমরা এখান হইতে দৃষ্টিগোচরে আনিতে পারি না? এমন কোন বৃত্তি কি মানবমনে বিদ্যমান্ দেখি না, যাহা তখনও যেমন, এখনও সেইভাবে বর্ত্তমান এবং তাহা হইতে কি এ বিশ্বাস বীজ বিকশিত হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাই না? দূরগামী কল্পনাবাহনে তৎকালীন মানবমনে নিদ্রা, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার নূতনত্ব অলৌকিকত্ব এবং গুরুত্বের বিষয় ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বে প্রলয়ান্তে প্রথম সৃষ্টিবিকাশ একবার শাস্ত্র সহায়ে আলোচনা করা যাউক।

প্রলয়নিশা অবসানপ্রায়। জলধির অবাতক্ষুব্ধ স্তিমিত সলিলরাশির ন্যায় বিচিত্রনামরূপধারী মায়া বা সৃজনী শক্তি এক্ষণে অপ্রতর্ক অবিজ্ঞেয় প্রসুপ্তনায় অবস্থিত, দেশকালাবলম্বনে নিয়ত ঘূর্ণায়মান অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড সমূহের গতিজনিত গগণব্যাপী স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষ এখন স্থির, শান্ত, ও নিস্তব্ধ। রূপরসাদির মোহন স্পর্শ নীরব ও কারণলীন। দেশ কালের প্রচার নাই। ভূত ভবিষ্যৎ অনন্ত বর্ত্তমানে শয়িত। অনন্ত মন অনন্ত সমাধিমগ্ন। লীলাময়ের লীলাবিলাসে, সহসা চেতনের কোমলস্পর্শে প্রকৃতিশক্তি কম্পিত ও জাগরিত হইল। স্পন্দনবাত এক হইতে দুই, দুই হইতে বহুভাব, ধারণ করিল। দেশ কাল এবং কার্য্যকারণ-ধারা প্রবাহিত হইল। ক্রমে কম্পন হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ বা পদার্থের তরলীভূত অবস্থা এবং তাহা হইতে ক্ষিতি বা পদার্থের দৃঢ়কঠিনাবস্থার ক্রমবিকাশ উপস্থিত হইল। যুগের পর যুগ ছুটিল— অনন্ত গগণ নিত্য নূতন নূতন গ্রহ নক্ষত্র সূর্য্য খচিত হইতে লাগিল। তাহার কতকাল পরে, আবার শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা নীহারাবগুণ্ঠনে সুন্দর সাজে প্রথম মানবকে কোলে লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বায়ু, তেজ প্রভৃতি জাগতিক শক্তিনিচয় কখন কোমল, কখন বা কঠোর স্পর্শে, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব এবং অভাব বোধ করাইয়া মানব শিশুর শিক্ষা এবং বৃত্তিবিকাশ-কার্য্য গ্রহণ করিল। অভাব বোধে উদ্যমের আবির্ভাব হইল। আবার উদ্যমের অবসানে দিনান্তে সুখময়ী নিদ্রা আসিয়া বাহ্য জগতের নামরূপাবরণকারী নিশার ন্যায় নবীন মানবের অন্তর্জগতের বৃত্তি সমুদায় মোহময় আবরণে আবরিত করিল। তখন কোথায় বা মনঃ-প্রচার, কোথায় বা ইন্দ্রিয়-প্রচার—স্মৃতি বুদ্ধি প্রভৃতি

সমস্ত স্তব্ধ নিস্পন্দ রহিল এবং ভিতরে চেতন পুরুষ, যিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় সহায়ে এতক্ষণ বাহিরের রূপরসাদি অনুভব করিতেছিলেন, যেন কোন এক নূতন রাজ্যে উপনীত হইলেন। সে রাজ্যের অধীশ্বরী ছায়া-কায়া স্বপ্ন দেবী। কুহকিনী বাসনা এবং কল্পনা তাঁহার চিরসঙ্গিনী। দেশ, কাল, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি নিয়ম সকল তাহাদের মোহন রবে ও মধুর স্পর্শে ঘূর্ণিত, আকুঞ্চিত, প্রসারিত এবং কখন বা এককালে লুপ্ত হইয়া যায়। তাহাদের ইঙ্গিতে বায়সকণ্ঠে শুদ্ধ তান লয় সমুদিত হইয়া প্রাণ মোহিত করে, কুরূপ স্বরূপ, অলব্ধ লব্ধ এবং অসম্ভবও কোথা হইতে সম্ভবপর অনুভূত হয়, আবার কখন বা সামান্য পিপীলিকা দংশনও ব্যাঘ্রাদি-আক্রমণের ন্যায় ভীষণ প্রতীয়মান হইয়া আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। নিদ্রাভঙ্গে এ সকল ছায়ার শাসন কোথায় লুকায়, তাহার কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সকলই অলীক ইন্দ্রজালতুল্য প্রতীয়মান হয়। এইরূপে নিদ্রার পর জাগরণ এবং জাগরণের পর নিদ্রার অধিকার প্রবাহ আসিয়া উপস্থিত হয়। জাগরণ সময়ে স্বপ্নস্মৃতি আসিয়া আবার নবীন মানবকে চিন্তান্বিত করে। সে ভাবিতে থাকে—রাত্রিকালে যে সকল সুন্দর দেশে ভ্রমণ করিলাম, সুন্দর নরনারীর সহিত আলাপ করিলাম, সুন্দর বা ভীষণ দৃশ্য সমূহ দর্শন করিলাম, সে সব কোথায়, কোন রাজ্যে। স্বভাবতঃ সত্যপ্রিয় ও বিশ্বাসপ্রবণ তাহার হৃদয়ে একথা তখন উদিত হয় না যে, সে সকল অলীক কল্পনাপ্রসূত। সে ভাবে জাগরণ কালের দৃশ্যানুভূত পদার্থ সমূহের ন্যায় সে সকলও সত্য—কোন না কোন স্থানে আছে, যথায় সে কোন প্রকারে উপনীত হইয়াছিল। ইহলোকে সে সকল দেখিতে না পাওয়ায় তাহার মনে সহজেই উদয় হয় যে, তবে দৃশ্যমান এই লোক ভিন্ন অপর একটা আছে, যথায় সে সময়ে সময়ে গমন করিয়া থাকে। এইরূপে স্বপ্নানুভূত বিষয় সমূহ হইতেই পরলোকে বিশ্বাস তাহার মনে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত, বৰ্দ্ধিত ও কালে দৃঢ়প্রোথিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত তিন মতের মধ্যে বিচার করিতে হইলে স্বপ্নদৃশ্যজগৎ হইতে মানব মনে পরলোক বিশ্বাসের বীজবিস্তার যুক্ততর এবং সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তবে এই প্রকারে বিশ্বাসবীজ অঙ্কুরিত হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় মতোক্ত প্রকারে যে ইহা কালে বৰ্দ্ধিত ও পুষ্টকায় হইয়াছে, এবিষয়ে সন্দেহ থাকে না। [ ক্রমশঃ ]

# আদর্শ ও বাস্তব।

স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত।

মানুষের আশা অনেক, মানুষ চায় অনেক। মনুষ ধরাকে স্বর্গ করিতে চায়, আপনাকে দেবতা, এমন কি, ঈশ্বর করিতে। চায় পদে পদে সে তাহার বিপরীত দেখিলেও, পদে পদে সে ভগ্নাশ হইলেও, তাহার আশার নিবৃত্তি হয় না। কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ, কিন্তু এ আশা বুঝি শ্বাস বিগত হইলেও যায় না; দেহ ভস্মধূলিতে পরিণত হইবার পরও বুঝি সেই ধূলিরাশি হইতে উত্থিত হইয়া আত্মা কি একটা অনন্ত আকাঙ্ক্ষায় আবার নবোদ্যমে নব কলেবর পরিগ্রহ করে। মানুষ তুঙ্গগিরিশৃঙ্গযাত্রী পথিক। পর্ব্বতের এক শৃঙ্গে উঠিলে দেখিতে পায়, সম্মুখে আর এক শৃঙ্গ। এইরূপে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ—অতি দূরে সেই সুধা-ধবল হিমানীমণ্ডিত অভ্রভেদী সর্ব্বোচ্চ চূড়া—যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় অথবা স্বপ্নের ন্যায়—যেন স্বর্গের সহিত—কি এক গভীর রহস্যময় রাজ্যের সহিত—মিশিয়া রহিয়াছে। পথিক তাহাই দেখে—তাহার মনোহারিত্বে কখন আনন্দে নাচিয়া উঠে, আত্মহারা হয়, আবার কখন বা তাহার অনধিগম্যত্ব কল্পনা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হয়। অথবা সে যেন উত্তর-পশ্চিম পথের (North-West Passage) আবিষ্কারক-পদাকাঙ্ক্ষী। কত সুবৃহৎ অর্ণবপোত, কত নরনারী এই দুরাকাঙ্ক্ষাবশে তুষারপ্রদেশে তুষারসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে, কে বলিতে পারে? তবু অপরে সেই সুনিশ্চিতমৃত্যু প্রদেশে যাইতে উদ্যত। ইহাই মানব জীবনের গভীর প্রহেলিকা। ইহা কি আলেয়ার অনুসরণ অথবা বিকট উন্মত্ততা? মানবজীবন কি বিয়োগান্ত নাটক—না মিলনান্ত? অথবা গভীর মহাশূন্যে মহানির্ব্বাণই জীবনের সুনিশ্চিত ও পরম-প্রার্থনীয় পরিণতি?

মানুষ, আশাসম্বল মানুষ, এ গভীর প্রশ্নের উত্তর দাও। ইহার উত্তরেই তোমার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

মানুষের দুটী চক্ষু ছাড়া আর একটী চক্ষু আছে। সেই চক্ষু সকলেরই আছে, তবে অল্পাধিক প্রস্ফুটিত। সেই চক্ষে মানুষ বর্ত্তমানের ঘন কুহেলিকা ভেদ করিয়া ভবিষ্যতের গভীরগর্ভস্থ রত্নরাজি অবলোকন করে ও তৎপ্রতি তৃষান্বিত হয়। আর এই দুইটী চক্ষু? এই দুইটী দেখে—

বর্ত্তমান, দেখে—কেবল সম্মুখদেশের ক্ষুদ্র অংশ, আর তাহাকেই বাস্তব বলিয়া অতি যত্নে পোষণ করে। কিন্তু কে বলিতে পারে—আজ যাহা ভবিষ্যৎ, কাল তাহা বর্ত্তমান হইবে না? কে বলিতে পারে—আজ যাহা প্রার্থনীয় রহিয়াছে, কাল তাহা লব্ধ হইবে না? কে বলিতে পারে—আজ যাহা 'দূরাৎ সুদূরে' কাল তাহা 'তদিহান্তিকে চ' হইবে না?

জগতের ইতিহাস—অল্পসংখ্যক স্বপ্নদ্রষ্টার ইতিহাস। ঈশা, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, চৈতন্য আদি এক এক জন স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁহাদের স্বপ্ন—লক্ষ লক্ষ জাগ্রদভিমানিগণের কার্য্যের প্ররোচক। তাঁহারা স্বপ্নে ভবিষ্যতের চিত্র দেখেন, দেখিয়া তাহাই উচ্চরবে ঘোষণা করেন। তাঁহাদের মত যোগনিদ্রার আবেশ যাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণে আসিয়াছে, তাঁহারাই সেই স্বপ্নগুলির কিয়ৎ পরিমাণ মর্ম্ম উদ্ঘাটন করেন—করিয়া জনসাধারণের ভাষায় জনসাধারণকে প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা অন্ততঃ তাঁহাদের সময়ে উন্মত্ত বিবেচিত, উপেক্ষিত, ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ বা নাস্তিকাপবাদে উপহসিত।

তাই সময়ে সময়ে চিত্তে সংশয় হয়—স্বপ্ন বেশী বাস্তব, অথবা এই বাস্তব বলিয়া প্রতীত বস্তু সমুদয়ই বাস্তব? তোমার যাহা ভাল লাগে তাহাকে তুমি বাস্তব বলিয়া, আর সকলকে আদর্শ, কাল্পনিক বা আকাশকুসুম নামে অভিহিত করিয়া থাক। তোমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই প্রাকৃতিক, সম্ভব, সহজাবস্থা, আর সব অপ্রাকৃতিক, অসম্ভব, কৃত্রিমাবস্থা—তুমি এ বিভাগপ্রণালী কোথা হইতে শিখিলে? স্বার্থমলিন মনোমুকুরে সত্যসূর্য্য কখনই প্রতিভাত হইবে না। আমার যাহা লাভের শক্তি নাই, তাহা অসম্ভব নহে। বরং 'অসম্ভব' শব্দটীকে প্রাজ্ঞদিগের অভিধান হইতে উঠাইয়া দিয়া কার্য্য কর, দেখ, জগতে কি যুগান্তর উপস্থিত হয়!

ঐতিহাসিক, প্রকৃত জগতের ইতিহাসের তত্ত্ব বল দেখি, প্রাণিতত্ত্ববিৎ, প্রাণিগণের স্বরূপতত্ত্ব বল দেখি, আর যেখানে যত প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আছ, সকলেই স্ব স্ব বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দেও দেখি, কেমন আদর্শের উপর বিশ্বাস, আদর্শকে বাস্তব বলিয়া বিশ্বাস হয় কি না?

সকলের উপর, হে ক্রমোন্নতিবাদিন্, তোমার কি সাক্ষ্য? ক্রমোন্নতির গতি কি এক স্থানে স্থগিত হইয়া যাইবে? না, তা ত কখনই হইতে পারে না। যত উন্নতি, তত গতি, তত বেগে গতি, তত অতৃপ্তি, তত আকাঙ্ক্ষা—পরমাদর্শে পরিণতিতেই শান্তি।

আর হে বিভিন্ন জগদ্বিশ্লেষণকারী পণ্ডিতগণ! যেখানে কোন ঘটনা প্রাণের এই গভীর আকাঙ্ক্ষার—প্রাণের এই সুস্পষ্ট ধ্বনির অনুমোদন না দেয়, সেখানে গর্ব্বিত না হইয়া নিউটনের সহিত সমস্বরে বিনীতভাবে বল, 'আমার অজ্ঞাত ঘটনা এখনও অনেক আছে—জ্ঞাতের সহিত তুলনায় অজ্ঞাতই সব।' সেই সামান্য জ্ঞাত ঘটনার প্রমাণে এই সার্ব্বজনীন হৃদয়োত্থিত ধ্বনির অপলাপ করিও না।

উন্নতি—উন্নতিই জগতের নিয়ম। গতিই জীবন, স্থিতিই মৃত্যু। গতিশীল আক্রমণকারীর ন্যায়, নিজ ভূমিতে দৃঢ় বলিয়া আক্রমণে সাহসী; আর স্থিতিশীলের নিজভূমি-রক্ষণেই সমস্ত শক্তির বিনিয়োগে দুর্ব্বলতার পরিচয়।

আদর্শ অবস্থালাভ সম্ভব—এই দৃঢ়বিশ্বাসই সকল বিশ্বাসের মূল। এই বিশ্বাস যাহার আছে, তাহার সব আছে; যাহার নাই, তাহার কিছুই নাই। আদর্শ অবস্থা লাভ সম্ভব—অবশ্যই সম্ভব। কোটি কোটি পরাজয়ও আদর্শলাভের অসম্ভবনীয়তার উদাহরণ হইতে পারে না। জগতে মহাপুরুষ, ঈশ্বরাবতারগণ আসিয়া এই আদর্শাবস্থা দেখাইয়া যান—দেখাইয়া যান, "দেখ, দেখ সকলে, আমি এই অবস্থা লাভ করিয়াছি :—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং।'

আমি পাপ তাপ মৃত্যু দুর্ব্বলতা সকলকেই পরাজয় করিয়াছি। আমি মৃত্যুঞ্জয়, আমি শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত,—শিবোঽহং শিবোঽহম্।"

---

# ভারতের জাতীয় জীবন।

( স্বামী সচ্চিদানন্দ লিখিত।)

অনন্ত জলধি বক্ষে ছোট বড় কত তরঙ্গ ওঠে, খেলা করে, আবার জলের বিম্ব জলে লয় পায়। জলরাশি-সমষ্টির সহিত ব্যষ্টি জলকণার সম্বন্ধ, কতদূর আদান প্রদান, গর্ব্বিত মানব তাহা জানিবার চেষ্টা করে না—করিবার শক্তিও নাই। জড় ছাড়িয়া উদ্ভিজ্জ জগতে আসিলে, অজ্ঞানের আবরণ ক্রমে সরিতে থাকে; এখানেও আলোয় আঁধার মিশ্রিত। প্রাণী-জগতে, পশু, বিশেষতঃ মানুষ সমাজে, একের সহিত অন্যের সম্পর্ক,

সকলের মধ্যে অন্যোন্য নির্ভরতা, প্রত্যেকের এক একটী ভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া আসা, তাহার পরিপুষ্টি ও সফলতা, শেষে অপরের মধ্যে সেই উদ্দেশ্য বিস্তার, নিজের যা কিছু ছিল পরকে দিয়া স্বার্থত্যাগজনিত সুখ-শান্তির ক্রোড়ে চির বিশ্রাম. সমষ্টির মহান উদ্দেশ্যর সহিত ব্যষ্টির সাদর পরিণয়, প্রতিপদে স্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপিত হইবে। একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকাকণা স্থানান্তরিত কর—অসীম জড়বিশ্বের গতিসামা অনন্ত কালের জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। ঐ নগন্য কীট আজ মরিয়া গেল, অতীতের কত দিন হইতে তাহার আয়োজন চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া জন্ম, শৈশবে সেই উদ্দেশ্যর সাধনোপযোগী শরীরগঠন, যৌবনে তাহার পরিস্ফুরন, বার্দ্ধক্যে তাহার বিস্তার, অন্তে কাজ সারিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ,—এই অবস্থাসমূহের একীকরণের নাম জীবন। বীজ রোপিত হইল; ক্রমে অঙ্কুর, ছোট গাছ, বড় গাছ, ডাল, পাতা; ফুল এখন ফোটে নাই, ফোটাইবে বলিয়া বৃক্ষ স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তদুপযোগী ভাবে গঠিত করিতেছে; এই বৃক্ষের শৈশবাবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা,—বৃক্ষ ফুল ফলে শোভিত, পুষ্পসৌন্দর্য্যে ভাবুকের প্রাণ আলো করিয়া, সৌরভে অরণ্যানী মাতোয়ারা, ফলদানে ক্ষুধিতের বুভুক্ষা তৃপ্ত করিয়া, বৃক্ষজীবনের উদ্দেশ্য সার্থক করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে একবীজ হইতে সহস্র, অযুত ভাবী বৃক্ষের বীজ উপ্ত; এক দিকে এক কেন্দ্রে যে উদ্দেশ্য সফলীকৃত, অন্যদিকে শত কেন্দ্রে সে উদ্দেশ্যর ভবিষ্যৎ বিস্তারের দ্বার উন্মুক্ত। অবশেষে নাশ—বৃক্ষজীবনের শেষ যবনিকা। শৈশবে আহার বিহারে স্বভাবচিহ্নিত পথে স্ব স্ব শরীর গঠন, যৌবনে আত্মরক্ষা, পরস্পরের সহিত মিত্রভাবে মিলন ও শত্রুভাবে সবিদ্বেষ সংঘর্ষণ, প্রধানতঃ সন্তানোৎপদন দ্বারা, পাশবিক কেবলমাত্র কায়িক, কুত্রাপি স্বল্পাধিক মানসিক শক্তির বিকাশ ও বিস্তার, পরবর্ত্তী পুত্রপৌত্রাদ্যপত্যবর্গে সেই শক্তির বীজ পরিচালিত করিয়া বার্দ্ধক্যে অন্তর্দ্ধান, এই সকল দেখিয়া আধুনিক চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী পশুজীবনে কোন না কোন উদ্দেশ্যর ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি নিশ্চিত বলিয়া স্থির করিতেছেন।

মানুষের মহত্ত্ব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পশ্চাৎ রাখিয়া অতীন্দ্রিয় চিত্ত ও চিদাকাশে বিচরণ করিবার শক্তিতে। পরা ও অপরা বিদ্যা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের বিষয়। অপরা বিদ্যা অনেক সময় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়া নাড়া

চাড়া করে, কিন্তু তাহার চরম উৎকর্ষ মানসিক বৃত্তির উদ্বোধনে। পরা বিদ্যা 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' সত্যে প্রতিষ্ঠিত। যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য শরীরবুদ্ধি ছাড়িয়া মন ও অধ্যাত্মজ্ঞানরাজ্যে যত দূর অগ্রসর, তিনি তত অধিক মানুষ নামার্হ।

বৈষম্যে সৃষ্টি, জীবন; সমতায় নাশ, মৃত্যু,—না অমরত্ব। আজ যদি সকল স্থানে শক্তির ওজন সমান হইত, জগতে গতি বলিয়া কিছুই থাকিত না। স্থূল প্রকৃতির পশ্চাৎ বিরাট্ মনোময় সূক্ষ্ম জগৎ অবস্থিত; তোমার, আমার প্রত্যেকের মন সেই বিরাটের এক একটী অংশ; চিন্তা সমুদয় সেই অংশের, হ্রদ তরঙ্গের ন্যায়, অবস্থা-ভেদ। নির্ব্বাত শান্ত জলে কি ঢেউ ওঠে? সকলেরই চিন্তা যদি এক ও একভাবাপন্ন হয়, আর চিন্তা বলিয়া কিছুই রহিবে না; চেতন মূর্ত্তি জড় পুত্তলিকায় পরিণত হইবে। ব্যক্তিগত রুচি-পার্থক্য এই বৈষম্য-নীতির ফল। সংসারবাদী আমরা; বহু জন্মান্তরে বার বার যে উদ্দেশ্যপথে জীবন চালিত হইয়াছে, এ জীবনও স্বতঃ, আমার প্রতিকূল চেষ্টা সত্ত্বেও, সেই দিকে ছুটিবে। ছেলেবেলা থেকে কেউ গান ভালবাসে, সহজে স্বরতালের সামঞ্জস্য বোঝে; অন্য একজনের কাছে গন্ধর্ব্বকণ্ঠানুকারী মোহিনী গীতলহরী বৃশ্চিক-দংশন, সারা জীবনটা গলা সাধিয়াও "সা"র মাত্র ঠিক হলো না। দিনে এক ঘণ্টা পড়িয়া সুবোধ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান পাইল; শত চেষ্টা, কত সুবিধা, কত প্রীতি,—তাহার প্রতিদান, "গুরু মহাশয় মরিলে গুরুমহাশয় হবে, বাবা না মলে নিস্তার নাই"। গাছ তলায় থাকা, সন্ন্যাস আমার সকল, হাজার অর্থের প্রলোভনে তাহা ছুটিবে না। বেশী টানিলে ছিঁড়িয়া যাইবে। আমার মত, তোমার হইতে ভিন্ন; তোমার যা ভাল লাগে, জোর করিয়া আমায় দিতে এলে, সদিচ্ছার পরিবর্ত্তে অপমাননা, অমৃতের স্থলে বিষ উঠিবে। মানুষকে উন্নত করিতে হইলে, তাহার রুচি-বৈষম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, "তুমি যা ক'চ্ছ সব ভুল, আর আমি যা ব'লছি সব ঠিক", ইত্যাদি স্পর্দ্ধা বাক্যের আশ্রয় না করিয়া, সে যে পথে এত দিন চলিয়া আসিতেছে সেই পথই বজায় রাখিয়া, আস্তে আস্তে উন্নতির সোপান দেখাইতে হইবে। মহাপুরুষেরা বলেন, সকল বৈষম্যের শেষ সীমা এক। ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি যিনি, তিনিই সদাচার্য্য।

জীবনোদ্দেশ্যের ব্যক্তিগত বৈষম্যের ন্যায় জাতিগত বৈষম্য আছে।

পাশ্চাত্য জাতির জীবনোদ্দেশ্য অপরা বিদ্যা, ভারতবাসীর জাতীয় জীবন পরা-বিদ্যার সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত। ভারতবর্ষে যত ধর্ম্মালোচনা, যত ধর্ম্মসম্প্রদায়, যত দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মাচার্য্যের অভ্যুত্থান, এরূপ কুত্রাপি নাই। ইয়োরোপ, আমেরিকা সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বেলিত। ভারতবাসী ধর্ম্মকথায় উৎসাহিত। এখানে সামাজিক উন্নতি, বা আর যা কিছু বল, ধর্ম্মের মধ্য দিয়া। ইংলণ্ডের নিম্নতম কৃষক পর্য্যন্ত রাজনীতি-আকাশের ক্ষুদ্রতম মেঘখণ্ডের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে; জিজ্ঞাসা কর, কোন্ দলের হাতে শাসন ভার, সে নিজে কোন্ দলের পক্ষে, তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিবে। আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকের এ সমস্ত বিষয়ে নিষ্ঠা নাই, কোনই খবর রাখে না। কিন্তু সে দিন চিকাগো সহরে এক মহতী ধর্ম্মসভা হইয়া গিয়াছে, সে সভায় তাহাদের দেশের এক নিঃসম্বল সন্ন্যাসী আপনার অপ্রতিম প্রতিভাবলে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রান্ত হইয়া, বিধর্ম্মী যবনের মধ্যে তাহাদের সনাতন ধর্ম্মের জয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছেন, এ খবর কুটীরবাসী মূর্খ হইতে প্রাসাদান্তপুরাবরুদ্ধ মহিলা-গণের, সকলের মুখে। জাতীয়-জীবন-যন্ত্র কোন্ সুরে বাঁধা, ইহা হইতে অনুমেয়।

এ বৈষম্যের বিশেষ কারণও আছে। মধ্য-এশিয়া মূল প্রদেশ হইতে শৈশব মানবজাতির দুই শাখা, একটী ভারতবর্ষে, অন্য ইয়োরোপখণ্ডে প্রসারিত। ভারতাভিমুখী আর্য্যনামধারী তদিতরকে যবন বলিতেন। ইয়োরোপের প্রকৃতি কোমল, শান্ত। ফুল-সাজির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ, নাত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীমালা, দীর্ঘ উপদ্বীপগুলি যেন সমুদ্রগর্ভে রত্ন অন্বেষণে অর্দ্ধ নিমগ্ন রহিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য একবার দেখিলে, মন আর ছাড়িতে চায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিষ্ঠুরতাও বিদ্যমান। শীতপ্রাধান্যবশতঃ ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অনায়াসফলপ্রদ নহে। এই চিত্তমোহিনী হৃদয়-শূন্য বারবনিতার পদে যবন চিরবিক্রীত। তাহার একমাত্র উপাস্য—বহির্জগৎ; ফল,—অপরা বিদ্যা। হাজার উপাসনা করিয়াও, এ বহির্জগতের অন্ত পাইতেছে না। আপাতসরলপ্রতীয়মান বাহ্য প্রকৃতির রূপমোহে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে যতই নাড়া চাড়া করিতেছে, দেখিতেছে ততই দুরারাধ্য। আর্য্যঋষিদিগের ভাগ্যচক্র অন্যপথে ঘূর্ণায়মান। ভারতীয় প্রকৃতি গম্ভীর, ধীর, স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত। গগনস্পর্শী, তুষারকিরীট হিমাদ্রি উত্তরে

সুদৃঢ় প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান, সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা অপরিমেয় জলরাশি লইয়া নৈরাশ্যকাতর কোন ভগ্নহৃদয়ার ন্যায় শনৈঃ সাগরসঙ্গমাভিমুখী, দুর্ভেদ্য দুর্গ সদৃশ সুবিস্তীর্ণ মহারণ্য, মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়া; মাঝে মাঝে প্রকৃতির বক্ষে ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর অগ্নিক্রীড়া। এ সৌন্দর্য্যে আর্য্যঋষি-দিগের চিত্ত প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিল, সত্য; সে আকর্ষণশক্তির দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে তাঁহারা প্রকৃতির দৃশ্যমান বহিঃ স্তর ভেদ করিয়া, জড়শক্তির লীলার পশ্চাৎ চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব আরোপিত করিয়াছেন। এরূপ আরোপণ গাঢ় অনুরাগের ধর্ম্ম,—যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকে ভগবদ্ভাবে, মনের যতদূর দৌড়, ততদূর উচ্চতম আদর্শরূপে দেখা। মিত্র, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, অশ্বিনী প্রভৃতি দেব দেবীর উদ্দেশ্যে গীত বৈদিক মন্ত্র ঐ শ্রেষ্ঠ ভাবের বিকাশ। শুধু তাহাই নহে। ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যে কি এক অচিন্ত্য শক্তি নিহিত আছে, যাহা আগে দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করে, পরে একটা ধাক্কা দিয়া যে কেন্দ্র হইতে প্রথমে চিত্তের বেগের আরম্ভ, সেই কেন্দ্রে চিত্তকে ফিরাইয়া দেয়। এই আকর্ষণ ও প্রতিঘাতের ফল,—ঋষিদিগের মন প্রথমে বহির্মুখী, পরে অন্তর্মুখী। প্রথমে, 'যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা', পরে, 'প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।' যখন বাহিরের জগৎ ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহারা অন্তর্জগতের সত্যানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় হেয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, অপরাবিদ্যার আলোচনায় সময় নষ্ট করা বৃথা, টুকরা টুকরা করিয়া পরিদৃশ্যমান অনন্ত বিশ্বকে কে জানিতে পারে? "হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত একেবারে জানা যায়?" উত্তর আসিল, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" "আত্মনো বা অরে দর্শনেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

তদবধি যবনেরা অপরাবিদ্যার উৎকর্ষসাধনে ব্যস্ত। পরাবিদ্যার আলোচনা ভারতজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া অপরাবিদ্যার চর্চ্চায় অনেক কষ্ট ও সহিষ্ণুতা; ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় লইয়া পরাবিদ্যার আলোচনায় তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধ্যবসায় ও স্থৈর্য্যের আবশ্যক। সর্ব্বদা লোকে যে বিষয় দেখে, শোনে, তৎসম্বন্ধীয় সত্যানুসন্ধানে মানুষের বিশেষ কষ্ট হয় না। যখন অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য আবিষ্কার করিতে হয়, তখন অসাধারণ সাবধানতা ও চিত্তের একাগ্রতা দরকার; তদুপযোগী সময়ের অবসরও চাই। সুফলা মাতৃভূমির ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত

আর্য্যজাতির আত্মতত্ত্ব-অনুসন্ধানের সুবিধা বিশেষ; অনেকে সমস্ত জীবন এই ব্রতেই কাটাইতেন। আশ্রমচতুষ্টয়বিভক্ত প্রত্যেক জীবন প্রতিপদে এই মহদুদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর; উঠিতে, বসিতে ধর্ম্ম। নহিলে আজ ধর্ম্মশেখরের সর্ব্বোচ্চ আসন আর্য্যজাতির অধিকারে কেন?

যবনের প্রধান দুই প্রশাখা গ্রীক ও রোমান্। গ্রীকজীবনের জাতীয় উদ্দেশ্য বিশেষতঃ ভাস্করকার্য্যে, স্থপতিবিদ্যায় এবং সাহিত্যে। রোমানের রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, পরদেশবিজয় এবং উপনিবেশস্থাপনে। ঐ সমস্ত বিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধিত করিয়া, বার্দ্ধক্যে তাহাদের বীজ সমগ্র ইয়োরোপে ছড়াইয়া, গ্রীক এবং রোমান্ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষক-পদে বিরাজিত। ইয়োরোপীয় সভ্যতায় যা কিছু ভাল আছে, তাহার মূল উৎস গ্রীক ও রোমান্। ইয়োরোপের ঘর দুয়ার, কবির কল্পনা, সকলই গ্রীক ছাঁচে ঢালা। রাজধর্ম্ম রোমানদিগের অনুকরণে। জীবনে যা করিতে হয়, তা করিয়া, এ দুই জাতি অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল ইহারা কেন,—সেই প্রাচীন আসিরিয়ান, ফিনিসিয়ান, বাবিলোনিয়ান, চালডিয়ান, ইজিপসিয়ান, জাতিরাই বা কোথায়? এক সময়ে ইহাদিগের বলদর্পে ধরিত্রী কম্পিতা ছিল। আজ তাহারা বিস্মৃতির অতল গর্ভে চিরনিমগ্ন।

না হইবেই বা কেন?

নশ্বর সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ তেজনাশক, যেথানে একমাত্র অনুসন্ধেয় আপাত-মধুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, সেই মর্ত্ত্যলোক যে জাতির যথাসর্ব্বস্ব, তাহার মরণে বিলম্ব হয় না। অনিত্যের মধ্যে থাকিয়া, চিরজীবিত্ব আশা করা দুরাশা। আর সহস্র ঝটিকা ঝঞ্ঝাবাত, কত উপদ্রব, বিজাতীয় তাড়না মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ভারতবাসী আমরা জীবিত, সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি। তালপত্রবহ্নিবৎ কত জাতি দুদিনের জন্য আসিয়া চলিয়া গিয়াছে; হিন্দু অটল, অমর, মরিয়াও মরে না, কারণ অজ নিত্য আত্মজ্ঞান তাহার জীবনের ভিত্তি। পাশ্চাত্য জগৎ সাবধান, বিজ্ঞানবলে হাজার আস্ফালন কর, জল মাটি বায়ু অগ্নি আমার শক্তির ক্রীড়াপুত্তলি বলিয়া যতই স্পর্দ্ধা কর, পাশববলে দুর্ব্বলের হৃদয়রুধিরপায়ী তুমি, তোমার মত যারা ছিল, তাদের যে দুর্গতির পথ, তোমারও শেষ তাই। আমাদিগের ভাগ্য-গ্রহকে নমস্কার, যদাশ্রিত মাহেন্দ্র-যোগে পূর্ব্বপুরুষগণ বহির্দৃষ্টি সংযত করিয়া দৃষ্টি অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন।

যখন আধুনিক সভ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ অরণ্যাশ্রয়, জন্তুর ন্যায় ছিলেন, প্রাচীনতম গ্রীক ও রোমান্ মনুষ্যসোপানের প্রথম ধাপে কেবল পদার্পণ করিতেছেন, যে অতীতের গাঢ় অন্ধকার ঐতিহাসিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেদ করিতে অসমর্থ, তখন আর্য্যজাতি ধর্ম্মপ্রান্তরের শেষ সীমায় উপস্থিত। ধর্ম্মজগতের চরম আবিষ্ক্রিয়া সমাপ্ত। অন্তর্জগতের দুর্বোধ্য সত্য যে জাতি এত শীঘ্র স্বায়ত্ত করিলেন, বহির্জগৎ যদি তাঁহাদের জীবনোদ্দেশ্য হইত, না জানি সে ক্ষেত্রে তাঁহারা কি মহদান্দোলন করিতেন। হয় নাই, আমাদেরই মঙ্গল।

ইহার পর বিস্তার। পৃথিবীর যেখানে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া যা কিছু আছে, এই আর্য্যভূমি হইতে সত্যের অমৃত প্রবাহ শতমুখে বাহির হইয়া, তাহার জীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছে। একবার নহে, বারবার। জারক্সিসের আক্রমণ, আলেক্জাণ্ডারের দিগ্বিজয়, আরাবদিগের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক, যখনই যে সূত্রে ভারতবর্ষের সহিত বাহিরের অন্যদেশের মিলন ঘটিয়াছে, তখনই ভারতের ধর্ম্মসম্পত্তি তাহাদের ধর্ম্মাভাবের পূরণ করিয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় দর্শন গ্রীক দর্শন-অবলম্বনে গঠিত। সেই গ্রীক-দর্শন ভারতীয় আত্মজ্ঞানের প্রতিধ্বনি। থেল্স্, গরগিয়াস, পিথাগোরাস, প্লেটো, আর্য্যঋষিদেরই রূপান্তর। খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুকরণ। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম, আর খৃষ্টধর্ম্মের, পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। উত্তমর্ণ হিন্দু-ধর্ম্মের অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক অধমর্ণ হ'চ্চে জগৎ-ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম। ভারতের বিজয়পতাকা ধর্ম্মরাজ্যে উড্ডীয়মান; তুরীভেরিনিনাদিত অসিঝনৎকারবিঘোষিত জয়পরাজয় সকলে বোঝে, দেখে, ঐতিহাসিকরাও তাহার উল্লেখ করেন। কিন্তু ভারতের যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি, অন্তর্জগতে; অস্ত্র—প্রীতি, সহিষ্ণুতা: সর্ব্ব ক্ষেত্রে শেষ জয় ভারতের। নিঃশব্দে ভারতীয় চিন্তাশক্তি অন্য জাতির ধর্ম্ম-চিন্তা চালিত করিয়াছে। কেবল অশোকের সময় বহ্বাড়ম্বরসম্বলিত মহাসমারোহের সহিত এই ধর্ম্মপ্রচার সাধিত হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

---

# আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে। ] [ ৪৩৯ পৃষ্ঠার পর।

বৃষ্টির আতিশয্য বশতঃ তরি তরকারি উৎপন্ন করা বড় ব্যয় ও কষ্ট সাধ্য। ফুলকপি,বাঁধাকপি, শালগম প্রভৃতি শীতোপযোগী তরকারি বড় দুর্লভ— বৃষ্টিতে সব নষ্ট হইয়া যায়, তা ছাড়া নানাবিধ পোকা মাকড়ের উপদ্রবও যথেষ্ট। বৃষ্টির কথা কি বলিব, পৌষ, মাঘ, এমন কি ফাল্গুন মাসকেও শ্রাবণ মাস ভিন্ন অপর কিছু মনে করিতে পারি নাই। এদেশে একে ত চাষ-বাস বড় কম, তাহাতে যে লোকে নানাবিধ ফসলের আবাদ করিবে, বৃষ্টির জন্য তাহাও পারে না। পূর্ব্বে যে কৃষিক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তথায় গিয়া দেখিলাম যে রাশি রাশি হরিদ্রা উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু বৃষ্টির অবিরাম হেতু কাঁচা হরিদ্রা মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে, শুকাইবার উপায় নাই, যথেষ্ট আবৃত স্থানও নাই। হরিদ্রার আবাদে বিশেষ লাভ আছে বলিয়া, ক্ষেত্রের কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। কাঁচা হরিদ্রার মূল রক্ষা করিবার জন্য সুবিস্তৃত চালা-ঘর এবং উহা সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবার জন্য fire house অর্থাৎ গৃহমধ্যে পাইপ দ্বারা অগ্নির উত্তাপ রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। যাঁহাদিগের অর্থ-সচ্ছলতা আছে, তাঁহারা উল্লিখিত প্রকারের ব্যবস্থা দ্বারা কার্য্য সমাধা করিতে পারেন ; কিন্তু আসামের চাষী ব্যক্তিগণ দ্বারা ঈদৃশ ব্যয়বাহুল্য ব্যাপার সংঘটন করা যে একেবারে অসম্ভব, তাহাতে সংশয় নাই। পাট খুব ভাল রকম জন্মিতে পারিলে কি হয় ?—উহা কাচিবার জন্য কোন পুষ্করিণী বা ডোবা নাই এবং যে সময়ে পাট উৎপন্ন হয়, সে সময় ত পূরা বর্ষা, সুতরাং উহাকে শুকাইবারও কোন উপায় নাই। দেশের ভৌতিক অবস্থা ত এই। তাহার পরে মজুরি। কুলি সকল বাঙ্গালা, বেহার প্রভৃতি স্থান হইতে এগ্রিমেণ্ট করিয়া আনিতে পারিলে, তবে সুবিধা ; কিন্তু তাহাতে প্রত্যেক কুলিতে একশত হইতে দেড়শত টাকা ব্যয় পড়ে,—তাহা ছাড়া এখানে তাহাদিগকে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হয়। স্বাধীন কুলি যাহারা আছে, তাহাদিগের মধ্যে পুরুষদিগের আট আনা এবং স্ত্রীলোকের, বালিকা যুবতী নির্ব্বিশেষে, সাত আনা রোজ মজুরি। এত খরচ করিলে চাষা ভুষা দূরের কথা, মধ্যবিত্ত লোকেও পারে না, সুতরাং আসামে

আবাদ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। যদি কখনও মজুরি-বিভ্রাট তিরোহিত হয়, তবেই আসামের সুদিন আসিবে, কিন্তু তাহা সুদূর পরাহত। আসামে দিন দিন যতই কুলি মজুর আমদানী হইতেছে, ততই কাজ বাড়িতেছে, কাজেই কিছুতেই আর সঙ্কুলান হইতেছে না। যত কুলি আইসে, তাহার প্রায় ৮৵১৫ রকম স্বদেশে প্রত্যাগত না হইয়া, এই দেশেই থাকিয়া যায় এবং এগ্রিমেণ্ট ফুরাইয়া গেলে, হয় পুনরায় এগ্রিমেণ্ট দেয়—না হয় স্বাধীন ভাবে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উত্তর-পশ্চিম বা মধ্যপ্রদেশের ন্যায় এদেশে কাজের অভাব নাই, সুতরাং পয়সারও অভাব নাই, এই জন্যই কুলিগণ আর ফিরিয়া যায় না।

নিম্ন আসামে নাগা দেখি নাই, কিন্তু এখানে বিস্তর নাগা দেখিতেছি। মার্গেরিটা নাগাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল; পরে এ স্থানটায় লোক জনের বসবাস হইতে আরম্ভ হওয়ায়, তাহারা ক্রমশঃ পাহাড়ের ভিতর দিকে প্রবেশ করিতেছে—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নাগাগণ আর্য্য জাতির অন্তর্গত নহে। মিস্‌মী, আবর প্রভৃতি আদিম নিবাসী যেমন বনজঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতে বাস করে, ইহারাও সেইরূপ একটা আদিম নিবাসী। ইহাদিগের চক্ষু ক্ষুদ্র, নাসিকা চাপা, চিবুকও তদনুরূপ, বর্ণ গৌর ও শ্যাম। উড়িষ্যাবাসীদিগের ন্যায় ইহারা মস্তকের সম্মুখ ভাগ ক্ষৌর করে। ইহারা গোঁপ-দাড়ি-হীন, যাহারা সহরে বা লোকালয়ে থাকে বা যাতায়াত করে, তাহারা বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। পরিধেয়ের মধ্যে এক লেংটী, গায়ে একটা জামা, মস্তকে টুপি বা 'শিরোপা'। টুপী তালপত্র বা বেতের বুনানী, উপরিভাগ মোগলাই টরবানের (Turban) ন্যায় সরু; তাহাতে নানাবিধ পক্ষীর পালক থাকে, আবার কাহারও টুপিতে অস্থি বিদ্ধ। ইহাদিগের হাঁটুর নিম্নে তিন চারি তবক বেত জড়ান থাকে। আজকালের সিপাহি পাহারাওয়ালা এবং ভ্রমণকারী সাহেব প্রভৃতি যেরূপ পায়ে পট্টি বাঁধিয়া থাকে, উহা তাহারই রূপান্তর মাত্র। পায়ে পট্টি বাঁধা থাকিলে, অধিক চলাচল করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না। নাগাদিগকে সর্ব্বদা পাহাড়ে উঠিতে নামিতে হয় বলিয়া, উহারা পায়ে ঐরূপ পট্টি বা বেত বন্ধন করে।

* ভ্রম-সংশোধন।—এই সংখ্যার ৫৫৭ হইতে ৫৬৪ পৃষ্ঠার নম্বর ৪৫৭ হইতে ৪৬৪ হইবে।

স্ত্রীলোকগণ সুশ্রী, কিন্তু ক্ষুদ্র চক্ষু, চাপা গাল, ইত্যাদি। ইহারা হাঁটু অবধি এক টুকরা ক্ষুদ্র কাপড় পরে, বুকে একখানা কাপড় বাঁধে। স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে ইহারা সকলেই বড় পাণ খাইতে ভালবাসে। সর্ব্বদা, দেখ, ইহাদিগের গালে পাণ আছে। দুই চারিটা পাণ, একটা কাঁচা সুপারি, একটু চুণ ও এক টুকরা শালি ইহাদিগের প্রত্যেকের নিকট আছে। ইহারা খদির ব্যবহার করে না, তাহার পরিবর্ত্তে শালি ব্যবহার করে। শালি এক রকম গাছের কাঠ—পাণের সহিত খাইলে ঠোঁট রাঙ্গা হয়। কি আসামী, কি নাগা, সকলেই পানের বড় প্রয়াসী বটে, কিন্তু পাণগুলা অতি জঘন্য। পাতা বড় বড়, কিন্তু মোটা,—চিবাইয়া ছিবড়া ফেলিতে হয়। তাহা ব্যতীত পাণগুলা অত্যন্ত ঝাল। পাণ যে এত ছিবড়া-যুক্ত ও ঝাল হয়, তাহার কারণ এই যে, এদেশে পাণের রীতিমত আবাদ নাই। বাঙ্গালা দেশে যেমন পাণের বরুজ আছে, এদেশে সে প্রথাই নাই; সুতরাং গৃহস্থগণ স্ব স্ব বাটীতে কোন গাছের উপর, বিশেষ সুপারি গাছে পাণের লতা উঠাইয়া দেয়। একে ত পাণের কোন পাট করে না, তাহাতে উহা রৌদ্রে অনাবৃত স্থানে জন্মে,—এই সকল কারণেই পাণ এত জঘন্য হয়। পাণ ঝাল হউক, আর অতি জঘন্য হউক, দাম কিন্তু বেশ —পয়সায় ৬।৭টী মাত্র।

বিগত ৭ই মার্চ্চ তারিখে মার্গেরেটা সহরে ভারতের ভাগ্যবিধাতা রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর সস্ত্রীক ও সদলে পদার্পণ করেন। তদুপলক্ষে সাহেবেরা নাগাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন—বড় লাটকে তাহাদিগের রণসজ্জা দেখানই উদ্দেশ্য। লাটসাহেব আসিবার ৩।৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে একদল নাগা—সংখ্যায় অনুমান ৪০০।৫০০ হইবে—আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় বারটা। বাঙ্গালায় বসিয়া ডিহীং নদীর অপর পারে একটা গম্ভীর হুঙ্কার উঠিতেছে—তাহা শুনিতে পাইয়া বাহিরে ছুটিয়া গেলাম। দেখিলাম—সেই নাগা দল অবিরাম হুঙ্কার দিতে দিতে হু—হু করিয়া চলিয়াছে—কাহারও যেন পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। নাগাগণ যে ভাবে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, ইহা তাহার অনুকরণ মাত্র। উভয়পক্ষ নাগা হইলে, উভয় দল হইতেই এই প্রকার ভীষণ হুঙ্কার উঠিয়া থাকে। এই রণহুঙ্কারের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে—কেবল এলোমেলো চীৎকার বা উচ্চ্যনিধ্বনি তাহা নহে। সকলের মুখে এক শব্দ—সকলের কণ্ঠ এক

স্বরে মিলিত। সেই হুঙ্কারের মধ্যে harmony আছে বলিয়াই, উহার গাম্ভীর্য্য এত অধিক এবং উহার বিক্ষেপও ঘূর্ণিত বা rolling বলিয়া বোধ হয়। প্রখর রৌদ্রে রক্তমূর্ত্তি, প্রায় অর্দ্ধনগ্ন, পত্র-বল্কল-অস্থি-বিরচিত আবরণে শিরোদেশ ভূষিত ৪০০।৫০০ নাগা দ্রুতপাদবিক্ষেপে হুহুঙ্কারে গগন বিকম্পিত করিতে করিতে যখন আসিতেছিল, রণগীতির উন্মাদিনী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া হর্ষোৎফুল্লমনে লম্ফমান হইতে হইতে, করস্থিত দা ঘুরাইয়া নাগা রণবেশ প্রদর্শন করিতেছিল, বাস্তবিক তাহা শরীর-রোমাঞ্চক এবং নিরীহ বাঙ্গালির পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ। যেরূপ দ্রুত বেগে তাহারা আসিতেছিল এবং সহরে আসিয়া পৌঁছিতে যত বিলম্ব হইল, তাহাতে অনুমান হয় যে একক্রোশ দূর হইতে আমরা সেই শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। সহরে আসিয়া পৌছিলে স্থানীয় পুলিষ তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিলেন—কি জানি যদি কোন বিভ্রাট ঘটায়।

বড় লাট বাহাদুরের আগমন উপলক্ষে "বাপু"কেও আনয়ন করা হইয়াছিল। বুদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়ের গুরু বা ধর্ম্মপ্রচারককে "বাপু" কহে। বাঙ্গালা ভাষায় বাপু অর্থে মহাগুরু। ইঁহার বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশ বৎসর,—দেহ ক্ষীণ, বর্ণ গৌর, মস্তিষ্ক গুম্ফাদি-মুণ্ডিত; পরিধানে হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় রঞ্জিত বসন, বর্ণ কিন্তু গৈরিক নহে,—কমলা; পদযুগলে চটিজুতা—ব্রহ্মদেশীয় বলিয়া বোধ হইল; কণ্ঠে স্ফটিক ও রুদ্রাক্ষের মালা; দক্ষিণ করেও রুদ্রাক্ষ-মালা ঘুরিতেছে, বামকরে ব্রহ্মদেশীয় একটী ছাতা আছে। সমভিব্যাহারে ২৫।৩০ জন শিষ্য আসিয়াছিলেন,— ইহাদিগের বসন ভূষণও মহাগুরুর ন্যায়। শিষ্যদল-মধ্যে ২।৩টী দশ বার বৎসর বয়স্ক, গৌরবর্ণ, সুকোমলকায় শিশুও দেখিলাম। শিশুদিগকে দেখিয়া বড় মায়া হইল,—ভালবাসিতে ইচ্ছা হইল; স্বাভাবিক কান্তি-জ্যোতির সহিত সাম্প্রদায়িক বেশ ভূষার যে কেমন একটা সামঞ্জস্য ভাব বাল্যস্বভাব-সুলভ সরলতা ও পবিত্রতার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাওয়া অপেক্ষা, অনুমান করা সহজ বলিয়া মনে হয়। বালকগুলির নগ্নপদ থাকায়, তাহাদিগের সৌন্দর্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই ঋষি-কুমারগুলিকে দেখিলে শোকসন্তপ্ত হৃদয় শান্তিলাভ করে এবং তীর্থাভিলাষীর তীর্থ দর্শন হয়। শিষ্যগণ সরল ও বিনয়ী এবং একান্ত গুরুভক্ত। ইহারা কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জিত, সুতরাং স্ত্রীলোকের সংসর্গ রাখেন না এবং অর্থ গ্রহণ করেন না। ইহাদিগকে ফাকিয়াল বলে;—ইহারা যে

স্থানে থাকেন, তাহার নাম"ফাকিয়াল বস্তি"—মার্গেরিটা হইতে দুই ক্রোশ দূরে, ডিহীং নদীর অপর পারে। ইঁহারাই বৌদ্ধ "ভিক্ষু।" বড় লাট বাহাদুরের অবতরণ জন্ত যে স্থানে প্ল্যাটফরম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারই ঠিক সম্মুখে ইহাদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। যথা সময়ে মহাগুরু সশিষ্যে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। মহাগুরু একখানি চেয়ারে ( ব্রহ্মদেশীয় বংশ নির্ম্মিত ) আসীন এবং শিষ্যগণ ভূপৃষ্ঠে আসনে উপবিষ্ট। মহাগুরুর মস্তকোপরে একটী বৃহৎ ছাতা এবং আশে পাশে আরও ৩.৪টী ছোট বড় ছত্র দ্বারা তাঁহাকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করা হইতেছিল,—ছত্রধারী শিষ্যগণ। বড়লাট বাহাদুর ও তদীয় পত্নী লেডি কুর্জ্জন অনেকক্ষণ তাঁহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাঁহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সাহেবদিগকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পর দিন, যথা সময়ে ষ্টেশনে আসিয়া বিদায়কালে মহাগুরুর অন্বেষণ করিলে, নিকট হইতেই তাঁহাকে আনয়ন করা হইল এবং লাট দম্পতী আগ্রহ সহকারে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করতঃ বিদায় লইলেন। মহাগুরুও তাঁহাদিগের উভয়কে এক এক ছড়া মালা প্রদান করিলেন এবং রাজ-প্রতিনিধি ও লেডি কুর্জ্জন উহা সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। পুর্ব্ব দিবস, বড় লাট বাহাদুর তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান কালে, মহাগুরু ও তাঁহার শিষ্যগণ যে আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হয়েন নাই, এজন্ত বাঙ্গালী মহলে একটা কথা উঠিয়াছিল, যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেইরূপ বলিতে লাগিলেন। আমিও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না, কেন না, বাহ্যিকভাবে দেখিলে যদিও ব্যাপারটা কিছুই নহে, কিন্তু একটু অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া দেখিলে, উহার মধ্যে অনেক জিনিষ পাওয়া যায়—ধর্ম্ম ও অর্থ,—দারিদ্র ও ঐশ্বর্য্য—কোনটা বড় ? উভয়ের মধ্যে দরের পার্থক্য কত ? সমাজ বড়—না ধর্ম্ম বড় ? লোকাচার বড়—না ধর্ম্মবল বড় ? মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া দেখিলাম যে, "পাপু" বা মহাগুরুর কিছু অন্যায় বা অপকর্ম্ম হয় নাই—বরং তিনি ধর্ম্মেরই প্রাধান্ত রক্ষা করিয়াছেন। বড় লাট বাহাদুর ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি এবং তিনি যে ভারতের ভাগ্যবিধাতা, তাহাও মহাগুরু জানিতেন। যিনি 'ভিক্ষু'—ত্যাগী—সন্ন্যাসী, তাঁহার সহিত সাংসারিক বা লোকাচার ব্যাপারের কোন সম্বন্ধই নাই। বড়লাট ইঁহার নির্ভয় আচরণে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, বা ক্রুদ্ধ হইলে, হয় ত তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতে পারিতেন,—অধিক কি, ফাঁসি দিতেও পারিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়

হইতে ধর্ম্মভাব কাড়িয়া লইতে পারিতেন না;—এই খানেই রাজরাজেশ্বর ভিক্ষুর নিকট পরাজিত,—এই খানেই অর্থ, ঐশ্বর্য্য, মান, মর্য্যাদা সন্ন্যাসীর নিকট পরাভূত,— সংসারের তাবৎ শক্তি—'মার্টিন হেনরি,' 'ম্যাক্সিমগন,' 'শাণিত অসি প্রভৃতির বিভীষিকা এই খানেই বিলোপ! অতি অল্পদিন হইল, কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর সভায় বক্তৃতাকালে বড়লাট নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি কোন সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষপাতী বা গোঁড়া নহেন এবং সকল সম্প্রদায়ের যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রস্তুত,—ইহাই তাঁহার হৃদয়ের উদারতার পরিচয়। আর মহাগুরু যে নিশ্চিন্ততা সহকারে বড়লাটকেও উপেক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাও মহাগুরুর হৃদয়বলের পরিচায়ক; এই কারণেই বোধ হয় গুণগ্রাহী লর্ড কুর্জ্জন বাহাদুর মহাগুরুকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কোন বড়লাটই এ প্রদেশে পদার্পণ করেন নাই। বাস্তবিক তৎপদস্থিত মহাজনের পক্ষে আসাম প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে আসা সময় নষ্ট ভিন্ন আর কি? এদেশে দেখিবার শুনিবার কিছুই নাই,—কেবল জঙ্গল, আর জনহীন প্রান্তর। প্রাদেশিক চিফ্-কমিশনর মিঃ কটন আসামের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর, সুতরাং তাঁহারই চেষ্টা ও যত্নের ফলস্বরূপ লর্ড কুর্জ্জন বাহাদুরের এ প্রদেশের আগমন। দ্বিতীয়তঃ—বড়লাট-কৌন্সিলে আপাততঃ যে একখানি কুলি-আইন বিষয়ক বিল আছে, তাহার বিষয়ে তদন্ত করা প্রভৃতি দুই চারিটী কারণ বশতঃ যে তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, ইহাই সকলের অনুমান। বড় লাটের আগমন উপলক্ষে এই জনহীন দেশে যতদূর আদর অভ্যর্থনা হওয়া সম্ভব তাহার কিছু ত্রুটী হয় নাই। সমগ্র আসামের মধ্যে মার্গেরিটা একটী দেখিবার স্থান, কাজেই এখানেও তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। আসিবার পথে ডিব্রুগড়ে সাহেব—চা কর সাহেবগণ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করেন এবং এক অভিনন্দন পত্র দেন। অন্যান্য বিষয়ের সহিত অভিনন্দনে ইহাও প্রার্থনা করা হয় যে, আসামের বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতির কোথায় কোন জিনিষের খনি আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একজন সুদক্ষ ভূগর্ভ বা খনিতত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত করা হউক। এবম্বিধ অভিনব প্রার্থনায় তিনি সাতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রত্যুত্তরকালে বলিয়াছেন যে, চিফ কমিশনর সাহেব সে প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া দাখিল করিলে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে মঞ্জুর তাহা করিবেন, তাহা স্থির। ইংরাজ জাতি ব্যবসায়ী,—

কিসে অর্থাগমের সুবিধা বা সুযোগ হয়, তাহা বুঝে এবং তদনুসারে প্রার্থনা করে, সুতরাং তাহা মঞ্জুর হয়। আমরা হইলে হয় ত প্রার্থনা করিতাম যে, মন্ত্রীসভায় আরও দুই চারিজন দেশীয় সভা যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হউক! অথবা, পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল অথবা সার জন্ উড্‌-বরনকে সেণ্টহেলেনায় পাঠাইয়া দিয়া, তত্তৎস্থানে সুযোগ্য দেশীয়কে,—মনের কথা বাঙ্গালীকে—নিযুক্ত করা হউক। তুমি যেমন কাপুরুষ, অদূরদর্শী, ক্ষীণমস্তিষ্ক ও লক্ষ্যভ্রষ্ট, উহা তোমার মুখেই শোভা পায়! লক্ষ লক্ষ নর নারী—তোমার দেশের—অনাহারে মৃতপ্রায়, অর্থাভাবে নিষ্পীড়িত, বসনাভাবে নগ্ন! কি উপায়ে তাহারা প্রতিপালিত হইতে পারে, কিসে তাহাদিগের দারিদ্র ঘুচে, কিসে দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হয়, দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, এ সকল গুরুতর বিষয় মস্তিষ্কের মধ্যে ধারণা করিবার শক্তি তোমার নাই, কাজেই তুমি রাজনীতির জন্য ব্যস্ত! সময়ক্ষেপণের উহা একটা উত্তম পন্থা,—'কুঁড়ের মত বসিয়া থাকা অপেক্ষা ঘুমান ভাল।' ( ক্রমশঃ )

---

## বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

আশ্চর্য্য মৎস্য।—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরভাগে সুরিনামের নদী ও পুষ্করিণীতে এক প্রকার অদ্ভুত মৎস্য পাওয়া যায়। ইহার নাম জিম্নোটাস্। ইহারা এরূপ তড়িৎশক্তি-বিশিষ্ট যে, সহজেই অপর প্রাণীকে বধ করিতে পারে। ক্ষুধার্ত্ত জিম্নোটাস্ মৎস্য দেখিতে পাইলেই তাহার দিকে ধাবিত হয় ও স্বীয় অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে আক্রান্ত মৎস্যের দেহে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া বধ করিয়া উহাকে ভক্ষণ করে। ক্যাপ্টেন্ ষ্টেড্‌ম্যান বলেন যে, তিনি একটী জিম্নোটাস্ ধরিবার জন্য বিংশতিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রত্যেকবার এরূপ আহত হন যে, তাঁহাকে অবশেষে নিরস্ত হইতে হয়। বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ব্যারণ হাম্বোল্ট তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ কিরূপে এই মৎস্য সংগ্রহ করে, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। যে জলাশয়ে জিম্নোটাস্ বাস করে, তাহারা তন্মধ্যে একদল বন্য অশ্ব তাড়াইয়া লইয়া যায়। মৎস্য সমূহ উত্তেজিত হইয়া অশ্বগণকে বারম্বার আক্রমণ করিয়া তাড়িতশক্তি নিঃশেষিত করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সহজেই ধৃত হয়।

কাচ ও হাইড্রোফ্লুয়োরিক এসিড।—ক্যাল্‌সিয়ম্ ফ্লুয়োরাইড

নামক খনিজ পদার্থ চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত গন্ধক-দ্রাবক মিশ্রিত করিলে "হাইড্রোফ্লুয়োরিক্ এসিড্ গ্যাস" নামক বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গেলসাক ও থিনার্ড এই যৌগিক পদার্থ বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করেন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার সংস্পর্শে কাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইজন্য কাচের উপর কোন চিত্র খোদিত করিতে হইলে, এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়। প্রথমে কিঞ্চিৎ মোম গলাইয়া, কাচখানি সমভাবে আচ্ছাদিত করিয়া, ছুরির দ্বারা মোম কাটিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়। তৎপরে এক সিসার পাত্রে ক্যালসিয়াম্ ফ্লুয়োরাইড্ চূর্ণের সহিত গন্ধক-দ্রাবক মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে যখন গ্যাস্ বহির্গত হইবে, তখন ঐ কাচখানি পাত্রের উপর কিয়ৎকাল রাখিয়া মোম তুলিয়া ফেলিলে চিত্রটী কাচের উপর দৃষ্ট হইবে।

দ্রব ফ্লুয়োরিন্।—হাইড্রোফ্লুয়োরিক এসিড হাইড্রোজেন ও ফ্লুয়োরিন্ নামক মূল পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে গঠিত। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রসায়নবেত্তাগণ এই যৌগিক পদার্থ হইতে ফ্লুয়োরিন্ গ্যাস বিশ্লিষ্ট করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে, জড়রাজ্যে ফ্লুয়োরিণের প্রভাব এতই অধিক যে, ইহাকে বিভিন্ন করিতে হইলে বিশেষ পারদর্শিতা ও উৎকৃষ্ট যন্ত্র আবশ্যক। অবশেষে সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক মোয়াসাঁর গভীর গবেষণার ফলে ফ্লুয়োরিন্ গ্যাস পৃথক রূপে সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রফেসার মোয়াসাঁ ও ডিউয়ার দ্রব বায়ুর সাহায্যে এই গ্যাসকে দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হন। এই দ্রব অবস্থায় ফ্লুয়োরিন্ বরফ অপেক্ষা ১৮৭ ডিগ্রি শীতল। বায়বীয় অবস্থায় ফ্লুয়োরিণের সংসর্গে আসিলে কয়লা, গন্ধক, লৌহ প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হয়। ফ্লুয়োরিন্ দ্রবীভূত হইলে আর এই সকল দ্রব্যের সহিত মিলিত হয় না। কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস ফ্লুয়োরিণের সংস্পর্শে আসিলেই জ্বলিয়া উঠে; একবিন্দু দ্রব গ্যাস কাষ্ঠের উপর পড়িলেই উহা প্রজ্বলিত হয়। একই পদার্থের অবস্থাভেদে গুণান্তর কত অধিক।

---

## সমালোচনা।

পদার্থবিদ্যা।—কলিকাতা বিশপ্-কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত স্কুলপাঠ্য বৈজ্ঞানিক পুস্তক।

মূল্য ৸৵০ মাত্র। ছাত্রবৃত্তি ও মাইনার পরীক্ষার্থীদিগের নিমিত্ত বিশেষ উপযোগী। ভাষা সুন্দর ও সহজ। গ্রন্থখানির নূতনত্ব ও বিশেষত্ব এই যে, যতগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সকলগুলিই প্রণেতার নিজের সুরচিত ও স্থূলবুদ্ধি বালকেরও সুখবোধ্য; এবং সেগুলি অতি সামান্য ব্যয়সাপেক্ষ। পল্লীগ্রামস্থ ক্ষুদ্র বিদ্যালয় পর্য্যন্তও ঐ সকল পরীক্ষার জন্য যন্ত্রাদি অনায়াসে ক্রয় করিতে পারেন—গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, সর্ব্বশুদ্ধ ব্যয় ১২৲ মাত্র। পুস্তকে সূচীপত্র অথবা কোনও প্রকার নির্ঘণ্ট-পত্র না দেওয়া, আজ কালকার বাজারে অত্যন্ত অনুচিত ; আশা করি গ্রন্থকার ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে সে অভাব মোচন করিবেন।

স্মৃতিসুলভ ভারতেতিহাস।—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। মূল্য দশ পয়সা মাত্র। ইহাতে নূতন ধরণে, ৯৯৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ভারতের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ, সাঙ্কেতিক ও অতি সংক্ষিপ্ত পদ্যের দ্বারা নির্ণয় করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১০৬টী পদ্য ও চারটী সূত্রে সম্পূর্ণ। পদ্য ও সূত্রগুলি হইতে তারিখ বাহির করিবার ১৫টী অতিক্ষুদ্র ও সহজ নিয়ম বা সঙ্কেত গ্রন্থের প্রথম দুই পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। বালকবালিকাগণ খেলার স্থলে পদ্যগুলি অনায়াসেই কণ্ঠস্থ করিতে পারিবেন এবং ঐ পদ্যাংশ গুলি হইতে, পূর্ব্ববর্ণিত ১৫টী সংকেত দ্বারা অতি সহজেই তারিখ বাহির করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

"দি গার্ডনিং সার্কিউলার।"—একখানি ইংরাজী ক্ষুদ্র মাসিক পত্র, কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ; কলিকাতা ১৮১নং অপার সার্কিউলার রোডস্থ 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্' হইতে প্রকাশিত। ভাষা ও ধরণ অতি সহজ। ধনী ও দরিদ্র, জমিদার ও রেইওত, নগর ও পল্লীগ্রাম প্রভৃতি সর্ব্বত্র ও সক শ্রেণীর লোকের পক্ষেই, কাগজখানি অতি আবশ্যকীয়। কতিপয় প্রকৃত উদ্যমশীল ও শিক্ষিত যুবক ইহার পরিচালক। এক্ষণে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে ; পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে কাগজখানি সকল অংশেই অভাবনীয়রূপে উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহার পরিচালক দেশহিতৈষী যুবকবৃন্দের উদ্যম-সার্থকতা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রার্থনীয়।

ভাষ্যানুবাদ। কি কারণে (জন্মপরিগ্রহ করি, তাহা বলিতেছি শুন) পরিত্রাণায় ইত্যাদি। 'সাধু' সৎপথাবলম্বিগণের পরিত্রাণ (অর্থাৎ) পরিরক্ষণের নিমিত্ত, 'দুষ্কৃৎ' পাপকারিগণের বিনাশের নিমিত্ত, এবং ধর্ম্মের সম্যক্ প্রকারে স্থাপন করিবার নিমিত্ত, আমি প্রতিযুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৮ ॥

---

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বাদেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন এবং মে দিব্যং জন্ম কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ (যাথার্থ্যেন) যোবেত্তি (স) দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম নৈতি (তথা) মাং এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে অর্জ্জুন আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান যাহার হয়, সে ব্যক্তি দেহত্যাগের পর আর জন্ম গ্রহণ করে না এবং আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

ভাষ্য।—তৎ জন্মেতি। জন্ম মায়ারূপং কর্ম্ম চ সাধুপরিত্রাণাদি যে মম দিব্যং অপ্রাকৃতমৈশ্বরং এবং যথোক্তং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ তত্ত্বেন যথাবৎ ত্যক্ত্বা দেহং ইমং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি আগচ্ছতি স মুচ্যতে হে অর্জ্জুন ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই জন্ম ইত্যাদি। আমার এই অপ্রাকৃত ঈশ্বরসম্বন্ধি যথোক্ত মায়াময় জন্ম এবং সাধুপরিত্রাণাদি, প্রকৃত রূপে যে ব্যক্তি জানে, সে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর জন্মান্তর লাভ করে না এবং আমাকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ) মুক্ত হয় ॥ ৯ ॥

---

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়ামামুপাশ্রিতাঃ।
বহবোজ্ঞানতপসা পূতামদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ বহবো জ্ঞানতপসা পূতাঃ (সন্তঃ) মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—আমার স্বরূপ-দর্শনকারী রাগ ভয় ও ক্রোধ-বর্জ্জিত বহু ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় পূর্ব্বক জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

ভাষ্য।—নৈষ মোক্ষমার্গ ইদানীং প্রবৃত্তঃ, কিন্তু হি পূর্ব্বমপি বীতরাগেতি। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ বীতা বিগতা যেভ্যস্তে বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া ব্রহ্মবিদ ঈশ্বরাভেদদর্শিনঃ মামেব পরমেশ্বরমাশ্রিতা কেবল

জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। বহবোঽনেকে জ্ঞানতপসা জ্ঞানমেব চ পরমাত্মবিষয়ং তপস্তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ পরাং শুদ্ধিং গতাঃ সন্তো মদ্ভাবং ঈশ্বরভাবং মোক্ষং আগতাঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ ইতরতপোনিরপেক্ষজ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যস্য লিঙ্গং জ্ঞানতপসেতি বিশেষণম্ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই মোক্ষমার্গ যে সম্প্রতি এ জগতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু পূর্ব্বকালেও (ইহা ছিল) (ইহাই বলা যাইতেছে যে) বীত রাগ, ইত্যাদি। বীতরাগভয়ক্রোধ (এই শব্দটির অর্থ এইরূপ হইবে যে) রাগ, ভয় ও ক্রোধ এই তিনটী বৃত্তি হইতে যাহারা (সম্পূর্ণরূপে) বিমুক্ত, (অর্থাৎ) যাহাদের রাগ, ভয় ও ক্রোধ অতীত হইয়াছে, তাহারাই বীতরাগভয়ক্রোধ, এই শব্দের দ্বারা) প্রতিপাদিত হয়। মন্ময় (অর্থাৎ) ব্রহ্মবিদ্, পরমেশ্বর হইতে আপনাকে অভিন্নরূপে যে দর্শন করে, তাহাকে ব্রহ্মবিদ্ বলা যায়। আমাকেই যাহারা আশ্রয় করে (অর্থাৎ) যাহারা কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠ, এই প্রকার বহু ব্যক্তি পরমাত্মবিষয় জ্ঞানরূপ-তপস্যা দ্বারা পরমশুদ্ধি লাভ করিয়া মদ্ভাব (অর্থাৎ) ঈশ্বরভাব, (বাস্তবপক্ষে) মোক্ষই প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্য তপস্যা প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ (হইয়াই মোক্ষলাভ করিয়া থাকে), ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য জ্ঞানতপসা এই প্রকার বিশেষণ (উপন্যস্ত হইয়াছে) ॥ ১০ ॥

---

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—যে মাং যথা প্রপদ্যন্তে, অহং তাং তথৈব ভজামি। হে পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—যে সকল ব্যক্তি যে প্রয়োজনের জন্য আমাকে অবলম্বন করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রয়োজন দানে অনুগৃহীত করিয়া থাকি। সর্ব্বপ্রকারেই মনুষ্যগণ আমার পথের অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ভাষ্য।—তব তর্হি রাগদ্বেষৌস্তঃ, যেন কেভ্যশ্চিদেবাত্মভাবং প্রযচ্ছসি, ন সর্ব্বেভ্য ইত্যুচ্যতে যে যথেতি। যে যথা যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিনঃ মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজামি অনুগৃহ্ণামি অহমিত্যেতৎ তেষাং মোক্ষং প্রত্যনর্থিত্বাত্। নহ্যেকস্য মুমুক্ষুত্বং ফলার্থিত্বঞ্চ যুগপৎ সম্ভবতি। অতো যে ফলার্থিনস্তান্ ফলদানেন, যে যথোক্তকারিণস্ত্বফলার্থিনো মুমুক্ষবশ্চ, তান্

জ্ঞানপ্রদানেন, তথা আর্ত্তান্ আর্ত্তিহরণেন ইত্যেবং যথা প্রপদ্য তাংস্তথৈব ভজামীত্যর্থঃ। ন পুনঃ রাগদ্বেষনিমিত্তঃ মোহনিমিত্তং বা কঞ্চিদ্‌ভজামি। সর্ব্বথাপি সর্ব্বাবস্থস্য মম ঈশ্বরস্য বর্ত্ম মার্গমনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ। যৎফলার্থিতয়া যস্মিন্ কর্ম্মণি অধিকৃতা যে প্রযতন্তে তে মনুষ্যা উচ্যন্তে, হে পার্থ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"তবে তোমার রাগ ও দ্বেষ আছে, যে কারণ তুমি প্রধান ব্যক্তিকেই আত্মভাব প্রদান কর, সকলকে তাহা কর না, ইহার উপর বলা যাইতেছে যে যে, যথেতি। যে প্রকারে (অর্থাৎ) যে প্রয়োজনের বশে যে ফল লাভ করিবার জন্য, যে সকল ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আমি সেই ফল প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়া থাকি, ইহাই তাৎপর্য্য। তাহারা মোক্ষ কামনা করে না। একই সময়ে একই ব্যক্তির মোক্ষাভিলাষ ও ফলকামনা এই উভয় হইতে পারে না। অতএব যাহারা ফলার্থী, তাহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া, যাহারা ফল কামনা করে না, অথচ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং মোক্ষ কামনাও করিয়া থাকে, তাহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া, যাহারা জ্ঞানী সন্ন্যাসী, ও মুমুক্ষু, তাহাদিগকে মোক্ষ প্রদান করিয়া এবং পীড়িত ব্যক্তিগণের পীড়া হরণ করিয়া, এই প্রকার যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, তাহাকে সেই ভাবে আমি অনুগৃহীত করিয়া থাকি, ইহাই (আমার বাক্যের অর্থ)। রাগদ্বেষবশে বা মোহপ্রযুক্ত আমি কাহারও সহিত ব্যবহার করি না। আমি সকল প্রকারেই সকল অবস্থাতে বিদ্যমান এবং ঈশ্বর আমার মার্গ মনুষ্যগণ অনুসরণ করিয়া থাকে, ফল কামনা পূর্ব্বক কর্ম্মে যাহারা অধিকৃত হইয়া প্রযত্ন করে, তাহারাই এই স্থলে মনুষ্যশব্দের দ্বারা উক্ত হইতেছে। সর্ব্বশঃ এই শব্দের অর্থ সর্ব্বপ্রকার ॥ ১১ ॥

---

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—ইহ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ দেবতাঃ যজন্তে মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং হি ভবতি ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। এই জগতে কর্ম্মের সিদ্ধি কামনা করিয়া (মনুষ্যগণ) দেবতাগণের পূজন করিয়া থাকে। এই মনুষ্যলোকে কর্ম্মের সিদ্ধি সত্বর হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

।—যদি তবেশ্বরস্য রাগাদিদোষাভাবাৎ সর্ব্বপ্রাণিষু অনুজিঘৃক্ষায়াং তুল্যায় সর্ব্বফলপ্রদানসমর্থে ত্বয়ি সতি বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানেনৈব মুমুক্ষবঃ সন্তঃ কস্মাত্ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রতিপদ্যন্তে ইতি শৃণু তত্র কারণং, কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কাঙ্ক্ষন্তোঽভীপ্সন্তো কর্ম্মণাং সিদ্ধিং ফলনিষ্পত্তিং প্রার্থয়ন্তো যজন্ত ইহ অস্মিন্ লোকে দেবতা ইন্দ্রাগ্ন্যাদ্যাঃ "অথ যো হন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসৌ অন্যঽহমস্মি ইতি ন সবেদ যথা পশু রেবং স দেবানাং" ইতি শ্রুতেঃ। তেষাং হি ভিন্নদেবতাযাজিনাং ফলাকাঙ্ক্ষিণাং ক্ষিপ্রং শীঘ্রং হি যস্মাৎ মানুষে লোকে মনুষ্যলোকেহি শাস্ত্রাধিকারঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষেইতি বিশেষণাত্ অন্যেষ্বপি কর্ম্মফলসিদ্ধিং দর্শয়তি ভগবান। মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাণীতি শেষঃ। তেষাং বর্ণাশ্রমাদ্যধিকারিকর্ম্মণাম্ ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি কর্ম্মজা কর্ম্মণো জাতা ॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—তুমি ঈশ্বর, তোমার রাগ বা দ্বেষ নাই, এই কারণ সকল প্রাণীরই উপর অনুগ্রহেচ্ছা তোমার তুল্য এবং তুমিই সকলের সকল প্রকার ফলদান সমর্থ, এই প্রকার হইলেও তুমি থাকিতে কেন সকল ব্যক্তি মুমুক্ষু হইয়া, বাসুদেবই সকল জগৎ, এই প্রকার যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হয় না ( ইহা যদি তোমার জিজ্ঞাস্য হয় ), তাহা হইলে তাহার কারণ ( বলিতেছি ) শ্রবণ কর। কাঙ্ক্ষন্ত ইত্যাদি।

কর্ম্ম সকলের সিদ্ধি ( অর্থাৎ ) ফলনিষ্পত্তিকে প্রার্থনা করিয়া, এই লোকে ( অধিকারী জীবগণ ) ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের ( প্রীতির জন্য ) যাগানুষ্ঠান করিয়া থাকে। "যে ব্যক্তি ভিন্ন দেবতার উপাসনা করে এবং আমি একজন পৃথক্ এবং দেবতা আমা হইতে ভিন্ন, এই প্রকার জ্ঞান যাহার আছে, সে ( ভ্রান্ত ), আত্মতত্ত্বজ্ঞান তাহার হয় নাই, সে দেবতাগণের নিকট পশুর ন্যায় প্রতীত হয়," এই প্রকার শ্রুতিতেও নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সকল ফলাকাঙ্ক্ষী ও ভিন্নদেবতাযাজিগণের এই মনুষ্য লোকে শীঘ্রই কর্ম্ম ফলের সিদ্ধি হইয়া থাকে; মনুষ্য লোকে এই প্রকার বিশেষরূপে নির্দ্দেশ দ্বারা, অন্য লোকেও ফলসিদ্ধি হইলেও এই মনুষ্য লোকে শীঘ্র যেমন কর্ম্ম ফলের সিদ্ধি হয়, সেই প্রকার শীঘ্র অন্য লোকে ফলসিদ্ধি হয় না, কারণ মনুষ্য লোকেই শাস্ত্রাধিকার আছে, ইহাই ভগবান্ দেখাইতেছেন। সেই সকল বর্ণাশ্রমাধিকারী ব্যক্তিগণের কর্ম্মজনিত-ফলসিদ্ধি শীঘ্রই হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১২ ॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং, তস্য (চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য) কর্ত্তারং অপি মাং অকর্ত্তারং (তথা) অব্যয়ং বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবহারিক সৃষ্টির প্রতি আমি কারণ হইলেও, তুমি, বাস্তব পক্ষে আমাকে অকর্ত্তা ও অবিনাশী বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য।—মানুষ এব লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাধিকারঃ নান্যেষু লোকেষু ইতি নিয়মঃ কিংনিমিত্ত ইতি। অথবা বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগোপেতা মনুষ্যা মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে সর্ব্বশ ইত্যুক্তং কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ নিয়মেন তবৈব বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে নান্যস্য ইত্যুচ্যতে চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং, ময়া ঈশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতং, 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদি'ত্যাদি শ্রুতেঃ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ। গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি। তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপইত্যাদীনি কর্ম্মাণি। সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি, তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি, রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্ম ইত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ। তচ্চেদং চাতুর্ব্বর্ণ্যং নান্যেষু লোকেষু, অতো মানুষে লোকে ইতি বিশেষণং। হন্ত তর্হি চাতুর্ব্বর্ণ্যসর্গাদেঃ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বাৎ তৎফলেন যুজ্যসে, অতো ন ত্বং নিত্যমুক্তো নিত্যেশ্বর ইতি। উচ্যতে। যদ্যপি মায়াসংব্যবহারেণ তস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমপি সন্তং মাং পরমার্থতো বিদ্ধি অকর্ত্তারমতএব অব্যয়মসংসারিণং চ মাং বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—মনুষ্য লোকেই বর্ণ ও আশ্রমাদিবিহিত কর্ম্মে অধিকার আছে, অন্য লোকে নাই, এই প্রকার নিয়মের কারণ কি? (এইরূপ অবতারণায় চাতুর্ব্বর্ণ্য ইত্যাদি শ্লোকের আরম্ভ হইতেছে), কিম্বা বর্ণ ও আশ্রমাদিবিভাগোপেত মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার বর্ত্মেরই অনুবর্ত্তন করে, ইহা বলা হইয়াছে, কি কারণে কিন্তু তোমারই পথের অনুসরণ করে অন্যের পথের অনুসরণ করে না? (এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য) চাতুর্ব্বর্ণ্যং ইত্যাদি শ্লোকের আরম্ভ হইতেছে)।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণই চাতুর্ব্বর্ণ্য ( শব্দের অর্থ ) ; আমি ঈশ্বর, এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপাদন করিয়াছি। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "ব্রাহ্মণ ( এই পরমেশ্বরের ) মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল" ইত্যাদি। গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগের অনুসারেই ( আমি চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট করিয়াছি )। গুণ শব্দের অর্থ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক ( অর্থাৎ ) সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, শম দম ও তপস্যা প্রভৃতি। যাহার সত্ত্বগুণ প্রকৃষ্ট নহে, অথচ রজোগুণই প্রধান, সেই ক্ষত্রিয়জাতির কর্ম্ম শৌর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি। তমোগুণ যাহার অপ্রধানভাবে অবস্থিত এবং রজোগুণই যাহার প্রধান, সেই বৈশ্য জাতির কর্ম্ম কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি। যাহার রজোগুণ অপ্রকৃষ্ট ভাবে অবস্থিত, অথচ তমোগুণই প্রধান, সেই শূদ্র জাতির কর্ম্ম কেবল শুশ্রূষা। এই প্রকার গুণানুসারে কর্ম্মবিভাগপূর্ব্বক আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি, ইহাই ( তাৎপর্য্য ) অর্থ, এই সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য অন্য লোকে বিদ্যমান নাই, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য মানুষলোক এই প্রকার বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। তবেই হইল, তুমি যদি চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়া থাক, তাহা হইলে সৃষ্টিকর্ম্মের কর্তৃত্ব এবং তাহার ফলের সহিত তোমার যোগ আছে, সুতরাং তুমি নিত্যমুক্ত এবং নিত্যেশ্বর হইতে পার না, এই প্রকার অর্জ্জুনের শঙ্কা সম্ভাবনা করিয়া ( ভগবান্ ) বলিতেছেন, যে যদ্যপি মায়িক ব্যবহারকালে আমি সৃষ্টিকর্ম্মের কর্ত্তা তথাপি পারমার্থিক ভাবে আমি অকর্ত্তা, অব্যয় এবং অসংসারী, এই ভাবেই তুমি আমাকে জানিও ॥ ১৩ ॥

---

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্ম ফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি, কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ( অপি ন ( বর্ত্ততে ) ইতি ( এবং প্রকারেণ ) যঃ মাং অভিজানাতি, স কর্ম্মভির্ন বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, আমার কর্ম্মফলেও স্পৃহা নাই। এইভাবে যে ব্যক্তি আমাকে জানিতে পারে, সে কর্ম্মের দ্বারা ( সংসারে ) বদ্ধ হয় না ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য।—যেষাং তু কর্ম্মণাং কর্ত্তারং মাং মন্যসে, পরমার্থতস্তেষামকর্ত্তৈবাহং যতঃ নেতি। ন মাং তানি কর্ম্মাণি লিম্পন্তি দেহাদ্যারম্ভকত্বেনাহঙ্কারা-

ভাবাৎ। ন চ তেষাং কর্ম্মণাং ফলেষু মে স্পৃহা তৃষ্ণা। যেষাং তু সংসারিণাং অহং কর্ত্তেত্যভিমানঃ কর্ম্মসু স্পৃহা তৎফলেষু চ, তান্ কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি যুক্তং, তদভাবান্ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তীত্যেবং, যোঽন্যোঽপি মামাত্মত্বেন অভিজানাতি নাহং কর্ত্তা, ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি স কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, তস্যাপি ন দেহাদ্যারম্ভকাণি কর্ম্মাণি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া তুমি আমাকে জানিতেছ, পরমার্থতঃ আমি তাহাদের কর্ত্তা নহি, যে কারণ ন ইত্যাদি। দেহাদির আরম্ভক অহঙ্কার নাই বলিয়া কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। সেই সকল কর্ম্মের ফলসমূহেও আমার স্পৃহা (অর্থাৎ) তৃষ্ণা নাই। যে সকল সংসারিগণের "আমি কর্ত্তা" এই প্রকার অভিমান আছে, কর্ম্মসমূহ তাহাদিগকেই লিপ্ত করিয়া থাকে, ইহাই উচিত। সেই প্রকার অভিমান না থাকা নিবন্ধন, কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। ইহা এই প্রকারই (জানিবে), অন্য ও যে কোন ব্যক্তি আমাকেই আত্মা বলিয়া জানে, আমি কর্ত্তা নহি, আমার কর্ম্ম ফলেও স্পৃহা নাই, এই প্রকার ভাবেই (যে আমাকে জানে) সে ব্যক্তিও কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না। কর্ম্ম সকল (অনুষ্ঠিত হইলেও) তাহার দেহাদির আরম্ভক হয় না, ইহাই অর্থ ॥ ১৪ ॥

---

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ এবং জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কৃতং, তস্মাৎ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং কর্ম্মৈব ত্বং কুরু ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—এই প্রকার জানিয়াই, পূর্ব্ব অতীত মুমুক্ষুগণও কার্য্য করিয়াছেন, এই কারণে অতীতমুমুক্ষুগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই অতি প্রাচীন (বৈদিক) কর্ম্ম তুমিও কর (তোমার বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে) ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য।—নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি এবমিতি। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি অতিক্রান্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ কুরু তেন কর্ম্মৈব, ত্বং ন তূষ্ণীমাসনং নাপি সন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈরপি অনুষ্ঠিতত্বাৎ যদ্যনাত্মজ্ঞস্ত্বং তদা আত্মশুদ্ধ্যর্থং, তত্ত্ববিচ্চেল্লোকসংগ্রহার্থং পূর্ব্বৈর্জনকাদিভিঃ পূর্ব্বতরং কৃতং নাধুনাতনং কৃতং নির্ব্বর্ত্তিতম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আমি কর্ত্তাও নহি, আমার কর্ম্মফলেও স্পৃহা নাই।

এই প্রকার ইত্যাদি। পূর্ব্ব (অর্থাৎ) অতীত মুমুক্ষুগণও এই প্রকার জানিয়া যে কারণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তুমি সেই কারণেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, বা সন্ন্যাস, তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। যে কারণে প্রাচীন মনীষিগণও কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, এই কারণে তোমার কর্ম্মই কর্ত্তব্য, তুমি যদি অনাত্মজ্ঞ হও, তবে আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, আর যদি তুমি তত্ত্বজ্ঞ হও, তবে লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; অতীত জনক প্রভৃতি মনীষিগণও এই কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, এই কর্ম্ম অধুনাতন নহে, ইহা অতি প্রাচীন (কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত আছে)॥ ১৫॥

---

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬॥

অন্বয়।—কিং কর্ম্ম (কর্ত্তব্যং), কিং অকর্ম্ম (ন কর্ত্তব্যং) (ইতি) অত্র (বিষয়ে) কবয়ঃ (বিদ্বাংসঃ) অপি মোহিতাঃ (মোহং প্রাপ্তাঃ), তৎ (তস্মাৎ) তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি, যৎ (কর্ম্ম) জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে॥ ১৬॥

মূলানুবাদ।—কোনটী কর্ম্ম (কর্ত্তব্য), কোনটী অকর্ম্ম (অকর্ত্তব্য), এই বিষয়ে বিদ্বান্‌গণও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এই কারণ আমি তোমাকে কর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি, যাহার জ্ঞান দ্বারা তুমি অশুভ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারিবে॥ ১৬॥

ভাষ্য।—তত্র কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তব্যং, ত্বদ্বচনাদেব করোম্যহং, কিং বিশেষিতেন পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতমিতি উচ্যতে, যস্মান্মহদ্বৈষম্যং কর্ম্মণি কথং কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম, কিং চ অকর্ম্মেতি কবয়ো মেধাবিনোঽপি অস্মিন্ কর্ম্মাদিবিষয়ে মোহিতাঃ মোহং গতাঃ। অতস্তে তুভ্যমহং কর্ম্ম অকর্ম্ম চ প্রবক্ষ্যামি, যজ্‌ জ্ঞাত্বা বিদিত্বা কর্ম্মাদি মোক্ষ্যসে অশুভাৎ সংসারাৎ॥ ১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—কর্ম্ম যদি করিতেই হয়, আমি তবে তোমার বচনানুসারেই করিব, এই কর্ম্ম চিরন্তন এবং অতীত মনীষিগণও ইহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, এই প্রকারে বিশেষণের উপন্যাস করিবার কি প্রয়োজন, ইহার উত্তর এই বলা যাইতেছে যে, যেহেতু কর্ম্মবিষয়ে মহৎ বৈষম্য (দেখিতে পাওয়া) যায়; কি প্রকার? (তাহা শুন) কিং কর্ম্ম ইত্যাদি। কি কর্ম্ম ও কি অকর্ম্ম, এই প্রকারে কর্ম্মবিষয়ে কবি (অর্থাৎ) মেধাবিগণও মোহিত

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত

# জ্ঞানযোগ।



স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ নামক ইংরাজী পুস্তকত্রয়ের বঙ্গানুবাদ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগের বঙ্গানুবাদ ১লা কার্ত্তিক হইতে উদ্বোধনের প্রতি সংখ্যায় এক ফর্ম্মা করিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। উদ্বোধনের গ্রাহক মহাশয়গণ উহা খুলিয়া যাহাতে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাঁধাইতে পারেন, এইরূপ ভাবে উদ্বোধনে উহা সন্নিবিষ্ট থাকিবে। জ্ঞানের চর্চ্চা বঙ্গদেশে অতি বিরল। অনেকের আবার জ্ঞানের উপর বিজাতীয় বিদ্বেষ দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ—জ্ঞান কি, সাধারণে সেই বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। এই জ্ঞানের ভিতর যে অতি সুন্দর কবিতা আছে, তাহা স্বামীজি তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দ্বারা ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকান্ বুধমণ্ডলীর নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল বক্তৃতার সময়ে বক্তা অনেক সময় এতদূর উত্তেজিত হইতেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী আপনাদের সভ্যতাসুলভ অভিমান ভুলিয়া প্রবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, কখন বা আপনাদের হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে করামলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন। হে বঙ্গভাষাভিজ্ঞগণ, আপনারাও যাহাতে সেই সকল তত্ত্বামৃত সম্ভোগ করিতে পারেন, যাহাতে আপনারাও সেই মায়াবাদের যুক্তিপূর্ণ গভীর রহস্য, মুক্তির প্রকৃত তত্ত্ব, সংসার ও সন্ন্যাসের সম্বন্ধ, অদ্বৈতবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা, উহার যুক্তি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অদ্বৈতজ্ঞান কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া' কিরূপে কার্য্য করা যাইতে পারে, তাহার তত্ত্ব—মোট কথা, জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে অতি সহজভাবে বুঝিতে পারেন, যাহাতে আবালবৃদ্ধবণিতা অতিসামান্য মনঃসংযোগেই শাস্ত্রীয় জটিল ও কূট তত্ত্ব সকলও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্য আমাদের এই উদ্যম। এই জ্ঞানযোগ কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তির চূড়া স্বরূপ। অথচ ইহা এত সরল যে, কেবল পাঠমাত্র করিলেই হৃদয়ে অপূর্ব্ব উদ্দীপনা উপস্থিত হইবে—বৈরাগ্যের ভাবে হৃদয় উদ্বেল হইবে এবং অদম্য কার্য্যকারিতা উপস্থিত হইবে।

---

# অম্বা-স্তোত্রম্।

## শ্রীমৎ স্বামিবিবেকানন্দ-বিরচিতম্।

### (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদ সহিত)

(১)

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্ম্মিভঙ্গৈঃ।
শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে॥

তুলি ঘোর উর্ম্মিভঙ্গে, মহাবর্ত্ত তার সঙ্গে,
এ ভব সাগরে কে মা খেলিতেছ বল না?
শিবময়ী মূর্ত্তি তোর, শুভঙ্করি এ কি ঘোর,
সুখ দুঃখ ধরি করে কর সবে ছলনা!
এই কি তোমার কায, সদা ব্যস্ত বিশ্বমাঝ,
অশান্ত ধরায় কি গো শান্তি দান বাসনা?

(২)

সম্পাদয়ন্ত্যবিরতং অবিরামবৃত্তা
যা বৈ স্থিতা কৃতফলং অকৃতস্য নেত্রী।
সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী
জানাম্যহং ধ্রুবমিদং ধৃতকর্ম্মপাশা॥

যে ছিঁড়েছে কর্ম্মপাশ, তারে করি চির দাস,
নিত্য শান্তিসুধারাশি পিয়াতেছ জননি,
কার্য্য করি ফল চায়, কৃত ফল দিতে তায়,
সদাই আকুল তুমি ওগো হরঘরণি,
জানি মা তোমায় আমি, কর্ম্মপাশে বাঁধ তুমি,
বেঁধো না বরদে মোরে, নাশ দুঃখরজনী।

(৩)

কো বা ধর্ম্মঃ কিমকৃতং ক কাপাললেখঃ
কিঞ্চাদৃষ্টং ফলমিহাস্তি হি যদ্বিনা ভোঃ।

ইচ্ছাপাশৈ র্নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ
যস্যা নেত্রী ভবতু সা শরণং মমাদ্যা॥

কি কারণে কার্য্যচয়, জগতে প্রকট হয়,
সুকৃত দুষ্কৃত কিম্বা ললাট লিখিত রে,
কেহ না দেখিয়া কূল, কহয়ে অদৃষ্ট-মূল,
ধর্ম্মাধর্ম্মে সুখদুঃখ এ নহে নিশ্চিত রে,
স্বতন্ত্র বিধানে যাঁর, বদ্ধ আছে এ সংসার,
সে মূল শক্তির আমি সদাই আশ্রিত রে।

( ৪ )

সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং
সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।
যস্যা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ॥

যাঁহার বিভূতিচয়, লোকপাল সমুদয়,
যাঁদের অমিত শক্তি কোন বাধা মানে না,
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, যে সাগরে নিরবধি,
সে অনন্ত জলনিধি যাঁহাদের রচনা,
প্রকৃতি বিকৃতিকারী, এই সব কর্ম্মচারী,
যাঁর বলে বলীয়ান্, কর তাঁরি অর্চ্চনা।

( ৫ )

মিত্রে শত্রৌ অবিষমং তব পদ্মনেত্রম্
স্বস্থে দুঃস্থে হ্ববিতথং তব হস্তপাতঃ।
মৃত্যুচ্ছায়া তব দয়া অমৃতঞ্চ মাতঃ
মা মাং মুঞ্চন্তু পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে॥

মা তোমার কৃপাদৃষ্টি, সমভাবে সুধাবৃষ্টি,
শত্রু মিত্র সকলের উপরেই করে গো,
সমভাবে ধনী দীনে, রক্ষা কর নিশি দিনে,
মৃত্যু বা অমৃত, দুয়ে তব কৃপা ঝরে গো,

যাচি পদে নিরুপমে, ভুলো না মা এ অধমে,
শুভ দৃষ্টি তব যেন সর্ব্ব তাপ হরে গো॥

( ৬ )

কাম্বা সদা ক্ব গুণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
ধত্তুং দোর্ভ্যামিব মতি র্জগদেকধাত্রীম্।
শ্রীসঞ্চিন্ত্যং সুচরণং অভয়প্রতিষ্ঠম্
সেবাসারৈরভিনুতং শরণং প্রপদ্যে॥

বিশ্বপ্রসবিণী তুমি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমি,
করিব তোমার স্তুতি বৃথা এই কল্পনা।
সীমাহীন দেশকালে, ধ'রে আছ বিশ্বজালে,
তোমায় ধরিতে হাতে উন্মাদের বাসনা,
অকিঞ্চন ভক্তধন, রমাভাব্য যে চরণ,
সে পদে শরণ পাই এই মাত্র কামনা।

( ৭ )

যা মামাজন্ম বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
অসংসিদ্ধেঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে বুদ্ধিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা সর্ব্বা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা॥

স্বরচিত লীলাগার, মনোহর এ সংসার,
সুখ দুঃখ লয়ে যথা নানা খেলা খেলিছ,
পূর্ণজ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হতে সুখ নাই,
দুঃখ পথ দিয়া মোরে করে ধরি চলিছ,
সফল নিষ্ফল হই, কভু বুদ্ধিহারা নই,
তোমারি প্রসাদে তুমি সদা মোরে রাখিছ,
তুমি গতি মোর তাই স্নেহে মাগো পালিছ।

ইতি শ্রীমদ্বিবেকানন্দস্বামিপাদবিরচিতং অম্বাস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

# গীতা-তত্ত্ব।

( স্বামী শুদ্ধানন্দ সঙ্কলিত। )

আজকাল গীতার চর্চ্চা সর্ব্বত্র। কি পাশ্চাত্যপ্রদেশে, কি এতদ্দেশে গীতার নাম শুনেন নাই, এমন লোক অতি বিরল। এই গীতা কত বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইল, আর ইহার উপর কত ভাষ্যটীকা টিপ্পনী হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। গীতা হিন্দুর বাইবেল, এ কথা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে, গীতাব্যাখ্যাত সত্যগুলি এত উদার যে, অনেক অন্যধর্ম্মাবলম্বী গীতাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে গৃহীত বা তদ্ধর্ম্মানুপ্রাণিত বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সর্ব্বদেশপূজিত, শত্রুমিত্রসমাদৃতা অমৃতময়ী গীতা সম্বন্ধে কোন আচার্য্য শিষ্যগণকে যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করেন, আমরা তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। এ বিষয়ে আমাদের কোন মতামত নাই। কেবল সুধীবর্গের চিন্তার জন্য এই উপদেশ সঙ্কলিত হইল।

"গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ। ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয় জানা আবশ্যক। ১ম,—গীতাটী মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত,অথবা বেদব্যাসপ্রণীত? ২য়,—কৃষ্ণ নামে কেহ ছিলেন কি না? ৩য়,—যে যুদ্ধের কথা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল কি না? ৪র্থ,—অর্জ্জুনাদি যথার্থ ঐতিহাসিক কি না? প্রথমতঃ, সন্দেহ হইবার কারণগুলি বুঝাইয়া দেওয়া যাউক। ১ম,—বেদব্যাস নামে অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্যাস বা দ্বৈপায়ন ব্যাস কে ইহার প্রণেতা? ব্যাস একটী উপাধিমাত্র। যিনি কোন পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই ব্যাসনামে পরিচিত। যেমন, বিক্রমাদিত্য—এই নামটীও একটী সাধারণ নাম। আরও, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য করিবার পূর্ব্বে গীতা-গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণে ততদূর পরিচিত ছিল না। তাঁহার পরেই গীতা সর্ব্বসাধারণে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বৌধায়ন ভাষ্য পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। একথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও ব্যাসকর্ত্তৃত্ব কতকটা সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু বেদান্তদর্শনের যে বৌধায়ন ভাষ্য ছিল, যাহা হইতে রামানুজ শ্রীভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শঙ্করের ভাষ্যেও যাঁহার নাম ও যাঁহার ভাষ্যের অংশবিশেষ পাওয়া যায়, যাঁহার কথা

লইয়া দয়ানন্দ স্বামী] প্রায়ই নাড়াচাড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষ খুঁজিয়া এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, রামানুজও অপর লোকের হস্তে একটী কীটদষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্তের বৌধায়ন ভাষ্যই যখন এতদূর অনিশ্চিততত্ত্বের অন্ধকারে, তখন গীতা সম্বন্ধে তৎকৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিতে চেষ্টা বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, গীতাখানি শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন।

২য়তঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে সন্দেহ এই :—ছান্দোগ্য-উপনিষদে একস্থলে পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোরনামা কোন যোগীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতে কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, আর বিষ্ণুপুরাণে গোপীদিগের সহিত বিহারকারী কৃষ্ণের কথা বর্ণিত আছে। আবার ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মদনোৎসব নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটীকেই লোকে দোলরূপে পরিণত করিয়া কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। তাহাতে রাসলীলা আদিও যে ঐরূপে চাপান হয় নাই, কে বলিতে পারে? পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আর, পূর্ব্বকালে লোকের নাম যশের আকাঙ্ক্ষা খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়াছে, যেখানে একজন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুরু অথবা অপর কাহারও নামে চালাইয়া দিয়া গেলেন। এইরূপ স্থলে সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের বড় বিপদ। পূর্ব্বকালে ভূগোলের জ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল না—অনেকে কল্পনাবলে ইক্ষু-সমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্র আদি রচিয়াছেন। পুরাণে দেখা যায়, কেহ অযুত বর্ষ, কেহ লক্ষ বর্ষ জীবন ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আবার বেদে পাই, 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ।' আমরা এখানে কাহার অনুসরণ করিব? সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা একরূপ অসম্ভব। লোকের একটা স্বভাবই এই যে, কোন মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্রের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অস্বাভাবিক কল্পনা করে। সম্ভবতঃ, কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজা ছিলেন। এ বিষয় খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীন কালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন।

আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদয় মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ নূতন ভাবে সমাজে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায়, প্রাচীন কালে এক একটী সম্প্রদায় উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে এক একখানি শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টী লোপ পাইয়াছে, শাস্ত্রখানি রহিয়া গেল। সেইরূপ গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব উচ্চ উচ্চ ভাব সকল নিবিষ্ট ছিল। ৩য়,—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে, কুরুপাঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা,—যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান ভক্তি, যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিক-লিপি-কুশল (Short-hand writer) ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যিনি সেই সমস্ত টুকিয়া লইয়া ছিলেন? কেহ কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রূপকমাত্র, ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য—সদসৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম; এ অর্থও অসঙ্গত না হইতে পারে। ৪র্থ—অর্জ্জুন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ এই,—শতপথব্রাহ্মণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহাতে একস্থলে সকল অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে সকল স্থলে অর্জ্জুনাদির নামগন্ধও নাই, অথচ পারীক্ষিত জনমেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে। অথচ মহাভারতাদিতে বর্ণনা—যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এখানে একটী কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্ম্মসাধন শিক্ষার কোন সংস্রব নাই। ঐগুলি যদি আজই প্রমাণিত হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে এত ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন আছে:—আমাদিগকে সত্য জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এদেশে এ সম্বন্ধে বড় সামান্য ধারণা আছে। অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটী ভাল বিষয় প্রচার করিতে হইলে, একটী মিথ্যা বলিলে যদি সেই প্রচারের সাহায্য হয়, তাহাতে কিছুমাত্র

দোষ নাই, অর্থাৎ The end justifies the means. এই কারণে অনেক তন্ত্রে পার্ব্বতী প্রতি মহাদেব উবাচ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের উচিত, সত্যকে ধারণা করা, সত্যে বিশ্বাস করা। কুসংস্কার মানুষকে এতদূর আবদ্ধ করিয়া রাখে যে, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন। তোমাদিগকে সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে।

এক্ষণে কথা হইতেছে,—গীতা-জিনিষটীতে আছে কি?—উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন, জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব সুন্দর গোলাপ, তাহার শিকড়, কাঁটা, পাতা সব সমেত। আর গীতাটী কি?—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজান—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে ও এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। এক্ষণে গীতা যে কয়েকটী প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্ব্বে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহার মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সমঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম্ম—এই নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থে আজ কাল অনেকে অনেকরূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে ত হৃদয়শূন্য পশুরা ও দেয়ালগুলিও নিষ্কামকর্ম্মী। অনেকে আবার জনকের উদাহরণে নিজেকে নিষ্কামকর্ম্মীরূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক ত পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইঁহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকবৎ পরিচিত হইতে চাহেন। প্রকৃত নিষ্কামকর্ম্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সকলজগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও

সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয় ভাব ও নিষ্কাম কর্ম—এই দুইটীই গীতার বিশেষত্ব।

এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক। 'তং তথা কৃপয়াবিষ্টং' ইত্যাদি শ্লোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জ্জুনের অবস্থাটী বর্ণিত হইয়াছে। তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,'—এই স্থানে অর্জ্জুনকে ভগবান্ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জ্জুনের বাস্তবিক সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সত্ত্বগুণী ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাঁহারা অন্য সময়ে যেমন শান্ত, বিপদের সময় তেমনি ধীর। অর্জ্জুনের ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে, যুদ্ধ প্রবৃত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই,—তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, আমরা সত্ত্বগুণী, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচিভাবে থাকিয়া মনে করেন, আমরা পরমহংস—কারণ শাস্ত্রে আছে, পরমহংসেরা জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ হইয়া থাকেন। পরমহংসদিগের সহিত বালকের তুলনা করা হয়, কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে, তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্মেষ মোটে হয়ই নাই। আলোকে পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃদু স্পন্দন উভয়ই দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু একটীতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটীতে উত্তাপের অত্যন্তাভাব বলিলেই হয়। সত্ত্ব ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ—সত্ত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিতে বড় ভালবাসেন। এখানে দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হইয়াছেন।

অর্জ্জুনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান্ কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতরে যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দাও,—ঠিক সেই ভাবেই ভগবান্ বলিতেছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি আপনাকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী, রোগী, শোকী করিয়া তুলিয়াছ—এ ত তোমার সাজে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'। জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই 'ভয়'। যে কোন কার্য্য তোমার ভিতরে শক্তির

উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য, আর যাহা তোমার শরীর মনকে দুর্ব্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,' তুমি বীর, তোমার এ সাজে না। তোমরা যদি জগৎকে এ কথা শুনাইতে পার, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে,' তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ সকল রোগ শোক পাপ তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উলটাইয়া দাও। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্,—যাও তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাঁহার বাহির দিকে দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেইদিকে দৃষ্টিপাত কর—সমগ্র জগৎকে বল, তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার।

এই একটী শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।

---

# ভারতের জাতীয় জীবন।

স্বামী সচ্চিদানন্দ লিখিত। ] [ ৪৬৩ পৃষ্ঠার পর।

ধর্ম্ম নিত্য, সৃষ্টির-বিবরণ, সেতু। অনন্তসৃষ্টির সঙ্গে, চিরকাল মানুষ নিত্য সত্যের জন্য কাঁদিবে, আর ভারত তাহাকে সান্ত্বনা দিবে,—এই ভারতীয় জীবনোদ্দেশ্য। যতদিন সৃষ্টির বৈষম্য বজায় রাখার জন্য থাকা দরকার, ততদিন অন্য জাতির জীবন নদী থাকিয়া, পরে বালুকাময় নদী-গর্ভাবশেষমাত্র হইবে। ভারতের জীবনস্রোত শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যারূপ সাগরের সহিত যুক্ত ; তাহার কার্য্যপ্রবাহের বিরাম নাই, কিন্তু জোয়ার ভাটা আছে। নাশ নাই, অবনতি আছে। মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতাধিকারের কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান অবনতির আরম্ভ। পূর্ব্বকালেও বোধ হয়, দু একবার তম আসিয়া ভারতের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল ; শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি সে সময়ে পতিত ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনা করেন। কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদ রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্য ভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য। দিবার পর রাত্রি, তার পর

আবার দিবা, বর্ষার পর শীত, শীতের পর বর্ষা, উত্থানের পর পতন, পতনের পর পুনরুত্থান—এ বৃত্তগতি জগতের নিয়ম; একদিকে অনন্ত উন্নতি বা অনন্ত অবনতি নাই। ভারত পড়িয়াছিল, আবার উঠিতেছে। এ প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পূর্ব্বকালীন পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এ পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য, বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

এ অবনতির কারণ—অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কেবল একমাত্র অন্তর্জগৎ লইয়া থাকা। নিত্যসত্যানুসন্ধানে সারা জীবন অতিবাহিত কর, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ, এ সব ভাল কথা। কিন্তু পারে ক জনে? যে মন আজ বহির্জগৎ লইয়া ব্যস্ত, তাহাকে শুধু বহির্জগৎ হইতে তুলিয়া লইলেই যে সর্ব্বসাধনার শেষ হইল, এমন নহে। যথার্থ বলিলে, এ কেবল সাধনার আরম্ভ। এই ত্যক্তবহির্জগৎবিষয় মনকে অতীন্দ্রিয় সত্যে দৃঢ়লগ্ন করিতে হইবে। মনের স্বভাব, বাধা না পাইলে, এলোমেলো ভাবা, নয়কে হয় করা। যতক্ষণ মন বহির্জগতে থাকে, বহির্জগৎ তাহার ঐ বিশৃঙ্খল গতি নিয়মিত করে; জলে আগুন ভ্রম হইলে, সে ভ্রম শুধ্রায়ে দেয়। জাগ্রতাবস্থায় এরূপ হয়ই না; যদি হয়, তা অল্পক্ষণের জন্য, পরক্ষণেই হুঁস্ হয়। স্বপ্নাবস্থায় মন নিরঙ্কুশ, যা ইচ্ছা তাই বানায়, মিথ্যাকে সত্য সাজায়; মানুষ পাখীর মত আকাশে ওড়ে। নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্জগতে অবস্থিত মনেরও এই বিপদ। সেথায় বহির্জগতের ভ্রমসংশোধনকারিণী দৃষ্টি একেবারেই নাই। চিত্তচিদাকাশস্থিত মনকে নীচু করিয়া মাঝে মাঝে বহির্জগতের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করাইলে, সে আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়া মিথ্যা সত্য মিশাইয়া ফেলে; ফল, কিম্ভূতকিমাকার না সত্য না মিথ্যা। ভারতবর্ষের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে, যোগী, ঋষি, তপস্বী, সন্ন্যাসী, বহির্জগৎ ছাড়িয়া একমাত্র অন্তর্জগৎ আশ্রয় করিতে যাইয়া, এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাহাতেই ধর্ম্মের অবনতি। শুধু ধর্ম্মে কেন—সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র, যে দিকে তাকাও, কেবল স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশি। দাক্ষিণাত্যের মন্দির গুলিতে দেখিবে, কতকগুলো হিজি বিজি মূর্ত্তি এক জায়গায় জড়ো করা, তার না আছে প্রাণ, না আছে অন্যোন্য সামঞ্জস্য। ছেলেগুলো ছবি আঁকে, দেখ্‌লে আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে; রামরাজার ছবি, রামের মুখ উত্তরদিকে, ত লক্ষ্মণের . মুখ

দক্ষিণে, ভরতের পূর্ব্বে, আর গীতার উর্দ্ধে। ভাব (Art) বলিয়া কিছুই নাই। সঙ্গীতেও তথৈবচ।

এখন উঠিতে হইবে। হয় উঠিতে হইবে, না হয় ধ্বংস; জগতে গতিহীন সম্পূর্ণ বিরাম অসম্ভব। চারিদিকে উন্নতি, অগ্রসর হও, এই কোলাহলের মধ্যে ভারতবর্ষের নিদ্রা কি বাঞ্ছনীয়, না সম্ভব? আর উঠিবে—ধর্ম্মের মধ্য দিয়া। রাজনীতিচর্চ্চা বা অন্য ধর্ম্মেতর আলোচনায় ভারতের প্রাণ স্পন্দিত হইবে না। মুষ্টিমেয় কৃতবিদ্য পাঁচ সাত জনের আস্ফালন সমগ্র জাতীয় জীবনের চিহ্ন নহে। আপামরসাধারণ ধর্ম্ম বোঝে, আপামরসাধারণের উদ্বোধনে জাতীয় উন্নতি; মুমূর্ষু ভারতের জীবনদায়িনী বিশল্যকরণী আপামরসাধারণসম্পত্তি ধর্ম্ম। যে বৈষম্যে ভারতজীবন গঠিত, তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে যাইলে বিষময় ফল উঠিবে। শত সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া ভারতের জীবন-স্রোত ধর্ম্ম পথে প্রবাহিত; কাহার সাধ্য, সে স্রোতের গতি অন্যদিকে উল্টাইয়া দেয়? দুই এক জায়গায় চড়া পড়িয়াছে, সত্য; চড়া কাটিয়া দেও, স্ববেগে নদী বহিতে থাকিবে। অশ্বত্থ-বৃক্ষ শুষ্কপ্রায় হইয়াছে বলিয়া, তাকে খর্জ্জুরে পরিবর্ত্তিত করিতে যাওয়া বাতুলতা। "এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ভারতজীবন কত শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া সংসারসূর্য্যের জরাদুঃখতাপে অলিতমস্তক পথিককে ছায়া দিয়া আসিতেছে; আজ তাহার দুই একটী শাখা ভগ্নপ্রায়, পতনোন্মুখ, প্রত্যেক হিন্দু ঘাড় পাতিয়া, কঙ্কালাবশেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার অবলম্বন হও; অনাবৃষ্টি হেতু বৃক্ষ শুষ্কপত্র, হৃদয়রুধিরে তাহার সিঞ্চন কর। নিজে ওঠো, পরকে উঠাও। মা ভৈঃ, জগদ্ধাত্রীর অমৃতপীযুষপানে তুমি অবিনাশী।

কিন্তু সাবধান! বলবান্ প্রবীণের ভার দুর্ব্বল শিশুর মাথায় অর্পণ করিও না। পুরুষসিংহোচিত ত্যাগ সকলের সাধ্য নহে; ভক্তি, প্রেম, সমাধি অনেক দূরের জিনিস। কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, বীরতেজে জীবন্ত ভগবৎ-প্রতিম মানুষের উপাসনা কর, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, কর্ম্মতপস্যা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ কর, বিরাট মাতৃভূমির পদে আত্মবলিদান কর, পুড়িতে—মরিতে শেখ, জড়তা ছাড়িয়া নড়িতে চড়িতে আরম্ভ কর, তখনই কর্ম্মক্ষয় হইবে, নিষ্কাম ভাবের অধিকারী হইবে। যার কিছু নাই, তার আবার ত্যাগ কি? কর্ম্ম, কর্ম্ম,—শেষনিশ্বাস পর্য্যন্ত। তার পর, অনেক পর, প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং,—অনেক পর, বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসম্। ( সমাপ্ত )

# ধর্ম্ম।

( স্বামী বিমলানন্দ লিখিত। )

শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন, "কেহ কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না।" ভগবদুক্ত এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করা বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। কি অন্তরে, কি বাহিরে, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখি কেবল কর্ম্ম। বহির্জ্জগতের যে সকল বস্তুকে আমরা চেতন বলিয়া থাকি, তাহাদের ত কথাই নাই, তাহারা ত দিবা রাত্র শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টায় ব্যস্ত; অচেতন বলিয়া যাহাদিগকে আমাদের ধারণা, তাহাদেরও এক অবস্থায় নিত্যস্থিতি অসম্ভব—তাহারাও ক্ষণকালের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া যখন ভিতরের দিকে চক্ষু ফিরাই, দেখি কর্ম্মস্রোতের খরতর বেগ। সে স্রোতের উপর অসংখ্য তরঙ্গ রঙ্গে ভঙ্গে খেলা করিতেছে। বাহ্য ইন্দ্রিয় স্থির, তবু দেখি মন মুহূর্ত্তের জন্য স্থির নয়,—কত কি করিতেছে, কতস্থানে যাইতেছে, সুখের আশায় মত্ত হইয়া কত আকাশ-কুসুম-সুশোভিত কল্পনা-কাননে বিচরণ করিতেছে, আবার কখন বা ভবিষ্যৎ দুঃখের আশঙ্কায় জড় সড় হইয়া নিরাশার নিবিড় আঁধারে নিপতিত হইতেছে।

এই অনন্তকালপ্রবাহী কর্ম্মস্রোতের উৎপত্তি কোথায়? কোথায় বা ইহার লয়? কোন্ শক্তির প্রেরণায় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে অহর্নিশি ছুটা ছুটী করিতেছে, আর কতদিনই বা এই অজ্ঞেয়স্বরূপা শক্তির অধীনে থাকিয়া এই রূপে ঘুরিবে—ইহা নির্ণয় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়। 'প্রকৃতিজ গুণসমূহ দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতেছি,' এ কথা বলিলে সেই বিচিত্র শক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় পাই না। "কর্ম্মফল" বলিলে কর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি বা অন্তিম পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ রহিয়া যায়। "এ সমস্ত কল্পনা মাত্র, বস্তুতঃ সেই এক অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র বিদ্যমান আছেন," অদ্বৈতবাদীর এই উত্তরের উপর স্বতঃই এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়,—শুদ্ধ বোধস্বরূপ অদ্বিতীয় সত্তার আবার দ্বৈতাভাস আইল কোথা হইতে? যেখানে দ্বিতীয় বস্তুর উপলব্ধি অসম্ভব, তাহাতে আবার বহু কল্পনা কিরূপে সম্ভবে?

"ঈশ্বরের ইচ্ছায় এ সমস্ত হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই আবার সমস্ত মিটিয়া যাইবে," দ্বৈতবাদীর এ উত্তরেও সকল শঙ্কার নিরাকরণ হয় না। ঈশ্বরকে যদি পূর্ণ বল, তবে তাঁহার আবার ইচ্ছা কি? ইচ্ছা ত অপূর্ণ জীবেই সম্ভবে।

যে দিকে যাই না কেন, সেই দিকেই কোন না কোন আপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হয়। তবে প্রত্যেক মনুষ্যই স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, কোন না কোন অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমরা কার্য্য করিয়া থাকি। এই অভাববোধই সকল কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ। বলিতে পার, রাজার আবার অর্থের অভাব কোথায়? তবে কেন তাঁহাকেও অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত দেখা যায়? শরীরে কোন প্রকার পীড়া নাই, তবু কেন ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীর লৌহ-সদৃশ দৃঢ় করিবার ইচ্ছা? রাজার অর্থের বাস্তবিক অভাব নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে অভাববোধ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তাঁহার যাহা আছে, তাহাতে তিনি যার পর নাই সুখে কাল যাপন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন—তাঁহার প্রাণের মধ্যে কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব সর্ব্বদাই রহিয়াছে—সংস্কারের বশে মনে করেন, আরও অধিক অর্থ হইলেই তাঁহার এই অভাববোধ চলিয়া যাইবে। শরীর বেশ সবল আছে, কোন কার্য্যই বন্ধ নাই, আহারটীও বেশ চলিতেছে—তবু মনে ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন, শরীর আরও সবল হইলে ভাল থাকিব। মা ষষ্ঠীর কৃপায় বাটীতে 'ন স্থানং তিলধারণে' তত্রাচ সন্তানের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। জয়নিনাদে দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু কোথায় কে একজন কি বলিয়াছে, সেই ভাবনাতেই বিঘূর্ণিত মস্তকে বসিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে স্পৃহা নাই, তাহাকেও একেবারে শান্ত দেখি না, সেও একবার এটা, একবার ওটা, এই রূপ করিয়া বেড়াইতেছে। যাঁহার সাংসারিক কোন দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিও কোন না কোন স্থানে কোন প্রকারের অভাব বোধ করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যিনি পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি অপরের কোন অভাব বোধ করিয়াছেন বলিয়াই, তাহার মোচনে ব্রতী। নির্ব্বাণলাভেচ্ছু সাধক

বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়াই প্রাণপণে নির্ব্বাণ লাভের জন্য যত্ন করিতেছেন। তবেই দেখিতেছি, সকল জীব কোন বস্তু বা অবস্থা বিশেষের অভাব বোধ করিয়াই কার্য্যে লিপ্ত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন বস্তু বা অবস্থার জন্য চেষ্টা হইলেও, সকলের মধ্যে একটী অভাববোধ সাধারণ ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণ হইতে বিশেষের উৎপত্তি, বিশেষ কখনও সাধারণের কারণ হইতে পারে না। অভাববোধটী সাধারণ, ইহা হইতেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের চেষ্টা, অর্থাৎ একমাত্র অভাববোধই ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

এই অভাববোধ আইসে কোথা হইতে? যদ্যপি আলোর জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে অন্ধকারের জ্ঞান কখনই সম্ভব হইত না, সুখ না জানিলে দুঃখ বোধ কিরূপে হইতে পারে? পরস্পরসম্বন্ধ (correlative) যাবতীয় পদার্থই অন্যোন্যাশ্রয়ী, অর্থাৎ একের জ্ঞান হইতেই তদ্বিপরীতের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন অভাব বোধ হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে ইহার বিপরীত অবস্থার উপলব্ধিও ভিতরে ভিতরে হইয়াছে—ভাব অর্থাৎ পূর্ণতার জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াই, অভাব বোধ করা সম্ভব। আবার যখন দেখিতেছি যে, এই অভাববোধ সর্ব্বদাই রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ভাবের জ্ঞানও অপ্রতিহতভাবে হৃদয়মধ্যে বিদ্যমান আছে। বিশেষ বিচারের পর দৃষ্ট হয় যে, অভাব বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই। যে বস্তুর যে অবস্থায় অবস্থিতি স্বাভাবিক বা আবশ্যক বলিয়া আমাদের ধারণা, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই আমরা অভাব বোধ করিয়া থাকি। আমি যদি মনে মনে ধারণা করিয়া রাখি যে অর্থ আমার আবশ্যক, তাহা হইলে অর্থ না পাইলে আমি অভাব বোধ করিব। যাহার সে ধারণা নাই, তাহার অভাববোধও হইতে পারে না। বিশেষ অভাবের কথা ছাড়িয়া পুনরায় সাধারণ অভাববোধ সম্বন্ধে এইরূপে বিচার করিলে বুঝিতে পারি যে, কেবল যে ভাব অর্থাৎ পূর্ণতার জ্ঞান আমাদের মধ্যে রহিয়াছে এমন নয়, সেই পূর্ণতায় অবস্থিতি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, ইহাও আমাদের ভিতরে ভিতরে ধারণা আছে। সে অবস্থায় থাকি না বলিয়াই, অভাব বোধ করি; অভাব বোধ করি বলিয়াই, কার্য্য করি; কার্য্য হইতেই ফলভোগ, আর ইহারই নাম সংসার। পারি যদি আমি আমার স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হইতে, তবেই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিব। যাহার যে

অবস্থায় স্থিতি স্বভাবসিদ্ধ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। জলের দ্রবত্বে অবস্থিতি স্বাভাবিক, সেই নিমিত্ত দ্রবত্ব জলের একটী ধর্ম্ম। পূর্ণতায় থাকা আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাই ইহাই আমার ধর্ম্ম।

---

# বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণ-বাদ।

( বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, লিখিত। )

কোন একটা ঘটনা ঘটিতে দেখিলেই, তাহার কোন কারণ আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া আমাদের স্বাভাবিক; তবে সেই কারণবোধ ব্যক্তি বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আকাশের কোণে কাল মেঘ দেখা দিল, কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই দিক হইতে বায়ু বহিল, মেঘও দ্রুত-গতিতে আসিয়া আকাশটাকে যেন ছাইয়া ফেলিল, বিদ্যুৎ চমকিল, বজ্র-নির্ঘোষ শ্রুত হইল, মুষলধারে বৃষ্টি হইল। আবার শান্তি আসিল, আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। এত বড় একটা ঘটনা দেখিয়া মানুষকে একটা সিদ্ধান্ত করিতেই হয় যে, কাল মেঘ দেখা দিল কেন? তবে অসভ্য অবস্থায় হয় ত স্থির করিতে হয়, সয়তানের ক্রোধ মানুষকে ভয়বিহ্বল করিবার জন্য অতবড় একটা আড়ম্বর করিয়া গেল। আবার যদি ঐ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতে কোন মানুষ মরিয়া গিয়া থাকে, তবে হয়ত স্থির করিয়া লইবে যে, ঐ মানুষটীর পাপেই দৈব বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, তাহার মৃত্যুতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল, কিন্তু দেশের পুণ্যে বৃষ্টিপাত হইয়া শস্যবৃদ্ধির কারণ হইল।

কবির নিকট ঐ ঘটনারই অন্যতর কারণ উপলব্ধি হইবে; তিনি হয় ত স্থির করিবেন, ইন্দ্র দেব, তাঁহার সম্বর্ত্ত আবর্ত্তাদি মেঘকে স্মরণ করিয়া শুষ্ক তৃণক্ষেত্রে জল সেচনে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। আবার হয় ত কোন অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত স্থির করিবেন যে, বায়ুবেগে পূর্ব্বে জলীয় বাষ্প বাহিত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছিল, ঐ বাষ্পে স্ফুরিত তড়িৎ শক্তি অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে উর্দ্ধতর বায়ু মণ্ডলীতে তাপের অল্পতা হওয়াতে বাষ্প মেঘাকারে পরিণত হইল। এইরূপে মেঘ একখানা স্ফুরিততড়িৎশক্তিমান প্রকাণ্ড দ্রব্যবিশেষ হইয়া দাড়াইল। তড়িৎ-

শক্তির প্রসিদ্ধ নিয়মে উহা নিম্নস্থ ভূতলে বিপরীত তড়িৎশক্তি স্ফুরণের কারণীভূত হইল এবং তাহার সহিত প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইল। কিন্তু মধ্যস্থ বায়ুমণ্ডলী তাহাদের মিশ্রণে বাধা দিতে লাগিল; ফল এই দাড়াইল যে, মেঘ গতিশীল হইয়া উঠিল, বায়ুরাশিও স্তরে স্তরে তড়িৎপূর্ণ হইয়া গতিশীল হইল,—ইহাকেই প্রবল বাত্যা বলিয়া আমরা জানিলাম। ইতিমধ্যে মেঘস্থ জলকণাদ্বারা বায়ুরাশিও কতক পরিমাণে আর্দ্র হইয়া মেঘে ও ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত দুই তড়িৎ সমষ্টির মিলনের যথাকথঞ্চিৎ পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। তথাপি মিলিবার সময় যে বাধা অতিক্রম করিতে হইল, তাহাতেই তাপ, আলোক ও শব্দের সৃষ্টি হইল, আমরা ইহাকেই বজ্রপাত বলিয়া বুঝিলাম।

এইরূপে মনুষ্য স্বীয় অবস্থা ও জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন কারণ অনুমান করিয়া থাকে। কিন্তু কারণ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা যে তাহার মনের স্বাভাবিক গুণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ঐ অনুসন্ধিৎসার উপরই নির্ভর করে। কোন ব্যাপার কেন ঘটিল? এই প্রশ্ন যাহার মনে উত্থাপিত না হয়, তাহার জ্ঞানলাভের কোন উপায় নাই। সকল কাজই যে মনে করে ভূতে করিয়া থাকে, তাহার নিজের করিবার বা বুঝিবার কিছুই নাই।

পক্ষান্তরে একথাও স্বীকার্য্য যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনার কারণ নির্ণয় করাও মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই জন্যই ভূতের কথা, অদৃষ্টের কথা, দৈবের কথা মনুষ্য সমাজে এত প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কারণ নির্দ্দেশ ও তাহাতে স্থিরবুদ্ধির নামই জ্ঞানলাভ। জ্ঞানলাভের ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং মনুষ্য যে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের অধিকারী, ইহাই তাহার অন্যতম নিদর্শন। সূর্য্য প্রত্যহ প্রাতে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তমিত হন। কেন এবং কিরূপে ইহা ঘটিয়া থাকে, সকল মানুষের নিকটই প্রশ্ন এই এক। ইহার উত্তর না মিলিলে মানুষের নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই। যাঁহার বেশী বিচার আসিল না, তিনি হয়ত দৈব বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন অর্থাৎ স্থির করিলেন যে, ভগবান্ সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করিয়া হুকুম দিয়াছেন, প্রত্যহ তুমি পূর্ব্বদিকে উঠিবে ও পশ্চিমদিকে শয়ন করিবে। অথবা হয়ত সূর্য্যের অদৃষ্টের কথাই মীমাংসা করিলেন অর্থাৎ স্থির করিলেন, বিশেষ শুভাদৃষ্টের ফলে জনৈক দিক্-পাল সূর্য্যরূপে পৃথিবীর হিতসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভূতের কথার মধ্যেও যে

কেহ ফেলিতে পারেন না, এমত নহে। সূর্য্যের অনুপস্থিতিতে ভূতের উৎপাতে হয়ত পৃথিবী উৎসন্ন যাইত, তাহাদিগের দমনার্থ সূর্য্যের ঐ গতি।

যাঁহারা কিছু ভাবনা চিন্তা রাখেন, তাঁহারা হয়ত স্থির করিবেন, সূর্য্য একটী নক্ষত্রবিশেষ; অপরাপর ব্যোমচারীও যেমন পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সূর্য্যও সেইরূপ করিতেছে। পৃথিবী অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় নিরলম্ব ভাবে আকাশে অবস্থিত। অতএব সমস্ত নক্ষত্রাদি যদি পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে, তাহা হইলে কাজে কাজেই সূর্য্যের উদয় পূর্ব্বদিকে ও অস্ত পশ্চিমদিকে হইবে। আবার সূক্ষ্মতর বিচারে হয়ত প্রতিপন্ন হইবে যে, সূর্য্য পৃথিবীকে ঘুরে না, পৃথিবীই নিজ মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিক্ মুখে প্রত্যহ একবার আবর্ত্তন করিতেছে; কাজেই সমস্ত গ্রহ তারকাদি ও সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে তাঁহারা ভূত, অদৃষ্ট বা দৈবের কথা দূর করিয়া বুদ্ধিগম্য কারণে প্রত্যক্ষবিষয়ের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু তাঁহাদিগকেই যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে, কেন পৃথিবীর উৎপত্তি হইল, অথবা কিরূপে ইহার সহিত সূর্য্যের বর্ত্তমান সম্বন্ধ ঘটিল, তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় দৈববাদ বা নির্ব্বাদ ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিতে হইবে, এক সময় এরূপ ঘটিয়াছিল, যাহাতে বর্ত্তমান সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়া থাকিবে। কেন?—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর নাই।

সকল 'কেন' র উত্তর মিলে না, কারণ আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

সে যাহাই হউক, ইহা একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃতির নিয়ম যতই আমাদিগের নিকট পরিচিত হইতে থাকে অর্থাৎ যতই আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই দৈববাদাদি নিরাকৃত হইয়া কার্য্য-কারণ-বাদ বিশদীকৃত হয়। বিজ্ঞান আলোচনা করিতে হইলে আমাদের প্রথম হইতেই স্থির করিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যেক কার্য্যের যুক্তি ও নিয়ম-সঙ্গত কারণ আছে, জগতে কোন ঘটনাই আকস্মিক, বা অহেতুক বা অনিয়মিত নহে। আজ যেটা আকস্মিক বা অহেতুক ভাবিয়া, অদৃষ্টাদির সাহায্যে মীমাংসা করিতেছি, সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে দেখা যাইবে, শত সহস্র ঘটনা ইহারই ন্যায় ঘটিতেছে এবং সকলেই কোন এক বিশেষ নিয়মের অন্তর্গত।

এস্থলে প্রথম হইতেই জানিয়া থাকা ভাল যে, এখানে 'বিজ্ঞান' শব্দ বিদেশীয় অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে অর্থাৎ যেখানে বিজ্ঞানের কথা হইবে, সেই খানেই পাশ্চত্য বিজ্ঞান বা জড়তত্ত্ব Physical science বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বর্ত্তমানে সভ্য জগৎ এই বিজ্ঞানোৎকর্ষে বলীয়ান্। ইংরাজ সমীপে ভারতের যদি কিছু শিক্ষণীয় থাকে, তবে এই বিজ্ঞানশাস্ত্র। বিজ্ঞানের অন্যতর ভিত্তিস্বরূপ উপরি উক্ত কার্য্যকারণবাদ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কেবলমাত্র এই মতটীতে কত শক্তি আনিয়া দেয়। মুমূর্ষু ভারতবাসীর পক্ষে অদৃষ্টবাদ, দৈববাদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারণবাদ প্রভৃতির পোষণ করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। দিন দিন ভারতবাসী রোগে, অনাহারে, নিরুৎসাহে জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহার স্থির ধারণা হওয়া উচিত যে, এ সকলের বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, অদৃষ্ট বা বিধিলিপি হইতে এ গুলি উৎপন্ন হইতেছে না। এই সকল বিপদ্-পাতের কারণানুসন্ধান বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহাই কেবল উল্লেখনীয় যে বিজ্ঞানচর্চ্চা দেশে উপযুক্ত রূপে প্রবেশ লাভ করিলে, সাধারণের বর্ত্তমান অবসন্ন মনোভাব তিরোহিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কারণ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্যতর মূলসূত্রই এই যে, কার্য্য মাত্রেরই প্রকৃতিনিয়মিত কারণ আছে।

---

# আমাদের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে। ] [ ৪৭০ পৃষ্ঠার পর।

ডিব্রুগড় ঘাট হইতে স্পেশাল ট্রেণে বড়লাট সদলে মার্গেরিটা যাত্রা করেন। পরে ডিগবয় নামক ষ্টেশনে রেল কোম্পানীর তৈলের কারখানা দেখিবার জন্য অবতরণ করেন। পরিদর্শন কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় গাড়িতে উঠিয়া মর্গেরিটা যাত্রা করিলেন। এতদুপলক্ষে ডিহিং-ব্রিজ নামক সেতুটীকে নানাবিধ পতাকা দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল;—সজ্জিত করিবার ভার স্থানীয় মেম সাহেব দিগের উপর ছিল, সুতরাং তাহা উত্তমই হইয়াছিল বলিতে হইবে—নতুবা লেডির অবমাননা—লাইবেল,

ডিফামেশন্ প্রভৃতি Criminal Proceedure Code'র অনেকগুলি ধারায় অভিযুক্ত হইবার আশঙ্কা আছে। যাহা হউক সার্দ্ধ তিন ঘটিকার সময় ট্রেণ সেতুর সন্নিকটে দেখাদিল। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। এ পারে আসিয়া পৌঁছিবা মাত্র সাহেব ও মেমগণ আগ্রহসহকারে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অবতরণ করাইলেন। ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া তাঁহারা নাগা সর্দ্দারগণকে দেখিলেন, কাফিয়ালগণকে দেখিলেন। এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অতীত হইলে লেডি কুর্জ্জন মহোদয়া শ্রীমতী হোল্ডার সহ ট্রলি আরোহণে শেষোক্ত মেমের বাঙ্গলায় শুভাগমন করিলেন। অন্যদিকে বড়লাট বাহাদুর সদলে সেই ট্রেণেই নিকটস্থিত refinery দর্শন করিতে গেলেন। আধঘণ্টার মধ্যে রিফাই-নরী দেখিয়া ফিরিয়া পুনরায় ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। অপরাপর সাহেবগণ, প্রাইবেট্ সেক্রেটারি, মিলিটারি সেক্রেটারি ইত্যাদি সমভিব্যাহারী পারিষদগণ, রেল কোম্পানীর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, আর বড়লাট বাহাদুর—লর্ড কুর্জ্জন রূপে—হোল্‌ডারদিগের বাঙ্গালায় গিয়া অতিথি হইলেন। মিঃ হোল্‌ডার স্থানীয় মাকুম-টী কোম্পানীর ম্যানেজার এবং ভলেণ্টিয়ার দলের কাপ্টেন। পুর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, লেডি কুর্জ্জন হোল্‌ডারদিগের বাঙ্গালায় গিয়া নদীতে (ডিহিং) মৎস্য ধরিবেন। আমরা তাহা দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম, আর হোল্ডার সাহেবের বাগানের নিম্নস্থিত ঘাট আমাদিগের বাঙ্গালা হইতে বেশ দেখা যায়; সেই একই নদী, জমিতে কেবল দুই একটা টিলার ব্যবধান মাত্র। যাহা হউক, সন্ধ্যা হইবার অনতিকাল পূর্ব্বে নদী-বক্ষে একখানি তরণী দৃষ্ট হইল। আরোহীদিগকে স্পষ্ট চিনিতে পারা যায় নাই, তবে যে ইঁহারা তাঁহারাই, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী ছিল না। তরণী উজানে বাহিয়া সবেগে আমাদিগের দিকে আসিতেছিল; কিন্তু বোধ হইল যেন আমাদিগকে দেখিয়াই তরণীর গতি স্থিরভাব ধারণ করিল। উজানে ৪০০।৫০০ ফুট উঠিলেই আমাদিগের সম্মুখীন হইতে হয়,—আমরা ৮।১০ জন বিভীষণ মূর্ত্তি মুরদাহেব বসিয়া থাকিতে নৌকা আর কিরূপে অগ্রসর হইতে পারে? বলা বাহুল্য, লাটদম্পতীর নৌকা-বিহারদর্শনমানসে কয়েকটী ভদ্রলোক আমাদিগের বাসায় সেদিন যথা সময়ে আসিয়া বারান্দায় বসিয়াছিলেন। তরণীর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, গাছের ছায়ায় নদীর জল

কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, তাহাতে তরণীর স্পষ্টদৃষ্টি অনেকটা কমিয়া গেল, কিন্তু তখনও তরণী দৃষ্টির বহির্ভূত হয় নাই। অন্ধকারের সঙ্গে তরণী ক্রমে মিলিত হইল, কিন্তু তাহার সন্নিকটে নদীতটে একটা লোক যেন আলোক লইয়া তরণী-আরোহীদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, এইরূপ অনুমান হইল; সুতরাং তখনও তরণীতে যে আরোহীগণ বিহার করিতেছিলেন, তাহা নিশ্চয়। এদিকে সূর্য্যাস্তকাল হইতেই ডিহিং-ব্রিজ আলোক-মালায় শোভিত হইয়াছিল;—ক্রমে যখন তাবৎ সেতুর উপরে, পার্শ্বে ও রেলিঙ্গের গাত্রে প্রদীপ সমুদয় জলিয়া উঠিল, তখন বড়ই শোভা হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে দিন আদৌ বৃষ্টি হয় নাই এবং সন্ধ্যার সময় বাতাসের বেগ ছিল না; এজন্য আলোকের খুব বাহার হইয়াছিল এবং যাহা হইল, সেতু নির্ম্মাণ হওয়া অবধি কখন তাহা ঘটে নাই—মার্গেরিটার তাহা কখনও হয় নাই। তবে যাহা হইল, তাহা আবার হওয়া সম্ভব।

পরদিন প্রাতে লাটসাহেব সদলে স্পেশাল ট্রেণে টিকক ও লিডু এই দুই স্থানের কয়লার খনি পরিদর্শন করিতে যান। বেলা প্রায় ১২টার সময় প্রত্যাগত হইয়া রেলওয়ে এজেণ্ট সাহেবের বাঙ্গালায় আমন্ত্রিত হয়েন। সেখানে দ্বিপ্রহরিক মহাভোজ হয়। কলিকাতার সেই সুবিখ্যাত গ্রেট-ইষ্টের্ণ-হোটেল কোম্পানী এখানে আসিয়া ভোজের বন্দোবস্ত করেন। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় সস্ত্রীক ও সদলে বড়লাট বাহাদুর রেলে চাপিয়া ডব্রুগড় যাত্রা করেন। স্থানীয় সাহেব মেমেরা three cheers দিয়া মহাজনগণকে বিদায় দিলেন। রাজ প্রতিনিধির কথায় এখানে ইতি।

একদিন সহসা কতকগুলা গাছপালার আবশ্যক হয়, কিন্তু এখানে কোন সাহেবের বাগান বা তদুপযোগী গাছপালাও নাই। দুই একটী সাহেবের গাছ পালার উপর ঈষৎ সখ আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের বাগানকে বাগান বলা যায় না, কারণ উহাতে কোন শৃঙ্খলা নাই এবং পারিপাট্যের বিশেষ অভাব। এ নাগাদ অনেক সাহেব সুবার বাড়ী ও বাগানবাগিচা দেখিলাম, কিন্তু এখানকার সাহেবদিগের ভাল বাঙ্গালাতেও বাগানের মত কিছু দেখিলাম না। যাহা হউক, সাহেবদিগের নিকট গাছপালা পাওয়া অসম্ভব দেখিয়া, কয়েকটা কুলি সংগ্রহ করিয়া জঙ্গলে গেলাম। জঙ্গলের আরম্ভ এখান হইতে আধ ক্রোশেরও কম। পাহাড় ভেদ করিয়া সরু পদরেখাবিচিহ্নিত পথ অনুসরণ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। খানিকদূর গিয়াই একটী নির্ঝরিণী পাই-

লাম। বর্ষাকালে উক্ত নির্ঝরিণী ২০।২৫ হস্ত বিস্তৃত হয়, এক্ষণে ১২।১৪ হইবে। গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিবার বাসনা আছে, কাজেই উহাকে কোন প্রকারে অতিক্রম করিতেই হইবে, কিন্তু ইংরাজী পোষাকে পার হওয়া অসম্ভব; অগত্যা একটা কুলির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উহা অতিক্রম করিলাম। উহাতে দু ফুট আন্দাজ জল এবং উহা খণ্ড খণ্ড প্রস্তরে পরিপূর্ণ। জলের প্রবাহ অতীব তেজস্বান এবং দ্রুত—ফুটা পড়িলে দুইখণ্ড হইয়া যায়। নির্ঝরিণী অতিক্রম করিয়া পুনরায় পাহাড়ে উঠিতে, প্রায় পঞ্চাশ ফুট উপরে এক স্থানে একটা ইষ্টকনির্ম্মিত অনতিউচ্চ পাকা ঘর দেখিতে পাইয়া, উহার মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম। নিকটে গিয়া দেখি যে, গৃহাভ্যন্তর হইতে ভয়ঙ্কর প্রবল বেগে ছয় ফুট বিস্তৃতি লইয়া অবিরাম ধারে জলপ্রবাহ বাহির হইয়া নির্ঝরিণীতে পড়িতেছে;—আর সেই গৃহাভ্যন্তরে ঝনাৎ—ঝনাৎ করিয়া একটা ভীষণ শব্দ হইতেছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, উক্ত নির্ঝরিণীর গতি এক বাঁক (turn) উপরে কিয়ৎ পরিমাণে আটক করিয়া সেই গৃহের মধ্যে আনীত হইয়াছে এবং তাহারই বেগে গৃহমধ্যস্থিত দুইখানা চক্র (wheel) ঘুরিতেছে, তাহাতেই সেই ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ উত্থিত হইতেছে; আর সেই বেগের হেতু আবশ্যকমত জল পাইপসংযোগে ৮০।৯০ ফুট উপরে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী মাকুম-চা-বাগিচায় চলিয়াছে। বিশেষ কাণ্ড কারখানা নাই, লোক জন নাই, অগ্নির সংস্পর্শ নাই—গভীর অরণ্যমধ্যে কল আপনা হইতে চলিতেছে। অনেকক্ষণ দেখিলাম ও মনে মনে বলিলাম, ধন্য ইংরাজ! ধন্য বিজ্ঞানশাস্ত্র! প্রবাহিণীকেও খাটাইয়া লইতে ছাড়িতেছে না। Hydraulic pressure principle ইহার মূল।

আবার কিছুদূর উপরে উঠিয়া দুই চারি ঘর নাগা দেখিলাম এবং এইখানে মনুষ্যপদচিহ্নিত পথ শেষ হইল। তখন সঙ্গস্থিত কুলিগণ জঙ্গল কাটিতে কাটিতে পথ করিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু দ্রুতগতি রোধ হইল। ক্রমে উপরে উঠিতেছি, যে দিকে তাকই সেই দিকেই—সম্মুখে, পশ্চাতে, আশে পাশে আকাশভেদী মহীরুহনিচয়ের ভীতিবিস্ময়োৎপাদক গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া একদিকে যেমন তাহাদিগের আক্রমণকারী ভাবে শরীর শিহরিয়া উঠে, অন্যদিকে পরক্ষণেই আবার আনন্দে হৃদয় মন উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সে ভাব বর্ণনা করা অসম্ভব—মুখে তাহা ব্যক্ত করা যায় না! সেই জঙ্গলময় পাহাড়ে উঠিতে নামিতে ৪০। ৪৫ মিনিট সময়ের মধ্যে

সেই একই নির্ঝরিণীকে তিনবার অতিক্রম করিতে হইল, সেই একই মানুষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া। অতঃপর একটা স্থানে উপস্থিত হইয়া বড় আরাম ও আনন্দ উপভোগ করিলাম—সে স্থানটা নির্ঝরিণীর কিনারায়, চারিদিকে পর্ব্বতমালা;—নির্ঝরিণী আঁকা বাঁকা ভাবে কাহার উদ্দেশে যেন নিরুদ্দেশ-প্রিয়জনের অন্বেষণে বাধা বিঘ্ন না মানিয়া খর তর বেগে চলিয়াছে। —পথিমধ্যে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া তাহার গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে, যেন বলিতেছে—'অত রাগ কেন? আমরা কি আর কেউ নই?' আর নির্ঝরিণী ক্রোধলজ্জাভিমানকম্পিত স্বরে কল্ কল্ শব্দে প্রস্তরগুলাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে। সে কল্ কল্, খল্ খল্ ছড় ছড় শব্দ নির্ঝরিণীর ভাঙ্গা প্রাণের অস্ফুট বুলি, কি গিরিরাজির ভগ্ন দেহের হা হুতাশ কাকুতি, তাহা বোধগম্য হইল না; অনেক চেষ্টা করিলাম, অনেক অপেক্ষা করিয়া নিকটে বসিয়া রহিলাম, এতদুভয়ের কেহই কিছু বুঝাইতে পারিল না, অথবা বুঝা ইল না;—আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিলাম। বনের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে ফিরিয়া আসিবার কথা ত ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, তবে অপরাহ্ণ অতীত হইয়া সন্ধ্যার দিকে দিনমণি ঝুঁকিলেন এবং শরীরও কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখন ভাবিলাম আর অগ্রসর হওয়া উচিত নহে, কারণ একেত বনজঙ্গল ভেদ করিয়া যাইতে হইতেছে, ফিরিবার কালে ঈষৎ অন্যমনস্ক বা দিশাহারা হইলেই বিপথে ও বিপদে পড়িবার আশঙ্কা আছে। তের চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে দারজিলিঙের জঙ্গলে একবার পথ হারাইয়া অনেক ঘুরিয়াছিলাম সে কথা মনে হইল। এখানে আর এক বিপদ—নাগাদিগের হস্তে। যে স্থানে ভ্রমণ করিতেছি, সে স্থানটা ব্রিটীশ সীমাভুক্ত হইলেও নাগাসীমারও অতিনিকট, যদি ভ্রমক্রমে তাহাদিগের সীমায় গিয়া পড়িয়া নাগাদিগের হস্তে পতিত হই এবং যদি তাহারা প্রাণেই বধ করে, তাহা হইলে কোন উপায় নাই। ব্রিটীশ সীমা অতিক্রম করিয়া নাগা দেশে যাইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অর্থাৎ স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার সাহেবের নিকট পাশ বা হুকুম লইতে হয়। সেই হুকুমের সহিত ডেপুটী কমিশনার লোক জনের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এতদবস্থায় নাগাদিগের হস্তে নিগৃহীত হইবার আশঙ্কা নাই; কোন বিপদ ঘটিলেও ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি যে মিসমী-অভিযান সদিয়া অভিমুখে গিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে মিসমীগণ সময়ে সময়ে ব্রিটীশ

প্রজাকে সুবিধায় পাইলে ধরিয়া লইয়া যায় এবং ততোধিক বর্ব্বরদিগের নিকট বিক্রয় করে এবং যাহারা ক্রয় করে, তাহারা নাকি সেই ক্রীত ব্যক্তিকে দেবতার সম্মুখে বলিদান করে ;—আদিম বর্ব্বরদিগের মধ্যে নরবলি এখনও চলিত আছে !

বিজন অরণ্যমধ্যে কত রকমের বৃক্ষ লতা গুল্ম দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কলিকাতা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানীয় বড় বড় সৌখীনের উদ্যানে যে সকল নানাবিধ বৃক্ষলতাদি দেখা যায় এবং অতি যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়, তাহার অনেক রকমই তথায় দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। ইচ্ছা হইল সবই দেশে লইয়া যাই। যাহা হউক, ঘুরিতে ঘুরিতে নির্ঝরিণীর আর একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম—সে স্থানটীর উভয় পার্শ্বেই সমুচ্চ পর্ব্বত, মধ্যদেশে দিয়া নির্ঝরিণী চলিয়াছে। তাহারই কিনারায় খানিকটা স্থান বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মনে হইল, কে যেন বন জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করতঃ প্রস্তর খণ্ড সকল বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। সে স্থানে আসিয়া বড় আরাম বোধ হইল। ক্ষণকাল তথায় বিশ্রাম লইলাম এবং তৃপ্তির সহিত সেই ঝরণ-নিঃসৃত নির্ম্মল শীতল বারি পান করিলাম। অতঃপর সূর্য্যাস্ত হইবার প্রাক্কালে সংগৃহীত উদ্ভিদ সমূহ সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। গিরিশ্রেণীপরিবেষ্টিত এই অগম্য অরণ্য মধ্যে যে স্থান আজ দেখিলাম, যে আনন্দ উপভোগ করিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না।

---

## রামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামী বিবেকানন্দ গত শ্রাবণ মাসে আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া প্যারিস্ নগরে আসিয়াছেন। স্বামীজি এবার আমেরিকায় অবস্থিতি কালে অধিকাংশ সময় ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশে বেদান্তপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়ায় প্রচার কার্য্যের আশাতীত ফল হইয়াছে। তথাকার অধিবাসীগণ বেদান্ত প্রচারের সুবিধার জন্য ১৬০ একার অর্থাৎ কমবেশী ৫৬০ বিঘা জমি প্রদান করিয়াছেন।

---

পূজা, ধ্যান, জপ, পাঠ, ভজন প্রভৃতি সাধন করিতে করিতে যদি দেখ, হৃদয়ে মানুষের প্রতি ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, না, তবে জানিবে তুমি ভগবানের নয়, ভুতের উপাসনা করিতেছ।

( অর্থাৎ ) মোহপ্রাপ্ত। এই কারণে আমি তোমাকে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি, যাহার জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি অশুভ ( অর্থাৎ ) সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবে॥ ১৬॥

---

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ॥ ১৭॥

অন্বয়।— হি ( যস্মাৎ ) কর্ম্মণঃ ( শাস্ত্রবিহিতস্য ) বোদ্ধব্যং ( অস্তি ) তথা বিকর্ম্মণঃ ( প্রতিষিদ্ধস্য ) বোদ্ধব্যং ( অস্তি। ) তথা অকর্ম্মণঃ ( অপি ) বোদ্ধব্যং ( অস্তি ) কর্ম্মণঃ গতিঃ ( তত্ত্বং ) গহনা ( দুর্জ্ঞেয়া )॥ ১৭॥

মূলানুবাদ।—যে কারণে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মবিষয়েও জ্ঞাতব্য আছে, এই প্রকার শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম ( অর্থাৎ ) কর্ম্মনিবৃত্তিবিষয়েও ( বহুতর ) জ্ঞাতব্য আছে, ( সেই কারণে ) কর্ম্মের তত্ত্ব অতিশয় দুর্জ্ঞেয়॥ ১৭॥

ভাষ্য।—নচৈতত্ত্বয়া মন্তব্যং কর্ম্ম নাম দেহাদিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধমকর্ম্ম চ তদক্রিয়া তূষ্ণীমাসনং কিং তত্র বোদ্ধব্যং ইতি। কস্মাদুচ্যতে—কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য হি যস্মাদপ্যস্তি বোদ্ধব্যং, বোদ্ধব্যং চাস্ত্যেব বিকর্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য, তথা অকর্ম্মণশ্চ তূষ্ণীম্ভাবস্য বোদ্ধব্যমস্তীতি ত্রিষপি অধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ। যস্মাৎ গহনা বিষমা দুর্জ্ঞানা কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণার্থং কর্ম্মাদীনাং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং গতির্যাথাত্ম্যং তত্ত্বমিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা তুমি বিবেচনা করিও না যে, দেহাদির চেষ্টাকে কর্ম্ম বলে, তাহা ত সর্ব্বলোক বিদিত, এইরূপ দেহাদির অক্রিয়াই অকর্ম্ম ( তাহাও সকলে জানে ), ( অর্থাৎ ) নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি, সুতরাং সেই বিষয়ে ( অধিক আর ) কি বুঝিতে হইবে? কেন? তাহাই বলা যাইতেছে যে, কর্ম্মণ ইত্যাদি। যে কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য আছে, ( সেইরূপ ) বিকর্ম্ম ( অর্থাৎ ) প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম বিষয়েও জ্ঞাতব্য আছে, এবং অকর্ম্ম ( অর্থাৎ ) নিস্তব্ধভাবে অবস্থান সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য আছে। বোদ্ধব্য ( অর্থাৎ জ্ঞাতব্য ) এই পদটীর অধ্যাহার তিন স্থলেই কর্ত্তব্য। কারণ, কর্ম্মের গতি ( অর্থাৎ ) তত্ত্ব গহন ( অর্থাৎ ) বিষম, দুর্জ্ঞেয়; কর্ম্ম এই পদটী প্রদর্শন মাত্র, এই শব্দের দ্বারা বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্মের গ্রহণ করিতে হইবে। কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়, ইহাই অর্থ॥ ১৭॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম পশ্যেত্ (তথা) যঃ অকর্ম্মণি কর্ম্ম চ পশ্যেত্, সঃ (এব) মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্, সঃ (এব) যুক্তঃ, সঃ (এব) কৃৎস্নকর্ম্মকৃত্ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দেখিয়া থাকে এবং অকর্ম্মেতে কর্ম্ম দেখিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ এবং সেই ব্যক্তি যুক্ত এবং সকল প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥ ১৮॥

ভাষ্য।—কিং পুনস্তত্ত্বং কর্ম্মাদের্যদ্বোদ্ধব্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং উচ্যতে কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণি, কর্ম্ম ক্রিয়তে ইতি ব্যাপারমাত্রং তস্মিন্ কর্ম্মণি, অকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি কর্ম্মাভাবে কর্তৃতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যোঃ বস্তু অপ্রাপ্যৈব হি সর্ব্ব এব ক্রিয়াকারকাদিব্যবহারঃ অবিদ্যাভূমাবেব কর্ম্ম যঃ পশ্যেত্ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু, স যুক্তো যোগী কৃৎস্ন কর্ম্মকৃত্ সমস্তকর্ম্মকৃচ্চ স ইতি স্তূয়তে কর্ম্মাকর্ম্মণোরিতরে-তরদর্শী। নহু কিমিদং বিরুদ্ধমুচ্যতে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিতি অকর্ম্মণি চ কর্ম্মেতি। নহি কর্ম্ম অকর্ম্ম স্যাদকর্ম্ম বা কর্ম্ম তত্র বিরুদ্ধং কথং পশ্যেদ্ দ্রষ্টা ? ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কর্ম্ম ও অকর্ম্ম প্রভৃতির যে বোদ্ধব্য তত্ত্ব বিষয়ে আমি বলিব, ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কি তাহাই বলিতেছি কর্ম্মণীত্যাদি। যাহা করা যায়, সেই ব্যাপার মাত্রকেই কর্ম্ম বলা যায়; সেই কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি কর্ম্মাভাব দেখিয়া থাকে। এই প্রকার অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মের অভাবেও যে ব্যক্তি কর্ম্ম দেখিয়া থাকে, (অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মনিবৃত্তিতে কি প্রকারে কর্ম্ম দেখিবে, এই প্রকার শঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়ই কর্ত্তার অধীন, (সুতরাং নিবৃত্তিতেও কর্তৃব্যাপার আছে, ইহা নিশ্চিত) প্রকৃত বস্তুর স্বরূপ না বুঝিয়াই, সকল প্রকার ক্রিয়াকারক প্রভৃতির ব্যবহার, অজ্ঞানক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। সেই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, সেই যুক্ত (অর্থাৎ) যোগী এবং সেই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (অর্থাৎ) সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠাতা। (এই সকল প্রশংসা বাক্যের দ্বারা) কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিবেকদর্শীর স্তুতি করা হইতেছে। (এই স্থলে এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে) কর্ম্মেতে যে অকর্ম্ম দর্শন করে ও অকর্ম্মেতে যে কর্ম্ম দর্শন করে ইত্যাদি বিরুদ্ধ বাক্য কি তাৎপর্য্যে বলা হইতেছে ? কর্ম্ম অকর্ম্ম হইতে পারে না এবং

অকর্ম্মও কর্ম্ম হইতে পারে না ; তাহাই যদি হইল, তবে দ্রষ্টা এই প্রকার বিরুদ্ধ দর্শন কি প্রকারে করিবে ? ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য।—নন্বকর্ম্মৈব পরমার্থতঃ সৎ কর্ম্মবদবভাসতে মূঢ়দৃষ্টের্লোকস্য তথা কর্ম্মৈব অকর্ম্মবৎ, তত্র যথাভূতদর্শনার্থমাহ ভগবান কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। অতো ন বিরুদ্ধং। বুদ্ধিমত্ত্বাদ্যুপপত্তেশ্চ বোদ্ধব্যমিতি চ যথাভূতদর্শনং উচ্যতে। ন চ বিপরীতজ্ঞানাদশুভান্মোক্ষণং স্যাদ্ যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি চোক্তং। তস্মাৎ কর্ম্মাকর্ম্মণী বিপর্য্যয়েণ গৃহীতে প্রাণিভিঃ—তদ্বিপর্য্যয়গ্রহণনিবৃত্ত্যর্থং ভগবতো বচনং কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যইত্যাদি। ন চাত্র কর্ম্মাধিকরণমকর্ম্মাস্তি কুণ্ডে বদরাণীব, নাপ্যকর্ম্মাধিকরণং কর্ম্মাস্তি কর্ম্মাভাবত্বাদকর্ম্মণঃ। অতো বিপরীতগৃহীতে এব কর্ম্মাকর্ম্মণী লৌকিকৈর্যথা মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকং শুক্তিকায়াং বা রজতম্ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—(একণে সিদ্ধান্ত কি ? তাহাই বলা হইতেছে) বাস্তবপক্ষে যাহা অকর্ম্ম (অর্থাৎ) পরমার্থ সৎ (ব্রহ্ম), তাহাই মূঢ়দৃষ্টি লোকের সমক্ষে কর্ম্মের ন্যায় প্রতিভাসমান হইয়া থাকে এবং কর্ম্মই (প্রপঞ্চ) অকর্ম্মের ন্যায় (পরমার্থসদ্ বলিয়া) প্রতীত হয়। এই কারণে (ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন তাহা) বিরুদ্ধ নহে। (ইহা যে বুঝিবে) সেই বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা, যে বুদ্ধিমত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহার উপপত্তি হইতে পারে এবং বোদ্ধব্যং ইত্যাদি বাক্যে যে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন হইতে পারে (যদি এই ভাবে এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করা যায়)। বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা অশুভ হইতে মোক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা জানিয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে ইহাও বলা হইয়াছে। সেই কারণে (ইহাই বর্ণনা করিতে হইবে যে) প্রাণিগণ কর্ম্ম ও অকর্ম্মকে বিপরীত ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকে ; সেই বিপরীত জ্ঞানকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দর্শন করে ইত্যাদি। বাস্তব পক্ষে এই জগতে কুণ্ড মধ্যে যেমন বদর ফল থাকে, সেইরূপ অকর্ম্মে কর্ম্ম থাকিবে, ইহা সম্ভবপর নহে ; এই প্রকার অকর্ম্মের অধিকরণও কর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ অকর্ম্মত কর্ম্মের অভাব স্বরূপ। এই কারণে (বলা গিয়াছে যে) মৃগতৃষ্ণায় জলের ন্যায় এবং শুক্তিকাতে রজতের ন্যা[illegible]ও জীবগণ কর্ম্ম ও অকর্ম্মকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে (ইহাই সংসারের স্বভাব) ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য।—ননু কর্ম্ম কর্ম্মৈব সর্ব্বেষাং ন ক্বচিদ্ব্যভিচরতি। তত্র নৌস্থস্য

নাবি গচ্ছন্ত্যাং তটস্থেষু অগতিষু নগেষু প্রতিকূলগতিদর্শনাৎ। দূরেষু চক্ষুষা অসন্নিকৃষ্টেষু গচ্ছৎসু গত্যভাবদর্শনাৎ। এবমিহাপি অকর্ম্মণি অহং করোমীতি কর্ম্মদর্শনং, কর্ম্মণি চ অকর্ম্মদর্শনং বিপরীতদর্শনং যেন তন্নিরাকরণার্থমুচ্যতে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। তদেতদুক্তপ্রতিবচনমপি অসকৃৎ অত্যন্তবিপরীতদর্শনভাবিততয়া মোমুহ্যমানো লোকঃ শ্রুতমপ্যসকৃত্তত্ত্বং বিস্মৃত্য মিথ্যাপ্রসঙ্গমবতার্য্য চোদয়তীতি পুনঃ পুনরুত্তরমাহ ভগবান্ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং চালক্ষ্য বস্তুনঃ। "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং" "ন জায়তে ম্রিয়তে" ইত্যাদিনা আত্মনি কর্ম্মাভাবঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়সিদ্ধ উক্তো বক্ষ্যমাণশ্চ। তস্মিন্ আত্মনি কর্ম্মাভাবে কর্ম্মবিপরীতদর্শনমত্যন্তনিরূঢ়ম্। ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কর্ম্ম কর্ম্মই (এবং অকর্ম্ম, অকর্ম্মই আছে) ইহার ব্যভিচার ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই প্রকার শঙ্কা করাও উচিত নহে, কারণ (দেখিতে পাওয়া যায় যে) নৌকারূঢ় ব্যক্তি, নৌকা চলিতে থাকিলে তটে স্থিত গতিহীন বৃক্ষ সমূহেও প্রতিকূল গতি দর্শন করিয়া থাকে এবং অতি দূরবর্ত্তী, সুতরাং চক্ষুর সহিত সম্যক্ প্রকারে অসম্বদ্ধ বস্তুনিকরের গতি থাকিলেও তাহা গতিহীন বলিয়াও লোকে দেখিয়া থাকে। এই প্রকারই এই সংসারে, অকর্ম্ম (অর্থাৎ) আত্মাতে কর্ম্ম (প্রপঞ্চ) দর্শন হইয়া থাকে এবং কর্ম্ম (অর্থাৎ) প্রপঞ্চে আত্মভ্রান্তি হইয়া থাকে, ইহাকেই বিপরীত দর্শন বলিয়া থাকে, ইহারই নিরাকরণ করিবার জন্য বলা হইতেছে যে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম ইত্যাদি। এই বিষয়ের উত্তর প্রদত্ত হইলেও, বারম্বার অত্যন্ত ভ্রান্তিজ্ঞানের দ্বারা ভাবিত হয় বলিয়া অতিশয় মোহপরায়ণ লোক, অনেকবার আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সদুপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিস্মৃত হয় এবং মিথ্যা প্রসঙ্গ সকলের বারম্বার অবতারণা করিয়া বৃথা নানাপ্রকার শঙ্কা করিয়া থাকে, এই কারণে ভগবান্ পুনঃ পুনঃ এই বিষয়ের উত্তর দিতেছেন। পরমার্থতত্ত্বের অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়ত্ব বিবেচনা করিয়াও (তিনি পুনঃ পুনঃ এই সকল উত্তর দিতেছেন), অব্যক্তোঽয়ং অচিন্ত্যোঽয়ং এই শ্লোক এবং ন জায়তে ম্রিয়তে ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, আত্মাতে কর্ম্ম হইতে পারে না, ইহা শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায়বলে সিদ্ধ এবং এই বিষয়ে আরও অনেক কথা বলা যাইবে। সেই অকর্ম্ম (অর্থাৎ) কর্ম্মাভাবরূপ আত্মাতে কর্ম্মরূপ বিপরীত পদার্থের ভ্রান্তিজ্ঞান চিরদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য।—যতঃ কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। দেহাদ্যাশ্রয়ং

কর্ম্ম আত্মনি অধ্যারোপ্য অহংকর্ত্তা মমৈতৎ কর্ম্ম ময়া ফলং ভোক্তব্যং ইতি চ তথাহং তূষ্ণীং ভবামি যেনাহং নিরায়াসোঽকর্ম্মা সুখী স্যামিতি কার্য্যকারণাশ্রয়-ব্যাপারোপরমং তৎকৃতং সুখিত্বমাত্মনি অধ্যারোপ্য ন করোমি কিঞ্চিৎ তূষ্ণীং সুখমাসমিত্যভিমন্যতে লোকঃ। তত্রেদং লোকস্য বিপরীতদর্শনাপনয়নায়াহ ভগবান্ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। অত্র চ কর্ম্ম কর্ম্মৈব সৎ কার্য্যকরণাশ্রয়ং কর্ম্মরহিতেঽবিক্রিয়ে আত্মনি সর্ব্বৈরধ্যস্তং যতঃ পণ্ডিতোঽপ্যহং করোমীতি মন্যতে। অত আত্মসমবেততয়া সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধে কর্ম্মণি নদীকূলস্থেষ্বিব বৃক্ষেষু গতিঃ প্রতিলোমেন অকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যথাভূতং গত্যভাবমিব বৃক্ষেষু যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কার্য্যকারণব্যাপারোপরমে কর্ম্মবদাত্মনি অধ্যারোপিতে তূষ্ণীমকুর্ব্বন্ সুখমাসে ইত্যহংকারাভিসন্ধিহেতুত্বাৎ তস্মিন্ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ। যত্রৈবং কর্ম্মাকর্ম্মবিভাগজ্ঞঃ স বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতো মনুষ্যেষু সযুক্তো যোগী কৃৎস্নকর্ম্মকৃচ্চ সোঽশুভান্মোক্ষিতঃ, কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণ (ভগবান্ই বলিয়াছেন যে) কি কর্ম্ম এবং কি অপকর্ম্ম, এই বিষয়ে পণ্ডিতগণও মোহিত। কর্ম্মের আশ্রয় দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, (কিন্তু) সেই দেহাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল আত্মাতে আরোপিত করিয়া (ভ্রান্ত জীব) ভাবিয়া থাকে যে "আমি কর্ত্তা, আমার ইহা কর্ম্ম, আমি ইহার ফলভোগ করিব।" এই প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারনিবৃত্তি এবং সেই নিবৃত্তিজনিত সুখিত্বও আত্মাতে আরোপিত করিয়া (ভ্রান্ত জীব) বোধ করিয়া থাকে যে, আমি এক্ষণে কিছুই করিতেছি না, আমি স্থির হইয়া রহিয়াছি এবং (নিষ্ক্রিয়ত্বপ্রযুক্ত) আমি এক্ষণে সুখী" ইত্যাদি। সেই এই প্রকার স্বভাবাক্রান্ত সংসারের লোকের এই প্রকার বিপরীত দর্শন নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান্ "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম" ইত্যাদি এই বাক্য বলিয়াছেন। এই স্থলে (ইহাও দেখিতে হইবে যে) কর্ম্ম কর্ম্মই (আছে) এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিই কর্ম্মের আশ্রয়, (তথাপি) সেই কর্ম্ম অবিক্রিয় সুতরাং কর্ম্মরহিত আত্মাতে সকল লোকেই আরোপ করিয়া থাকে, কারণ (দেখিতে পাওয়া যায় যে) "আমি করিতেছি" এই প্রকার অভিমান পণ্ডিতেরও আছে। এই কারণে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া কর্ম্ম সকলের জ্ঞানগোচর হইলেও, প্রতিলোমভাবে অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মের (ঐকান্তিক) অভাব যে ব্যক্তি প্রকৃতভাবে দর্শন করিয়া থাকে (যেমন নৌকারূঢ় ব্যক্তির নিকট তীরস্থ বৃক্ষনিকরে গতি প্রতীত হইলেও, বিবেকদর্শী ব্যক্তি ঐ সকল বৃক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে গতির অভাবই বিলোকন করেন), এইরূপ অকর্ম্ম অর্থাৎ

কার্য্যাকরণপ্রভৃতি ক্রিয়ার অভাব (যাহা কর্ম্মের ন্যায় আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে, কারণ ঐ সকল ব্যাপারাভাব লোক আত্মাতে আরোপ করিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকে যে, "আমি কিছুই এইক্ষণে করিতেছি না, আমি বেশ সুখে আছি" ইত্যাদি) ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার অভাবেও যে ব্যক্তি কর্ম্ম (অর্থাৎ) সংসারধর্ম্ম রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতরূপে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিভাগ বুঝিয়া থাকে সেই ব্যক্তি মনুষ্যগণের মধ্যে পণ্ডিত এবং সেই ব্যক্তিই যোগী এবং সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং সেই ব্যক্তিই সকল প্রকার অশুভ হইতে মোচিত হইয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ১৮॥

ভাষ্য।— অয়ং শ্লোকোঽন্যথা ব্যাখ্যাতঃ কৈশ্চিৎ; কথং নিত্যানাং কিল কর্ম্মণামীশ্বরার্থেঽনুষ্ঠীয়মানানাং তৎফলাভাবাদকর্ম্মাণি তান্যুচ্যন্তে গৌণ্যা বৃত্ত্যা। তেষাঞ্চাকরণমকর্ম্ম তচ্চ প্রত্যবায়ফলত্বাদ কর্ম্মোচ্যতে গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা। তত্র নিত্যে কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ফলাভাবাৎ যথা ধেনুরপি গৌর-গৌরুচ্যতে ক্ষীরাখ্যং ফলং ন প্রযচ্ছতীতি তদ্বৎ। তথা নিত্যাকরণে ত্বকর্ম্মণি কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ নরকাদিপ্রত্যবায়ফলং প্রযচ্ছতীতি। নৈতদ্যুক্তং ব্যাখ্যানং এবং জ্ঞানাদশুভান্মোক্ষানুপপত্তেঃ। যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি ভগবতোক্তং বচনং বাধ্যেত। কথং নিত্যানাং অনুষ্ঠানাদশুভাৎ স্যান্নাম মোক্ষণং নতু তেষাং ফলা-ভাবজ্ঞানাৎ নহি নিত্যানাং ফলাভাবজ্ঞানং অশুভমুক্তিফলত্বেন চোদিতং নিত্যকর্ম্মজ্ঞানং বা নচ ভগবতৈবেহোক্তম্॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—কোন কোন পণ্ডিত এই শ্লোকটীর আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কি প্রকার? (তাহা বলা যাইতেছে) ঈশ্বরার্থ যাহার অনু-ষ্ঠান করা যায়, সেই সকল নিত্যকর্ম্মই অকর্ম্ম শব্দের প্রতিপাদ্য, কারণ ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা সংসারবন্ধরূপ ফল হয় না। কর্ম্মশব্দের এই প্রকার অর্থ (অবশ্য) গৌণীবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে (গৌণীবৃত্তি লক্ষণাবিশেষ অভিধেয় অর্থের অন্বয় বাধিত হইলে অভিধেয় অর্থের সদৃশ আর একটি বস্তু শব্দের যে শক্তিবিশেষের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় সেই লক্ষণাশক্তিকেই গৌণীবৃত্তি বলা যায়)। নিত্য কর্ম্মসমূহের অকরণ কর্ম্মশব্দের অর্থ; নিত্যকর্ম্ম না করিলে যেহেতু নরকাদি প্রত্যবায়রূপ ফল হয় এই কারণে নিত্যকর্ম্মের অকরণও গৌণীবৃত্তির দ্বারা কর্ম্মশব্দের অর্থ (বলিয়া বুঝিতে হইবে); তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি নিত্যকর্ম্মে ফল (নরকাদি) হয় না বলিয়া তাহাকে অকর্ম্ম বলিয়া বোধ

করে (যেমন ধেনু গৌ হইলেও যদি দুগ্ধাদি ফল না দেয় তাহা হইলে তাহাকে অগৌ বলা যায়, সেইরূপ নিত্যকর্ম্মের অকরণরূপ অকর্ম্মে যে ব্যক্তি নরকাদি ফলদায়িত্ব আছে বলিয়া কর্ম্মজ্ঞান করিয়া থাকে) সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্ (ইত্যাদি), এই প্রকার ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা অশুভ হইতে মোক্ষলাভ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে, "যাহা জানিয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে" এই প্রকার ভগবানের বাক্য বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। কি প্রকারে? (তাহা বলি) নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অশুভ হইতে মোক্ষ হইতে পারে ইহা স্বীকার করিতে পারা যাইলেও নিত্যকর্ম্মের ফল নাই এই প্রকার জ্ঞানমাত্রেই যে অশুভ হইতে মোক্ষ হইবে ইহা কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। নিত্যকর্ম্মের ফলাভাব-জ্ঞান অশুভ-মোক্ষের কারণ বলিয়া কোন স্থলে বিহিত হয় নাই, এবং নিত্যকর্ম্মের জ্ঞানও অশুভের মোক্ষহেতু বলিয়া কোন স্থলে উক্ত হয় না; ভগবানও এই প্রকার কথা গীতা-শাস্ত্রের কুত্রাপিও বলেন নাই॥ ১৮॥

ভাষ্য।—এতেনাকর্ম্মণি কর্ম্ম দর্শনং প্রত্যুক্তং নহ্যকর্ম্মণি কর্ম্মেতি দর্শনং কর্ত্তব্যতয়েহচোদ্যতে নিত্যস্য তু কর্ত্তব্যতা মাত্রং। নচাকরণান্নিত্যস্য প্রত্যবায়ো ভবতীতি বিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলং স্যাৎ। নাপি নিত্যাকরণং জ্ঞেয়ত্বেন চোদিতং। নাপি কর্ম্মাকর্ম্মেতি মিথ্যাদর্শনাদশুভান্মোক্ষণং বুদ্ধিমত্ত্বং যুক্ততা কৃৎস্নকর্ম্মকৃত্ত্বাদি ফলমুপপদ্যতে স্তুতির্বা। মিথ্যাজ্ঞানমেবহি সাক্ষাদশুভরূপং কুতোঽন্যস্মাদশুভান্মোক্ষণং। নহিতমস্তমসো নিবর্ত্তকং ভবতি॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই দোষ আছে বলিয়া অকর্ম্মেতে কর্ম্মদর্শন (করিতে হইবে এই প্রকার ব্যাখ্যাও যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া) নিরস্ত হইতেছে। অকর্ম্মেতে কর্ম্ম দর্শন করিতে হইবে এই প্রকার এই স্থানে বিহিত হইতেছে ইহা বলা যায় না; নিত্যকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় হয় বলিয়া তাহার জ্ঞানে যে অশুভনিবৃত্তিরূপ কোন ফল হইবে তাহা হইতে পারে না। নিত্যকর্ম্মের অকরণ এস্থলে জ্ঞেয় বলিয়াও বিহিত হইতেছে না। কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলিয়া দর্শন করাকে মিথ্যাজ্ঞান কহে সেই মিথ্যাজ্ঞান হইতে অশুভ নিবৃত্তি বুদ্ধিমত্তা যুক্ততা ও কৃৎস্নকর্ম্মকারিত্বাদিরূপ (গীতোক্ত) ফল হইতে পারে ইহা সম্ভবপর নহে এবং এতাদৃশ মিথ্যাজ্ঞানের স্তুতিও সম্ভবপর নহে। মিথ্যাজ্ঞানই সাক্ষাৎ অশুভরূপ। তাহার দ্বারা আবার কি প্রকারে অন্য অশুভ হইতে মোক্ষলাভ হইবে? অন্ধকার অন্ধকারের নিবর্ত্তক হইতে পারে না॥ ১৮॥

ভাষ্য।—নন্থ কর্ম্মণি যদকর্ম্মদর্শনং অকর্ম্মণি বা কর্ম্মদর্শনং ন তন্মিথ্যা জ্ঞানং কিং তর্হি গৌণং ফলাভাবনিমিত্তং। ন কর্ম্মাকর্ম্মবিজ্ঞানাদপি গৌণাৎ ফলস্যাশ্রবণাৎ। নাপি শ্রুতহান্যশ্রুতপরিকল্পনয়া কশ্চিদ্বিশেষোলভ্যতে। স্বশব্দেনাপি শক্যং বক্তুং নিত্যকর্ম্মণাং ফলং নাস্তি অকরণাচ্চ তেষাং নরকপাতঃ স্যাদিতি। তত্র ব্যাজেন পরব্যামোহরূপেণ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদিনা কিম্। এবৈবং ব্যাচক্ষণেন ভগবতোক্তবাক্যং লোকব্যামোহার্থং ইতিব্যক্তং কল্পিতং স্যাৎ। নচৈতচ্ছদ্মরূপেণ বাক্যেন রক্ষণীয়ং বস্তু নাপিশব্দান্তরেণ পুনঃ পুনরুচ্যমানং সুবোধং স্যাদিত্যেবং বক্তুং যুক্তং কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ইত্যত্রহি স্ফুটতর উক্তোহর্থো ন পুনর্ব্বক্তব্যো ভবতি। সর্ব্বত্র চ প্রশস্তং বোদ্ধব্যং চ কর্ত্তব্যমেব ন নিষ্প্রয়োজনং বোদ্ধব্য মিত্যুচ্যতে ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ। যদি বল কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দর্শন কিংবা অকর্ম্মেতে কর্ম্ম দর্শন মিথ্যা দর্শন নহে কিন্তু ফলাভাবরূপ সাম্য নিবন্ধন গৌণদর্শন (কোন একটী শব্দের দ্বারা তাহার শক্যার্থ প্রকাশ না করিয়া শক্যার্থের সদৃশ অর্থ যদি লক্ষণা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে সেই শক্যার্থ সদৃশ বস্তুর জ্ঞানকে গৌণদর্শন কহা যায় বস্তুর স্বরূপ একেবারে না বুঝিয়া তাহাকে অন্য রূপে যদি বুঝা যায় তাহা হইলে ঐ জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান কহা যায় যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান কিন্তু উহা গৌণদর্শন নহে। তেজস্বী কোন পুরুষকে দেখিয়া যদি বলা যায় যে এই ব্যক্তি সিংহ তাহা হইলে এই সিংহ শব্দের শক্যার্থ সদৃশ ঐ তেজস্বী ব্যক্তির যে জ্ঞান সিংহ শব্দের দ্বারা হইয়া থাকে তাহাকে গৌণসিংহ জ্ঞান কহে এই প্রকার জ্ঞানকেই গৌণদর্শন কহে ইহা মিথ্যা জ্ঞান হইতে পারে না তাহার কারণ এই যে এইরূপ স্থলে প্রকৃত বস্তুর স্বরূপ না বুঝিয়া অন্যরূপে তাহার জ্ঞান হয় না।) তাহাও ঠিক নহে কারণ গৌণ কর্ম্মাকর্ম্ম বিজ্ঞান হইতেও কোন প্রকার ফল শাস্ত্রে শ্রুত হয় নাই। এই প্রকার শ্রুত হানি এবং অশ্রুত পরিকল্পনা করিয়া কোন বিশেষ ফললাভ হইতেছে তাহাও বলা যায় না। স্পষ্ট শব্দের দ্বারাও ত ইহা বলা যাইতে পারিত যে নিত্যকর্ম্মের করণে কোন প্রকার ফল নাই। কিন্তু তাহাদিগের অকরণে নরকে পতন হয়। এই প্রকার স্পষ্টভাবে বলা সম্ভবপর হইলেও কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদিরূপে পরব্যামোহকর কপটমার্গ অবলম্বন করিবার প্রয়োজন কি? এই প্রকার কপট বাক্যের দ্বারা কোন বস্তুকে রক্ষা করিতে হইবে তাহাও বলা যায় না। এই প্রকার বক্র রীতিতে বারংবার অন্য শব্দের দ্বারা উপদেশ

# জ্ঞানযোগ।

## সন্ন্যাসীর গীতি।

( ১ )

উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রি শিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে, পর্ব্বত-প্রদেশে,
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে—
যে সঙ্গীত-ধ্বনি-প্রশান্ত- লহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি,
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ,
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ ত্রিবেণী—
—সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি—
উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও গাও সেই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ২ )

ভেঙ্গে ফেল শীঘ্র চরণ শৃঙ্খল—
সোণার নির্ম্মিত হলে কি দুর্ব্বল,
হে ধীমান্, তারা তোমার বন্ধনে?
ভাঙ্গ শীঘ্র তাই ভাঙ্গ প্রাণপণে।
ভালবাসা-ঘৃণা, ভাল-মন্দ দ্বন্দ্ব,
ত্যজহ উভয়ে, উভয়েই মন্দ।
আদর দাসেরে, কশাঘাত কর,
দাসত্ব তিলক ভালের উপর—

স্বাধীনতা বস্তু কথন জানে না,
স্বাধীন আনন্দ কভু ত বুঝে না।
তাই বলি, ওহে সন্ন্যাসি-প্রবর,
দূর কর দুয়ে অতীব সত্বর।
কর কর গান কর নিরন্তর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ৩ )

যাক্ অন্ধকার, যাক্ সেই তমঃ,
আলেয়ার মত বুদ্ধির বিভ্রম
ঘটায়ে, আঁধার হইতে আঁধারে
নিয়ে যায় এই ভ্রান্ত জীবাত্মারে।
জীবনের এই তৃষা চিরতরে
মিটাও জ্ঞানের বারি পান করে।
এই তমঃ রজ্জু জীবাত্মা পশুরে
জন্মমৃত্যুমাঝে আকর্ষণ করে।
সেই সব জিনে—নিজে জিনে যেই,
ফাঁদে পা দিও না, জেনে তত্ত্ব এই।
বলহ সন্ন্যাসী, বল বীর্য্যবান্,
করহ আনন্দে কর এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ৪ )

'কৃতকর্ম্মফল ভুঞ্জিতে হইবে',
বলে লোকে, 'হেতু কার্য্য প্রসবিবে,
শুভ কর্ম্ম—শুভ, মন্দে—মন্দ ফল,
এ নিয়ম রোধে নাহি কার বল।
এ মর-জগতে সাকার যে জন,
শৃঙ্খল তাহার অঙ্গের ভূষণ।'
সত্য সব, কিন্তু নামরূপপারে
নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।

জানো তত্ত্বমসি, করো না ভাবনা—
করহ সন্ন্যাসী, সদাই ঘোষণা—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ৫ )

সত্য কিবা তারা জানে না কখন,
সদাই যাহারা দেখয়ে স্বপন—
—পিতা মাতা জায়া অপত্য বান্ধব—
আত্মা ত কখন নহে এই সব,
নাহি তাহে কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ।
নাহিক জনম, নাহি খেদাখেদ।
কার পিতা তবে, কাহার সন্তান?
কার বন্ধু, শত্রু কাহার, ধীমান?
একমাত্র যেবা—যেবা সর্ব্বময়,
যাহা বিনা কোন অস্তিত্বই নয়,
তত্ত্বমসি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
উচ্চরবে তাই এই তান ধর,
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ৬ )

একমাত্র মুক্ত—জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয়,
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া,
সাক্ষীর স্বরূপ—সদাই বিদিত,
প্রকৃতি জীবাত্মারূপে প্রকাশিত,
তত্ত্বমসি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
ধর ধর ধর উচ্চে তান ধর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ৭ )

অন্বেষিছ মুক্তি কোথা বন্ধুবর,
পাবে না ত হেথা, কিম্বা এর পর,

শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ—
নিজ হস্তে রজ্জু—যাহে আকর্ষণ,
ত্যজ অতএব বৃথা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্ন্যাসী,
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ৮ )

ভেব না দেহের হয় কিবা গতি—
থাকে কিম্বা যায়—অনন্ত নিয়তি—
কার্য্য অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারব্ধের অধিকার,
কেহ বা উহারে মালা পরাইবে—
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে—
কিছুতেই চিত্ত-প্রশান্তি ভেঙ্গ না,
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা।
কোথা অপযশ—কোথা বা সুখ্যাতি ?
স্তাবক স্তাব্যের একত্ব প্রতীতি,
অথবা নিন্দুক নিন্দ্যের যেমতি।
জানি এ একত্ব আনন্দ-অন্তরে
যাও হে সন্ন্যাসী, নির্ভীক-অন্তরে—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ৯ )

পশিতে পারে না কভু তথা সত্য—
কাম লোভ বশে যেই হৃদি মত্ত—
কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যে জন,
হয় না তাহার বন্ধন-মোচন।
কিম্বা কিছু দ্রব্যে যার অধিকার—
হউক সামান্য—বন্ধন অপার—
ক্রোধের শৃঙ্খল কিম্বা পায়ে যার,
হইতে না পারে কভু মায়া পার।

ত্যজ অতএব, এ সব বাসনা,
আনন্দে সদাই করহে ঘোষণা—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ১০ )

সুখ তরে গৃহ কোরো না নির্ম্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে মহান
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস—
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও।
হউক কুৎসিৎ, কিম্বা সুরক্ষিত,
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত,
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
কোন্ খাদ্যপেয় অপবিত্র করে?
হও তুমি চল স্রোতস্বতী মত,
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য প্রবাহিত,
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ১১ )

তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয়,
অতত্ত্বজ্ঞ তোমা হাসিবে নিশ্চয়।
হে মহান্, তোমা করিবেক ঘৃণা,
তাহাদের দিকে চেয়েও দেখ না।
স্বাধীন,উন্মুক্ত—যাও স্থানে স্থানে,
অজ্ঞান হইতে উদ্ধার অজ্ঞানে—
মায়া-আবরণে ঘোর অন্ধকারে,
নিয়তই যারা যন্ত্রণায় মরে,
বিপদের ভয় কোরো না গণনা—
সুখ-অন্বেষণে যেন হে যেতনা—

যাও এ উভয়-দ্বন্দ্ব-ভূমি পারে,
গাও গাও গাও গাও উচ্চস্বরে—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( ১২ )

এইরূপে বন্ধো, দিন পর দিন,
করমের শক্তি হয়ে যাবে ক্ষীণ—
আত্মার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে,
জনম তাহার আর না হইবে,
আমি বা আমার কোথায় তখন ?
ঈশ্বর—মানব—তুমি—পরিজন ?
সকলেতে আমি—আমাতে সকল—
আনন্দ, আনন্দ,আনন্দ কেবল,—
সে আনন্দ তুমি, ওহে বন্ধুবর,
তাই হে আনন্দে ধর তান ধর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

---

# মায়া।

মায়া এই কথাটী আপনারা প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ অত্যন্তঅযথাপূর্ব্বক কল্পনা বা কুহক বা এইরূপ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মায়াবাদরূপ একতম স্তম্ভের উপর বেদান্ত স্থাপিত বলিয়া, ইহার যথার্থ উপলব্ধি আবশ্যক। মায়াবাদ বুঝাইতে হইলে সহসা হৃদয়ঙ্গম না হইবার আশঙ্কা আছে, এ কারণ আপনারা কথঞ্চিৎ মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বৈদিক সাহিত্যে মায়া শব্দের্ যে প্রাচীনতম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কুহক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তখন প্রকৃত তত্ত্ব প্রস্ফুরিত হয় নাই। আমরা এইরূপ শ্লোক দেখিতে পাই, "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপমিয়", ইন্দ্র মায়াদ্বারা নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এস্থলে মায়াশব্দ ইন্দ্রজাল বা তত্তুল্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেকানেক শ্লোকের ঈদৃশ অর্থগ্রহণ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে মায়া শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত

হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইত্যবকাশে এতৎ-শব্দ-প্রতিপাদ্য ভাব ক্রমশঃই পরিপুষ্ট হইতেছিল। পরবর্ত্তী সময়ে দেখা যায় প্রশ্ন হইতেছে, "আমরা জগতের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারি না কেন?" ইহার এইরূপ নিগূঢ় অর্থ-সূচক উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়:—"আমরা জল্পক, ইন্দ্রিয়সুখে পরিতৃপ্ত ও বাসনা-পর বলিয়া এই সত্যকে নীহারাবৃত করিয়া রাখিয়াছি"—"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্পা আসুতৃপ উক্‌থশাসাশ্চরন্তি।" এস্থলে মায়াশব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার যে কারণ অবধারিত হইয়াছে, তাহা, এই সত্য ও আমাদিগের মধ্যে, কুজ্ঝটিকাবৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই ভাবটী পরিব্যক্ত হইতেছে। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে, মায়া-শব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। কিন্তু এ সময়ে ইহার প্রভূত রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে; নূতন অর্থরাশি ইহার সহিত সংলগ্ন হইয়াছে; নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত ও পুনরুক্ত হইয়াছে; মতান্তর গৃহীত হইয়াছে; অবশেষে মায়া-বিষয়ক ধারণা একটী স্থির ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা উপনিষদে পাঠ করি, "মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে," "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্ধ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" আমাদিগের দার্শনিক পণ্ডিত-গণের সম্বন্ধে দেখা যায়, যদবধি মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব না হইয়াছিল, তাঁহারা এই মায়াশব্দ বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, মায়াশব্দ বা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহা অনেকটা বিজ্ঞানবাদে পরিণত হইয়াছিল এবং মায়া কথাটী এইরূপ অর্থেই এক্ষণে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দু যখন "জগৎ মায়াময়" বলেন, সাধারণ মানবের মনে এই ভাব উদয় হয় যে, "জগৎ কল্পনা মাত্র।" বৌদ্ধদার্শনিকদিগের ঈদৃশ ব্যাখ্যার কিছু ভিত্তি আছে, কারণ এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বাহ্য জগতের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বেদান্তোক্ত মায়ার শেষ পরিপুষ্টাকৃতি, বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্বাস্তিত্ব-বাদ বা কোনরূপ মতবাদ নহে। আমরা কি, ও, সর্ব্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনা মাত্র। আমি আপনাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেদ যাঁহাদের অন্তরনিঃসৃত, তাঁহাদের চিন্তাশক্তি মূলতত্ত্ব অনুধাবনে ও আবিষ্করণেই অভিনিবিষ্ট ছিল। তাঁহারা যেন এই সকল তত্ত্বের বিস্তারিত অনুশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং সে জন্য অপেক্ষাও করেন নাই। তাঁহারা বস্তুর অন্তরতম প্রদেশে উপনীত হইতেই ব্যগ্র ছিলেন।

পরোক্ষ কিছু যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাঁহারা আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বিশেষ প্রতিপত্তি সকল অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও, এই সকল মূলতত্ত্বই বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। একটী দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইথর (ether) বা আকাশ বিষয়ক অভিনব তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে রহিয়াছে। এই আকাশ-তত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ইথর অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্টভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইহা মূলতত্ত্বেই পর্য্যবসিত ছিল। তাঁহারা এই আকাশ তত্ত্বের কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় জীবনীশক্তি যাহার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, সেই সর্ব্বব্যাপী জীবনীশক্তি-তত্ত্ব বেদে—উহার ব্রাহ্মণাংশেই, প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংহিতার একটী দীর্ঘমন্ত্রে সকলজীবনী শক্তির বিকাশক প্রাণের প্রশংসাবাদ আছে। এই উপলক্ষে আপনাদের কাহারও হয়ত জানিতে আনন্দ হইতে পারে যে, আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুযায়ী এই পৃথিবীর জীবোদ্ভব-তত্ত্ব বৈদিক দর্শনে পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয় সকলেই জানেন যে, জীব অন্য গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে সংক্রামিত হয়, এইরূপ একটী মত প্রচলিত আছে। জীব চন্দ্র লোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করে, কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের ইহাই স্থির মত।

মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা বিস্তৃত ও সাধারণ তত্ত্ব সকল বিবৃত করিতে অতিশয় সাহস ও আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন। বাহ্য জগৎ হইতে তাঁহারা এই বিশ্বরহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে যথা সম্ভব উত্তর পাইয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রতিপত্তি সকল এই প্রশ্নের মীমাংসায় একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। কারণ ইহার মূলতত্ত্ব সকল এই মর্ম্মাবধারণে অক্ষম। যদ্যপি পুরাকালে আকাশ-তত্ত্ব বিশ্বরহস্য ভেদে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন আমাদিগকে সত্যাভিমুখে অধিক অগ্রসর করিতে পারিবে না। যদ্যপি বিশ্বতত্ত্ব-নির্ণয়ে এই সর্ব্বব্যাপী জীবনীশক্তি-তত্ত্ব অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন নিরর্থক, কারণ তাহা বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবে না। আমি এই বলিতে চাই, তত্ত্বানুশীলনে হিন্দু দার্শনিকগণ আধুনিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় এবং কখন কখন তাঁহাদিগের অপেক্ষাও

# অনাথ-আশ্রম ও জাতীয় উপকারিতা।

হিন্দু-সমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত অনাথাশ্রম বাঙ্গালা দেশে ত কুত্রাপি নাই, সমগ্র ভারতবর্ষেও আছে কি না সন্দেহ। যদিও দুই একটী মাত্র থাকে, তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং স্থানীয় কোন বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত; তাহাতে ভারতের সর্ব্বত্রীয় প্রদেশের অনাথ বালক বালিকাগণ (হিন্দু হইলেও) স্থান পায় না। সুতরাং খ্রীষ্টানগণ আমাদের দেশের অনাথ বালক বালিকাগণকে কিছুদিন লালনপালন করিয়া অনায়াসে নিজ সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া লয়েন। ইহাতে খ্রীষ্টান মিশনারীগণেরও দোষ নাই; অনাথ বালক-বালিকাগণেরও দোষ নাই। দোষ আমাদিগের আধুনিক স্বদেশের। নীচ জাতীয় দরিদ্র দেখিলেই ত আমরা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দি। তাহারা হিন্দু হইলেও, তাহাদিগকে শূদ্র, অস্পৃশ্য ও অগণ্য জ্ঞানে আমরা অবহেলা করিয়া থাকি। তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও আমরা কিছু ক্ষতি মনে করি না। যদি একান্তই দয়ার্দ্র চিত্ত হইলাম, মনে যদি একান্তই দেশহিতৈষিতারূপ প্রগাঢ় সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল, তাহাদিগকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিলাম, বা একখানি ছিন্ন বস্ত্র দিলাম, বা বড় জোর, বাটীতে ভৃত্য করিয়া রাখিলাম। তাহাদিগকে যত্নসহকারে লালনপালন করা, লেখা পড়া ও ভদ্রোচিত আচার ব্যবহার শিখান, অন্তরে প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য জ্ঞান কখনও আমাদিগের মনে উদয় হয় না। সুতরাং নীচবংশোদ্ভব নিরাশ্রয় অনাথগণ পেটের জ্বালায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা যত্ন করে তাহাদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে, তাহাদিগের কথা শুনিতে, এবং তাহাদেরই ধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য হয়।

কি আশ্চর্য্য! কাহাদের ধন কাহারা ভোগ করে দেখুন; কাহাদের লোক কাহারা লইয়া যায়। কেনই বা না লইয়া যাইবে। আমরা নিজেরাই যে ঘরের লক্ষ্মী বাহির করিয়া দিতেছি! লক্ষ্মী চঞ্চলা, কখনও এক জায়গায় স্থির থাকিবার নন; যিনি যত্ন করিবেন, তাঁহারই নিকটে যাইবেন। আমরা জাত্যভিমান ও ধনগর্ব্বাদিতে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেছি না যে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করিতেছি, তাহারাই আমাদিগের দেশের লক্ষ্মী; তাহাদিগের হইতেই আমাদিগের ধন, মান, সুখ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই। তাহারা যদি না থাকিত, আজ আমরা অমরাবতী তুল্য সহরে রাজপ্রাসাদোপরি

দুগ্ধফেণনিভ শুভ্র ও পুষ্পরেণুসম কোমল শয্যাদির সুখ ভোগ করিতে পারিতাম না। যাহাদিগকে ঘৃণা করি, আজ তাহারা যদি না থাকিত, আমাদিগকেই তাহাদিগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইত; আমাদিগকেই আজ তাহাদিগের ন্যায় লাঙ্গল স্কন্ধে বহন করিয়া ধান্য-ক্ষেত্রে দৌড়াইতে হইত, রৌদ্রে বা বারিপাতে অনাহারে অনবরত শস্য রোপণাদি কার্য্য করিতে হইত, গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কোদাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে হইত; স্বাস্থ্যরক্ষা নিমিত্ত মস্তকে করিয়া ময়লা লইয়া 'ধাবার' মাঠে ফেলিয়া আসিতে হইত। মনে করুন, যাহাদিগকে ঘৃণা করি, তাহাদিগের অবর্ত্তমানে, আমাদিগের কতদূর দুর্দ্দশা হওয়া সম্ভব।

দেশপালনার্থ রাজাকেও যেমন দরকার, প্রজাকেও তেমনি দরকার; ভদ্রলোককেও যেমন প্রয়োজন, ছোটলোককেও তেমনি আবশ্যক; একের অভাবে অপরের কষ্ট ও দেশের ক্ষতি। আট-ছয়—আটচল্লিশ; এই গুণফলের পক্ষে আটও যেমন আবশ্যকীয়, ছয়ও তেমনি আবশ্যকীয়। অবশ্য আটের স্বতন্ত্র মূল্য ছয়ের অপেক্ষা বেশী স্বীকার করি; কিন্তু ঐ "৪৮"কে লাভ করিবার জন্য, আটের সঙ্গে গুণক-ছয়কে এত আবশ্যক হয় যে, এতদভাবে আর অমন পাঁচটী আটের (যোজনার্থ) প্রয়োজন হইয়া পড়ে। একটা মোট আনিতে, একটী ছোটলোক হয়ত অনায়াসেই পারিবে; আর সেইটী ভদ্রলোক দ্বারা আনাইতে হইলে, হয়ত, অমন ছয়জন ভদ্রলোককে হিমশিম খাইতে হইবে। অবশ্য, ছোটলোককে যে পূজা করিতে বা মাথায় রাখিতে বলিতেছি, তাহা নহে; যতটা তাহাদিগকে যত্ন করা কর্ত্তব্য, যতটা যত্ন বা সদ্ব্যবহার করিলে তাহারা আমাদিগের ও দেশের যথেষ্ট উপকারে আসিতে পারে, ততটা আমরা কেন না করি? দেশপালনে ও জাতীয়তা রক্ষণে তাহারাও যে কিছু কম সহায়, তাহা নহে।

ভদ্র-সন্তান অনাথ হইয়া পড়িলে অন্যের নিকট আশ্রয় পাইতে পারেন। কিন্তু, নীচবংশোদ্ভব সন্তানগণ দুর্ভিক্ষে, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেও আমাদের দেশের কয়জন ভদ্রলোক ব্যথিত হন? প্রতি বৎসরেই ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষবশতঃ শতসহস্র দরিদ্র নর নারী ও অনাথ বালকবালিকা অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে; কয়জন দেশীয় ভদ্রসন্তান সেই দুর্ভিক্ষানল মধ্যে যাইয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইতেছেন? কিন্তু দেখুন, কত খ্রীষ্টান পাদ্রী, কত খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী, সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত-

দিগকে সেবা করিতে করিতে নিজেদের অমূল্যজীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে দারুণ বিসূচিকা ভীষণ রূপে বিস্তৃত হইয়া থাকে; কত শত নিরাশ্রয়গণ রোগাক্রান্ত হইয়া পথে ঘাটে ও মাঠেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; অকপট হৃদয়ে দুই হস্ত দিয়া তাহাদিগের সেবা করিতে করিতে কত পাদ্রী পাদ্রিণী রোগাক্রান্ত হইয়া কবরে নীত হন। সহৃদয় খৃষ্টানগণ স্বচক্ষে এ সকল ভীষণ ব্যাপার দেখিয়াও তথা হইতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না; বরং দ্বিগুণ উদ্যমের সহিত সেবা-ব্রতে বদ্ধ পরিকর হইতেছেন।

আর তত্রস্থ স্থানীয় জমীদার ও স্বদেশী ভদ্রলোকগণ কি করিতেছেন? স্থান ও দেশ পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলায়ন করিতেছেন; যখন দুর্ভিক্ষপ্রকোপ তথায় নির্ম্মূল হইবে, তখন আবার তাঁহারা তথায় যাইয়া স্বত্বভোগ বা স্বার্থ চরিতার্থ করিবেন। আমাদিগের নিজদেশের অনাথগণের প্রাণরক্ষা, কেন বিদেশ হইতে বিধর্ম্মিগণকে আসিয়া করিতে হয়?—ইহা কি লজ্জার কথা নয়? যে ভারতের লোক এককালে সামান্য বিহঙ্গমের প্রাণ রক্ষার্থ নিজের গাত্র হইতে মাংসখণ্ড অবলীলাক্রমে স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন; যে ভারতের রাজা প্রজা-রঞ্জনার্থ প্রাণাধিক নিজমহিষীকেও বিসর্জ্জন দিতে লেশমাত্রও বিচলিত হন নাই; যে ভারতের পিতা-মাতা অভ্যাগতের সেবার জন্য একমাত্র কুলতিলক প্রিয়তম নিজসন্তানকেও স্বহস্তে ভীষণরূপে বলিদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যে ভারতের দান ও অদ্ভুত পরোপকার ত্রিভুবন-খ্যাত হইয়াছিল; অতিদূর বিদেশীয় প্রাচীন কবিগণ কল্পনার উচ্চতম শৃঙ্গে উপবেশন করিয়া যখন দান ধর্ম্ম দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতির একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিবার বাসনায় কোন্ দেশের নাম উপমার ছলে উল্লেখ করিবেন ভাবিতেন, তখন সেই ভাবাবিষ্ট সিদ্ধ কবিগণের তুলিকা হইতে রত্নাকর ভারতের নামই স্বতঃ নিঃসৃত হইয়া পড়িত;— যে স্বর্গোপম ভারতের মাহাত্ম্য অতিদূর ও দুর্গম্য বিদেশের অন্তরেও এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছিল; যে ভারতের গৌরব জগতের সর্ব্বত্র শাখী পাখী পর্য্যন্ত গাহিত; আজ কিনা, সেই ভারতের অনাথগণ অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে,—দেখিয়া, 'ভদ্র' ও 'সভ্য' নামধারী ভারতবাসিগণ (ছি ছি ছি! "ভারতবাসিগণ"? স্বার্থপর কখন 'ভারতবাসী' নাম ধারণ করিবার উপযুক্ত নন।) ভয়ে দূরে পলায়ন করিতেছেন। প্লেগ উপস্থিত হইল, সকলে গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করি-

লেন ; স্বচ্ছন্দে, আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, নির্ভরশীল নিরাশ্রয়, দরিদ্র অনাথ প্রভৃতি, সকলকেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন ; হৃদয়ে একটুও বাজিল না ; যাহাদিগের পলাইবার কোনও স্থান নাই, যাহাদিগের দেখিবার কেহ নাই, যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া অনেকে ঘৃণা করেন, তাহাদিগের জন্য কিছুমাত্রও বন্দোবস্ত না করিয়া ভয়ে রাতারাতি পলায়ন করিলেন। ইহাও বুঝিলেন না যে, যেখানে যাইয়া উপস্থিত হইবেন, সেখানে সেই রোগবীজ লইয়া তত্রস্থ তাঁহাদিগকেও বিপদগ্রস্ত করিবেন। এ সকল স্বার্থপর লোকের দ্বারা জগতের ( জগতের কথা দূরে থাকুক, নিজের দেশের ) কি হিতসাধন হইতে পারে? দেশের আপদ বিপদে যদি জনসাধারণের কিছুমাত্র যথাসাধ্য উপকার না করিলেন, ত জনপদে বাস না করিয়া, "মনুষ্য" নামে নিজেকে পরিচয় না দিয়া, জঙ্গলে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে চতুষ্পদের ন্যায় অনায়াসে দিন যাপন করিতে পারেন। রুষ্ট হইবেন না, সহৃদয়তা না থাকিলে, পরের জন্য প্রাণ না কাঁদিলে, দয়া ধর্ম্ম বা সদসৎজ্ঞান না থাকিলে, মনুষ্য—পশু সমান ; এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। নিজের উদর পূর্ণ হইলেই হইল, অভুক্তকে যদি এক মুষ্টি অন্ন না দিলাম ; নিজের স্বার্থ পরিতৃপ্ত হইলেই হইল, পরার্থে যদি কিছু না করিলাম, জগতে অসংখ্য কীট তুল্য জন্মাইলাম, খাইলাম পরিলাম, আর মরিয়া যাইলাম—যদি বিশেষত্ব কিছু না থাকিল, তবে মনুষ্যে আর পশুতে তফাৎ কি?

যদি বলেন, পরের উপকার করিবার আমার সাধ্য নাই, তা বলিয়া কি নিজেরও উপকার করিব না? আপনি বাঁচিলে ত বাপের নাম? পরকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজে যে মরি? পরকেও রক্ষা করিতে পারিব না, নিজেকেও রক্ষা করিতে পারিলাম না, ইহা কি বুদ্ধিমানের কার্য? নিজেকে রক্ষা করা কি প্রকারান্তরে পরের বা দেশের উপকার করা হইল না? নিজে বাঁচিলে ত পরের উপকার করিব? মনে করুন : গঙ্গায় নৌকা করিয়া যাইতেছি, অনেক গুলি যাত্রী আছে—স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে মেয়ে, ছোট লোক, ভদ্র লোক ইত্যাদি ; সকলেই পরস্পর অপরিচিত। কিয়দ্দূর যাইয়া গঙ্গায় হঠাৎ তুফান ; তরি টল টলায়মান, ডুবে যায় যায়। সাঁতার আমি একাই জানি, যাত্রিগণের মধ্যে আর কেহ জানে না, যেরূপ তুফান এবং আমারও যেরূপ সামর্থ্য, তাহাতে আমি একা নিজেকেই বাঁচাইতে পারি কি না সন্দেহ। এখন কি করা কর্ত্তব্য? আর একটিকে পৃষ্ঠে চাপাইয়া দুইজনেই ডুবিব ; না—সকলকার হাত

ছিনাইয়া নিজে বাঁচিবার চেষ্টা করিব? কোনটি বুদ্ধিমানের কর্ম্ম? এরূপ অনেক শুনা গিয়াছে যে,একজন ডুবে যাইতেছে দেখিয়া,আর একজন তাহাকে বাঁচাইতে যাইয়া দুইজনেই ডুবিয়া মরিয়াছে।—আমার নিজের বিড়ালই পথ্য পায় না, পরের দিকে চাই কি করে? সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, কষ্টে শ্রেষ্টে কোনও রকম করে নিজের পেটের একমুষ্টি অন্ন জোগাড় করি মাত্র; তাহার ভিতর হইতে অপরকেই বা দিই কি, নিজেই বা খাই কি? সময়ই বা পাই কখন, পরের সেবা করিবার? কাজে কাজেই ভিখিরী এলে দূর দূর করি, প্লেগ এলে পলায়ন করি।

—বেশ। আবার এও এক শ্রেণীর লোক আছে:—

নিশীথ সময়, সকলেই ঘোর নিদ্রিত; হঠাৎ আকাশসমান বন্যা আসিয়া জেলার যাবতীয় গ্রাম, লোক জন, ঘর বাড়ি সমস্ত তীব্র বেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে, সুষুপ্ত অবস্থাতেই, অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন; ভাসিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই অগাধ জলমধ্যে অনেককে প্রাণত্যাগ করিতে হইল, কে কোথায় কেমনে মরিল কাহারও খোঁজ খবর নাই। একজন উঁহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধ নিদ্রিত ছিলেন; তিনি জাগরিত হইয়াই দেখেন, অতি ভীষণ ব্যাপার মধ্যে নিপতিত, প্রাণ রক্ষা করা ভার। কিয়দ্দূর পরে দেখেন, পার্শ্ব দিয়া একটি বৃক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে; সেই বৃক্ষটির উপর নির্ভর করিয়া যাইতে লাগিলেন; ক্ষণিক পরেই দেখেন, একটি লোক মৃতপ্রায় হইয়া নিকটেই আসিতেছে; অমনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই বৃক্ষের উপর অতিকষ্টে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষটী এতবড় নহে যে, দুইটী ব্যক্তির ভার বহন করে, বুঝিতে পারিয়াই স্বয়ং বৃক্ষটী ত্যাগ করিলেন। কিয়দ্দূর ভাসিয়া আসিতে না আসিতেই, নিজে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সেই অচেতন অবস্থায় ২০ ক্রোশ দূরে এক সহরের নিকট কিনারায় আসিয়া লাগেন। পরদিন প্রাতে সহরস্থ লোকজন অন্বেষণ করিতে করিতে দেখেন যে, এইরূপ একটী লোক পড়িয়া আছেন। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর, তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। ঘটনাটী সত্য; খোগা বন্যার সময় ঘটিয়াছিল।

তিনি অতি পরোপকারী লোক ছিলেন; যদি স্বার্থপর হইয়া নিজের বৃক্ষে অপরকে তুলিয়া না লইতেন, তাঁহার এতদূর জীবন সংশয় হইত না। যাঁহারা সহৃদয়, তাঁহারা কখনই অন্যরূপ আচরণ করিতে পারেন না। নগ-

রাজা বন-বাসেও, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও, পরোপকার করিতে ছাড়েন নাই; দেখিয়া, কলি হার মানিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন, তথাচ আশ্রিতকে কোনও মতে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। শুনিয়া থাকিবেন, নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া সকলকে রক্ষা করিবার জন্য, কিরূপ ভয়ানক বারুদের বস্তা হইতে, একজন, জলন্ত বাতী সরাইয়া আনিয়াছিলেন। ইহাও শুনিয়া থাকিবেন, একজন সামান্য ভৃত্য কিরূপ নিজের জীবন দান করিয়া ব্যাঘ্রের "গ্রংট্র করাল" হইতে কতকগুলি লোককে বাঁচাইয়াছিলেন। পুস্তক ও পুরাণাদি পাঠ করিলে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বংসর সাতেকের কথা হইল; পদব্রজে অযোধ্যা যাইতেছিলাম। সঙ্গে কেহ বা কিছুই ছিল না; একা মাত্র, ও একবস্ত্র—তাহাও অর্দ্ধাংশ। একদিবস পথে গ্রাম বা বসতি কোনও প্রকার পাওয়া গেল না; দিবা প্রায় অবসান; সমস্ত দিবসই অনাহার। পূর্ব্বদিবস মধ্যাহ্নে যৎসামান্য ভিক্ষা পাওয়া গিয়াছিল মাত্র। পূর্ব্ব অপরাহ্নে পাঁচক্রোশ ও সে দিবস প্রায় সাত ক্রোশের পথশ্রম। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে দূরে গুটীকতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুপড়ি দেখিতে পাওয়া গেল। নিকটে যাইয়া বুঝিলাম, লোক গুলি সাঁওতাল অথবা ধাঙ্গড় জাতীয়, অতি গরিব; আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ক্যা মাংতা"; বলিলাম, "খানেকো ভিক্ষা মাংতা।"—হামারা ভাত খায়েগা? হাঁ জি খায়েগা।—বয়ঠো। হাত ডেড়েক লম্বা ও আধহাতটাক মোটা একখণ্ড বৃক্ষের শাখা উপবেশনার্থে দিলেন। তাঁহাদিগের একখানি ঝুপড়ি; হাত চারেক চওড়া ও প্রায় ৮ হাত লম্বা; কোথাও পাতা, কোথাও চারিটি খড়, কোথাও বেনা বা উলু, কোথাও বা কাটীমুটী, কোথাও বা একটু চট্ দিয়া মাত্র আবৃত। যেমন চাল, তেমনি দেওয়াল। সম্মুখে হাত আষ্টেক জমি একটু পরিষ্কার করা উঠানের মত। উপরে বিমল চন্দ্রালোক। চতুর্দ্দিকে ময়দান; মধ্যে মধ্যে এক একটী খর্ব্বাকৃতির বৃক্ষ। দাতার পরিবারের মধ্যে—তাঁহারা দুইজন উজ্জ্বল কৃষ্ণকায় স্ত্রী পুরুষ, এবং তদনুরূপা একটী কুমারী কন্যা। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রন্ধন হইয়া গিয়াছিল। হাঁড়ির ভিতর হইতে তিনটী গোল গোল পাকানো ডেলা বাহির করিলেন—দুইটী বড় ও একটী ছোট; তিনটী ভাঙ্গিয়া চারিটী করা হইল; রাখিবার স্থান নাই, বোধ হয় তাঁহাদের আবশ্যকও করে না, মাটীতেই রাখিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে, আমাকে হাত পাতিতে বলিলেন।

সেই চারিটী লাড্ডু হইতে একটী আমার হাতে দিলেন; তাঁহারাও তিন জনে এক একটী লইয়া বসিলেন। লাড্ডু গুলি অতি নিকৃষ্ট আউস-চাউলের খুদ সিদ্ধ; এক একটিতে ৫।৭ গ্রাস হইবে মাত্র; তাহাই তাঁহাদিগের খাদ্য; দুইবেলা এইরূপ এক এক লাড্ডু জুটিলেই পরম ভাগ্য মনে করেন।

দেখুন, যাহাদিগকে আমরা নিকৃষ্ট নীচজাতিসম্ভূত বলিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছল্য করি, তাহারাই আবার নিজেদের একমুষ্টি অন্ন হইতে যথাসাধ্য আমাদিগকে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর আমরা কি করি? প্রচুর থাকিতেও দিই না। দিবার ইচ্ছা থাকিলে ত দিব। ইচ্ছা থাকিলেই সব হয়। ইচ্ছা না থাকিলেই নানাপ্রকার বড় বড় বিপরীত যুক্তি দেখাই। যাঁর অন্তরে যথার্থ ভালবাসা আছে, যাঁর প্রাণ অন্যের জন্য কাঁদে, যিনি যথার্থ সকলকার হিতাকাঙ্খী, যিনি যথার্থ দেশ-হিতৈষী, তিনি কখনই স্বার্থপর হইতে পারেন না; নিরাশ্রয় বা অনাথ দেখিলে তিনি কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কোনও পল্লিগ্রামে যাইলেই দেখিতে পান। সকলকারই সাধ্য কিছু না কিছু আছেই আছে। যথাসাধ্য উপকার সকলেই করিতে পারেন, কোনও সন্দেহ নাই। করেন না, সে কেবল ছল মাত্র; ইচ্ছা নাই বলিয়াই করিতে পারেন না। ইচ্ছাই বা আসিবে কেমন করিয়া? ইচ্ছা আসিবার মত আচরণ করিলে ত? দিবা রাত্রি অসৎসঙ্গ ও অসৎচর্চ্চা করিলে মনুষ্যত্ব, জাতীয়ত্ব প্রভৃতি সর্ব্বস্ব লোপ হইয়া যায়। নিজেত পরোপকার করিব না, অপরে যদি করে তাহাতেও ছল ধরিব ও বাধা দিব।— আজ কাল আমাদের এইরূপই অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রত্যেক পাড়াতেই প্রায় একটী করিয়া (ছোট বা বড়) আড্ডা আছে। সকাল বেলা ঘুমে থেকে উঠিয়াই সেই আড্ডাতে যাইলাম; ৮৷৷০টা বা ৯টা যতক্ষণ না বাজে, যতক্ষণ না আফিসের বেলা হয়, ততক্ষণ আড্ডা দিতেছি; আফিস থেকে আসিলাম, আসিয়াই আবার সেই আড্ডা—যতক্ষণ না রাত্রি ৮টা বা ৯টা বাজে; কেহ বা সন্ধ্যা আটটার সময় খাইয়া আসিয়াই, আবার সেই আড্ডায়—রাত্রি ১১।১২টা পর্য্যন্ত। কেহ বা, এ পাড়া ও পাড়া, দুই চারিটী আড্ডা ঘুরিয়া থাকেন। আড্ডায় সাধারণতঃ হইয়া থাকে কি?—কেবল পরচর্চ্চা। পরচর্চ্চা যদি সৎ হয়, খুবই ভাল। কিন্তু সাধারণতঃ আড্ডায় লোকের অহিত-চর্চ্চাই হইয়া থাকে। পরনিন্দা ত হয়ই, ইহা ছাড়া আবার, যদি কেহ দেশের বা জনসাধারণের কোন বিশেষ উপকার

করিতে যান, ত তাহার নানা প্রকার অযথা ছল বা দোষ ধরিতে আরম্ভ করেন, এবং বিধিমতে বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন। মনে করুন, কোন পাড়ায় সাহিত্য-সভা, পুস্তকাগার, হরিসভা, সামাজিক সভা, স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় সভা প্রভৃতি রকমের যদি কিছু নূতন স্থাপিত হয়, আড্ডাধারিগণ সূক্ষ্ম এবং দূর-দৃষ্টির অভাবে কেবল তাহার অযথা ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, এবং সে সকলের নিষ্ফলতা বা অনিষ্টকারকতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনুসন্ধান করিলে আড্ডা মাত্রেরই এ সকল দোষ, কিছু না কিছু, দেখিতে পাইবেন। একটী আড্ডার কথা আমাদিগের স্মরণ পড়িতেছে; সেদিন রাস্তা দিয়া আসিতেছিলাম, একটী আড্ডায়, শুনিতে পাইলাম, 'উদ্বোধন' এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অনাথাশ্রম সম্বন্ধে কথা হইতেছে—"উদ্বোধনের এই কয় সংখ্যায় আমাদিগের পড়বার বেশী কিছু নাই, কেবল অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-মোচন এবং প্লেগনিবারণ প্রভৃতি নিজেদের কার্য্যাদি দিয়াই কাগজখানি পূর্ণ করিয়াছেন;" "এ সকল ত নিজেদেরই বিজ্ঞাপন"।

দেখুন একবার; অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ-মিশন কিরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভারতের অনাথগণকে কুড়াইয়া আনিয়া লালন পালন করিতেছেন, এবং অনাথগণ তাঁহাদিগের আশ্রমে থাকিয়া কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহাই দুই একবার কিছু উদ্বোধনে বলা হইয়াছিল। অপরাধ কি না, রামকৃষ্ণ-মিশন কিরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রাণপণে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন; অপরাধ কিনা, রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রতধারিগণ কিরূপ জীবন সমর্পণ করিয়া প্লেগাক্রমণ হইতে স্বদেশবাসিগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; তাহাই এক আধবার কিছু উক্ত কাগজে লেখা হইয়াছিল।

এ সকল দেশহিতকর কার্য্যের কথা যদি না লিখিব, ত কাগজ-পত্রের আবশ্যক কি? কেবল গল্প দিয়াই যদি কাগজ ভরিয়া দিলাম, ত মাসিক পত্রের পরিবর্ত্তে, উপন্যাস-ভাণ্ডার বা দারগার-দপ্তর লিখিলেই ত ছিল ভাল? যে পত্রে, হৃদয়বান্ দেশহিতৈষিগণের কার্য্য যদি জনসাধারণের নয়নপটে চিত্রিত করিয়া তাঁহাদিগের অন্তরস্থ প্রসুপ্ত সহৃদয় বা সদ্বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিলাম, ত সে পত্রের 'উদ্বোধন' নাম রাখিবার প্রয়োজন কি? মুর্শিদাবাদ-অনাথাশ্রমের একটী ঘটনা বলি:—একদা একটী চতুর্দ্দশীয়

অনাথ বালকের অত্যন্ত পীড়া হওয়াতে, একদিবস শয্যায় অচেতন অবস্থায় তার মল নিঃসৃত হয়। শীতকাল, অর্দ্ধরাত্র; অনাথটীকে বিষ্ঠাক্তকলেবর দেখিয়া দুর্গন্ধে ও ঘৃণায়, আশ্রমস্থ কেহই তাহার ত্রিসীমানায় যাইলেন না। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ দুই হস্ত দিয়া সেই অনাথের বিষ্ঠা মুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা কি হৃদয়বত্তার লক্ষণ নহে? না—প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য নহে? সম্প্রতি আমরা

## মুর্শিদাবাদ-অনাথাশ্রম

হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দের যে পত্র পাইয়াছি তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, অনাথ-আশ্রম কর্ত্তৃক কতদূর জাতীয় উপকার সাধিত হইবার সম্ভব। অখণ্ডানন্দস্বামী লিখিতেছেন:—

"গত জুলাই মাস হইতে অনাথ আশ্রমের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। আশ্রমে প্রাতে ৩ ঘণ্টা কাল যে স্কুল, তাহাতে আশ্রমের ছাত্র ১১টী, আর বাহিরের ৯।১০টী। আশ্রমের স্কুলে আপাততঃ লোয়ার প্রাইমার ক্লাস খুলিয়া তদুপযুক্ত পুস্তকাদি ধরানো গিয়াছে। অন্যান্য টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার (শিল্পবিদ্যার) সহিত ইহাদিগকে ইউনিভারসিটি-এডুকেশনও আমরা দিব। এবং বালকগণকে রীতিমত পরীক্ষা দিতে পাঠাইব।

উক্ত স্কুল ছাড়া আবার একটী নৈশবিদ্যালয় (নাইট-স্কুল) খুলিয়াছি। ইহাতে আশ্রমের বড় ছেলে কয়টীকে ইংরাজী পড়াইয়া, বাকী কয়টীকে, যে যা পড়ে, পড়াইয়া, বাহিরের আটটী যুবা চাষী ছাত্রকে একটু একটু লেখা পড়া শিখাইয়া থাকি। গত মাস হইতে কয়েকটী চাষী বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নিয়মপূর্ব্বক পড়িতে আসিতেছে দেখিয়া আমি বড়ই উৎসাহিত হইয়াছি। রাত্রে ১০॥টা পর্য্যন্ত পড়াইয়া থাকি।

টেক্‌নিক্যাল-এডুকেশনের মধ্যে আপাততঃ, তাঁতের, ছুতারের, ও দরজির কায শিখাইতেছি। আশ্রমের ছেলেরা 'ষ্টিলপেনের হাণ্ডল্' অতি সুন্দর তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে। বহরমপুর সহরে ইহার বড় আদর হইয়াছে। সেদিন সহরে কতকগুলি লইয়া যাওয়াতে, তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকটী দুই পয়সা করিয়া সব গুলি বিক্রয় হইয়া গেল। কাশীমবাজারের মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া ২০০ কলমের অর্ডার দিয়াছেন। বার্নিশ করিয়া দিলে, তিনি প্রত্যেক কলম তিন পয়সা করিয়া লইবেন, বলিয়াছেন। আমরা যোগাইতে পারিলে, তাঁহার সদর ও মফঃস্বল কাছারীতে এই কলমই চালাইবেন

বলিয়াছেন। আরও ২।১টী জমীদারের নিকট হইতে কলমের অর্ডার পাইয়াছি। বালকেরা একটী ছোট টেবিলের নমুনা দেখিয়া অতি সুন্দর একখানি টেবিল প্রস্তুত করিয়াছে। সেই রকম আর একখানি টেবিলেরও অর্ডার পাইয়াছি।

রেশম-কীট প্রতিপালন করিবার জন্য আমরা সমস্ত আয়োজন করিতেছি। বোধ হয় শীঘ্রই সফল হইব।

পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুতানার অন্তর্গত কিশেনগড়ে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ

## রাজপুতানা-অনাথালয়

নামক, রামকৃষ্ণমিশনের অপর একটী অনাথাশ্রম হইতে অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দ আমাদিগকে গত ভাদ্রমাসে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

" * * * এক্ষণে অত্র অনাথ বালক বালিকার সংখ্যা ১১২। তাহার মধ্যে ৭৭ জন বালক, এবং ৩৫টী বালিকা। ইহাদিগের সকলকার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর; ব্যারাম একেবারে নাই বলিলেই হয়। দুইবেলা অনাথদিগকে, যব ও গম মিশ্রিত ময়দার রুটি এবং ডাল দেওয়া হয়। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে বৈকালে সামান্য জল খাবারও দিয়া থাকি। অনাথদিগের বিছানার জন্য জাজিম করা হইয়াছে; শীঘ্রই প্রত্যেককে এক একখানি কম্বল দেওয়া যাইবে। পানীয় জলের উত্তম বন্দোবস্ত আছে; তত্রাচ তন্মধ্যে পারমাঙ্গানেট-অভ-পটাস দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফেনাইল, কারবলিক-পাউডার, চুন ইত্যাদি অকাতরে খরচ করা হয়। কতকগুলি অনাথবালক বালিকাকে এখানকার সুতা ও কারপেটের কারখানায় কার্য্য শিখিতে পাঠান হয়, ইহা ইতি পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবেন।

অনাথগণকে ভরণ-পোষণ করা ব্যতীত, প্রত্যেক দিন দুইবেলা প্রায় পাঁচ শত গরীবকে একমণ চাউল ও ডাউলের খিচড়ি দেওয়া হয়। অতি দরিদ্র ও ছিন্নবস্ত্র-পরিধান স্ত্রীলোকদিগকে ঘাগরা, চাদর, পাজামা, এবং পুরুষদিগকে কাপড়, পাজামা, কোর্ত্তা ইত্যাদিও দিয়া থাকি। ঈশ্বর-ইচ্ছায়, শীঘ্রই বোধ হয় গরীব দিগকে প্রায় একশত কম্বল বিতরণ করিতে পারিব। বর্ষাকালে যাহাদিগকে সর্ব্বদাই বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়, তাহাদিগের মোটা কাপড় বা কম্বল একান্ত আবশ্যক।"

দেখুন! এত গুলি অনাথ আজ আশ্রয় ও শিক্ষা অভাবে, হয়ত ভিক্ষাবৃত্তি বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। অথবা, দয়াময় হিন্দুদিগের আশ্রয় ছাড়িয়া খৃষ্টান-কবলে পতিত হইত। অন্বেষণ করিলে সমগ্র ভারত হইতে এমন আরও সহস্র সহস্র বালক-বালিকা পাওয়া যাইতে পারে, যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া বেড়িয়া বেড়াইতেছে, অথবা সাহায্য অভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এ সকল অনাথবালক কি ভারতের নহে? তাহারা কি ভারত-জাত নহে? তাহারা কি ভারতের ধন-সম্পত্তি নহে? ভারত-জাত হইয়া, ভারতের ধন-সম্পত্তি হইয়া ভারতবাসীর যত্ন ও সাহায্য কেন পায় না? হিন্দু-নামধেয় হইয়া, হিন্দু ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া, নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িলেই যে, হিন্দুর সাহায্য না পাইয়া তাহারা পরধর্ম্মীর হস্তগত হয়, কেন?—ভারত আজ ভারতবাসী শূন্য, না হিন্দুর আজ হিন্দুত্ব লুপ্ত? তবে কেন ভারতের এত দুগ্ধপোষ্য শিশু অনাথ হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে? ভারত জননী কি ভারত হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন? দেশে কি আর জননী-নাম মাত্র নাই? দেশ কি আজ পিতামাতা শূন্য? আর কি কেহ এখানে হৃদয়ে বাৎসল্য স্নেহ পোষণ করেন না?—যে, আজ দুগ্ধপোষ্য শিশু, আহা! একবিন্দু দুগ্ধাভাবে, ভারতের ক্রোড় হইতে যমালয়ে নীত হইতেছে? যান্, যাইয়া দেখিয়া আসুন, ভারতের দুর্ভিক্ষাক্রান্ত দেশ সমূহে কত শিশু-সন্তান রাস্তায় মরিয়া পড়িয়া রহিতেছে! প্রতিবৎসরেই এরূপ ঘটিতেছে কেন? ইহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিলে, আমাদিগের দেশের কি কোনও উপকারে ইহাদিগকে লাগাইতে পারা যায় না? আমরা ঘরের ভিতরে বসিয়া বেশ নানাবিধ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রূপে দিবা রাত্র আকণ্ঠ ভোজন করিয়া ক্রমশঃ স্থূলকায় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি; আর, ঘরের বাহিরে যে, কতশত জন যাহারা প্রকারান্তরে, আমাদিগের অন্নের সংস্থান করিয়া দিবে, তাহারা না খাইতে পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহা আমাদিগের জ্ঞান-গোচর হইতেছে না; জ্ঞান-গোচর হইলেও আমাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিতেছে না। উল্টে, সংবাদ-বক্তাগণের উপর ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকি। কেন? যথার্থতঃ দেখিতে গেলে, আমাদিগের যে দয়া ধর্ম্ম একে বারেই লোপ পাইয়াছে তাহা নহে। আমাদিগের অন্তরে আজও ভারতের সেই প্রাচীন গুণাবলির বীজ সমূহ নিহিত রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে কেন আমরা এত নির্দ্দয়তা ও

স্বার্থপরতার পরিচয় দিতেছি? কেবল একমাত্র জিনিষের অভাবে এত নির্দ্দয় প্রহার পাইতেছি; কেবল এক মাত্র জিনিষের অভাবে আমাদিগের দেশ ক্রমশঃ 'ছার খারে' যাইতেছে, যাবতীয় গুণরাশি লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিতেছে, ধনরাশি পরহস্তগত হইতেছে, অনাথশিশুগণকে পর্য্যন্তও আমরা হারাইতেছি! সেই জিনিষ কি? কি সেই জিনিষ, যাহার অভাবে দেশের এত দুর্দ্দশা? কি সেই জিনিষ যাহার সাহায্যে ভারত আবার স্বর্গতুলা হইতে পারে? সেই জিনিষ হইতেছে—

## জাতীয়ত্ব-বোধ।

("জাতীয়ত্ববোধ" সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় বলা যাইবে)।

---

## সৃষ্টিতত্ত্ব।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত।)

সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই দার্শনিকগণ সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত। আধুনিক বাহ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্যও তাহাই কি না, স্থির বলা যায় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টি বহির্ম্মুখী; দর্শন অন্তর্ম্মুখ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যেক পদার্থের সংশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক চাহেন, ঐহিক সুখ সুবিধার অনন্ত উৎসের আবিষ্কার ও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির মূল-কারণানুসন্ধান। দার্শনিক চাহেন, মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাদি মানসিক ব্যাপারের সংশ্লেষণ করিয়া দুঃখত্রয়াতীত পরমশান্তিলাভ ও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের কারণ-সমাধান। বৈজ্ঞানিক চাহেন, ভূতপঞ্চককে ক্রীড়নক করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের, মনীষার ও দৈবীকল্প লীলার প্রদর্শন। দার্শনিক চাহেন, অনন্ত-ভাব-ভাণ্ডার মনের উপর নিঃশেষাধিপত্য বিস্তার করিয়া ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান রাজ্যের ক্রান্তিদর্শন। একজন ভৌতিক পদার্থের (matter) দাস; আর একজন মানসিক ব্যাপারের (mind) ক্রীড়াপুত্তলিকা। একজন প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতের গূঢ়নিয়মনরহস্যভেদে উদ্যোগশীল; আর একজন মনোব্যাপারের অলৌকিক শক্তিবিকাশে পরিমগ্ন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ এই দুইয়ের একেতর রাজ্যে অবশ্যই বিচরণ করেন।

প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান হইতে পারে না। যাহা বাহিরে দর্শন করা যায়, তাহার ভাবগুলি (Ideas) মনে সঞ্চিত হয়; এইরূপ ভূয়োদর্শনজনিত ভাবের সমষ্টিই মন। সুতরাং, এই বিচার প্রণালীতে দেখা যায়,

মনের উপর বহির্জ্জগতের প্রাধান্য সম্পূর্ণ ও নিত্যবিদ্যমান। ফরাসী পণ্ডিত কোমৎ ও তন্মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ( positivists ) এজন্য প্রত্যক্ষবাহ্যবিজ্ঞানবাদী। তাঁহারা বলেন, এই ভূতভৌতিক সংমিশ্রণোৎপন্ন বাহ্য জগৎ ভিন্ন মন আর কিছুই জানিতে পারে না। কিন্তু মনস্তত্ত্ববাদী দার্শনিকগণ বলিতেছেন, বহিঃপ্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের ভাব ( idea ) মনে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই, তোমার বাহ্য জগৎ আছে। নতুবা কে বুঝিতে পারিত যে, বাহ্যজগৎ বর্ত্তমান আছে? আমার ভাবেই তোমার জগৎ; নতুবা তোমার জগতের অস্তিত্ব কোথায়? ভাব ছাড়া জগৎ নাই; আবার জগৎ ছাড়াও ভাব নাই; এজন্য উভয়ই উভয়ের আপেক্ষিক বা অন্যোন্যাশ্রয়ী। জড় ও মন এ উভয়ের পক্ষসমর্থনকারীরা তাই আবহমান কাল হইতেই সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন।

প্রত্যক্ষবিজ্ঞানবাদী ও মনস্তত্ত্ববাদী উভয়েই নিজ নিজ মতানুকূলে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যানে অগ্রসর। জল, বায়ু, বিদ্যুৎ বা অম্লজান সংশ্লেষণ বা বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, আমার একেতর উপাদানেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণ হইয়াছে। দার্শনিক বলিতেছেন, অহঙ্কারাত্মক বিরাট্ মন বা অব্যক্ত মহৎ হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং মনই জগতের উৎপত্তি-কারণ। ন্যায়, সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি ভারতীয় দর্শন, প্লাটো, হেগেল, কোমৎ, কাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য দর্শন সকলেই এই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যানে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ফলাইয়াছেন। এমন কি, যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র জগতে সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, সেই বেদ, বাইবেল ও কোরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেও সৃষ্টিতত্ত্ব-ব্যাখ্যার অসদ্ভাব নাই। তাহারা সকলেই ভ্রান্ত, এ কথা বলা অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক; তথাপি এ বিষয়ের কিঞ্চিদালোচনা করা যাক্।

মনের করণ ( instruments ) গুলি সীমাবদ্ধ। চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি নাতিদূরেই প্রতিহত হয়। দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতি শক্ত্যাদির স্ফুরণ দার্শনিকগণ স্বীকার করিলেও, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই অনন্ত গ্রহতারাখচিত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সকল রূপরসাদিগুণের উপর তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পূর্ণাধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকে, তবে ইন্দ্রিয়াদি যে দেশকালনিমিত্তাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহা প্রমাণীত হইয়াছে। মন যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানসমষ্টি মাত্র, তখন মনও সসীম

হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং মনোবিম্বিত জগৎও সীমাবদ্ধ। জীবগত মন ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য ব্যক্তিগত জগৎও ভিন্ন ভিন্ন—যেমন দূরত্ব ও নৈকট্য বশতঃ একই পদার্থ বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং, যাহা লইয়া আমরা জগৎ জগৎ করিতেছি, তাহার মূলস্বরূপ যে কি, তাহা কোনকালে, কেহই জানিতে পারে নাই, পারিবেও না। যে জগৎই জানিবার উপায় নাই, তাহার আবার কারণানুমান করিতে যাওয়া বাতুলতা ও প্রবল সাহসিকতা প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। অগণ্য গ্রহ-তারাখচিত অনন্ত বিমান, অনন্ত-স্থাবর-জঙ্গম-ব্যূহ-বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড, ও অযুত-নদ-নদী-পর্ব্বত-সাগর পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল দর্শন করিয়া, কোন্ অর্ব্বাচীন বৈজ্ঞানিক ইহার কারণানুসন্ধানে হতাশ না হইয়াছেন? অনন্তভাবতরঙ্গের গভীর উৎস মনের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করিয়াই বা কোন্ দার্শনিক সৃষ্টি-রহস্যের নিঃশেষ মীমাংসায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এজন্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিচারপথে সৃষ্টিতত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি-তত্ত্বানুসন্ধানে অন্বয়ী প্রমাণে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বাদি গভীর প্রশ্নের মীমাংসা হইতেই পারিতেছে না।

ক্ষীণমস্তিষ্ক ভাবপ্রবণ (sentimental) একদল লোক জগতে জন্মিয়াছেন, যাহারা বলেন, এই সৃষ্টি দেখিয়াই সৃষ্টিতত্ত্বরহস্য বা জগৎ-কারণ বা ঈশ্বরানুমান হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেহ বা ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুল্লেখা দর্শন করিয়া কালীলীলা-দর্শনে আত্মহারা হন। কেহ বা শ্যামলশাদ্বলপূর্ণ শস্যক্ষেত্রে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম দর্শন করেন। কেহ বা সমুদ্র, আকাশ ও পর্ব্বতে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর দর্শনে কাঁদিয়া আকুল হন। হে ভাবুক! যদি তুমি ঐ সকল রমণীয় বা গভীর দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে বা গভীরতায়, কেবল সৌন্দর্য্যের বা গভীরতার জন্য (beauty for beauty's sake) অভিভূত বা আত্মহারা হইয়া থাক, তবে তোমাকে সাধুবাদ দিতেছি; আমিও সে ভাবের জন্য লালায়িত। কিন্তু ভাবপ্রবণতার প্রাবল্যে অথবা কীটভক্ষিত মস্তিষ্কের বৈকল্য বশতঃ যদি তুমি 'অবাঙমনসগোচরং" ব্রহ্মের হস্তাক্ষর যথাযথভাবে দর্শন কর, তাহা হইলে তোমাকে ভাবপ্রবণ উন্মাদ বলিয়া দয়ার পাত্র মনে করিব।

পক্ষান্তরে দর্শনবিৎ যুক্তিপ্রাণ একদল লোক জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহারা বলেন, এক মাত্র শাস্ত্রযুক্তি ও স্বাধীনযুক্তি সহায়তায়ই ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেহ বা শরীরকৃচ্ছ্রকারী তপস্যা-

বলম্বনে মনোজয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন,কেহ বা যুক্তিতর্কের ফাঁসে ঈশ্বরের হাত বাঁধিয়া কয়েদীর ন্যায় তাঁহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে চাহেন। হে জ্ঞানিন্! যদি অনুরাগের সহিত সুধু ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য, তুমি শাস্ত্র বা যুক্তির আশ্রয় লইয়া থাক, তবে তোমাকে সাধুবাদ দিতেছি। আমিও সে শ্রুতানুকূল যুক্তিপথের পথিক। কিন্তু বিদ্যা ফলাইবার বাসনায়, যদি তুমি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ব্রহ্মের সত্তাপ্রমাণে অগ্রসর হইয়া থাক, তবে তোমাকেও দয়ার পাত্র মনে করিব।

যাহাহউক পূর্ব্বোক্ত বিচার প্রণালীতে আমরা দেখিয়াছি, এ সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কারণ এক প্রকার অজ্ঞেয়। সুতরাং, স্পেনছারের অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) বা কপিলের নিরীশ্বরবাদ আসিয়া পড়িতেছে। আস্তিক! তুমি হতাশ হইও না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি তোমার অনুকূলেই উপস্থাপিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৈজ্ঞানিক বাহ্যজড়শক্তির সমীকরণে অসমর্থ হইয়া, নিজের অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা বুঝিয়া বলিতেছে, "I am collecting the pebbles only," আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে কতিপয় উপল সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র। দার্শনিক অণিমাদি মহাশক্তি লাভ করিয়াও বলিতেছেন, "ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষঃ।" নিজের অজ্ঞতার দিকে উভয়েরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়াছে। উভয়েই বুঝিয়াছে, "ইহা কারণ নহে", "ইহা কারণ নহে"—"নেতি," "নেতি"। প্রত্যক্ষে বা অনুমানে যাহা যাহা জগৎকারণ বলিয়া দৃষ্ট বা অনুমিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তখনি বুঝিয়াছেন, "নেতি" "নেতি"। এই আত্ম-অজ্ঞতাই আত্ম-জ্ঞানের উদ্ভাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "যস্যামতং তস্যমতং", "বিজ্ঞাতমবিজানতাম্", প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের সাক্ষীরূপে তাহারা দণ্ডায়মান হইতেছেন। উভয়েই সৃষ্টিতত্ত্ব ছাড়িয়া অনন্ত ব্রহ্মতত্ত্বে অবগাহনোন্মুখ হইয়াছেন। দেশ, কাল নিমিত্তের অলীক পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আর মুখে কেবল "নেতি" "নেতি"। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বুঝিয়াছেন, যে সৃষ্টি-রহস্য-ভেদে এত গ্রন্থ লিখিলাম, এখন দেখি সে সৃষ্টিই নাই। এক অখণ্ড চৈতন্য আমিই দিক্ দেশ কাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। বেদমুখে তাই ঋষি গাইতেছেন :—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

# সমালোচনা।

১। "দি প্যাসটোরাল শ্রীকৃষ্ণ" (অর্থাৎ রাখাল শ্রীকৃষ্ণ)।

২। "শ্রীকৃষ্ণ দি কিং মেকর" (অর্থাৎ রাজকর্ত্তা-শ্রীকৃষ্ণ)।

১৩০৪ এবং ১৩০৬ সালের জন্মাষ্টমী দিবসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ সহরে ইংরাজী ভাষায় দুইটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সেই দুই বক্তৃতা উক্ত দুইখানি পুস্তিকাকারে তদীয় মাদ্রাজী শিষ্যগণ বাহির করিয়াছেন। প্রথমটী "ট্রীপ্লিকেন লিটারারী সোসাইটীতে," এবং দ্বিতীয়টী "এগ্‌মোর রিডিং রুমে." দেওয়া হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজস্থ রামকৃষ্ণমিশনের মঠের অধ্যক্ষ। ইনি একজন সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী।

প্রথম বক্তৃতায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা এবং দ্বিতীয়টীতে তাঁহার মথুরা ও পাণ্ডব-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত মতে করিয়াছেন এবং অতি সুন্দর হইয়াছে। গোপীলীলা অতি সাবধানে লিখিত, সকলেই অনায়াসে সন্তোষের সহিত পাঠ করিতে পারেন। ভাষা অতীব সুন্দর, ঈসপস্ ফেবলের সারল্য, এরেবিয়ান নাইটের মাধুর্য্য এবং লাইফ অফ বোনাপার্টের লোমহর্ষণ ঘটনাবলির চিত্র, বক্তৃতাদ্বয়ে একত্র সমাবিষ্ট দেখিতে পাইবেন। নভেল-নাটক না পড়িয়া, এইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিলে ভাষাও শিক্ষা হয়, গল্পও পড়া হয়, এবং স্বদেশের প্রাচীন পুরাণাদির এবং সহজ সহজ ধর্ম্মতত্ত্বেরও চর্চ্চা করা হয়। মূল্যও অতি যৎসামান্য—চারি আনা করিয়া এক এক খানি; "ব্রহ্মবাদিন আফিস, ট্রীপ্লিকেন, মাদ্রাজ," এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

প্রকাশকগণ দ্বিতীয় সংস্করণে, বক্তৃতাগুলির একটু সূচীপত্র যেন করিয়া দেন। দুঃখের বিষয় বক্তৃতাগুলিতে মধ্যে মধ্যে হেডিং মাত্রও করিয়া দেওয়া হয় নাই। এ সকল গ্রন্থকার না করিলেও, প্রকাশক বা সম্পাদকের একান্ত কর্ত্তব্য।

---

# প্রাপ্তি স্বীকার।

বড়বাজার নিবাসী, উদ্বোধনের জনৈক গ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সেট মহাশয় কিষেণগড় অনাথাশ্রমের সাহায্যের জন্য, এক কালীন ৫০৲ টাকা দান করিয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

---

প্রদান করিলেই যে বস্তু ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় তাহাও নহে। তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার আছে, এই বাক্যের দ্বারা এই প্রকার অর্থ অতি স্ফুটভাবেই বলা হইয়াছে। ঐ বিষয় আবার বলিবারও কোন প্রয়োজন নাই। সর্ব্বত্র যাহা প্রশস্ত ও কর্ত্তব্য তাহারই বোধ করান উচিত; যাহা নিষ্প্রয়োজন তাহা ( শাস্ত্রে ) বোদ্ধব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য।—ন চ মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং ভবতি। তৎপ্রত্যুপস্থাপিতং বা বস্ত্বাভাসং। নাপি নিত্যানামকরণাদভাবাৎ প্রত্যবায়ভাবোৎপত্তির্নাসতো বিদ্যতে ভাব ইতি বচনাৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি চ দর্শিতম্। অসতঃ সজ্জন্মপ্রতিষেধাৎ অসতঃ সদুৎপত্তিং ব্রুবতা অসদেব সদ্ভবেৎ সচ্চাসদ্ ভবেদিত্যুক্তং স্যাৎ। তচ্চায়ুক্তং সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ। ন চ নিষ্ফলং বিদধ্যাৎ কর্ম্মশাস্ত্রং, দুঃখস্বরূপত্বাত্ দুঃখস্য চ বুদ্ধিপূর্ব্বকতয়াকার্য্যত্বানুপপত্তেঃ। তদকরণে চ নরকপাতাভ্যুপগমে অনর্থায়ৈব উভয়থাপি করণেঽকরণে চ শাস্ত্রং নিষ্ফলং কল্পিতং স্যাত্। স্বাভ্যুপগমবিরোধশ্চ নিত্যং নিষ্ফলং কর্ম্মেত্যভ্যুপগম্য মোক্ষফলায়েতি ব্রুবতঃ। তস্মাদ্ যথাশ্রুতএবার্থঃ কর্ম্মণ্য-কর্ম্ম যইত্যাদেঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতোঽয়মস্মাভিঃ শ্লোকঃ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—মিথ্যাজ্ঞান কখনই বোদ্ধব্য হইতে পারে না, সেই মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত অসদ্ অর্থ বুঝিয়াও কোন ফল নাই। (আর একটী বিষয় দেখিতে হইবে যে) নিত্য কর্ম্মের অকরণ অভাব, সেই অভাব হইতে প্রত্যবায় রূপ ভাব বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না, "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" "এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে ও কেমন করিয়া অসত্ হইতে সৎ উৎপন্ন হইবে" ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করিয়া, এই বিষয়টী আমি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি যে অসত্ হইতে সতের জন্ম কিছুতেই হইতে পারে না। অসৎ হইতে সতের জন্ম হয় এই কথা যিনি বলেন, তিনি ইহাও বলিতে পারেন যে সত্ অসত্ হয় এবং অসত্ সত্ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার হইতে পারে না, কারণ ইহা সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের বিরুদ্ধ। শাস্ত্রও যে নিষ্ফল কর্ম্মের বিধান করিতে পারে, তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে না। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দুঃখ স্বরূপ ( অথচ ) তাহার দ্বারা কোন ফল লাভ ও হয় না। (কেহই) জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্ফল ও অথচ দুঃখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না। নিত্যকর্ম্মের অকরণে নরকপাত হয়, ইহা স্বীকার করিলেও শাস্ত্র অনর্থকরই হইয়া উঠে। কারণ নিত্যকর্ম্মের করণেও ক্লেশ, অকরণেও নরকাদিরূপ ক্লেশ,

উভয় প্রকারেই শাস্ত্র নিষ্ফল ইহাই কল্পিত হইয়া উঠে। নিত্যকর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, ইহা বলিয়া আবার যদি বল যে নিত্যকর্ম্ম নিষ্ফল, তাহা হইলে নিজের অভ্যুগমের সহিতই বিরোধ হইয়া উঠে। এই সকল কারণে ( বলিতে হইতেছে যে ) কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ ইত্যাদি শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থই করিতে হইবে এবং সেই প্রকারেই আমরা এই শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিয়াছি ॥ ১৮ ॥

---

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ ( কর্ম্মাণি ) কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ,। বুধাঃ তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং পণ্ডিতং আহুঃ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ। যাহার সকল প্রকার কার্য্যই কাম ও সঙ্কল্পরহিত, জ্ঞানীগণ, সেই জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্ম্মা পুরুষকে পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য।—তদেতৎ কর্ম্মণি অকর্ম্মাদি দর্শনং স্তূয়তে যস্যেতি। যস্য যথোক্তদর্শিনঃ সর্ব্বে যাবন্তঃ সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি সমারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ কামৈস্তৎ কারণৈঃ সঙ্কল্পৈশ্চ বর্জ্জিতাঃ মুধৈব চেষ্টা মাত্রাঃ অনুষ্ঠীয়ন্তে। প্রবৃত্তেন চেৎ লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন চেৎ জীবনমাত্রার্থং তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানং তদেবাগ্নিস্তেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য তং আহুঃ পরমার্থতঃ পণ্ডিতং বুধা ব্রহ্মবিদঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এবম্বিধ, কর্ম্মেতে অকর্ম্মাদি দর্শনের স্তুতি করা যাইতেছে যে যস্যেত্যাদি। যথোক্তদর্শী যে ব্যক্তির সকল সমারম্ভ ( অর্থাৎ ) কর্ম্ম, যাহা আরম্ভ করা যায় তাহাকে সমারম্ভ বলে, (এই কারণে সমারম্ভ শব্দের অর্থ কর্ম্ম, কর্ম্মেরও আরম্ভ হয় ) কামসংকল্পবর্জ্জিত ( অর্থাৎ ) কাম ও তাহার কারণ সংকল্প হইতে একেবারে নির্ম্মুক্ত। ( অর্থাৎ ) সে ব্যক্তির যাহা কিছু কর্ম্ম, তাহা কেবল স্বতঃ প্রয়োজনশূন্য কেবল চেষ্টা স্বরূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি যদি সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্তিপর হয়, তাহা হইলে তাহার ফল লোকসংগ্রহ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। আর সে ব্যক্তি যদি সন্ন্যাসী হয়, তাহা হইলে তাহার যাহা কিছু চেষ্টা তাহা কেবল জীবনধারণের জন্য। সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা পুরুষকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ পরমার্থতঃ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। কর্ম্মাদিতে অকর্ম্মাদিদর্শনকে জ্ঞান কহা যায়—সেই জ্ঞানরূপ অগ্নি যাহার

শুভাশুভ কর্ম্ম সকলকে দগ্ধ করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা বলা যায় ॥ ১৯ ॥

---

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তোনিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়।—( যঃ ) কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ ( চ ) সন্ কর্ম্মণাপি অভিপ্রবৃত্তো ( ভবতি ) স নৈব কিঞ্চিৎ করোতি ( কর্ম্মফলেন যুক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ ) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাহীন এবং আশ্রয়হীন হইয়া কর্ম্মফলে আসক্তিপরিহারপূর্ব্বক ( বিহিত ) কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ( প্রকৃত পক্ষে ) সে ব্যক্তি কিছুই করে না ॥ ২০ ॥

ভাষ্য।—যস্ত্বকর্ম্মাদিদর্শী সোঽকর্ম্মাদিদর্শনাদেব নিষ্কর্ম্মা সংন্যাসী জীবনমাত্রার্থচেষ্টঃ সন্ কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্ততে যদ্যপি প্রাগ্ বিবেকতঃ প্রবৃত্তঃ। যস্তু প্রারব্ধকর্ম্মা সন্ উত্তরকালমুৎপন্নাত্মসম্যগ্দর্শনঃ স্যাৎ স কর্ম্মণি প্রয়োজনং অপশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যজত্যেব। স কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ কর্ম্মপরিত্যাগাসংভবে সতি সতি কর্ম্মণি তৎফলে চ সঙ্গরহিততয়া স্বপ্রয়োজনাভাবাৎ লোকসংগ্রহার্থং পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাৎ তদীয়ং কর্ম্ম অকর্ম্মৈব সম্পদ্যতে ইত্যেতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ত্যক্ত্বেতি। ত্যক্ত্বা কর্ম্মসু অভিমানং ফলাসঙ্গঞ্চ যথোক্তেন জ্ঞানেন নিত্যতৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষো বিষয়েষ্বিত্যর্থঃ। নিরাশ্রয় আশ্রয়রহিতঃ। আশ্রয়োনাম যদাশ্রিত্য সিসাধয়িষতি। দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টফলসাধনাশ্রয়রহিত ইত্যর্থঃ। বিদুষা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরমার্থতোঽকর্ম্মৈব তস্য নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বাৎ। তেনৈবংভূতেন প্রয়োজনাভাবাৎ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যক্তব্যমেবেতি প্রাপ্তে ততো নির্গমাসম্ভবাৎ লোকসংগ্রহচিকীর্ষয়া শিষ্টবিগর্হণাপরিজিহীর্ষয়া বা পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপিনিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বান্নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি অকর্ম্মাদিদর্শী ( অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ ) সে অকর্ম্মাদি দর্শনের প্রসাদেই নিষ্ক্রিয় ও সন্ন্যাসী, কেবল জীবনরক্ষার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত সেই ব্যক্তি, বিবেক জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইলেও সেই অবস্থার কোন বিহিত কর্ম্মে আর প্রবৃত্তিমান্ হয় না। যে ব্যক্তি কিন্তু প্রথমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরে সম্যক্ প্রকারে আত্মদর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তিও

কর্ম্মে কোন প্রকার প্রয়োজন না দেখিতে পাইয়া তাহার পরিত্যাগই করিয়া থাকে। কিন্তু কোন কারণে কর্ম্ম পরিত্যাগ ( তাহার নিকটে ) অসম্ভব হইলে, কর্ম্মেও তাহার ফলে সঙ্গ না থাকা নিবন্ধন, নিজের কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও, লোকসংগ্রহার্থ সেই ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু হইলেও, বাস্তব পক্ষে কিছুই করে না। জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা তাহার কর্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া, তাহার কর্ম্ম কর্ম্মই নহে, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে ত্যক্ত্বেত্যাদি। বিহিত কর্ম্ম সমূহে অভিমান ও ফলাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথোক্ত জ্ঞানের সাহায্যে নিত্যতৃপ্ত ( অর্থাৎ ) বিষয় সমূহে নিরভিলাষ এবং নিরাশ্রয় ( অর্থাৎ ) দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সাধন সমূহে আশ্রয় বর্জ্জিত, যাহাকে অবলম্বন করিয়া লোক পুরুষার্থ সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহারই নাম আশ্রয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কোন কর্ম্ম করিলেও ( বাস্তব পক্ষে ) ঐ কর্ম্ম কর্ম্মই নহে, কারণ সেই ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় আত্মার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছে। সেই নিরাশ্রয় ও নিত্যতৃপ্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির, স্বীয় কোন প্রকার প্রয়োজন নাই বলিয়া সাধনের সহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই উচিত, এই প্রকার সম্ভাবনা যদি করা যায় তাহার নিরাকরণ করিবার জন্য ( ভগবান্ বলিতেছেন যে ) ( জীবিত ব্যক্তির পক্ষে ) কর্ম্ম একেবারে না করিয়া থাকা অসম্ভব, এই জন্য সেই ব্যক্তি ( পূর্ব্বোক্ত প্রকার ) লোক সংগ্রহের জন্যই হউক কিংবা শিষ্টজনের নিকট নিন্দার পরিহার করিবার ইচ্ছায়, পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও নিষ্ক্রিয় আত্মার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া ( প্রকৃতপক্ষে ) কিছুই করে না ॥ ২০ ॥

---

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—নিরাশীর্যতচিতাত্মা ( তথা ) ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ ( সন্ ) বা কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ( জ্ঞানী ) কিল্বিষং ন আপ্নোতি ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—কামনা হীন, জিতেন্দ্রিয় এবং সকল প্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগকারী জ্ঞানী, কেবল শরীরস্থিতিমাত্র হেতু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও কোন প্রকার পাপ বা পুণ্য লাভ করে না। ২১ ॥

ভাষ্য।—যঃ পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ প্রাগেব কর্ম্মারম্ভাৎ ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি নিষ্ক্রিয়ে সঞ্জাতাত্মদর্শনঃ সদৃষ্টাদৃষ্টবিষয়াশীর্বিবর্জ্জিততয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থে

কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যজ্য শরীরযাত্রা মাত্রচেষ্টঃ যতির্জ্ঞাননিষ্ঠো মুচ্যত ইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ নিরিতি। নিরাশী নির্গতা আশিষো যস্মাৎ স নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা বাহ্যঃ কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতঃ তাবুভাবপি যতৌ সংযতৌ যেন স যতচিত্তাত্মা। ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ ত্যক্তঃ সর্ব্বঃ পরিগ্রহো যেন স ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ শারীরং শরীরস্থিতিমাত্র-প্রয়োজনং কেবলং তত্রাপি অভিমানবর্জ্জিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন নাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি কিল্‌বিষম্ অনিষ্টাখ্যং পাপং ধর্ম্মং চ ধর্ম্মোঽপি মুমুক্ষোঃ কিল্বিষমেব বন্ধাপাদক-ত্বাৎ॥ ২১॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সাধক হইতে বিলক্ষণ ( অর্থাৎ ) কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বেই সকল পদার্থেরই অন্তঃস্থিত নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্বাত্মভূত পর ব্রহ্মেতেই আত্মভাবের দ্রষ্টা, সেই ব্যক্তি, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা না থাকা প্রযুক্ত দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফলের সাধন কর্ম্মে কোন প্রকার প্রয়োজন না দেখিতে পাইয়া, কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যই বাহ্য চেষ্টা করে, সেই জ্ঞাননিষ্ঠ যতি মোক্ষলাভ করে, ইহাই বুঝাইবার জন্য ( ভগবান্ ) বলিতেছেন যে, নিরাশীরিত্যাদি। "নিরাশীঃ" যাহার হৃদয় হইতে আশীঃ ( অর্থাৎ ভোগ তৃষ্ণা ) নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই নিরাশীঃ। "যত চিত্তাত্মা" চিত্ত শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ এবং আত্মা এই শব্দটীর অর্থ ( এই স্থলে ) বহিরিন্দ্রিয় ও স্থূল দেহ। এই সকল বস্তু যাহার সংযত হইয়াছে, তাহাকেই যতচিত্তাত্মা বলা যায়। "ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ" সকল পরিগ্রহ যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সেই ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহ। ( এই প্রকার বিশেষণযুক্ত ব্যক্তি ) "শারীর" ( অর্থাৎ ) শরীরস্থিতিমাত্রের হেতু "কেবল" তাহাতেও অভিমান বর্জ্জিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও "কিল্‌বিষ" অনিষ্ট নামক পাপ এবং পুণ্য লাভ করে না, বন্ধের কারণ এই জন্য ধর্ম্মও মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট কিল্‌বিষ শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে ( কিল্‌বিষ শব্দের প্রকৃত অর্থ পাপ )। ২১॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যত্র কিং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং কর্ম্ম অভিপ্রেতং আহো স্বিৎ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মেতি। কিঞ্চাতো যদি শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং কর্ম্ম যদি বা শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়ো-জনং শারীরমিতি ? । উচ্যতে যদা শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম শারীরমভিপ্রেতং স্যাৎ তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধমপি শরীরেণ কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্‌বিষমিতি ব্রুবতো বিরুদ্ধাভিধানং প্রসজ্যেত॥ ২১॥

ভাষ্যানুবাদ।—এস্থলে এই প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেবল শারীর কর্ম্ম এস্থলে শারীর শব্দটীর অর্থ কি? শরীরের দ্বারা যাহাই সাধিত হইতে পারে, তাহাই কি শারীর কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? কিংবা শরীর-স্থিতিমাত্রই যাহার উদ্দেশ্য সেই কর্ম্মই এইস্থলে শারীর কর্ম্ম, এই শব্দটীর অভিপ্রেত অর্থ। যদি বল ইহার তাৎপর্য্য কি? শরীরের দ্বারা যাহা কিছু কর্ম্ম নিষ্পাদিত হয় তাহাই যদি শারীর শব্দের অর্থ, তাহা হইলেই বা কি হয়, অথবা শরীর স্থিতিমাত্র প্রয়োজন যে কর্ম্ম তাহাই, যদি শারীর শব্দের অভিপ্রেত অর্থ হয়, তাহা হইলেই বা কি হয় ( ইহার এই দুইপ্রকার অর্থের মধ্যে কোন অর্থটী সাধু এবং কোনটী সাধু নহে সেই বিষয়ে ) বলা যাইতেছে যে, যদি শরীরের দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মমাত্রই শারীর শব্দের অভিপ্রেত অর্থ হয়, তাহা হইলে প্রতিষিদ্ধ দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফলের হেতু কর্ম্ম করিলেও পাপভাগী হয় না, এই কথা যিনি বলেন, তাঁহার কথা নিতান্ত শাস্ত্রবিপরীত হইয়া উঠে॥ ২১॥

ভাষ্য।—শাস্ত্রীয়ং চ কর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং শরীরেণ কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যপি ব্রুবতোঽপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গঃ। শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিতি বিশেষণাৎ কেবলশব্দপ্রয়োগাচ্চ বাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্মবিধিপ্রতিষেধ-বিষয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মশব্দবাচ্যং কুর্ব্বন্ প্রাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যুক্তং স্যাৎ। তত্রাপি বাঙ্মনসাভ্যাং বিহিতানুষ্ঠানপক্ষে কিল্বিষপ্রাপ্তিবচনং বিরুদ্ধমাপদ্যেত। প্রতিষিদ্ধসেবাপক্ষেঽপি ভূতার্থানুবাদমাত্রমনর্থকং স্যাৎ। যদা তু শরীরস্থিতি-মাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মাভিপ্রেতং ভবেৎ তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম বিধিপ্রতিষেধগম্যং শরীরবাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্ত্যং অন্যদকুর্ব্বন্ তৈরেব শরীরাদিভিঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলশব্দপ্রয়োগাদহং করোমীত্যভিমানবর্জ্জিতঃ শরীরাদিচেষ্টামাত্রং লোকদৃষ্ট্যা কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং। এবং ভূতস্য পাপশব্দবাচ্যকিল্বিষপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ কিল্বিষং সংসারং নাপ্নোতি জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধসর্ব্বকর্ম্মত্বাৎ অপ্রতিবন্ধেন মুচ্যত এবেতি সম্যগ্ দর্শনফলানুবাদ এবৈষঃ। এবং শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যস্যার্থস্য পরিগ্রহে নিরবদ্যং ভবতি॥ ২১॥

ভাষ্যানুবাদ।—শাস্ত্র বিহিত, দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ফলের কারণ কর্ম্ম, শরীরের দ্বারা করিলে পাপভাক্ হয় না, এই প্রকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিলেও যাহা অপ্রাপ্ত তাহারই প্রতিষেধের আপত্তি হইয়া পড়ে। ( অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কাহারও পক্ষে যখন পাপ হইবার সম্ভাবনাই

নাই, তখন শাস্ত্রীয় কর্ম্ম, শরীরের দ্বারা করিলে পাপভাগী হয় না, ইহা বলা নিরর্থক হইয়া উঠে, পাপ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তাহার প্রতিষেধ নিষ্প্রয়োজন ) ( এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে গেলে আরও দোষ এই যে ) শারীর কর্ম্ম; এই প্রকার বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, এইজন্য এবং কেবল এই শব্দটীরও প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া, প্রকারান্তরে ইহাই উক্ত হইয়া যায় যে বাক্য ও মনের দ্বারা যে সকল কর্ম্মের নিষ্পাদন হইতে পারে, ঐ সকল দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সাধন কর্ম্ম করিলে কিল্বিষ প্রাপ্ত হয়। সে পক্ষেও বাক্য ও মনের দ্বারা সম্পাদনীয় শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পক্ষেও পাপপ্রাপ্তিবচন নিতান্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পক্ষেও পাপপ্রাপ্তিবচনও নিষ্প্রয়োজন ভূতার্থানুবাদ মাত্র ( অর্থাৎ যাহা সকলেরই বিদিত, তাহারই পুনঃ কথন ) হইয়া উঠে, ( নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে পাপ হয় ইহা সকলেরই বিদিত আছে )। যদি শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজন কর্ম্মই এইস্থলে শারীর কর্ম্ম ( বলিয়া ) অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ( এই প্রকার তাৎপর্য্য বর্ণনও করিতে হয় যে ) বিধিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফলের হেতু, শরীর, বাক্যও মনের দ্বারা সাধ্য অন্য যাবৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বাক্য, মন ও শরীরের দ্বারাই, আমি করিতেছি এই প্রকার অভিমান পরিহারপূর্ব্বক, শরীর স্থিতির জন্য শরীরাদির চেষ্টা বাহ্যতঃ করিলেও পাপভাগী হয় না, কারণ এই প্রকার নিরভিমান ব্যক্তির, পাপ শব্দ বাচ্য কিল্বিষ প্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া, বিনা বাধায় সেই জ্ঞানী মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ এবং ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের ফলেরই অনুবাদ করা হইতেছে। শারীর কেবল কর্ম্ম ইত্যাদির এই প্রকার অর্থ করিলে কোনপ্রকার দোষ থাকে না ॥ ২১ ॥

---

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতোবিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ ( অযাচিতোপনত পরিতুষ্টঃ ) দ্বন্দ্বাতীতঃ ( শীতোষ্ণাদিসঙ্গেঽপি নির্ব্বিকারঃ ) বিমৎসরঃ ( নির্ব্বৈরবুদ্ধিঃ ) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ ( হর্ষবিষাদবর্জ্জিতঃ ) সন্ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—অযাচিত অথচ প্রাপ্ত বস্তুর লাভেই যাহার আকাঙ্ক্ষা

নিবৃত্তি হয়। শীতোষ্ণসম্পর্কেও যাহার বিকার নাই, অযাচিত বস্তুরও প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে যে হর্ষবিষাদবিরহিত সেই জ্ঞানী পুরুষ কার্য্য করিয়াও সংসারে বদ্ধ হয় না ॥ ২২ ॥

ভাষ্য।—ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য যতেরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ পরিগ্রহস্যাভাবাদ্ যাচনাদিনা শরীরস্থিতৌ কর্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তায়াং অযাচিতমসংকৢপ্তং উপপন্নং যদৃচ্ছয়া ইত্যাদিনা বচনেনানুজ্ঞাতং যতেঃ শরীরস্থিতিহেতোরন্নাদেঃ প্রাপ্তিদ্বারং, আবিষ্কুর্ব্বন্নাহ যদৃচ্ছেতি। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো হ প্রার্থিতোপনতো-লাভঃ যদৃচ্ছালাভঃ তেন সন্তুষ্টঃ সঞ্জাতালং প্রত্যয়ঃ দ্বন্দ্বাতীতো দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণাদিভি র্হন্যমানোঽপি অবিষণ্ণচিত্তঃ দ্বন্দ্বাতীত উচ্যতে। বিমৎসরো বিগত মৎসরো নির্ব্বৈরবুদ্ধিঃ। সমস্তুল্যঃ যদৃচ্ছালাভস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ। য এবম্ভূতো যতিরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোর্লাভালাভয়োঃ সমঃ হর্ষবিষাদবর্জ্জিতঃ কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শী যথাভূতাত্মদর্শননিষ্ঠঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনে ভিক্ষাটনাদিকর্ম্মণি শরীরাদিনির্ব্বর্ত্ত্যে নৈব কিঞ্চিৎ করোম্যহং "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" ইত্যেবং সদা পরিচক্ষাণ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভাবং পশ্যন্ নৈবং কিঞ্চিদ্ ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম্ম করোতি লোকব্যবহারসামান্যদর্শনেন লৌকিকৈরারোপিত-কর্ত্তৃত্বে ভিক্ষাটনাদৌ কর্ম্মণি কর্ত্তা ভবতি। স্বানুভবেন তু শাস্ত্রপ্রমাণাদি-জনিতেন অকর্ত্তৈব। স এবং পরাধ্যারোপিতকর্ত্তৃত্বং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম্ম কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে বন্ধহেতোঃ কর্ম্মণঃ স হেতুকস্য জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাদিত্যুক্তানুবাদ এবৈষঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সকল প্রকার পরিগ্রহ যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাদৃশ সংন্যাসীর পরিগ্রহ না থাকা নিবন্ধন যাচনাদির দ্বারা শরীরযাত্রার নির্ব্বাহ-প্রসক্ত হইলে, অযাচিত অসংকৢপ্ত এবং যদৃচ্ছাবশতঃ উপনীত (অন্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে) ইত্যাদি বচন বিহিত, সংন্যাসীর শরীর-স্থিতির প্রতি কারণ অন্নাদির প্রাপ্তির উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য বলিতেছেন যে যদৃচ্ছেত্যাদি। "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট" অপ্রার্থিত হইয়া উপস্থিত লাভকে যদৃচ্ছালাভ বলা যায়, তাহাতেই যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট (অর্থাৎ) ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, এই প্রকার বুদ্ধিশালী, তাহাকেই যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট বলা যায়। "দ্বন্দ্বাতীত" দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ) শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বারা আহত হইয়াও যে ব্যক্তি বিষণ্ণচিত্ত হয় না, তাহাকেই দ্বন্দ্বাতীত বলা যায়। 'বিমৎসর' বিগত-মৎসর (অর্থাৎ) বৈরবুদ্ধি যাহার একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, তাহাকেই

# বঙ্গ-যুবকের প্রতি।



(স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত।)

হে বঙ্গ-যুবক,
কর অবধান—
ভাবিয়া ভরসা তুমি জগতের;
এই মোহ সাজে কি তোমারে?
কভু সুখ-প্রলোভনে মোহিত অন্তরে,
কভু বা কলহ-বশে, কাল গোঁয়াইছ রসে,
এ ভাব কি সাজে হে তোমারে?

এই মোহ সাজে কি তোমারে?
তুমি হে অনন্তশক্তিধর,
সর্ব্বশক্তি তোমার ভিতর,
ব্রহ্মাণ্ড এ ভাণ্ডের ভিতর,
এই মোহ সাজে কি তোমারে?

ভারতের সব গেছে—গেছে তন্ত্র বেদ,
গিয়াছে বাল্মীকি ব্যাস—কিবা তাহে খেদ?
জাগাও হৃদয়-তন্ত্র, জপ স্বার্থত্যাগ-মন্ত্র,
হও ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা—ত্যজি ভেদাভেদ।
ক্ষুদ্র দৃষ্টি ভুলে গিয়ে, মাত সে ভূমারে লয়ে,
ইন্দ্রিয়-অতীত যেবা, নাহি যাহে ক্লেদ।

ভারতের প্রাণ ধর্ম্মের কৌটায়,
ধর্ম্ম-নাশে ভারতের প্রাণ যায়—
ধর্ম্ম-উদ্দীপনে পুন সমুদয়।

তাই বলি,—
উড়াও ত্যাগের ধ্বজা, জগতের পাবে পূজা,
ত্যাগ সর্ব্ব-সদ্গুণ-আলয়,
ত্যাগেরে ত্যজিলে হায়, ত্যক্ত সমুদয়।

ছাড় কন্যা পুত্র প্রিয়া, ছাড় পিতা মাতা মায়া,
ছাড় বন্ধু, ছাড় ভ্রাতা, ছাড় ছাড় অন্য কথা,
পরিবার সুখ শান্তি সময় এ নয়।
কোটি কোটি ভগ্নী ভ্রাতা মরে অনাহারে,
কে আছ হৃদয়বান্, হও হও আগুয়ান—
একটী বোনের কিম্বা ভ্রাতার উদ্ধারে।

এক অঙ্গ পুষ্টি হয়, আর অঙ্গ পায় ক্ষয়,
পুষ্টি নয়, ভিষকেরা রোগ তাকে কয় ;
ধনিক যুবক কেহ, শিক্ষিত বলিষ্ঠ দেহ,
পাশে তার ক্ষীণ ভ্রাতা, পাশে তার শীর্ণা মাতা,
রোগশোকে ক্ষুধাবশে মরে দলে দলে ;—
—আছে কি ঈশ্বর কেহ দয়ার শরীর,
যার রাজ্যে এই সব হয় অনাচার,—
স্বাধীনতা আশে কেহ ঝরায় রুধির,
স্বার্থপর করে কেহ বিজয়-হুঙ্কার ?

নাহিক ঈশ্বর হেন শূন্যে স্বর্গোপরে,
মেঘমন্দ্রে কিম্বা সেই বজ্রের ঘর্ঘরে।
শোভাময়ী বিদ্যুল্লতা, নাই তথা নাই তথা,
নাই অগ্নি কিম্বা বনস্পতির ভিতরে,
অথবা সে হিমালয়-নিভৃত-কন্দরে।

হে বঙ্গ যুবক,
তোমার ভিতরে তাঁর মহিমা-বিকাশ,
স্বার্থ-ত্যাগ, দয়ারূপে যাঁহার আভাস।
হৃদয়ে মহান্ কর, বৈরাগ্যের বেশ ধর,
এস দলে দলে, শীঘ্র ব'বে সুবাতাস—
ঘুচিবেক জননীর দীর্ঘ হা হুতাশ।

যাও,
ভুখে দাও অন্ন, পিয়াসীরে দাও জল,
বিদ্যাহীনে দাও বিদ্যা, জ্ঞানহীনে জ্ঞান,

দেখাও চরিত্র-বল, জিনিবে পাশব-বল,
ধর্ম্মতেজে জিনিবে হে, বিজয়ীর দলে —
রহিবে অক্ষয় যশ ভব-ধরা-তলে।

ধর্ম্মের বিস্তার কর শুভাশিষ সনে,
সকলে অভয় দাও, হিংসারে বিদায় দাও,
আর যাহা প্রয়োজন আসিবে আপনি,
হাসিবে পুলকে পুন হাসিবে জননী।

তাই বলি হে বঙ্গ-যুবক!
উঠ নব অনুরাগে,
দেশের ভরসা তুমি, দরিদ্র-সম্বল,
দেখাও দেখাও তব ত্যাগ-মন্ত্র-বল —
যেন পুন এ ভারত জাগে।

জাগিলে ভারত, জগৎ জাগিবে—
ভারতের আলো গগন ছাইবে।

---

# জাতীয়ত্ব-বোধ।

[ পূর্ব্ব সংখ্যায় ৫৩২ পৃষ্ঠার পর। ]

আমাদিগের জাতীয়ত্ব-বোধ নাই বলিয়াই—সমগ্র দেশের যাবতীয় লোকের পরস্পর পরস্পরের কদর ও একান্ত আবশ্যকতা আমরা কেহ বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই—পরস্পর পরস্পরের সহিত যে কি নিকট সম্পর্ক তাহা আমাদিগের দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করা নাই বলিয়াই—দেশে এত ভেদাভেদ জ্ঞান, এত ছোট বড় জ্ঞান, এত তুচ্ছজ্ঞান, ও আত্মাভিমান; এবং সেই কারণ বশতঃই আমাদিগের ভিতর এত ঘনিষ্ঠতার, আত্মীয়তার ও একতার অভাব; এবং আমরা সেই একতারূপ বৃহৎ কল্পতরুমূলে নাই বলিয়াই দেশের এত দুর্দ্দশা, এত বিশৃঙ্খলতা ও এত ভূয়োভূয়ঃ অনিষ্ট-সম্পাত!

আমরা জানিনা যে, দেশের সকল শ্রেণীর সকল লোকই আমাদিগের একান্ত আবশ্যক—তা মুখ্য ভাবেই হউক, আর গৌণভাবেই হউক, সমাজ

ভাবেই হউক, আর প্রকারান্তরেই হউক। আমরা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না যে, দেশের যত লোক বা দ্রব্য সমস্তই আমাদের। আমাদের দ্রব্য, আমাদের লোক, আমাদের দেশ, আমাদের জাতি, আমাদের আচার ব্যবহার, সকল বিষয়েই আমাদেরত্ব—আমাদের বলিয়া টান—নাই, এই জন্যই এত জাতীয়ত্বের অভাব। আমাদিগের বলিয়া জ্ঞান না আসিলে কোন বিষয় রক্ষা বা যত্ন করিতে ইচ্ছা হয় না।

যেমন "তুমি আমার, আমি তোমার"—এইরূপ জ্ঞান না হইলে বিশুদ্ধ প্রেম লাভ হয় না। তেমনি, 'দেশ আমাদের, আমরা দেশের', এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে প্রকৃত ও মহাপবিত্র জাতীয়ত্ব-বোধ উদিত হয় না। আমরা কেহ, কেবল মাত্র নিজের জন্য নহি; নিজের জন্য কতটুকু?—যতটুকু একান্ত না হইলে, পরের উপকারে আসিতে পারিব না। নিজেকে দেখি কেন—নিজেকে রক্ষা করি কেন? পরকে দেখিব বা রক্ষা করিব বলিয়া। নিজের জন্য করি কেন?—পরের জন্য যদি কিছু করিতে পারি। পরের জন্য করাই—শ্রেষ্ঠ 'করা'; পরকার্য্য—শ্রেষ্ঠ কার্য্য; 'পর' মানেই—শ্রেষ্ঠ। যে হৃদয়, পরের জন্য প্রশস্ত হয় নাই, সে হৃদয়ে পরব্রহ্মের ছায়া পড়ে না; 'পর' মানেই—ব্রহ্ম। ক্রমশঃ অগ্রসর না হইলে কি রূপে 'দূর' নিকট হইবে? আগে নিকটস্থ-দিগের সেবা করিয়া, চতুঃপার্শ্বস্থদিগের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া, হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও নিজের স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে অভ্যাস করি; সকলকে আপনার ভাবিয়া, নিজের পরমাত্মীয় বোধ করিয়া, পরম স্নেহপূর্ণনেত্রে দেখিতে আগে অভ্যাস করি; তবেত সেই হৃদয় পবিত্র হইবে, সেই নয়ন নির্ম্মল হইবে; এবং তবেই ত, সেই নয়ন, "দূরাৎ দূরতরম্"কে অতি সন্নিকটেই দেখিতে পাইবে; এবং তবেই ত সেই হৃদয়, সেই "মহতো মহীয়ান্"এর সহিত নিজের আত্মার একত্ব অনুভব করিতে পারিবে।

ভারত যেন একটী বৃহৎ বপু। হিমালয় ইহার শির; পূর্ব্ব ও পশ্চিমাঞ্চল ইহার সুবৃহৎ হস্তদ্বয়; আর্য্যাবর্ত্ত ইঁহার হৃৎমণ্ডল; মধ্যদেশ—যেন দেহের অতি সুন্দর অধোভাগ; এবং দক্ষিণাঞ্চল যেন ইঁহার পুণ্যময় পাদদেশ।

পাশ্চাত্য দেহতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, জীবন-ধারণের জন্য—তিনটী একান্ত আবশ্যকীয় বস্তু; যথা, রেস্‌পিরেশন (অর্থাৎ প্রাণবায়ুর

ক্রিয়া), নর্ভাস-সিসটেম অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলী, এবং ব্লড সার্কুলেশন অর্থাৎ শোণিত-প্রবাহ। এই তিনটী বিষয়ের মধ্যে পরস্পর সুন্দর সম্বন্ধ। একটীর অভাবে অপর দুইটী অত্যন্ত অনর্থক, এবং মৃত্যু অনিবার্য্য। জীবন ধারণ করিতে হইলে, ভারতেরও পক্ষে, তদ্রূপ, তিনটী ব্যাপারের প্রধান প্রয়োজন,—আত্মীয়তা, একতা, ও সম্মিলন। একতা—যেন ভারতের প্রাণবায়ু; আত্মীয়তা—যেন ইঁহার স্নায়ু-মণ্ডলী; এবং পরস্পর সম্মিলন—যেন ভারতের শোণিত প্রবাহ। এই তিনটীর মধ্যে কোন একটীর বিশেষ ক্ষতি হইলেই জানিবেন—ভারতের জীবন-সংশয়।

শোণিত যেমন শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক, ভারতের জাতীয় সম্মিলনেরও তদ্রূপ স্বার্থশূন্য ও অতিপবিত্র হওয়া প্রয়োজন;—সম্মিলনের সমিতি কোথাও উপস্থিত হইলে কোনও সভ্যের হৃদয়ে যেন দেশ-ভ্রমণ,হাওয়া পরিবর্ত্তন, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, যশ বা অর্থ, প্রভৃতি কোনও প্রকার স্বার্থমলিনতা না থাকে। শোণিত যেমন প্রাণ বায়ুর স্পর্শে শুদ্ধ হইয়া শরীর পুষ্টি ও রক্ষার্থে স্ব স্ব স্থানে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ, আমরা সকলেও যেন একতা-ভাবে ভাবিত হইয়া অতি শুদ্ধান্তঃকরণে সাধারণের মঙ্গলার্থ স্বস্বক্ষেত্রে ধাবমান হই। দ্বেষ, হিংসা, আলস্য, বা কোনও প্রকার স্বার্থ হইতেছে দূষিত বায়ু; ইহারা প্রকৃত প্রাণ-বায়ু নহে, প্রাণ বা জীবন রক্ষার্থ সাহায্য করিতে পারে না। আমরা যেন সে সকল মলিন বায়ু সেবন না করি। অন্তরস্থ যাবতীয় মলিনতা, যেন সেই শোণিত-পাবক প্রাণবায়ু স্পর্শে, যেন সেই শক্তিসঞ্চারক ও পরমশুভদায়ক একতা-ভাবের সংসর্গে নিঃশেষ ভাবে বহির্ভূত হইয়া যায়। চরক ঋষি শরীরস্থ বায়ু সম্বন্ধে এক স্থলে বলিতেছেন, "বায়ুরেব স ভগবান্"। একতাই যেন ভারতের পতিতপাবন-ভগবানের স্বরূপ হইতে পারেন; আমরা যেন সেই একতার শরণাগত হইতে ত্রুটী না করি।

আমাদের যেন বিশেষ স্মরণ থাকে, একতাই দেশের প্রাণবায়ু; আত্মীয়তা—স্নায়ু-মণ্ডলী; সম্মিলন—শোণিত-প্রবাহ; এবং আমরা যেন সেই শোণিতের সারভূত জীবাণু (Corpuscles)। শরীরের কোনও স্থলে একটু সামান্যও কোন আঘাত লাগিলে, যেমন ইনফ্লামেশন্ (প্রদাহ প্রভৃতি) হয় অর্থাৎ স্থানীয় শোণিতাণু সমূহ যেমন তৎক্ষণাৎ রণ-সাজে দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ ভারত-দেহের কোনও অংশে কিছু আঘাত লাগিলেই যেন তৎক্ষণাৎ চতুঃপার্শ্বস্থ অধিবাসীগণ রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হন।

যেমন একটি অঙ্গুলিতে বিশেষ আঘাত লাগিলে, সমবেদনাবাহক স্নায়ুর অস্তিত্ব বশতঃ, অপর অঙ্গুলিগুলি তৎক্ষণাৎ অস্পন্দ বা আড়ষ্ট হয়; যেমন দেহের কোনও স্থানে ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হইলে, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে শিরের কেশ পর্য্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, ভারতের কোনও অংশে আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে, যেন কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি-শিখর পর্য্যন্ত সমবেদনায় কম্পমান হইয়া উঠে। এইরূপ আত্মীয়তা যেন ভারতে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। স্নায়ু-মণ্ডলি যত দৃঢ় হইবে, শরীর তত বলিষ্ঠ হইবে। পরস্পর আত্মীয়তা যত পরিপক্ক হইতে থাকিবে, ভারতও তত সুস্থ ও বলবান্ হইতে থাকিবেন।

জাতীয়তার অপর এক নাম 'আত্মীয়তা' দিলে বোধহয় কিছু ক্ষতি হয় না। আত্মীয়তার স্থাপন ও রক্ষণেই জাতীয়তার স্থাপন ও রক্ষণ। লোকের খবরাখবর লইলে, আপদ-বিপদে সাহায্য করিলে, সুখ-দুঃখের ভাগী হইলে, লোকের সহিত মিষ্ট আলাপন করিলে, ও দোষ ঢাকিয়া গুণ গ্রহণ করিলেই, আত্মীয়তা স্থাপিত হয়; এবং সেইটী নিঃস্বার্থ হৃদয়ে অন্তরের সহিত রক্ষা করিয়া আসিলেই অতীব মঙ্গলকর ও সুখদায়ক হয়। তাহা না করিয়া আমরা কেবল লোকের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াই; বড় লোক, ধনীলোক, বা গুণীলোকের, কোনও প্রকারে (না থাকিলেও) দুটা দোষ পাঁচজনের সমক্ষে বা কাগজপত্রে বাহির করিতে পারিলেই, যেন নিজের পাণ্ডিত্য ও স্পর্দ্ধা মনে করি; কাহারও গুণ গাহিতে যেন নিজের অবমাননা মনে করি। কাহাকেও কিছু দিব না, বরং কিসে লোকের নিকট হইতে দু পয়সা লইব, তাহারই চেষ্টা করি। এরূপ করিলে কি আর পরস্পর সদ্ভাব থাকে? না—জাতীয়তা রক্ষা হয়?

হয় ত, এম-এ পাশ করিয়াছি; বহিরই দুটা কথা তোতা-পাখীর মত মুখস্থ করিয়া দুই একবার পারিতোষিক লাভ করিয়াছি; আর কি রক্ষা আছে? যারা লেখা-পড়া জানে না, বা অল্প জানে, অথবা যারা সে-কালের বুড়া, তাদের কথাত ছাড়িয়াই দিন, আমার "কোট" বজায় রাখিবার জন্য—যারা যথার্থ লেখা পড়া জানে, তাদিগকেই যারে তৃণ-জ্ঞান করি—অপরে কা কথা! এরূপ করিলে কি আর পরস্পর সদ্ভাব থাকে? না—জাতীয়তা রক্ষা হয়?

হয়ত গায়ের গন্ধে ভূত পালায়; অমাবস্যার নিশায় দাঁড়াইলে বোধ

হয়, সে নিশার ঘনীভূত কেন্দ্র যেন আমিই; আমা হইতেই যেন অমাবস্যার গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের ছটা নিঃসৃত হইতেছে—এমনি আমার রঙ। পেটে জোটে না ভাত, পরিয়াছি মস্ত এক হ্যাট এবং কোট এবং প্যাণ্ট এবং বুট; ইংরাজী দুটা কথা এক করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু সাহেব সাজিয়াছি! তার উপর,—এক বাইসাইকল চাপিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছি; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই হউক আর বুড়ো-বুড়ীই হউক, বাচ্চা ছেলে-মেয়েই হউক, বা কোনও ভদ্রলোকই হউক—সম্মুখে না পড়িলেও, সে দাম্ভিক ইংরাজী-ধরণের ঘৃণাসূচক বক্র আওয়াজে লোক হটাইবার কায়দা কি!—সে আওয়াজ নির্গত করিতে ইংরেজ ত হার মানেই, এমন কি ফিরিঙ্গি পর্য্যন্তও হার মানিয়া যায়!! দেখিলে, লোকের মনে উদয় হয়, "বা বাঙ্গালী! বা! 'কাঠ-খোট্টা' বা সাঁওতালও যে ইহার অপেক্ষা অনেক ভাল; এই কি বাপু সভ্যতা-শিক্ষা? জাতীয়তা বজায় রাখিয়া কি সভ্য হওয়া যায় না? বাঙ্গালী-পোষাকে, বাঙ্গালী-আহারে, বাঙ্গালী-আওয়াজে, বা বাঙ্গালা ভাষায়, বা দেশীয় দ্রব্য-ব্যবহারে কি সভ্যতা নষ্ট হয়? এ দেশের কোনও শাস্ত্রে ত বলেই না; বলি—ইংরাজীই কোন শাস্ত্র এইরূপ সভ্যতার শিক্ষা দেন কি?" একদা এক বড়লাটের নিকট, কলিকাতার একটী বড় বাঙ্গালী-বাবু হ্যাট কোট কলার কফ পরিয়া "পুরো দস্তুরের" সাহেব সাজিয়া উপস্থিত হন; বড়লাট বলিলেন, "তুমি যদি তোমার জাতীয় পোষাকে আসিতে, আমি তোমার প্রতি বেশী সন্তুষ্ট হইতাম"। লাট বাহাদুর হইতেছেন—লর্ড রীপন; বাঙ্গালী বাবুটীর আর নাম করিব না; মনে করুন—"আমিই" (কেননা এই রূপ অসভ্যতার হাওয়া অনেকের গায়ে লাগিতে পারে ত?)।

বড় লোক হইব বা হাকিম হইব বলিয়া বিলাতে যাইলাম। যাইবার সময় হয়ত, কত মহৎ মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। সাত্ত্বিক দেশের সাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত আধারে কি অত তীব্র রাজসিক-তৈল রক্ষা করিতে সকলে পারেন? না—জানেন? অতি সাবধানতার সহিত, অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া অতি কৌশলে রক্ষা করিতে হয়; নচেৎ বিষ উৎপন্ন হইয়া পড়ে। যাইলাম—স্বদেশের উপকার করিতে শিখিব, জাতীয়তা রক্ষা করিতে শিখিব, ইংরাজ-শাসনের গৌরব বৃদ্ধি করিব—এই সকল উদ্দেশে; আসিলাম তার ঠিক বিপরীত হইয়া—দেশে লোকের উপর অত্যাচার করিতে, জাতীয়তা লোপ করিতে এবং ইংরাজ-শাসনে কলঙ্ক ঢালিতে! হয়ত, সকলকে

জ্বালাইয়া পুড়াইয়া, অবশেষে, নিজে কবরস্থ হইবার জন্ত আবার সেইখানেই ফিরিয়া যাইলাম। হাড় ক'খানা কেন—এই দেশের জিনিষ—এই দেশেই দিই না ?—তা হবে না, মরিয়া সত্যই সাহেব হইতে হইবে কি না। এখানে মরিলে জানি কি, যদি আবার কালা আদমী জন্মাই ? এরূপ করিলে কি আর পরস্পর সদ্ভাব থাকে ? না—জাতীয়তা রক্ষা হয় ? থিয়েটারের শ্রীকৃষ্ণ হইলেও বা একদিন এরূপ বলা সাজিত যে,—

"আর ত ব্রজে যাব না ভাই, যেতে মন নাহি চায়।
বাপ পেয়েছি, মা পেয়েছি ; ছেলে খেলা ভুলে গেছি ;......"

অবশ্য, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আমরা কিছু বলিলাম না, কেন না, অনেকে হয়ত, সৎ উদ্দেশ্যেই সেইখানে বাস করিতেছেন।

আমার পিতা-পিতামহ হয়ত প্রজার প্রজা তস্য প্রজা ছিলেন। না খাইয়া না দাইয়া ক্রমশঃ কোনও রকম করিয়া, একটু জমিদারী রাখিয়া গেছেন, আমি সেইটী বন্ধক দিয়া সাহেবিয়ানা করিতেছি, প্রজাদিগকে উৎ-পীড়ন করিতেছি, বিলাতী ও বিদেশীয় দ্রব্যাদির আমদানি করাইতেছি, দেশীয় কার-কারবার লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ করিলে কি আর পরস্পর সদ্ভাব থাকে ? না—জাতীয়তা রক্ষা হয় ?

হয়ত—স্মৃতির দুইখানা পাতা উল্টাইয়াছি, বা সবে একটু সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে শিখিয়াছি, আর কি মাটিতে পা পড়ে ? পা এখন যাবতীয় লোকের মাথায়—তাও গরীব হইলে। ধনী যদি শূদ্রাৎ শূদ্রতর বা অতি নীচাশয়ও হয়, তবুও, তাঁর দুয়ারে দু বেলা "হত্যা" দিতেছি, তাঁর পিছন পিছন সর্ব্বদাই বেড়াইতেছি—যদি তিনি একবার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। গরী-বের বা শূদ্রের মাথায় পা দি, ক্ষতি নাই—যদি আশীর্ব্বাদটা করি ; তা নয়— কেবল ঘৃণাই করিব, তা তার হাজার গুণই থাক, আর হাজার সে আমা-দের উপকারই করুক। আরে বাপু, যদি ব্রাহ্মণই হইত, তার ব্রাহ্মণত্ব কই ? ব্রাহ্মণ হইলে কি মানুষকে ঘৃণা করিতে হয় ? না—সমদর্শী হইতে হয় ? পণ্ডিত হইলে কি দম্ভে ধরাকে সরা দেখিতে হয়, অথবা "বিদায়" ধন বা মান্য পাইবার জন্ত বড়লোকের পদানুসরণ করিতে হয়, না নিরভিমানী, গুণগ্রাহী ও নির্ল্লোভী হইতে হয় ? এতে আর কি পরস্পর সদ্ভাব থাকে ?—না জাতীয়তা রক্ষা হয় ? দেশে যে একেবারেই সদ্‌ব্রাহ্মণ নাই,তা বলিতেছি না ; এমন ব্রাহ্মণও দেখিয়াছি যে, তাঁহারা যথার্থ প্রাতঃস্মরণীয় ও প্রকৃত দেশহিতৈষী ; তবে, তাঁহাদের সংখ্যা

কিছু কম। অবশ্য, জাত্যভিমান ও পাণ্ডিত্যাভিমান সকল দেশেই আছে, কিন্তু আমাদের দেশে একটু বাড়া বাড়ি; এত বেশী যে, শত্রুপক্ষ অনায়াসেই দেশের গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে। জাতিভেদ—উত্তম; জাত্যভিমান কিছু নয়। জাতিভেদ থাকে কিছু ক্ষতি নাই; বরং ইহা দেশের শোভাই বৃদ্ধি করে। কিন্তু, জাত্যভিমান থাকিলে দেশের অশেষ অমঙ্গল অনবরত ঘটিতে পারে।

'জাতি' শব্দের অর্থ সাধারণতঃ আমরা বর্ণ বা বংশ-গত বলিয়া জানি; যথা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি। 'জাতি' শব্দের আর এক অর্থও আমরা জানি, তাহা আকৃতিগত; যথা, দেবতা, অসুর, মানব, স্ত্রী, পুরুষ, বিহঙ্গম, পশু প্রভৃতি। 'জাতি' শব্দের যে আরও এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্থ আছে, তাহা আমরা হয়ত সকলে জানি না, তাহার মাহাত্ম্য আমরা হয়ত সকলে বুঝিতে পারি না; সে অর্থ দেশগত; যথা, ফরাসী, রুশ, ইংরাজ প্রভৃতি। আমরা—ভারত-সন্তান; জাতিতে আমরা সকলেই ভারত-বাসী। এই অর্থটী আমাদিগের ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। তাহা হইলে স্বজাতির প্রতি একটু টান হইতে পারে, স্বজাতির গৌরব কিসে বৃদ্ধি হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি পড়ে, কিসে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হয় তাহার চেষ্টায় সকলের উদ্যত হওয়া সম্ভবপর হয়।

আমরা জানি না যে, ভারত আমাদিগের একটী বৃহৎ বাটী। দেশের যাবতীয় লোক সকলেই আমরা এক পরিবার; ছোট বড় ধনী নির্ধনী সকলেই এক (ভারত-মাতা) মায়ের স্তন্য পান করিয়া আমরা মানুষ, এক অন্নেই প্রতিপালিত। বাড়ির সকলেই আমরা পরস্পর পরমাত্মীয়। একবাড়িতে থাকিয়া ভাই-ভাই বিবাদ বা জ্ঞাতি-বিবাদ করিলে, সে বাড়ি শীঘ্রই উৎসন্ন যায়; এক বাড়িতে থাকিয়া পরস্পর অসদ্ভাব পোষণ করিলে, সে বাড়ির আর ভদ্রস্থ থাকে না।

ভারত-বহির্ভূত অন্যান্য দেশীয়গণ আমাদিগের জ্ঞাতি। জ্ঞাতিগণকে আমাদিগের প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য যে, ভারতের গৌরব কত; তাঁহারা দেখুন যে, ভারত হইতে তাঁহারা কত উপকৃত হইতে পারেন, ভারত তাঁহাদিগের মুখ কত উজ্জ্বল করিতে পারেন। সকলে দেখুন যে, পৃথিবীর যাবতীয় জাতিবর্গের মধ্যে ভারত কত গুণশালী এবং সর্ব্ববিষয়েই কতদূর উন্নত। এ সকল আলঙ্কারিক ভাষা নহে; এ সকল কবি-কল্পনা নহে,

এ সকল ঔপন্যাসিক বর্ণনা-কৌশল নহে। এ সকল কথার মধ্যে যাথার্থ্য যথেষ্ট আছে। ভারত যথার্থই সকল যুগে ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিরুপম ছিলেন। আজ কেবল সেই সোণার ভারত এই ক্ষুদ্র চেতা হতভাগ্য-দিগের হস্তে পড়িয়া শ্রীভ্রষ্ট ও লুপ্ত-গৌরব-প্রায় দেখাইতেছেন। এখনও আশা আছে ; এখনও ভারতের প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইয়া বাহির হয় নাই। পতিত ভারত এখনও পুনরুত্থান করিতে পারেন। প্রাচীন যশোরাশি এখনও পুনরুদ্দীপিত হইতে পারে। বেশী আয়াস সাধ্য যে, তাহাও নহে। কেবল মাত্র প্রয়োজন—পরস্পরের সদ্ভাব ও

## সৎ-ইচ্ছা (*Good wishes*)।

ইচ্ছা—দুই প্রকার ; সৎ ও অসৎ। শুভ ইচ্ছাই সৎ ; অশুভ ইচ্ছা অসৎ। নিজের বা পরের—মঙ্গল হউক ভাবিতেও যতক্ষণ, আর, অমঙ্গল ভাবিতেও ততক্ষণ। তবে, জল যেমন নিম্নগামী, মানুষের প্রবৃত্তিও তদ্রূপ স্বতঃই নিম্নদিকে গমনোন্মুখ। সুতরাং, পরের অশুভ কামনা করা, বা নিজে অসৎ-পথে যাওয়া বেশী সম্ভব। এ স্থলে, সৎসঙ্গ সদালোচনা, ও সৎবিচার প্রয়োজন ; মনকে বুঝান আবশ্যক যাহাতে মন অসৎ-ইচ্ছাকে আসিতে না দেয়। অসৎ-পদার্থ মাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও অশেষ অপকারী ; সৎ-পদার্থ—নিত্য, অবিনশ্বর, এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পরন্তু, সদিচ্ছা-উদ্ভাবন বিশেষ যে কষ্ট-সাধ্য তাহা নয় ; ইহাতে অর্থব্যয় নাই ; কায়-ক্লেশ নাই ; কোনও প্রকার স্বার্থ-ব্যাঘাতের লেশ মাত্র সম্ভব নাই। বরং, স্বার্থপরগণের প্রচুর স্বার্থ পরিতৃপ্ত হইতে পারে ; অলসগণের শ্রম আরও স্বল্প হইতে পারে ; এবং, কৃপণগণের অর্থাগম অধিকতর হইতে পারে। সদ্ভাব বা সদিচ্ছার শক্তি—( force of good will )—জীবন্ত ; আমাদিগের স্থায়, অলস মানুষের স্থায়, জীবন্তে মৃত নহে। সদিচ্ছার সে সচেতন-শক্তি অগ্নি-অপেক্ষা কার্য্যক্ষম, এবং তপোবলের তুল্য সদা সর্ব্ব-দক্ষ ; তড়িত-অপেক্ষা বেগগামী, মনের সম অতি-দ্রুত গমনশীল ; ব্রহ্মার অপেক্ষাও উদ্ভাবন-শক্তি সম্পন্ন, এবং কবির ন্যায় সুন্দর সৃষ্টি-পটু।—সদিচ্ছার শক্তি এত প্রবল।

মনে করুন আপনি এখানে বসিয়া আছেন ; আপনার কোনও আত্মীয় দূর দেশে আছেন। এখান হইতে যদি আপনি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা মনে

মনে যথার্থ অন্তরের সহিত করেন, সে ইচ্ছা প্রায়ই পূর্ণ হয়—তাঁহার মঙ্গল হওয়া খুবই সম্ভব। ক্রমশঃ আপনার ইচ্ছা শক্তি যখন প্রবল ও বর্দ্ধিত হইবে, তখন সমগ্র দেশের উপর মঙ্গল-কামনা করিলেও সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। পরের মঙ্গল-কামনা করিলে যে, কেবল পরেরই মঙ্গল হয় তাহা নহে, নিজেরও মঙ্গল হয়।

সদিচ্ছা ( অর্থাৎ শুভ-ইচ্ছা ) অতি যত্নের সহিত, অতি অন্তরের সহিত, অতি সত্যের সহিত, হৃদয়ে উদ্ভাবন করিতে হয়। যিনি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে সদিচ্ছা পোষণ করেন, তাঁর সহস্রদোষ থাকিলেও সে সকল ভস্মীভূত হয় এবং তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হন; অলস হইলেও তিনি অতি কার্য্যক্ষম হইয়া উঠেন; দরিদ্র হইলেও তিনি ধনবান হইতে পারেন; অতি কৃপণ হইলেও আশ্চর্য্য দাতা হইয়া উঠেন, অগণ্য থাকিলেও মহা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, অতি মূর্খ হইলেও তিনি মহা পণ্ডিত হন; এমন কি—বোবা হইলেও বক্তা হন, বা পঙ্গু হইলেও পর্ব্বত লঙ্ঘান।—সদিচ্ছার এত প্রভাব!

প্রকৃত সদিচ্ছা বা শুভ-ইচ্ছাকে (good wishes) কাহারও নিকট প্রেরণ করিতে হয় না; গম্যস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয় না; পথ প্রদর্শন করিয়া দিতে হয় না; কার্য্য করিবার কোনও উপদেশ দিয়া দিতে হয় না; তাহাকে পত্র দ্বারা বা লোক-মারফত পাঠাইতে হয় না। সে স্বয়ং নিঃশব্দে অন্তর হইতে নিঃসৃত হইয়া, অন্তরেই ( অপর কাহারও ভিতর ) প্রবেশ করে; কখনও বহির্দ্দেশে বা অযথা স্থানে অপব্যয়িত হইতে জানে না; নিজের স্থান নিজেই অন্বেষণ করিয়া লয়; কোনও না কোন যোগ্য ক্ষেত্রে—যোগ্য লোকের অন্তরে যাইয়া প্রবিষ্ট হয়; প্রবিষ্ট হইয়াও তথায় যে, নিশ্চেষ্টভাবে থাকে তাহা নহে। পরশ-মণি যেমন নিজ স্পর্শ-গুণে কদর্য্য লৌহকেও সুন্দর স্বর্ণখণ্ডে পরিণত করে—শুনিয়াছি; তদ্রূপ, সদিচ্ছা, সেই লোকের ভিতর যাইয়া, যদি তথায় কোনও প্রকার পরনিন্দা পরপীড়া স্বার্থপরতা পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কিছু দোষ থাকে, সে সকল দূরীকৃত করিয়া, যাবতীয় মনমালিন্য সাফ করিয়া, সেই মনুষ্যের অন্তরে দেবভাবের উদ্রেক করান, এবং অশেষ প্রকার সদুদ্যমে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া, "পরায় সতাং জীবনং"—ইহাই জীবনের পরিচালক-মন্ত্র তাঁহার কর্ণে দিয়া তাঁহাকে প্রকৃত মনুষ্যরূপে পরিণত করাইয়া দেন।

এক প্রকার "আতস বাজী" যেমন উর্দ্ধোদেশে শূন্যমার্গে বেগে গমন পূর্ব্বক ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া অন্ধকারময় অমাবস্যার নিশাতেও নানা-প্রকার আলোকের বিস্তার করে—দেখিয়াছি ; কোথাও বা, সদিচ্ছা তদ্রূপ, হৃদয় শূন্য সমাজে, উদ্যম শূন্য পাড়ায়, লক্ষ্য-শূন্য আড্ডায় যাইয়া তথাকার যাবতীয় তমোরাশি নাশ করিয়া, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া, পরস্পর পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে যাহাতে সকলের মতি হয়, এইরূপ বিধান বিস্তার করিতে থাকেন।

এক প্রকার কামানের বৃহৎ গোলা যেমন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিজ গর্ভস্থিত বিষাক্ত পদার্থ সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তার পূর্ব্বক শত্রুকুলকে ধ্বংশ করে—পুস্তকে পড়িয়াছি ; কোথাও বা সদিচ্ছা তদ্রূপ কোষাকারে দূরদেশে যাইয়া নিজ বক্ষ বিদীরণ পূর্ব্বক ধন-ধান্যাদির দ্বারা দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ প্রভৃতি দেশের দুর্ব্বিপাক সমূহকে বিনষ্ট করেন।

এই ত গেল, সদিচ্ছার উদ্ভাবন ও বিক্ষেপণ শক্তি। আকর্ষণ, বশীকরণ, শুদ্ধীকরণ, সিদ্ধীকরণ, প্রভৃতি, সদিচ্ছার আরও অশেষ প্রকার অসাধারণ শক্তি আছে। আমরা কখন কখন সাধু সন্ন্যাসিগণের ভিতরেও এই সকল শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। কেন? তাঁহারা প্রকৃত সদিচ্ছাবান পুরুষ,—সেই জন্যই ; নিজের ও পরের জন্য কেবলই তাঁহারা শুভকামনা করিয়া থাকেন।

সদিচ্ছা বা শুভকামনা কখনই অসৎ বা নিন্দনীয় হইতে পারে না, তা—নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ—নিস্বার্থতা। শুভকামনা, নিঃস্বার্থ ব্যতীত, অন্য কোন প্রকারের হওয়া অসম্ভব। নিজের জন্য শুভকামনা করিলে, নিঃস্বার্থতার প্রকাশ কি রূপে হইল? তাহার উত্তর এই :—ইন্দ্রিয় নিচয়ের অযথা চরিতার্থতার নামই স্বার্থপরতা ; মিতাচরণ নিজের জন্য হইলেও নিঃস্বার্থ ; (পূর্ব্ব সংখ্যায়ই বলা হইয়াছে "নিজের জন্য করি কেন?—পরের জন্য কিছু করিতে পারিব বলিয়া); তদুপরি, যিনি যত পরিমাণে অকিঞ্চিৎ-কর ইন্দ্রিয়-গ্রামের আবশ্যকতা হ্রাস করিতে পারিয়াছেন, তিনি তত পরিমাণে নিঃস্বার্থ। ইহারও উপর, যিনি বহিরিন্দ্রিয় সমষ্টিরূপ 'নিজেকে' সংযত করিয়া অন্তরস্থ 'নিজের' হিতসাধন, করেন, তিনি ত পূর্ণ নিঃস্বার্থ। সকলেই জানেন, 'স্ব' মানে—স্বয়ং, যেমন "স্বপ্রকাশ'। 'স্ব' মানে আরও দুই রকম আছে ; (১) ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিশিষ্ট দেহাভিমানী বদ্ধ জীব, এবং (২) তদতীত পরমাত্মা ; 'স্বার্থ'

'নিঃস্বার্থ' প্রভৃতির অন্তর্গত 'স্ব' শব্দের দ্বারা 'ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট বদ্ধ জীবকে' লক্ষ্য করা হয়, এবং 'স্বস্বরূপ' প্রভৃতির 'স্ব'র দ্বারা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হয়; 'স্ব' শব্দের এই দুইটী অর্থের মধ্যে প্রথম অর্থটী মন্দ ও দ্বিতীয় অর্থটী ভাল; প্রথম অর্থটী ইদানীন্তন, দ্বিতীয় অর্থটী পুরাতন; প্রথমটী ক্ষুধাদির প্রিয়, দ্বিতীয়টী নিতান্ত সাংসারিকগণের পক্ষে ব্যবহার্য্য।

সদিচ্ছা এত পবিত্র, ও পুণ্যময়, এত সজীব ও শক্তিমান্ যে, তাহাকে কেহ নিজের জন্য উদ্ভাবন করিলেও, সেই সদিচ্ছা নিজে নিজেকে নিদেন গৌণভাবে বা অলক্ষিত ভাবেও পরের জন্য পরিণত করিবেই করিবে; পরের জন্য প্রথমে গৌণভাবে থাকিলেও,অবশেষে মুখ্য ভাবে পরিণত হয়। প্রথমে বাহ্যিক দেখিতে, সাধুগণ (গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন) যেন নিজের জন্যই কেবল সদিচ্ছাপোষণ করেন; নিজের জন্যই কেবল ব্যস্ত, সমস্ত সাধনভজন যেন নিজের জন্যই কেবল করেন; কিন্তু, তাঁহারা যখন সিদ্ধ হন, অথবা সাধনপথে অগ্রসর হন, তখন প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা অবশিষ্ট জীবন সর্ব্বতোভাবেই পরের জন্য অতিবাহিত না করিয়া থাকিতে পারেন না। সাধুগণ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন তাঁহাদিগকে "সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করিলাম" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। সাধুগণ এত সর্ব্বজন প্রিয় হন কেন? সাধুগণের অন্তরে এত আকর্ষণশক্তি, এবং বশীকরণ শুদ্ধীকরণ সিদ্ধীকরণ প্রভৃতি শক্তি প্রবল কেন?—তাঁহাদিগের ভিতর সদিচ্ছা পূর্ণভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমাণ বলিয়া।

'সৎলোক' মানেই— সদিচ্ছাবান্ পুরুষ। যাঁহার অন্তরে সদিচ্ছা বিশেষ প্রবল,যিনি যথার্থ সকলেরই জন্য অনবরত মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, যিনি যথার্থই সকলকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা শূদ্র হউন, দরিদ্রই হউন বা ধনবান হউন, মূর্খই হউন বা পণ্ডিত হউন—তাঁহার নিকট সকলে স্বতঃই আকৃষ্ট হন, তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ হন, তাঁহার নিকট আসিলে সকলেই শান্তি লাভ করেন; বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্তও বশতাপন্ন হয়; তিনি যাহাকে যাহা বলেন সে তাহাই করে; সকলের দৃঢ় বিশ্বাস—তিনি নিশ্চয়ই অতি মঙ্গলের জন্য বলিতেছেন। পরন্তু তাঁহার প্রতি সকলের এতদূর ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে যে তিনি কাহাকেও কিছু করিতে বলিলে সে তাহা না করিয়া থাকিতে পারে না; এইরূপে তিনি অসৎ লোককেও ক্রমশঃ সৎ করিতে পারেন। আরও,সৎ লোকের নিকট থাকিলে, সৎ ইচ্ছা সম্পন্ন

লোকের নিকট বাস করিলে, স্বতঃই অন্তরে সৎ-ইচ্ছা ও সদ্ভাবের উদয় হয়। ক্রমশঃ যেমন সেই সদ্ভাব অন্তরে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তিরও বৃদ্ধি হয়। পরে তিনি সেই স্বীয় সদিচ্ছা-বলে অনেক কঠিন কঠিন সৎকার্য্য অল্প আয়াসেই করিতে পারেন। যদি কেহ নিজে নিজে সদিচ্ছা উদ্ভাবন ও পোষণ না করিতে পারেন, তিনি যেন সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করেন।

যে স্থানে এরূপ সৎসঙ্গেরও সম্ভব নাই, যে পাড়ায় কোনও প্রকৃত সৎলোক বা সদিচ্ছাবান্ পুরুষ নাই, সেই পাড়ার "আড্ডা" গুলিতে কিছু পরিবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের ইষ্টানিষ্টের মূল হইতেছে—

আড্ডা।

( আড্ডা সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় কিছু বলিব )।

---

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। "শঙ্করাচার্য্য।"—আধুনিক ধরণের একখানি নাটক, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। ভট্টপল্লী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। গৈরিশ ছন্দে লিখিত। ভাষার লালিত্য ও মধুরত্বে গ্রন্থখানি সুন্দর হইয়াছে। পাঠ করিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হইবেন। শঙ্করের অলৌকিক মাতৃভক্তি, পতিপ্রাণা লীলাবতীর অসামান্য গুণাবলী, সরলমতি-মণ্ডনের হৃদয়স্পর্শী শোকোচ্ছ্বাস, দৃঢ়মতি-পদ্মপাদের গুরুভক্তি, ধর্ম্মোন্মাদ হস্তামলকের তমোনাশী ও মনোহারী উপদেশমালা প্রভৃতি যথার্থই সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছে। বিশেষ, নবীন পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে, শঙ্করের অমৃতোপম মাতৃভক্তি, লীলাবতীর সতীত্ব, স্ত্রীজাতিদুর্ল্লভ-সত্যনিষ্ঠত্ব, এবং কর্ত্তব্যবোধ অতিশয় উপকারী। এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের "অনুগ্রহ পত্র" নামক পৃষ্ঠায় দেখিলাম হেমবাবু বলিতেছেন—"শঙ্করাচার্য্যের নীরস জীবন লইয়া যে এমন সুন্দর কাব্য রচিত হইতে পারে ইহা পূর্ব্বে আমি কখন মনেও করি নাই"। ইহা দেখিয়া মনে করিলাম—মূল গ্রন্থখানি সমালোচনা করিব? না—গ্রন্থের "অনুগ্রহপত্রের" সমালোচনা করিব? হেমবাবু যেমন "পূর্ব্বে কখনও মনে করেন নাই" যে, নীরস শঙ্করাচার্য্যের জীবন অবলম্বন করিয়া এমন সরস কাব্য রচনা হইতে পারে; আমরাও তদ্রূপ পূর্ব্বে কখন

মনেও করি নাই” যে, সরস কবিবর হেমবাবু, সচ্চিদানন্দ সাগরে বিমগ্ন শঙ্করাচার্য্যের জীবনকে নীরস দেখিবেন। বিশেষ, যে শঙ্করাচার্য্যের মাহাত্ম্যে ও কীর্ত্তিকলাপে আজও ভারতবর্ষ মহীয়ান—আজও কাশীধাম, বদরিকাশ্রম দ্বারকা, জগন্নাথ ও রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থান পুণ্যবান, যে শঙ্করাচার্য্যের অলোকসামান্য জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার-শক্তিতে হিন্দুধর্ম্মের আজ এত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত—আজ বেদ-বেদান্তাদি এত পুনরুজ্জ্বলীকৃত, আজ সন্ন্যাসীগণ এত পূজ্য; সেই শঙ্করাচার্য্য যদি না আসিতেন, তাঁহার জীবন যদি নীরস হইত, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের যে, যাবতীয় রস-কস সমস্তই আজ অস্তমিত হইত। বোধ হয়, হেমবাবু বার্দ্ধক্য বশতঃ ও তজ্জন্য মনশ্চাঞ্চল্য বশতঃ হঠাৎ কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন; ইহা তাঁর স্থির বুদ্ধি প্রসূত নহে।

২। যোগদর্শনম্।—ভারতবর্ষের কতিপয় সাধু “নিগমাগম মণ্ডলী” নামক একটী সভা গঠন করিয়াছেন। সংক্ষেপে, সভার মোট উদ্দেশ্য—হিন্দু-শাস্ত্রপ্রচার ও দেশের নানাপ্রকার হিতকার্য্য করা। মণ্ডলীর প্রধান স্থান হইতেছে মথুরায়। তথা হইতে “যোগদর্শনম্” নামক পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক খানিতে সমগ্র পাতঞ্জল দর্শনের মূল দেবনাগরী-অক্ষরে, এবং হিন্দীভাষায় সেই সূত্রগুলির “নিগমাগম-ভাষ্য” নামক বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাগুলি অতি সুন্দর ও সরল হইয়াছে।

৩। লীলামৃত।—নাটকাকারে একখানি ধর্ম্ম গ্রন্থ। ৺রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত। গ্রন্থকার কলিকাতাবাসী অনেক ধর্ম্মাত্মার নিকট সুপরিচিত ছিলেন; তাঁহার পবিত্র জীবনের শেষ কয় বৎসর ধর্ম্মের জন্য এত দূর উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া অনেকে স্তম্ভিত হইতেন। সেই বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ-প্রসূত—“লীলামৃত”। ইহাতে ভগবানের লীলা ভক্তগণের নিকট যে কি অমৃতময়, তাহা দেখান হইয়াছে। গ্রন্থকার পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর, সম্প্রতি তৎপ্রিয়বন্ধুগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়া “তত্ত্ব-মঞ্জরী”র উপহার স্বরূপে প্রদত্ত হইতেছে। (“তত্ত্ব-মঞ্জরী” গ্রন্থকারের প্রচারিত একখানি প্রিয় মাসিক পত্র)।

৪। গৃহস্থের আদর্শ দেহত্যাগ।—এই পুস্তকখানিতে কোন ময়মনসিংহ নিবাসী ব্যক্তির মা জীবনে কিরূপ নিষ্ঠাবতী ছিলেন

এবং সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইলে কিরূপে তাঁহার যোগিসম জ্যেষ্ঠপুত্র ক্রমাগত নাম শ্রবণ করাইয়া, নাম জপ করিতে বলিয়া এবং শাস্ত্রোপদেশ শুনাইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে শাস্ত্র হইতে মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকখানি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত লিখিত। আমাদের দেশে জীবন চরিত লিখিবার প্রথা নাই। কত অদৃশ্য প্রদেশে কত কুসুম যে নীরবে সুগন্ধ বিতরণ করিয়া ঝরিয়া যায়, জনসমাজ তাহার খোঁজ রাখে না। এই পুস্তকখানিতে একটী প্রকৃত হিন্দুমহিলার জীবনচরিতের এই সূচনা দেখিয়া আমরা পরম প্রীত। এই রমণী পাশ্চাত্য আলোকের কিছুই পান নাই। কিন্তু যে ধর্ম্ম হিন্দু, মাতৃস্তনপানের সহিত শিক্ষা করে, সেই ধর্ম্মভাবে লালিত পালিত হইয়া কিরূপে উপযুক্ত পুত্রের সহায়তায় সহজে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই ঘটনায় বিশেষ অলৌকিকতা কিছুই না থাকিলেও, আমাদের বিবেচনায় এই সকল জীবন কেবল আমাদের বঙ্গভাষায় নয়, আমাদের রাজভাষায়ও প্রকাশিত করা উচিত। তাহা হইলে হিন্দু রমণীদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের যে কুসংস্কার আছে, তাহা অপনীত হইবে। আমরা এই পুস্তকখানি সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তকপাঠে সকলেই আধ্যাত্মিক উপকার পাইবেন।

৫। স্বাস্থ্যসাধন বা আয়ুর্ব্বেদ কুসুমাঞ্জলী।—ঋষিসম্পাদক কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত। এই গ্রন্থখানি কবিরাজ মহাশয়ের বিজ্ঞাপনপুস্তক হইলেও ইহাতে সহজ সহজ কবিতাছলে কতকগুলি স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কোন্ আহার অপর কোন্ আহারে জীর্ণ হয়, তৎসম্বন্ধে কবিতাটী উদ্ধৃত হইল ঃ—

"মুড়ি চালভাজা চিড়ে, জীর্ণ পায় নারিকেলে। কলাতে কাঁঠাল জীর্ণ, ওল জীর্ণ কটুতেলে॥ খিচুড়ী সৈন্ধবে জীর্ণ, দুগ্ধ জীর্ণ হয় ঘোলে। বাসী অন্ন পিঠা মাংস পাক পায় কাঁজি জলে॥ মিশ্রি উষ্ণ দুধে আম, সৈন্ধবেতে কলা কাবু। খেজুরের গুড়ে জীর্ণ হয়ে যায় কমলা লেবু॥ ইক্ষু জীর্ণ আদা খেলে, দধি পরিপাক পায়। নুন জল শর্করাতে, মনে রেখো এ সবায়॥

অধিকতর সাহসী ছিলেন। তাঁহারা এরূপ অনেক সুবিস্তৃত সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আজও সম্পূর্ণ নূতন, এবং এরূপ অনেক মতবাদ বিদ্যমান আছে, যাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞান অদ্যাপি মতবাদরূপেও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল আকাশতত্ত্বে অধিরোহণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু সমধিক অগ্রসর হইয়া সমষ্টি-মনকেও একটী সূক্ষ্মতর আকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহারও উচ্চে অধিকতর সূক্ষ্ম আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কিছুই মীমাংসা হইল না। রহস্যের উত্তরদানে এই সকল তত্ত্ব অক্ষম। বাহ্য জগতবিষয়ক জ্ঞান যতদূরই বিস্তৃত হউক না কেন, এ রহস্যের উত্তরদান করিতে পারিবে না। মনে হয় যেন কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি, কয়েক সহস্র বৎসর আরও অপেক্ষা করা যাউক, ইহার মীমাংসা হইবে। বেদান্তবাদী মনের সসীমতা নিঃসংশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতএব উত্তর করেন, "না, আমাদিগের সীমাবহির্ভূত হইবার শক্তি নাই, আমরা দেশকাল নিমিত্তের বাহিরে যাইতে পারি না।" যেরূপ কেহই স্বকীয় সত্তা হইতে উল্লম্ফন করিতে সক্ষম নহেন, সেইরূপ দেশ ও কালের নিয়ম যে সীমাবন্ধনী স্থাপন করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। দেশকালনিমিত্তসম্বন্ধীয় রহস্যাবধারণপ্রযত্ন বিফল, যে হেতু এরূপ চেষ্টা করিতে গেলেই এই তিনেরই সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা কিরূপে সম্ভবে? জগতের অস্তিত্ব-বাদ তাহা হইলে কিরূপ ভাব ধারণ করিতেছে? "এই জগতের অস্তিত্ব নাই", "জগৎ মিথ্যা।"—ইহার অর্থ কি? ইহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, এই অর্থ। আমার, তোমার ও অপর সকলের মনের সম্বন্ধে ইহার কেবল আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা এই জগৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদি আমাদের আর একটী অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহাতে আর কিছু অভিনব প্রত্যক্ষ করিতাম এবং ততোধিক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলে, ইহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইত। অতএব ইহার সত্তা নাই—সেই অপরিবর্ত্তনীয়, অচল, অনন্ত সত্তা ইহার নাই। কিন্তু ইহাকে অস্তিত্বশূন্য বলা যাইতে পারে না; কারণ ইহার বর্ত্তমানতা রহিয়াছে এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই, আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। ইহা সৎ ও অসতের মিশ্রণ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন স্থূল কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে

আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের সমস্ত জীবনই এই সৎ ও অসৎরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ। জ্ঞানাধিকারে এই বিরুদ্ধ ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ মনে হয়, যেন মনুষ্য জিজ্ঞাসু হইলেই সমগ্র জ্ঞান লাভে সক্ষম হইবে ; কিন্তু কয়েকপদ অগ্রসর না হইতেই, এরূপ অভেদ্য অন্তরাল দেখিতে পান, যাহা স্থানান্তরিত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তাঁহার সমস্ত কার্য্য বৃত্ত-সীমাবাস্থিত হইয়া ভ্রাম্যমান এবং সেই বৃত্তসীমা তাঁহার পক্ষে অলঙ্ঘনীয়। তাঁহার অন্তরতম ও প্রিয়তম রহস্য সকল মীমাংসার জন্য তাঁহাকে দিবারাত্র উত্তেজিত ও আহ্বান করিতেছে, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে তিনি অক্ষম, কারণ তাঁহার নিজ বুদ্ধির সীমা উল্লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। তথাপি বাসনা তাঁহার অন্তরে সবলে প্রোথিত রহিয়াছে ; কিন্তু এই সকল উত্তেজনার দমনই যে কেবল মাত্র মঙ্গলকর, তাহাও আমরা অবগত আছি। আমাদের হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন, প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে আদেশ করিতেছে। অপরদিকে এক অমানুষী শক্তি বলিতেছে যে, নিঃস্বার্থতাই একমাত্র মঙ্গলকর। জন্মাবধি প্রত্যেক বালকই সুখাশাবাদী (Optimist) ; সে কেবল সুখের স্বপ্নই দর্শন করে। যৌবন সময়ে সে অধিকতর সুখাশাবাদী হয়। মৃত্যু, পরাজয়, বা অপমান বলিয়া কিছু আছে, ইহা কোন যুবকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। বৃদ্ধাবস্থা আসিল—জীবন একটী ধ্বংসরাশি হইয়াছে ; সুখ স্বপ্ন আকাশে বিলীন হইয়াছে ; বৃদ্ধ নিরাশাবাদ অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে আমরা প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া আশা শূন্য, অন্তশূন্য, সীমা ও গন্তব্যজ্ঞান পরিশূন্যের ন্যায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধাবিত হইতেছি। ললিতবিস্তরে লিখিত বুদ্ধচরিতের একটী প্রসিদ্ধ সঙ্গীত এ সম্বন্ধে আমার স্মরণ হয়। এইরূপ বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব মানবের পরিত্রাতারূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন, কিন্তু তিনি রাজ-বাটীর বিলাসিতায় আত্মবিস্মৃত হওয়াতে, তাঁহার প্রবোধার্থ দেবকন্যাগণ-কর্ত্তৃক একটী সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। সে সঙ্গীতের মর্ম্মার্থ এইরূপ, "আমরা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছি—নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই।" এইরূপ আমাদের জীবন বিরাম জানে না— অবিরতই চলিয়াছে। এখন উপায় কি ? যাঁহার অন্নপানের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান, তিনি সুখাশাবাদী হইয়া বলেন, 'ভীতিকর দুঃখের কথা কহিও না। সংসারের দুঃখ ও ক্লেশের কথা শুনাইও না।' 'তাঁহার নিকট গিয়া বল—সকলই মঙ্গল। তিনি বলেন,

'সত্যই আমি নিরাপদে আছি; এই দেখ, কেমন সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছি, আমার শীতের ভয় নাই। অতএব আমার সম্মুখে এ ভয়াবহ চিত্র আনিও না।' কিন্তু, অপরদিকে শীতে ও অনাহারে কত লোক মরিতেছে। যাও, তাহাদিগকে শিক্ষা দাও যে সমস্তই মঙ্গল—ঐ এক জন এ জীবনে ভীষণ ক্লেশ পাইয়াছে, সে ত সুখের, সৌন্দর্য্যের, মঙ্গলের কথা শুনিবে না। সে বলিতেছে, সকলকেই ভয় দেখাও, আমি যখন কাঁদিতেছি, অপরে কেন হাসিবে? আমি সকলকেই আমার সহিত ক্রন্দন করাইব; কারণ আমি দুঃখ-প্রপীড়িত, সকলেই দুঃখ-প্রপীড়িত হউক—ইহাই আমার শান্তি।' আমরা এইরূপ সুখাশাবাদ হইতে নিরাশাবাদে যাইতেছি। অতঃপর মৃত্যুরূপ ভয়াবহ ব্যাপার—সমগ্র সংসারই মৃত্যুমুখে যাইতেছে; সকলেই মরিতেছে। আমাদিগের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যকলাপ, সমাজসংস্কার, বিলাসিতা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান—মৃত্যুই সকলের এক গতি। ইহাই সন্দেহ, ইহাই সুনিশ্চিত। নগরাদি হইতেছে ও যাইতেছে, সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে—গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া বিভিন্নগ্রহস্থিত বায়ুপ্রবাহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই রূপ অনাদি কাল হইতে চলিয়াছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্য্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্ম্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে,—সকলেই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম মমতা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেন আমরা এ জীবনের মমতা করি? কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না? ইহা আমরা জানি না। ইহাই মায়া।

জননী সন্তানকে সযত্নে লালন করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ঐ সন্তানের প্রতি রহিয়াছে। বালক বর্দ্ধিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয়ত কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়া প্রত্যহ মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপিও পুত্রে আকৃষ্ট। বিচার শক্তি জাগরিত হইলে, তাহাকে স্নেহাবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। তিনি জানেন না যে, এ স্নেহ নহে, এক অপরিজ্ঞেয় শক্তি তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী অধিকার করিয়াছে। তিনি ইহা দূরীভূত করিতে পারেন না। তিনি যতই চেষ্টা করুন না, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ইহাই মায়া। আমরা সকলেই কল্পিত সুবর্ণ-লোমের অন্বেষণে ধাবিত হইতেছি সকলেরই

মনে হয়, ইহা আমারই প্রাপ্তব্য; কিন্তু তাঁহাদের কয়জন এ সংসারে জীবিত? জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই স্বর্ণ লোম প্রাপ্ত হইতে তাঁহার দুই কোটীর একাংশেরও অধিক সম্ভাবনা নাই। তথাপি প্রত্যেক লোকই ইহার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন; কিন্তু অধিকাংশ কখন কিছুই প্রাপ্ত হন না। ইহাই মায়া। ইহ সংসারে মৃত্যু দিবারাত্র সগর্ব্বে ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আমরা চিরকাল জীবিত থাকিব। কোন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, "এই পৃথিবীতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য কি?" রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, "লোক সকল প্রত্যহই চতুর্দ্দিকে মরিতেছে, কিন্তু জীবিতেরা মনে করে, তাহারা কখনই মরিবে না"। ইহাই মায়া। আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, জীবন, প্রত্যেক ঘটনা মধ্যে সর্ব্বত্রই এই বিষম বিরুদ্ধ ভাব রহিয়াছে। সুখ দুঃখের, ও, দুঃখ সুখের অনুগামী হইতেছে। একজন সংস্কারক আবির্ভূত হইয়া কোন জাতিগত দোষ সমূহ প্রতিকারার্থ যত্নবান্ হইলেন; অমনি অপরদিকে বিশ সহস্র দোষ তৎ-প্রতিকারের পূর্ব্বেই উত্থিত হইল। ভগ্নোন্মুখ পুরাতন অট্টালিকার ন্যায় এক স্থানের জীর্ণসংস্কার করিতে, অপর দিক্ ধ্বংশাবশেষ প্রাপ্ত হয়। ভারতীয় রমণীগণের চির-বৈধব্য জনিত দোষ প্রতিকারার্থ আমাদের সংস্কারকগণ চীৎকার ও প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে অকৃতবিবাহই প্রধান দোষ। একস্থানে অপরিণীতাদের যন্ত্রণা মোচনে সহায়তা করিতে হইবে; অন্যস্থানে বিধবাদিগের কষ্ট অপসারণে যত্নবান্ হইতে হইবে। দেহের পুরাতন বাত ব্যাধির ন্যায় শীরঃস্থান হইতে তাড়িত হইয়া ইহা অঙ্গ আশ্রয় করিতেছে; অঙ্গ হইতে পাদদেশ অধিকার করিতেছে কেহ কেহ বা অপরাপেক্ষা ধনশালী হইয়াছেন, বিদ্যা, সম্পদ, ও জ্ঞানানুশীলন, কেবল তাঁহাদেরই সম্পত্তি হইয়াছে। জ্ঞান কি মহত্তর ও মনোহর! জ্ঞানানুশীলন কি সুন্দর! ইহা কেবল কতিপয়ের করায়ত্ত! এ চিন্তা ভয়ানক! সংস্কারক আসিলেন এবং সাধারণের মধ্যে এই জ্ঞান বিস্তার করিলেন। জনসাধারণের নিকট অধিক পরিমাণে শারীরিক সুখ আনীত হইল। কিন্তু জ্ঞানানুশীলন যতই অধিক হইতে লাগিল, হয়ত শারীরিক সুখ ততই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এখন কোন্ পথ অবলম্বন করা যাইবে? সুখের জ্ঞান হইতে অসুখের জ্ঞান যে আসিতেছে? আমরা যে যৎসামান্য সুখভোগ করিতেছি, অন্য কোথাও তাহা সেই পরিমাণে অসুখ

উৎপাদন করিতেছে। সকল বস্তুরই এই অবস্থা। যুবকেরা হয়ত ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহারা বহুদিন জীবিত আছেন, অনেক যন্ত্রণা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া। দিবারাত্র এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু ইহার সুমীমাংসা অসম্ভব। এইরূপ হইবার কারণ কি? এ বিষয়ের ন্যায়সঙ্গত কোন প্রশ্নই প্রস্তুত হইতে পারে না; এ জন্য এ প্রশ্নের উত্তরও অসম্ভব। ইহার কারণাবধারণ হইতে পারে না। উত্তর করিবার পূর্ব্বে, ইহার তাৎপর্য্য বোধই হইবে না,—ইহা কি, তাহা জানিতেই পারিব না। আমরা ইহাকে এক মুহূর্ত্তও স্থির রাখিতে পারি না, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের হস্ত-বহির্ভূত হইতেছে। আমরা অন্ধযন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছি। আমাদের নিঃস্বার্থতা, পরোপকারচেষ্টা স্মরণপথে আনিতে পারি, কিন্তু আমরা নির্ব্বন্ধবশতঃই এরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম। আমাকে এইস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আপনাদিগকে বক্তৃতা দানে উপদেশ দিতে হইতেছে, এবং আপনারা উপবেশনপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছেন, ইহাই নির্ব্বন্ধ। আপনারা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, হয়ত কেহ ইহা হইতে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছেন; অপরে হয়ত মনে করিবেন, লোকটা অনর্থক বকিয়াছে; আমি বাটী যাইয়া ভাবিব, আমি বক্তৃতা দিয়াছি; ইহাই মায়া।

অতএব, এই সংসারগতির বর্ণনার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে এ কথা শ্রবণ করিলে ভীত হয়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগ প্রতিকার হইবে না। শশক যেরূপ কুক্কুর কর্তৃক অনুসৃত হইয়া নিম্নে মস্তক গোপন করতঃ আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে, আমরা সুখাশা বা নিরাশাবাদী (Pessimist) হইয়া অবিকল সেই শশকের ন্যায় কার্য্য করিতেছি। ইহা রোগমুক্তির ঔষধ নহে। অপর পক্ষে, ইহ জীবনের প্রাচুর্য্য সুখ ও সচ্ছন্দ ভোগিগণ বিস্তর আপত্তি উত্থাপিত করেন। এ দেশে, ইংলণ্ডে, নিরাশাবাদী হওয়া সুকঠিন। সকলেই আমাকে বলিতেছেন—জগৎকার্য্য কি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে! ইহা কিরূপ উন্নতিশীল! কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় জীবনই তাঁহাদের জগৎ বলিয়া জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—খ্রীষ্ট-ধর্ম্মই পৃথিবী মধ্যে একমাত্র ধর্ম্ম, কারণ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী জাতিমাত্রেই সমৃদ্ধিশালী। এরূপ হেতুবাদ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের ভ্রমই প্রমাণীত হইতেছে। যেহেতু অখ্রীষ্টান

জাতীদিগের দুর্ভাগ্যই খৃষ্টান জাতীর সৌভাগ্যশালিতার প্রতি কারণ। একের সৌভাগ্যবর্দ্ধন অপরের শোণিতশোষণ অপেক্ষা করে। সমস্ত পৃথিবী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলে, অন্ন-স্বরূপ অখৃষ্টান জাতির অনস্তিত্ব নিবন্ধন খৃষ্টান জাতি স্বতঃই দরিদ্র হইবে। সুতরাং এ যুক্তি আপনাকেই খণ্ডন করিতেছে। উদ্ভিজ্জ পশ্বাদির অন্নস্বরূপ, মনুষ্য পশ্বাদির ভোক্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত ব্যাপার—মনুষ্য পরস্পরের, দুর্ব্বল বলবানের, ভক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান! ইহাই মায়া। এ রহস্যের তুমি কি মীমাংসা কর? আমরা প্রত্যহই অভিনব যুক্তি শ্রবণ করি। কেহ বলিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। এরূপ সম্ভাবনা অত্যন্ত সন্দেহ-স্থল হইলেও, আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম কিন্তু, এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে মঙ্গল হইবার কারণ কি? পৈশাচিক রীতি অবলম্বন ব্যতীত, মঙ্গলের মধ্য দিয়া কি মঙ্গল সাধন হয় না? বর্ত্তমান মানবগণের বংশোদ্ভবেরা সুখী হইবে; কিন্তু তাহাতে আমার কি ফল লাভ হইতেছে, আমি যে এখন এ ভয়ানক যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি? ইহাই মায়া। ইহার মীমাংসা নাই। এরূপ শ্রবণ করা যায় দোষাংশের ক্রম পরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটী বিশেষত্ব। সংসার হইতে এইরূপ দোষভাগ ক্রমাগত পরিত্যক্ত হইলে, অবশেষে কেবল মঙ্গলই বিদ্যমান থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি সুন্দর। এ সংসারে যাঁহাদের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান আছে, যাঁহাদের প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, যাঁহাদিগকে ক্রমবিকাশের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের দাম্ভিকতা বর্দ্ধন করিতে পারে। সত্যই ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকর ও শান্তিপ্রদ। সাধারণ লোকপাল যন্ত্রণা ভোগ করুক—তাঁহাদের ক্ষতি কি? তাহারা মারা যায়—সে জন্য তাঁহাদের ভাবিবার কি দরকার? বেশ কথা; কিন্তু এ যুক্তি আদ্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ, ইঁহারা বিনা প্রমাণে অবধারণ করিয়াছেন যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ, এতদপেক্ষা দোষাবহ নির্দ্ধারণ এই যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবৃদ্ধিশীল, এবং অমঙ্গল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গল ভাগ এইরূপে ক্রমবিকাশ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমে নিঃশেষিত হইবে এবং মঙ্গলই কেবল বিরাজিত থাকিবে—ইহা অতি সহজ উক্তি। কিন্তু অমঙ্গলের পরিমাণ যে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়? ইহা কি ক্রমশঃই বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হইতেছে না? একজন অরণ্যবাসী মানব, যে মনোবৃত্তি পরিচালনায় অনভিজ্ঞ, একখানি পুস্তক পাঠেও অসমর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে শ্রবণই করে নাই, অদ্য রাত্রে তাহাকে বিশ খণ্ডে বিভক্ত কর, কল্য সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। শানিত অস্ত্র তাহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাহির করিয়া আন, তথাপিও সে আরোগ্য হইবে। কিন্তু আমরা অধিক সভ্য হইলেও, পথে যাইতে আঁচড় লাগিলে মরিয়া যাই। শিল্পযন্ত্র দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উন্নতিও ক্রমবিকাশ বর্দ্ধন করিতেছে; কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়া, লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করিতেছে। একজনকে ধনশালী করিয়া, সহস্রকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে। সংখ্যাতীত মানবকুলকে ক্রীতদাস করিয়াছে। এই পথেই ইহা চলিয়াছে। পাশব প্রকৃতি মানবের সুখভোগ ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ; তাহার দুঃখ ও সুখ ইন্দ্রিয় মধ্যেই সন্নিবিষ্ট আছে। যদি সে প্রচুর আহার না পায়, কিম্বা শারীরিক অসুস্থতা ঘটে, সে আপনাকে দুর্ভাগা মনে করে। ইন্দ্রিয়ে তাহার সুখ-দুঃখের উত্থান ও পর্যবসান হয়। যখন এরূপ ব্যক্তির উন্নতি হইতে থাকে, সুখের সীমারেখার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসুখেরও বৃদ্ধি সমপরিমাণে হয়। অরণ্যবাসী মানব ঈর্ষাপরবশ হইতে জানে না, বিচারালয়ে যাইতে জানে না, নিয়মিত কর দিতে জানে না, সমাজকর্তৃক নিন্দিত হইতে জানে না, পৈশাচিকমানবপ্রকৃতিসম্ভূত যে ভীষণ অত্যাচার পরস্পরের হৃদয়ের গুহ্যতম ভাব অন্বেষণে নিযুক্ত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা সে দিবারাত্র পর্য্যবেক্ষিত হইতে জানে না। সে জানে না—ভ্রান্তজ্ঞানসম্পন্ন গর্ব্বিত মানব কিরূপে পশু অপেক্ষাও সহস্রগুণে পৈশাচিকস্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আমরা যখনই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে উন্মুক্ত হইতে থাকি, আমাদের সুখানুভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সহিত যন্ত্রণানুভবের শক্তিরও স্ফূর্ত্তি হয়। স্নায়ু-মণ্ডল সূক্ষ্মতর হইয়া অধিক যন্ত্রণাসহিষ্ণু হয়। সকল সমাজেই ইহা অহ-রহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, মূঢ় সাধারণ মানব, তিরস্কৃত হইলে অধিক দুঃখ অনুভব করে না, কিন্তু প্রহারের আতিশয্য হইলে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। ভদ্র-লোক একটী কথার তিরস্কারও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার স্নায়ুমণ্ডল এত সূক্ষ্ম ভাবগ্রাহী হইয়াছে। তাঁহার সুখানুভূতি সহজ হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার দুঃখেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণের ক্রমবিকাশবাদ ইহার দ্বারা অধিক সমর্থিত হয় না। আমাদের সুখী হইবার শক্তি যতই

বর্দ্ধিত করি, যন্ত্রণাভোগের শক্তি সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমার বিনীত অভিমত এই, আমাদের সুখী হইবার শক্তি যদ্যপি সমযুক্তান্তর শ্রেঢ়ীর (যোগখড়ি—Arithmetical progression) নিয়মে অগ্রসর হয়, অপরদিকে অসুখী হইবার শক্তি সমগুণিতান্তর শ্রেঢ়ীর (গুণখড়ি—Geometrical progression) নিয়মে বর্দ্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী মানবসমাজ সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ নহে। আর উন্নতিশীল আমরা জানিতেছি, যতই উন্নত হইব, আমাদের পরদুঃখকাতরতা ততই বৃদ্ধি হইবে। আমাদের তৃতীয়ভাগ লোক যে আজন্ম উন্মাদগ্রস্ত, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ইহাই মায়া।

অতএব আমরা দেখিতেছি, মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত বিশেষ মতবাদ নহে। সংসারের ঘটনা যে ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই বর্ণনামাত্র। বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি; সর্ব্বত্রই এই ভয়ানক বিরুদ্ধভাবের মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি। যেখানে মঙ্গল, সেই খানেই অমঙ্গল রহিয়াছে। যেখানে অমঙ্গল, সেইখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন, মৃত্যু সেই খানেই ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিতে হইবে; যে কাঁদিতেছে, সেও হাসিবে। এ ব্যাপার পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। আমরা অবশ্য এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি, যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না, যেখানে আমরা কেবল হাসিব, কাঁদিব না। কিন্তু যখন এই সকল কারণ সমভাবে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান অছে, তখন এরূপ সংঘটনা স্বতঃই অসম্ভব। যেখানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি বিদ্যমান, কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যেখানে সুখোদ্দীপক শক্তি বর্ত্তমান, দুঃখদায়িকা শক্তিও সেইখানে লুকায়িত।

অতএব বেদান্তদর্শন সুখাশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে। ইহা উভয় বাদই প্রচার করিতেছে। ঘটনা সকল যে ভাবে বর্ত্তমান, ইহা তাহাই গ্রহণ করিতেছে; অর্থাৎ, এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ; একটীকে বর্দ্ধিত কর, আর একটীও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। এরূপ সংস্কারই বিরুদ্ধভাব-যুক্ত। কিন্তু এরূপ মত ব্যক্ত করিয়া ও ঈদৃশ বিশ্লেষণ দ্বারা, বেদান্ত এই একটী মহারহস্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছেন যে, মঙ্গল ও

বিমৎসর বলা যায়। সম (অর্থাৎ) তুল্য, যদৃচ্ছালাভের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে (তুল্য। ইহাই তাৎপর্য্য) এই প্রকার যে সন্ন্যাসী শরীরস্থিতিহেতু অন্নাদির লাভ বা অলাভে সম (অর্থাৎ) হর্ষবিষাদবর্জ্জিত (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মাদিতে অকর্ম্মাদিদর্শনকারী এবং শরীরাদিসাধ্য অথচ শরীরস্থিতিমাত্র-প্রয়োজন ভিক্ষার্থ ভ্রমণাদি কার্য্যে 'আমি কর্ত্তা" নহি, গুণনিচয় গুণ-সমূহেই ক্রিয়া করিতেছে" এই প্রকার সর্ব্বদা বুঝিয়া আপনার অকর্তৃত্ব সর্ব্বদা দর্শনপূর্ব্বক প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষাটনাদি কোন কার্য্যই করে না। কিন্তু অন্য লোকের সহিত ব্যবহার বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা নিবন্ধন, লোকগণকর্ত্তৃক আরোপিত ভিক্ষাটনাদি কর্ম্মের কর্ত্তা (বলিয়া ব্যবহৃত) হয়, অথচ শাস্ত্র ও প্রমাণ দ্বারা জনিত স্বানুভাবে যে আপনাকে প্রকৃতপক্ষে অকর্ত্তা বলিয়া বুঝিয়া থাকে। সেই (ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ) সংন্যাসী, অপর ব্যক্তি যাহার কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া থাকে, সেই ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম করিয়াও (সংসারে) বদ্ধ হয় না, কারণ অবিদ্যার সহিত বন্ধহেতু কর্ম্ম (তাহার পক্ষে) জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে। জ্ঞানীর স্বরূপ বর্ণন করিয়া যাহা কিছু বলা হইয়াছে, এস্থলে তাহাই (ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রকারান্তরে) আবার বলা হইল॥ ২২॥

---

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩॥

অন্বয়।—গতসঙ্গস্য (আসক্তিশূন্যস্য) মুক্তস্য (ধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরহিতস্য) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (তত্ত্বজ্ঞানসমাহিতমনসঃ) যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ (কর্ত্তব্য-মিতি বুদ্ধ্যৈব বিহিতমনুতিষ্ঠতঃ) সমগ্রং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে (সংসারবন্ধনহেতুত্বং ন ভজতে)॥ ২৩॥

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধন রহিত, যাহার হৃদয় তত্ত্বজ্ঞানেই সর্ব্বদা একাগ্র এবং যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য এই জ্ঞানেই কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে, তাহার সকল কর্ম্মই বিলীন হয় (অর্থাৎ সংসারবন্ধের প্রতি কারণ হয় না)॥ ২৩॥

ভাষ্য।—ত্যক্‌ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গমিত্যনেন শ্লোকেন যঃ প্রারব্ধকর্ম্মা সন্ যদা নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মদর্শনসম্পন্নঃ স্যাৎ, তদা তস্য আত্মনঃ কর্তৃকর্ম্মপ্রয়োজনাভাব-দর্শিনঃ কর্ম্মপরিত্যাগে প্রাপ্তে কুতশ্চিন্নিমিত্তাত্তদসম্ভবে সতি পূর্ব্ববৎ

তস্মিন্ কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি স ইতি কর্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিতঃ। যস্যৈবং কর্ম্মাভাবো দর্শিতস্তস্যৈব গতসঙ্গস্য সর্ব্বতো নিবৃত্তাসক্তেঃ জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ জ্ঞান এব অবস্থিতং চেতঃ যস্য সোঽয়ং জ্ঞানাবস্থিতচেতাস্তস্য যজ্ঞায় যজ্ঞনির্ব্বৃত্ত্যর্থং আচরতো নির্ব্বর্ত্তয়তঃ কর্ম্ম সমগ্রং সহাগ্রেণ ফলেন সহ বর্ত্ততে ইতি সমগ্রং কর্ম্ম তৎ সমগ্রং প্রবিলীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং ইত্যাদি শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মারম্ভের পর নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকেই আত্মরূপে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার সেই সময় নিজের সম্বন্ধে কর্ত্তা কর্ম্ম ও প্রয়োজনাদির অভাব দর্শন হওয়াতে, সকল প্রকার কর্ম্মের পরিত্যাগ প্রাপ্ত হইলে ও কোন কারণ বশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় সেই কর্ম্মেতেই প্রবৃত্তি থাকিলেও, "কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে সে কোন কর্ম্ম করে না" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা তাহার কর্ম্মাভাব দর্শিত হইয়াছে, যাহার এই প্রকার কর্ম্মাভাব দর্শিত হইয়াছে, তাহার (বিষয়েই বলা যাইতেছে যে গতসঙ্গস্যেত্যাদি)। গতসঙ্গ (অর্থাৎ) সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তি রহিত, মুক্ত (অর্থাৎ) ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত। জ্ঞানাবস্থিতচেতা (অর্থাৎ) জ্ঞানেতেই যাহার চিত্ত অবস্থিত থাকে, সেই জ্ঞানাবস্থিতচেতা, এই প্রকার বিশেষণ-যুক্ত ব্যক্তি কেবল যজ্ঞের নিষ্পাদনের জন্যই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার ফলের সহিত সকল কর্ম্মই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অগ্রশব্দের অর্থ ফল, ফলের সহিত যুক্ত কর্ম্মকে সমগ্র কর্ম্ম কহা যায়, ইহার অর্থ ॥ ২৩ ॥

---

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—অর্পণং ব্রহ্ম (এব,) হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ হুতং (অপি ব্রহ্মৈব) ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (তেন) গন্তব্যং (অপি ফলং) ব্রহ্মৈব ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ।—যাহা দ্বারা হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা ব্রহ্ম (স্বরূপেই ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির সমক্ষে প্রতীয়মান হয়, এই প্রকার) হবনীয় দ্রব্যও ব্রহ্ম, যে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাও ব্রহ্ম, হবনক্রিয়াও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মরূপ হবনক্রিয়াতে যাহার সমাধি আছে, তাহার দ্বারা যে ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহাও (ব্রহ্মজ্ঞ যতির নিকট) ব্রহ্ম (বলিয়াই প্রতীয়মান হয়) ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য।—কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম স্বকার্য্যারম্ভমকুর্ব্বৎ

সমগ্রং প্রবিলীয়ত ইত্যুচ্যতে যতো ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মার্পণং যেন করণেন ব্রহ্মবিদ্ হবিরগ্নৌ অর্পয়তি তদ্ ব্রহ্মৈবেতি পশ্যতি তস্যাত্মব্যতিরেকেণাভাবং পশ্যতি যথা শুক্তিকায়াং রজতাভাবং পশ্যতি তদুচ্যতে ব্রহ্মার্পণমিতি। যথা যদ্রজতং তং শুক্তিকৈবেতি। ব্রহ্ম, অর্পণমিত্যসমস্তে পদে। যদর্পণবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে লোকে তদস্য ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—কি কারণে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও, ঐ কর্ম্ম ফলের সহিত প্রবিলীন হইয়া যায় এবং নিজ ফলদানে সমর্থ হয় না? তাহারই উত্তর স্বরূপ বলা যাইতেছে যে, যে কারণে ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি। "ব্রহ্মার্পণ" যে করণের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্ অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য অর্পণ করিয়া থাকে, সেই করণকে সে ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপেই বুঝিয়া থাকে (অর্থাৎ) আত্মস্বরূপব্রহ্মব্যতিরেকে ঐ বস্তুর কোন সত্তাই নাই, ইহাই বুঝিয়া থাকে যেমন শুক্তিতে (রজত দৃষ্ট হইলেও, বাস্তবপক্ষে) রজতের অভাব লোকে দেখিয়া থাকে, সেই রূপই বলা যাইতেছে যে অর্পণ দ্রব্য ব্রহ্মই। যেমন (লোকে বলিয়া থাকে যে) যাহা রজত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বাস্তবিক শুক্তি ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। ব্রহ্ম অর্পণ এই দুইটী পদে সমাস করা হয় নাই। যে বস্তুকে লোক অর্পণ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাই ব্রহ্মবিদের সমক্ষে ব্রহ্মবুদ্ধিতেই গৃহীত হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য।

ভাষ্য।—ব্রহ্মহবিস্তথা যদ্ হবির্বুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণং তদ্ ব্রহ্মৈবাস্য। তথা ব্রহ্মাগ্নাবিতি সমস্তং পদং। অগ্নিরপি ব্রহ্ম যত্র হূয়তে ব্রহ্মণা কর্ত্রা ব্রহ্মৈব কর্ত্তেত্যর্থঃ। যত্তেন হুতং হবনক্রিয়া তদ্ ব্রহ্মৈব যত্তেন গন্তব্যং ফলং তদপি ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম তস্মিন্ সমাধির্যস্য স ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিঃ তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যম্। এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুণাপি ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরমার্থতোঽকর্ম্ম ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ।—"ব্রহ্ম হবিঃ", হবি এই বুদ্ধিতে যে বস্তু গৃহীত হয়, তাহাও ব্রহ্মবিদ্ যতির সমক্ষে ব্রহ্মই। সেই প্রকার 'ব্রহ্মাগ্নৌ' এই স্থলেও ব্রহ্মাগ্নিপদটী সমস্ত। ব্রহ্মস্বরূপ কর্ত্তা যে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রক্ষেপ করে, তাহাও ব্রহ্ম এবং হবিপ্রক্ষেপকর্ত্তাও ব্রহ্ম। ইহাই অর্থ। সেই প্রক্ষেপকর্ত্তা যে হবনক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহাও ব্রহ্ম। এবং সেই হবনক্রিয়ার দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহাও ব্রহ্ম। 'ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি' ব্রহ্মস্বরূপ কর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্ম বলা যায়, সেই ব্রহ্মকর্ম্মে যাহার সমাধি আছে, তাহার নাম ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি,

সেই ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি ব্যক্তিও ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার লোক সংগ্রহের অভিলাষে ব্রহ্মবিদ্ যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাও বাস্তব পক্ষে বন্ধের হেতু ( কর্ম্ম নহে ), কারণ ঐ কর্ম্মের ফলোৎপাদিনী শক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য।—এবং সতি নিবৃত্তকর্ম্মণোঽপি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনঃ সম্যগ্দর্শন-স্তুত্যর্থং যজ্ঞত্বসম্পাদনং জ্ঞানস্য সুতরামুপপদ্যতে। যদর্পণাদি অধিযজ্ঞে প্রসিদ্ধং তদস্যাধ্যাত্মং ব্রহ্মৈব পরমার্থদর্শিনঃ। ইতি। অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বে হর্পণাদীনাং বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানং অনর্থকং স্যাৎ। তস্মাদ্ ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্ব-মিত্যভিজানতো বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মাভাবঃ। কারকবুদ্ধ্যভাবাচ্চ। ন হি কারক-বুদ্ধিরহিতং যজ্ঞাখ্যাং কর্ম্ম ইষ্টম্। সর্ব্বমেবাগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম শব্দসমর্পিত-দেবতাবিশেষসম্প্রদানাদিকারকবুদ্ধিমৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ফলাভিসন্ধিমচ্চ দৃষ্টম্। নোপমৃদিতক্রিয়াকারকফলভেদ বুদ্ধিমৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানফলাভিসন্ধিরহিতং বা। ইদং তু ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতার্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধিকর্ম্ম অতোঽকর্ম্মৈব তৎ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এইপ্রকার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বর্ণন করিলে নিবৃত্ত-কর্ম্ম। সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসীর সম্যগ্দর্শনের স্তুতির নিমিত্ত তদীয় ব্রহ্মজ্ঞানের ও যজ্ঞত্বসম্পাদন ( অর্থাৎ যজ্ঞের সহিত রূপক করিয়া ) স্তুতকরা সুস্পষ্টভাবে সংলগ্ন হইয়া যায়। ( এই শ্লোকের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিতে হইবে যে ) লোকে যজ্ঞপ্রকরণে যে সকল বস্তু অর্পণাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে, সেই সকল বস্তুই পরমার্থদর্শী যতির সমক্ষে সর্ব্বাত্মভূতব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। এই প্রকার তাৎপর্য্য যদি না হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থেরই ব্রহ্মস্বরূপতা ত সিদ্ধই আছে, তাহার মধ্যে আবার বিশেষ করিয়া অর্পণাদি পদার্থেরই ব্রহ্মরূপতাভিধান নিরর্থক হইয়া পড়ে। সেই কারণে সিদ্ধ হইতেছে যে, "এই সকল বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম ব্যতি-রেকে আর কিছুই নহে," এই প্রকার জ্ঞান যাহার হইয়াছে, সেই বিদ্বান্ যতির কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। কারণ তাহার কারকবুদ্ধি নাই, ( কর্ত্তা, করণ, সম্প্রদান, প্রভৃতি ) কারকবুদ্ধি না থাকিলে যজ্ঞ নামক কর্ম্ম হইতে পারে, এমন ত দেখা যায় না। অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সকল বিহিত কর্ম্মের এই স্বরূপ যে তাহারা দেবতা বিশেষ সম্প্রদান প্রভৃতি কারক শব্দের দ্বারা প্রমথে বোধিত হয়, ঐ সকল বস্তুর জ্ঞান এবং নিজের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান যাহার আছে, এইপ্রকার

কর্ত্তাই ঐ সকল যজ্ঞ করিয়া থাকে, ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এইটী ক্রিয়া, ইহা কারক এবং ইহা ফল, এই প্রকার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইলে, যজ্ঞাদি কোন কার্য্যই হইতে পারে না, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলাভিসন্ধি না থাকিলেও ঐ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না, ইহাও দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ক্রিয়া, কারক এবং ফল বিষয়ে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় বলিয়া, ব্রহ্মজ্ঞযতিগণের কর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মই হইতে পারে না॥ ২৪॥

ভাষ্য।—তথা চ দর্শিতং "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" "কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" ইত্যাদিভিঃ। তথা চ দর্শয়ন্ তত্র তত্র ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধ্যুপমর্দ্দং করোতি। দৃষ্টা চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদৌ কামোপমর্দ্দেন কাম্যাগ্নিহোত্রাদিহানিঃ। তথাচ মতিপূর্ব্বকামতিপূর্ব্বকাদীনাং কর্ম্মণাং কার্য্যবিশেষস্যারম্ভকত্বং দৃষ্টম্। তথেহাপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতার্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধের্বাহ্যচেষ্টামাত্রেণ কর্ম্মাপি বিদুষোঽকর্ম্ম সংপদ্যতে। অতউক্তং সমগ্রং প্রবিলীয়ত ইতি॥ ২৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" যে ব্যক্তি কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দেখিয়া থাকে,) "কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" (কর্ম্মেতে অভিপ্রবৃত্ত হইয়াও সে কিছুই করে না,) "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" (গুণ সকল গুণেতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে,) "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" (সমাহিতচেতা তত্ত্ববিৎ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে আমি কিছুই করিতেছি না) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা সেই প্রকারই দেখান হইয়াছে, এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ ক্রিয়া কারক ও ফলের মধ্যে পরস্পর ভেদ বুদ্ধির উপমর্দ্দন করিয়াছেন। কাম্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতিযাগে কামনার নিবৃত্তি হইলে, ঐ কাম্য অগ্নিহোত্রাদিরও নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলাভিসন্ধান এবং ফলের অনভিসন্ধানপূর্ব্বক কৃত কর্ম্মের ফলেও বিশেষ হইয়া থাকে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই প্রকার এখানেও অর্পণাদিকারক, ক্রিয়া, ও ফলের পরস্পর ভেদবুদ্ধি, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা উৎসাদিত হইয়াছে বলিয়া বিদ্বানের বাহ্যচেষ্টামাত্র কর্ম্মও প্রকৃত পক্ষে (পাপ পুণ্যের হেতু) কর্ম্ম হয় না। এই কারণেই বলা হইয়াছে "তাহার সমগ্রই প্রবিলীন হয়।"

ভাষ্য।—অত্র কেচিদাহুঃ যদ্ব্রহ্ম তদর্পণাদীতি। ব্রহ্মৈব কিল পঞ্চবিধেন

কারকাত্মনা ব্যবস্থিতং সৎ তদেব কর্ম্ম করোতি। তত্রনার্পণাদিবুদ্ধির্নিবর্ত্ত্যতে কস্তু অর্পণাদিষু ব্রহ্ম বুদ্ধিরাধীয়তে। যথা প্রতিমায়াং বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধিঃ যথা বা নামাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরিতি। সত্যমেবমপি স্যাৎ যদি জ্ঞানযজ্ঞস্তুত্যর্থং প্রকরণং স্যাৎ।অত্র তু সম্যগ্দর্শনং জ্ঞানযজ্ঞশব্দিতং অনেকান যজ্ঞশব্দিতান্ ক্রিয়াবিশেষান্ উপন্যস্য শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞইতিজ্ঞানং স্তৌতি। অত্রচ সমর্থমিদং বচনং ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনে। অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বে অর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ। যে ত্বর্পণাদিষু প্রতিমায়াং বিষ্ণুবুদ্ধিবৎ ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ক্ষিপ্যতে নামাদিষ্বিব চেতি ব্রুবতে। ন তেষাং ব্রহ্মবিদ্যোক্তা ইহ বিবক্ষিতা স্যাৎ অর্পণাদিবুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ জ্ঞানস্য। নচ দৃষ্টিসম্পাদনজ্ঞানেন মোক্ষফলং প্রাপ্যতে। "ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ইতি চোচ্যতে বিরুদ্ধং চ সম্যগ্ দর্শনমন্তরেণ মোক্ষফলং প্রাপ্যতে ইতি। প্রকৃতবিরোধশ্চ সম্যগ্দর্শনঞ্চ প্রকৃতং কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ তস্যৈ ইত্যত্র অন্তেচ সম্যগ্দর্শনং তস্যৈবোপসংহারাৎ। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ "জ্ঞানং লব্ধা পরাংশান্তিং" ইত্যাদিনা সম্যগ্দর্শনস্তুতিমেব কুর্ব্বন উপক্ষীণোঽধ্যায়ঃ। তত্রাকস্মাৎ অর্পণাদ ব্রহ্মদৃষ্টিরপ্রকরণে প্রতিমায়াং ইব বিষ্ণুদৃষ্টি রুচ্যত ইত্যনুপপন্নম্ তস্মাদ্ যথাব্যাখ্যাতার্থ এবায়ং শ্লোকঃ॥ ২৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে যে ব্রহ্ম তাহাই অর্পণাদি (অর্থাৎ) ব্রহ্মই পঞ্চবিধ কারক স্বরূপে ব্যবস্থিত হইয়া সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই স্থলে অর্পণাদি বুদ্ধির নিরাকরণ করা হইতেছে না, কিন্তু অর্পণাদি বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধির উৎপাদন করা হইতেছে, যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতির বুদ্ধি কিম্বা নামেতে ব্রহ্ম বুদ্ধি করা গিয়া থাকে। সত্য এইপ্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারিত, যদি এই স্থানটীতে জ্ঞান যজ্ঞের প্রকরণ না হইত। এই অধ্যায়ে কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞ শব্দের প্রতিপাদ্য সম্যগ্দর্শনজ্ঞানকে, অনেক যজ্ঞশব্দপ্রতিপাদ্য ক্রিয়া বিশেষের নাম করিয়া পরে "দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞই মুখ্যতর" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্তুতি করিয়াছেন। ব্রহ্মার্পণং ইত্যাদি শ্লোকবাক্যও জ্ঞানের যজ্ঞত্ব সম্পাদনে সমর্থ। তাহা না হইলে সকল পদার্থেরই সাধারণ ভাব ব্রহ্মরূপতা থাকিলেও বিশেষ করিয়া অর্পণাদি কতিপয় বস্তুবিশেষের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন অনর্থক হইয়া উঠে। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, প্রতিমাতে বিষ্ণুবুদ্ধি কিংবা নামে ব্রহ্ম বুদ্ধির ন্যায় এস্থলে অর্পণাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপিত

হইতেছে, তাহাদের মতানুসারে এস্থলে স্পষ্ট উক্ত ব্রহ্মবিদ্যাও বিবক্ষিত হইতে পারে না, কারণ এস্থলে (তাঁহাদের মতে) যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও অদ্বৈত ব্রহ্ম বিষয়ক নহে, কিন্তু তাহা অর্পণাদি দ্বৈতবিষয়ক। কোন একটী বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইবে, এই প্রকারের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ ফল হইতে পারে না, জ্ঞানবানই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় থাকে, ইহাও বলা হইতেছে, (অথচ) সম্যগ্ দর্শন ব্যতিরেকে মোক্ষলাভও হয়, ইহা যদি মতে (হইলেও) বলা হইতেছে (ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে,) এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে প্রকৃত বিরোধ (ও উপস্থিত হয়,) (ইহা সম্যগ্ দর্শনেরই প্রকরণ) সুতরাং সম্যগ্ দর্শনই এই অধ্যায়ে প্রকৃত (প্রতিপাদ্য); কর্ম্মণ্য কর্ম্ম ইত্যাদি শ্লোকে সম্যগ্ দর্শনের আরম্ভ করিয়া অধ্যায়ের অন্তে সেই সম্যগ্ দর্শনেরই উপসংহার করা হইয়াছে। "দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানময় যজ্ঞই মুখ্যতম", "জ্ঞান লাভ করিয়া পরম শান্তি লাভ করে," ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্ঞানেরই স্তুতি করিয়া এই অধ্যায়টী পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং অর্পণাদি পদার্থে ব্রহ্মদৃষ্টির ইহা প্রকরণ নহে বলিয়া প্রতিমাতে বিষ্ণু বুদ্ধির ন্যায় অপ্রকরণে এইস্থলে অর্পণাদিতে ব্রহ্মদৃষ্টি বলা হইতেছে এই প্রকার ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে। সেই কারণে এই শ্লোকটীর যে প্রকার ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, তাহাই সঙ্গত (ইহা জানিতে হইবে)॥ ২৪॥

---

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫॥

অন্বয়।—অপরে যোগিনঃ (কর্ম্মিণঃ) দৈবং যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে। অপরে (জ্ঞানিনঃ) ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞং (আত্মানং) যজ্ঞেনৈব (আত্মনৈব) উপজুহ্বতি (ভেদবুদ্ধিনিরাকরণেন একমিতি ভাবয়ন্তি)॥ ২৫॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মজ্ঞানহীন কর্ম্মিগণ দেবপ্রীতির জন্য (অগ্নিষ্টোমাদি) যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে স্বয়ংই আপনাকে হবন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধির নিরাকরণ করিয়া আত্মা ও ব্রহ্ম এক, এই প্রকার ভাবনা করিয়া থাকেন॥ ২৫॥

ভাষ্য।—তত্রাধুনা সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদ্য তৎস্তুত্যর্থং অন্যেঽপি যজ্ঞা উপক্ষিপ্যন্তে। দৈবমেবেত্যাদিনা। দৈবমেব দেবা ইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেন অসৌ দৈবোযজ্ঞস্তমেব অপরে যজ্ঞং যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ পর্য্যুপাসতে কুর্ব্বন্তি।

ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মাগ্নৌ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' যৎ 'সাক্ষাৎ অপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম' "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদিবচনোক্তং অশনায়াদিসর্ব্ব-সংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং নেতি নেতীতি নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে। ব্রহ্ম চ তদগ্নিশ্চ স হোমাধিকরণত্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মাগ্নিঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মাগ্নৌ অপরেঽন্যে ব্রহ্মবিদো যজ্ঞং যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা আত্মনামসু যজ্ঞশব্দপাঠাৎ। তমাত্মানং ·· পরমার্থতঃ পরমেব ব্রহ্ম সন্তং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযুক্তমধ্যস্তসর্ব্বোপাধিধর্ম্মকং আহুতিরূপং যজ্ঞেনৈব আত্মনৈব উক্তলক্ষণেন উপজুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি। সোপাধি-কস্য আত্মনঃ নিরুপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেণ এব যদ্দর্শনং স তস্মিন্ হোমস্তং কুর্ব্বন্তি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ। সোঽয়ং সম্যগ্‌দর্শনলক্ষণো-যজ্ঞো দৈবযজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষু উপক্ষিপ্যতে ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি শ্লোকৈঃ। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ইত্যাদিনা স্তুত্যর্থম্॥ ২৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রসঙ্গে সম্যগ্‌ দর্শনের যজ্ঞরূপতা সম্পাদন করিয়া তাহার স্তুতির জন্য, অন্য যজ্ঞের ও প্রস্তাব করা যাইতেছে দৈবমেবেত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। দেবগণ যাহার দ্বারা সংকৃত হইয়া থাকেন, তাহাকে দৈব যজ্ঞ বলা যায়, অপর যোগী (কর্ম্মী) গণ দৈব যজ্ঞের পর্য্যুপাসনা করিয়া থাকেন (অর্থাৎ) অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। "সত্যজ্ঞান এবং অনন্ত (ইহাই) ব্রহ্মের স্বরূপ," "বিজ্ঞান এবং আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ," "যাহা সাক্ষাৎ এবং প্রত্যক্ষ, তাহা সকলই ব্রহ্ম" "যে আত্মা সর্ব্বান্তর" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রকাশিত, ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি সকল প্রকার সংসারধর্ম্ম বর্জ্জিত, নেতি নেতি ইত্যাদি বাক্য বোধিত, সকলপ্রকার ভেদ বর্জ্জিত সেই পরমাত্মবস্তুই ব্রহ্মশব্দের অর্থ; হোমের আশ্রয়ত্ববিবক্ষায় সেই ব্রহ্মই অগ্নিরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে অপর যোগিগণ (অর্থাৎ) ব্রহ্মবিদ্ গণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞকে আহুতিরূপে অর্পণ করিয়া থাকেন, বস্তুতস্ত যাহা পর ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াও বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সহিত যোগবশতঃ সংসারের দুঃখিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া প্রতীত হয়, সেই আত্মা জীবই এই স্থলে যজ্ঞ এই শব্দটীর দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, আত্মার নামগণের মধ্যে যজ্ঞ শব্দটীও দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারধর্ম্মরূপ উপাধি বিশিষ্ট আত্মার নিরুপাধিক পরব্রহ্ম স্বরূপে যে দর্শন, তাহাই সেই পরমাত্মাতে হোম, তাহাই করিয়া থাকেন (অর্থাৎ) যাঁহারা জীব ব্রহ্মের অভেদ দর্শনশীল সন্ন্যাসী (তাঁহারাই এই প্রকার হোম করিয়া থাকেন)। দৈব যজ্ঞ প্রভৃতি যজ্ঞের মধ্যে

# প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ। ] [ ৩৬১ পৃষ্ঠার পর।

আহার শুদ্ধ হ'লে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হ'লে আত্মসম্বন্ধি অচলা স্মৃতি হয়—এ শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েই মেনেছেন। তবে শঙ্করাচার্য্যের মতে আহার শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, আর রামানুজাচার্য্যের মতে ভোজ্য দ্রব্য। সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হ'লে ইন্দ্রিয় সকল যথাযথ কার্য্য কি ক'রেই বা করে? কদর্য্য আহারে ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণ-শক্তির হ্রাস হয় বা বিপর্য্যয় হয়, এ কথ সকলেরই প্রত্যক্ষ। অজীর্ণ দোষে এক জিনিসকে আর এক বলে ভ্রম হওয়া এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি আদি শক্তির হ্রাস সকলেই জানেন। সেই প্রকার কোনও বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা উপস্থিত করে, তাও ভূয়োদর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাদ্যা-খাদ্যের বাচবিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব; যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্তু ভুলে, আধারটা নিয়েই টানা হেঁচড়া করছি এখন।

রামানুজাচার্য্য ভোজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে তিনটী দোষ বাঁচাতে বলছেন। জাতি দোষ, অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্য দ্রব্যের জাতিগত; যেমন পেঁয়াজ, লশুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে, মনে অস্থিরতা আসে; অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। আশ্রয় দোষ, অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলে দুষ্ট বুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সৎ বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্ত দোষ, অর্থাৎ ময়লা কদর্য্য কীট কেশাদি দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতি দোষ এবং নিমিত্ত দোষ থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই কর্ত্তে পারে, আশ্রয় দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয় দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুৎ-মার্গ, "ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা"। তবে অনেক স্থলেই "উল্‌টা সমজ্‌লি রাম" হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে, একটা কিম্ভূত-কিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এস্থলে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি জগৎগুরুদের জীবনে পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি ব্যবহার করে গেছেন। জাতিদুষ্ট অন্ন ভোজন সম্বন্ধে, ভারতবর্ষের মত শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নাই। সমস্ত ভূমণ্ডলে, আমাদের দেশের মত পবিত্র দ্রব্য আহার করে, এমন আর

কোনও দেশ নাই। নিমিত্ত দোষ সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে; ময়রার দোকান, বাজারে খাওয়া, এ সব মহা অপবিত্র এবং দেখ্‌তেই পাচ্ছ কিরূপ নিমিত্ত দোষে দুষ্ট ময়লা, আবর্জ্জনা, পচা, পক্কড় সব ওতে আছেন,—এর ফল হচ্ছে তাই। এই যে ঘরে ঘরে অজীর্ণ, ও ঐ ময়রার বাজারে খাওয়ার ফল, এই যে প্রস্রাবের ব্যায়রামের প্রকোপ, ওও ঐ ময়রার দোকান। ঐ যে পাড়াগেঁয়ে লোকের তত অজীর্ণ দোষ, প্রস্রাবের ব্যায়রাম হয় না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে লুচি কচুরি প্রভৃতি বিষ লড্ডুকের অভাব। এ কথা বিস্তার করে পরে বল্‌ছি।

এই ত গেল খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে প্রাচীন সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের মধ্যে আবার অনেক মতামত প্রাচীনকালে বলেছে এবং আধুনিক কালে বলছে। প্রথম প্রাচীনকাল হতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এক মহা বিবাদ, আমিষ আর নিরামিষ। মাংস ভোজন উপকারক কি অপকারক? তা ছাড়া জীবহত্যা ন্যায় বা অন্যায়, এ এক মহা বিতণ্ডা চিরদিনের। একপক্ষ বলছেন—কোনও কারণে হত্যারূপ পাপ করা উচিত নয়; আর একপক্ষ বলছেন—রাখ তোমার কথা, হত্যা না করলে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্রবাদীদের ভেতরও মহাগোল। শাস্ত্রে একবার বল্‌ছেন, যজ্ঞস্থলে হত্যা কর—আবার বলছেন, জীবঘাত করো না। হিঁদুরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যজ্ঞ ছাড়া অন্যত্র হত্যা করা পাপ। কিন্তু যজ্ঞ করে সুখে মাংস ভোজন কর। এমন কি, গৃহস্থের পক্ষে অনেকগুলি, নিয়ম আছে যে, সে সে স্থলে হত্যা না করলে পাপ;—যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে সকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস না খেলে পশু জন্ম হয়—মনু বল্‌ছেন। অপরদিকে জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব বলছেন যে, তোমার শাস্ত্র মানিনি, হত্যা করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধ সম্রাট্‌ অশোক, যে যজ্ঞ করবে, বা নিমন্ত্রণ করে মাংস খাওয়াবে, তাকে সাজা দিচ্ছেন। আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁকরে—তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণের মদ মাংস খাওয়ার কথা রামায়ণ মহাভারতে রয়েছে, সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মান্‌ছেন! বর্ত্তমান কালে শাস্ত্রও শুন্‌বে না ও মহাপুরুষ বলেছে বল্লেও শোনে না। পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ; অপর পক্ষ বলছেন, ও গল্প-কথা, তা হলে হিঁদুরা নীরোগী হত, আর ইংরেজ আমেরিকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান

মাংসাহারী জাত রোগে লোপ হয়ে যেত এতদিনে। এক পক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যে, কপি খেলে কপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্য বুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বলছেন, ভাত ডালে যা আছে মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম কর্ত্তে পারে; অপর পক্ষ বলছেন, তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হত; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান্ ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু চিনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দ্দশা দেখ—আর জাপানীরাও ঐ ছিল; মাংসাহার আরম্ভ করে অবধি ওদের ভোল ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড়-লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারে বদ হজম, আর এক পক্ষ বলছেন, সব ভুল, নিরামিষাশী গুলোরই যত পেটের রোগ। এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোষ্ঠশুদ্ধি রোগ শাক পাতড়া খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তাবলে কি দুনিয়া শুদ্ধকে তাই করতে চাও? ফল কথা চিরকালই মাংসাশী জাতেরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতেরা বলছেন যে, যখন যজ্ঞের ধূম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে, এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্য্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না। আমাদের দেশে আর্য্যসমাজি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাদ উপস্থিত। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংস খাওয়া একান্ত আবশ্যক; আর পক্ষ বলছেন একান্ত অন্যায়। এই ত বাদ বিবাদ চলছে। সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার ত বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্মকর্ম্মভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক্, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ধর্ম্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটে খুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরি চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈ কি। যত দিন মনুষ্যসমাজে এই ভাব থাকবে, "বলবানের জয়", তত দিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোনও রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার

কর্ত্তে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্ব্বল পেষা যাবেন। রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বল্লে চলেনা—জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।

আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও হচ্ছে বিবাদ। একপক্ষ বলছেন যে, ভাত, আলু, গম, যব, জনার প্রভৃতি শর্করাপ্রধান খাদ্যও কিছুই নয়, ও সব মানুষে বানিয়েছে, ঐ সব খেয়েই যত রোগ। শর্করা-উৎপাদক Starchy খাবার রোগের ঘর। ঘোড়া গরু পর্য্যন্ত ঘরে বসে চাল গম খাওয়ালে রুগী হয়ে যায়, আবার মাঠে ছেড়ে দিলে কচি ঘাস খেয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ঘাস শাক পাতাড় প্রভৃতি হরিৎ সবজিতে শর্করা-উৎপাদক পদার্থ বড্ড কম। বনমানুষ জাতি বাদাম ও ঘাস খায়, আলু গম ইত্যাদি খায় না; যদি খায়, ত অপক্ক অবস্থায়, যখন ষ্টার্চ্চ (starch) অধিক হয় নাই। এই সমস্ত নানাপ্রকার বিতণ্ডা চলছে। এক পক্ষ বলছেন, শূল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং দুগ্ধ এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘজীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল, ফলাহারী অনেক দিন পর্য্যন্ত যুবা থাকবে, কারণ ফলের খাট্টা হাড় গোড়ে জঙ্গ্ ধরতে দেয় না।

এখন সর্ব্ববাদিসম্মত মত হচ্চে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয় এমন খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে ;—যদি হজমেই সমস্ত শক্তি টুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল ?

ভাজা জিনিস গুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ি। ঘি, তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য। আমাদের বাঙ্গালা দেশের জন্য এখনও দূর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাহাই প্রশস্ত। কোন্ প্রাচীন বাঙ্গালী কবি লুচি কচুরী'র বর্ণনা কচ্ছেন ? ও লুচি কচুরী এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালে ভদ্রে লোকে খায়। উপরি উপরি "পাকি রসুই" খেয়ে থাকে এমন লোক ত দেখি নাই। মথুরার চোবে কুস্তিগীর লুচি-লড্ডুক-প্রিয়, দু চার বৎসরেই চোবের হজমের সর্ব্বনাশ হয়, আর চোবেজী চূরণ খেয়ে খেয়ে মরেন।

গরিবরা খাবার যোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকা-

নের খাবারে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই, একদম্ উল্‌টা আছেন বিষ—বিষ—বিষ। পূর্ব্বে লোকে কালে ভদ্রে ঐ পাপ গুলো খেত; এখন সহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা সহরে বাস করে, তাদের নিত্য ভোজন হচ্ছে ঐ। এতে অজীর্ণ রোগে অপমৃত্যু হবে তায় কি বিচিত্র! খিদে পেলে ও কচুরী জিলিবি খানায় ফেলে দিয়ে, এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত, ডাল, আটার রুটি, মাছ, শাক, দুদ্ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণির মত খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোলমাত্র, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস দিবে-পয়সা থাকে, খাও, তবে ও পশ্চিমি নানা প্রকার গরম মশলা গুলো বাদ দিয়ে। মশলাগুলা খাওয়া নয়—ও গুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য। কচি কলাই সুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদ; পারিস-রাজধানীর ঐ সুপ একটি বিখ্যাত খাওয়া। কচি কলাইসুঁটি খুব সিদ্ধ করে, তারপর তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তার পর একটা দুদছাঁকনির মত তারের ছাঁকনিতে ছাঁকলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আসবে। এখন হলুদ, ধনে, জিরেমরিচ, লঙ্কা, যা দেবার দিয়ে সাঁতলে নাও—উত্তম সুস্বাদ সুপাচ্য ডাল হ'ল। যদি একটা পাঁটার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে, ত উপাদেয় হয়।

ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধুম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দুচার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকি সব বদ্ হজম। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হলো? যেটুকু হজম হবে, সেই টুকুই খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদ হজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া, দুটোই বদ হজম। পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন (Albumen) দেখা দিয়েছে বলেই হাঁ করে বসোনা। ওসব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনোনা। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁট আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পার ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থ যাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ "ভাল কর্ত্তে পারবো না, মন্দ করবো, কি দিবি তাই বল"। পারত পক্ষে ঔষুধ খেয়ো না। রোগে যদি এক আনা মরে, ঔসুধে মরে ১৫ আনা। পার যদি প্রতি বৎসর পূজার বন্দের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন হওয়া আর কুড়ের বাদশা হওয়া দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাকে ধরে হাটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা ত জীবন্ত রোগী, সেটা ত হত-ভাগা। যেটা লুচির ফুল্‌কো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা ত মরে আছে। যে এক দমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো। সেধে রোগ অকাল মৃত্যু ডেকে আন্‌লে কে কি করবে?

আবার ঐ যে পাঁউরুটি, উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকে ছুঁয়ো না একদম। খামীর দিলেই ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়ান। কোনও খামীরদার জিনিস্ খাবে

এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্ব্বপ্রকার খামীরদার জিনিসের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। শাস্ত্রে যে কোনও জিনিস মিষ্টি থেকে টকেছে, তার নাম শুক্ত; তা খেতে নিষেধ,—কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয়—উত্তম জিনিস্। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয়, ত তাকে পুনর্ব্বার খুব আগুনে সেঁকে খেও। অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জল শুদ্ধির বড়ই ধুম। এখন ঐ যে ফিল্‌টার, ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিল্‌টার জলকে ছেঁকে দেয় মাত্র, কিন্তু রোগের বীজ যে সকল কীটাণু তাতে থাকে, ওলাউঠো, প্লেগের বীজ, তা যেমন তেমনিই থাকে; অধিকন্তু ফিল্‌টারটি স্বয়ং ঐ সকল বীজের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়ান। কলকেতায় যখন প্রথম ফিলটার করা জল হল, তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠো হয় নাই; তার পর যে কে সেই, অর্থাৎ সে ফিলটার মশাই এখন স্বয়ং ওলাউঠো বৃদ্ধির আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ফিলটারের মধ্যে দিশি তেকাঠার উপর ঐ যে তিন কল্‌সির ফিল্‌টার, উনিই উত্তম; তবে দু তিন দিন অন্তর বালি বা কয়লা বদ্‌লে দিতে হবে বা পুড়িয়ে নিতে হবে। আর ঐ যে একটু ফট্‌কিরি দেওয়া গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, ঐটি সকলের চেয়ে ভাল। ফট্‌কিরির গুঁড়ো যথাসম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় পূরে একটু ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলিতি ফিলটার মিল্‌টারের ঘাড়ে চড়ে, কলের জলের মাথায় ঝাঁটা মারে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে পার্‌লে নির্ভয় হয় বটে। ফট্‌কিরি থিতোন জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর, ফিল্‌টার মিল্‌টার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে একদম বাষ্প করে দেয়, আবার সেই বাষ্পকে জল করে, তার পর আর একটা যন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু তার মধ্যে পূরে দেয়, যে বায়ুটা বাষ্প হবার সময় বেরিয়ে যায়। সে জল অতি বিশুদ্ধ; ঘরে ঘরে

এখন দেখ্‌ছি তাই। যার আমাদের দেশে দুপয়সা আছে, সে ছেলে পিলে গুলোকে নিত্যি কচুরি মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে !! ভাত রুটি খাওয়া অপমান !! এতে ছেলে পিলে গুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না ত কি? এত বড় ষণ্ডা জাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাই মোণ্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান্ দেশে বাস, দিন রাত কসরত !! আর আমাদের অগ্নিকুণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর ঘরে নড়ে বসতে চাইনি, আর আহার লুচি কচুরি মেঠাই—ঘিয়ে ভাজা, তেলেভাজা !! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার—এক কথায় দশক্রোশ হেঁটে দিত; দুকুড়ি কই মাছ কাঁটাশুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলে গুলো কলকেতায় আসে, চস্‌মা চখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ি চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে; কলকত্তাই হওয়ার এই ফল !! আর সর্ব্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ঔষুধের জোরে সব কর্ত্তে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে, ত অমনি একটু ঔষুধ দাও; পোড়া বদ্দিও বলেনা যে, দূর কর ঔষুধ, যা, দুক্রোশ হেঁটে আসগে যা। নানান দেশ দেখ্‌ছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখ্‌ছি। তবে আমাদের ভাত, ডাল, ঝোল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মোচার ঘণ্টোর জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাক্‌তে তোমরা যে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝছো না এই আপ্‌সোস। খাবার সকল কি ইংরেজের কর্ত্তে হবে—সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙ্গালী খাওয়া, উপাদেয়, পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব্ব-বাঙ্গলায়, ওদের নকল কর যত পার। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ; শেষ কলাইয়ের দাল আর মাছের টক মাত্র—আধা-সাঁওতালী বীরভূম বাঁকুড়োয় দাঁড়াবে !! তোমরা কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্ব্বনেশে ময়দার তালে হাতে মাটি দেওয়া ময়রার দোকান রূপ সর্ব্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছ, ওর মোহিনীতে বীরভূম, বাঁকুড়ো, ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও টাঁইমাছ, কচ্ছপাদি, জলে ছেড়ে দিয়ে, সইভ্য হচ্ছে !!! নিজেরা ত উচ্ছন্ন গেছ, আবার দেশশুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড সভ্য, সহুরে লোক। ওরাও এমনি আহাম্মক যে, ঐ কলকেতার আবর্জ্জনা গুলো খেয়ে, উদরাময় হয়ে মর্ মর্ হবে, তবু বলবে না যে এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে—নোনা লেগেছে !! কোনও রকম করে সহুরে হবে !!

(ক্রমশঃ—)

# আড্ডা।

( পূর্ব্বসংখ্যায় ৫৫৮ পৃষ্ঠার পর।)

এমন পাড়াই নাই, যে পাড়ায় কোন না কোন রকমের আড্ডা নাই। এক প্রকার ধরিতে গেলে, আড্ডাই আমাদিগের দেশের জাতীয়ত্বের এবং নিজের নিজের মনুষ্যত্বের হ্রাস বৃদ্ধির, মঙ্গল অমঙ্গলের, উন্নতি ও অবনতির কারণ। হেলায় বৃথা সময় কাটাইয়া মনুষ্যত্বের হানি করিতে আড্ডা যেমন মজবুত, এমন আর কিছুই নহে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ, ধনী নির্ধনী পণ্ডিত মূর্খ প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরই একটা না একটা আড্ডা আছে। আড্ডা মানে কোনও নিয়মিত প্রাত্যাহিক, সাপ্তাহিক, বা মাসিক সভা, ক্লব, বা কোনও প্রকার মিটিং বলিতেছি না। আড্ডা মানে—গল্পের স্থান; আড্ডা মানে অযথা বিরামের স্থান, অযথা খেলার স্থান, অযথা ফুর্ত্তির বা রগড়ের স্থান, যে স্থানে যাইবার জন্ত অনেক সময়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়; যে স্থানে যাইবার, বসিবার, কথা কহিবার, বা কোনও প্রকারের, কোন নিয়মাদি বিশেষ কিছু নাই; যে স্থানে প্রত্যহই বা সর্ব্বদাই যাইয়া থাকি; যে স্থানে কয়েকটি অতি ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া, প্রায় আর কেহ আসেন না, যদি বা আসেন, ত অতি অল্পক্ষণের জন্তই। এই সকল স্থানে নানাপ্রকার চর্চ্চা হইয়া থাকে। আড্ডায় যদি একটা কথা উঠিল, তাহা অযথা বা মিথ্যাই হউক, আর যাহাই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সে কথা পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া যাইল। আড্ডায় যদি কেহ একটা 'মতলব' করিলেন, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ সকলে তাহাতে হাঁ দিলেন। আড্ডার কথা বেদবাক্য; আড্ডা হইতে যে কথা শুনিয়া আসিব, সে কথা যদি প্রকৃতই মিথ্যা হয় এবং তাহার বিপক্ষে যদি দশ হাজার সৎলোক সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবুও আড্ডার কথা কোন মতে অবিশ্বাস করিতেছি না।—আড্ডার হাওয়া সাধারণতঃ প্রায় এই রূপই হইয়া থাকে, তবে দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে এই হাওয়া কিছু কম বা বেশী বহে মাত্র।

আড্ডা নানা প্রকারের আছে। প্রধানতঃ আড্ডাগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) মজলিশী, আজগুবী, বা খোষ গল্পের আড্ডা। আফিম আলী বৃদ্ধ ব খোসাহেব মহাশয়গণই সচরাচর এই সকল আড্ডার প্রধান সভ্য।

(২) খেলার আড্ডা। সতরঞ্চ, পাশা, তাশ প্রভৃতি এই সকল আড্ডার আদরের দ্রব্য। যুবা ও বৃদ্ধ উভয় দলই এই আড্ডায় সমান আকৃষ্ট হন।

(৩) গান বাজনার আড্ডা। এখানে যুবা বা বৃদ্ধ সকলই প্রায় আনন্দ পাইয়া থাকেন। আজকাল কিন্তু যুবক দলের ভিতরেই এই সকল আড্ডা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, ভাল ভাল কন্সর্ট-পার্টী, থিয়েটার পার্টী, যাত্রার দল, প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিতেছি না; কেন না, তথায় অনেক বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। সে সকল—রেগুলার মীটিং, ক্লব বা এসোসিয়েশন্ (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বা নিয়মিত সভা) নামে পরিগণিত হইতে পারে।

(৪) ফূর্ত্তির আড্ডা। অল্প স্বল্প পাঁচ রকম ইয়ারকী, পরচর্চ্চা, ঠাট্টা তামাসা, গুড়ুক সেবন, গল্প প্রভৃতি হরেক রকমে, এই সকল আড্ডায় সময় অতিবাহিত হয়। ইহাতে যুবার ভাগই বেশী।

(৫) নেশার আড্ডা। কোন কোন ভদ্র এবং শিক্ষিত লোককেও দেখিতে পাওয়া যায়—গুলি গাঁজা বা চরশ প্রভৃতি নীচ নেশায় রত। তাঁহারা গোপনে গোপনে ঐ সকল আড্ডায় যাইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসেন; মনে করেন, যেন কেহই টের পাইল না।

(৬) মিশ্রিত আড্ডা। অর্থাৎ, এ সকল আড্ডায় পূর্ব্বোক্ত সকল রকমেরই রস অল্প বিস্তর আছে।

এ সকল ছাড়া আরও অনেক রকমের ভাল মন্দ আড্ডা আছে; তাহাদিগের উল্লেখ অনাবশ্যক, অথবা অযোগ্য।

এই ত গেল পুরুষদিগের আড্ডা। মেয়েদেরও আড্ডা আছে। গঙ্গার ঘাট ত এক প্রধান আড্ডা; গঙ্গা বা নদী যদি দূর হয়, ত নিদেন দিঘী বা পুষ্করিণী। সহর হইলে আড্ডা দিবার সময় একবার—প্রাতঃকাল; পল্লীগ্রাম হইলে, দুই বেলা—দুপুর বেলা স্নানের সময়ে, আর সন্ধ্যাকালে জল আনিতে যাইবার সময়। সহরে, পুরুষগণ আফিসে বাহির হইয়া যাইলে পর, আর একটী মস্ত আড্ডা দিবার সময়; মফঃস্বলে ত, পুরুষগণ নিদ্রা যাইলেও, একবার পাড়ায় বাহির হইয়া দুইটা কথা কহিয়া আসা যায়। যাহা হউক অনেক কারণে, স্ত্রীলোকদিগের আড্ডা তত ধর্ত্তব্য নয়। এমন অনেক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা আজও সূর্য্যদেবের দর্শন পর্য্যন্ত কদাচিৎ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ।

পুরুষদিগের আড্ডাসকল হইতে আমরা যথেষ্ট আশা করিতে পারি।

এই সকল আড্ডাও দেশের অনেক উপকারে আসিতে পারে। কোনও নূতন বিষয় প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, আড্ডায় যতশীঘ্র ও সহজে প্রবর্ত্তিত হয়, এত আর কোথাও হয় কি না সন্দেহ। কৌশল ক্রমে বা প্রকারান্তরে তথায় যে কোন ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহাই তথাকার সকলের ভিতর অনতিবিলম্বে চলিয়া যায়। অন্যান্য চর্চ্চার সহিত অতি ধীরে ধীরে, অতি অল্প অল্প করিয়া, খেলা ধূলার ছলে, দেশের যথা সম্ভব হিত চর্চ্চা, পাঁচজনের মঙ্গল কামনা, সকলকার প্রতি শুভেচ্ছা, অনায়াসেই আড্ডায় প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। ইহা বৃদ্ধি পাইলেই ক্রমশঃ অনেকের ভিতর সদ্বৃত্তি এবং সদুদ্যমের বিকাশ হইবে। বিকাশ হইলে নিজের মঙ্গল, পাড়ার মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, সমগ্র জগতের মঙ্গল হইবে, ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইবে, এবং নিজের মনুষ্যজীবন ধন্য হইবে।

আড্ডা গুলিতে একটী সামান্য উপায় অনায়াসে অবলম্বন করিতে পারেন। সকলেই জানেন, ভিক্ষাদানে হৃদয় পবিত্র হয় ও সদ্বৃত্তির উদয় হয়। আমাদের দেশে আজও ভিক্ষাদান প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই; হাজার গরীব হউন, ভারতে এমন গৃহস্থ খুব কমই আছেন, যিনি শতকরা নিদেন একজন ভিখারীকেও একমুষ্টি তণ্ডুল প্রদান না করেন। ভারতে এমন খুব কমই পরিবার আছেন, যে পরিবারের মধ্য হইতে কেহ না কেহ, রমণীই হউন বা পুরুষ হউন, বার মাসে তের পার্ব্বণের মধ্যে কোনও না কোন পার্ব্বণে, নিদেন এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করেন। তদ্রূপ, যদি আমরা সকলেই কোনও প্রকারে, কষ্টে শ্রেষ্টে, নিদেন এক আধ পয়সা করিয়াও ভিক্ষা স্বরূপ আড্ডাতে জমাইতে পারি, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। ভিক্ষা প্রদান করিলে হৃদয় অতি পবিত্র হয়; এবং সেই হৃদয়ে সদিচ্ছা স্বতঃই ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে; মন প্রফুল্ল হইতে থাকে, মুখশ্রী বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং তাঁহাকে দেখিলে সকলে শান্তি লাভ করেন। সাধুগণ ভিক্ষালব্ধ অন্নকে এত পবিত্র মনে করেন কেন? তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, সদিচ্ছাবান্ পুরুষ ব্যতীত ভিক্ষা প্রদান করিতে কেহ সক্ষম হন না। আমরা সাধারণতঃ, অন্ন আহার করিতে করিতে শরীরের কোন স্থানে অন্ন একটী হঠাৎ পড়িয়া গেলে, সেই স্থানটী অপবিত্র জ্ঞানে ধৌত করি; সাধুগন কিন্তু, গাত্রস্থিত বহির্ব্বাসের একাংশে পাঁচ সাত বাটী হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনেন—গাত্রও ধৌত করেন না, সমগ্র বহির্ব্বাসও ধৌত

করেন না, কেবল মাত্র বাহির্বাদের সেই অংশটুকু জলে পরিষ্কার করিয়া লয়েন। হয়ত কোন সাধু সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন আহার করিয়া সেই হস্ত, মস্তকে মুছিয়া ফেলিলেন। কেন? অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও এক কারণ যে, সেই অন্নের ভিতর 'শুভ ইচ্ছা' যেন নারায়ণ স্বরূপে বিরাজমান, সেইজন্য অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সেই অন্নস্পৃষ্ট হস্ত মস্তকে স্পর্শ করান। শুধু যে, ভিক্ষা নিজে পবিত্র, এবং যিনি ভিক্ষা দেন, তিনিই যে কেবল পবিত্র তাহাই নহে; যাঁহাকে ভিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহাকে ত নারায়ণ স্বরূপে জ্ঞান করিতেই হয়, তাহা ছাড়া যেখানে ভিক্ষা দেওয়া হয় সে স্থান পর্য্যন্তও পবিত্র হয়। সেই জন্যই, অন্নসত্র, সদাব্রত, প্রভৃতি স্থান এত দেবালয় তুল্য পবিত্র। আমরাও কেন না আমাদিগের আড্ডা-গুলিতে অতি যৎসামান্যও কিছু ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিয়া সে গুলিকে পবিত্র করি, এবং নিজেরাও ধন্য হই?

অবশ্য, সেই সঞ্চিত ভিক্ষার সং ও সংযত ব্যবহার আবশ্যক। প্রধানতঃ, দুইটি উপায়ে ইহা সদ্ব্যয়িত হইতে পারে। প্রথমতঃ, নিজের পাড়ার আপদ বিপদে বা কোনও প্রকার আবশ্যকে সাহায্য করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, তাহার মধ্য হইতে যৎ কিঞ্চিৎ, দেশের কোনও সাধারণ বড় জাতীয় সভাতে দিতে পারি। এই দুইটী আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রথমটীর পরিণাম একতা; দ্বিতীয়টীর—জাতীয়তা। উভয় বৃত্তেরই একই কেন্দ্র; প্রভেদ কেবল একটী ক্ষুদ্রতর, অপরটী বৃহত্তর। উভয়েরই সমান উদ্দেশ্য—শ্রীবৃদ্ধি; প্রথমটীর—পাড়ার, দ্বিতীয়টীর—সমগ্র দেশের। প্রথমটী যেমন—সোপান; দ্বিতীয়টী—ছাদ। সোপান দ্বারা ছাদে উঠুন; আপনার রূপ দেখিয়া, গৌরব দেখিয়া, ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, আপনার শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, আপনার শোভা দেখিয়া, জগৎ মুগ্ধ হউন, চন্দ্র তারকা আপনার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করুন। 'আমাদিগের মাতৃভূমি রত্নগর্ভা' নাম সার্থক হউক।

আড্ডার নাম শুনিলেই যেন সাধারণতঃ লোকের মনে একটা ঘৃণাসূচক ভাব আসে। সে ভাব যেন সকলকার মন হইতে দূরীকৃত হয়। আড্ডা সকল যেন আমাদিগের দেশের নেতৃমণ্ডলি-স্বরূপে পরিণত হয়, যেন পাড়ার আদর্শ-স্থান বলিয়া গণ্য হয়—এই একান্ত প্রার্থনা। যাবতীয় আড্ডাগুলি যদি সদ্ভাবে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আর দেশের কোনও স্থানে আপদ বিপদের ভয় থাকে না। যদি কোনও পাড়ায় কাহারও কোনও আপদ

বিপদের সম্ভব হয়,ত তৎক্ষণাৎ স্থানীয় আড্ডায় খবর দিলেই যেন তিনি নির্ভয় প্রাপ্ত হন। আড্ডা যেন, দীন দরিদ্র, অনাথ-অনাথাগণের আশ্রয় হয়; আড্ডা যেন বিপন্নগণের একমাত্র শরণ-স্থল হয়; যেন দুষ্টের পরিবর্তন ও শিষ্টের আদর-স্থান হয়; ধনী নির্ধনী, গুণী ও নির্গুণ, মহৎ ও ক্ষুদ্র, বালক বা বৃদ্ধ, সকলকারই যেন প্রিয় কুটীর হয়। আড্ডা যেন পল্লীর শান্তি-নিকেতন হয়। আড্ডা যেন যাবতীয় লোককে একতাবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারেন। দেশের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিতে পারেন এবং ভারতের নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিয়া স্বজাতির জীবন রক্ষা করিতে পারেন। নিজ মাতৃভুমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন

---

# আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে ] [ ৫০৪ পৃষ্ঠার পর।

একমাসের অধিক কাল হইল মার্গেরেটায় আসিয়াছি, কিন্তু বাধ্য-পতিকে এতদিন স্থানীয় কল কারখানাদি কিছুই দেখিবার সুযোগ পাই নাই। কাজ কর্ম্ম সমাধা হইল—দেশে শীঘ্রই ফিরিয়া যাইব, সুতরাং সে সকল দেখিতে আরম্ভ করিলাম। আজ ( ২৪শে মার্চ্চ ১৯০০ ) স্থানীয় রিফাই-নারি (Refinery) দেখিতে গিয়াছিলাম। উক্ত আফিসের একটী কেরাণী বাবু বিশেষ যত্ন-সহকারে আমাকে সমুদায় দেখাইলেন এবং এক একটী করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। বাবুটী আসামী, কিন্তু আকার প্রকার বাঙ্গালীর ন্যায়। নাম—বড়ুয়া। ইতিপূর্ব্বে ডিগবয়ের নামোল্লেখ করিয়াছি। সেই স্থানে পিট্রোলিয়মের ভোয়ারা আছে এবং ইহাকে petroleum spring বা well কহে। নাগাপাহাড়ের দিকে নামডাং নামক স্থানে কোম্পানীর ঐরূপ petroleum well আছে। এই স্থান হইতে রেলে খনিজ (crude oil) তৈল রিফাইনারিতে আইসে। অগ্রে খনিজ তৈলের কথা বলি, পরে রিফাইনারির কথা বলিব। আসামের স্থানে স্থানে petroleum, coal প্রভৃতির বিস্তর খনি আছে, তাহা Geological

survey of India আফিসের বিবরণীতে দেখা যায়। ইতিপূর্ব্বে আসামী গণ তাহা জানিত। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে প্রথম কয়লার আবিষ্কার হয়। এবং সেই সময় হইতেই প্রায় তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়। স্থানীয় নদীতে পূর্ব্বে প্রায় তৈলের অংশ ভাসিয়া যাইতে দেখা যাইত এবং তাহারই গতি অনুসরণ করিয়া ইহার প্রধান স্থান নির্দ্দেশ হয়। যে স্থানে তৈল শোষণ করিবার কারখানা—ডিগ্‌বয়—তথায় রেল কোম্পানীর কারখানা আছে এবং তাহাকে drillery কহে। টিলার উপরে অনেক গুলি Pump বা well আছে। টিউব ওয়েল (tube well) মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে ১২০০।১৪০০, এমন কি ১৬০০ ফুট নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। উহার নল বা পাইপ যথা স্থানে গিয়া ঠেকিলেই ভিতর হইতে সজোরে কর্দ্দমবৎ একরূপ পদার্থ উপরে উঠিতে থাকে এবং উহাই crude oil অর্থাৎ খনিজ তৈল। সেই তৈল গাড়িতে বোঝাই করিয়া মার্গেরেটার রিফাইনারিতে আনীত হয়। crude oil আনিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রকারের গাড়ী আছে এবং উহা ঠিক ইঞ্জিনের বয়লার (boiler) সদৃশ; তবে বয়লারে ধূমউদ্গীরণকারী চিম্নী থাকে, ইহাতে তাহা নাই। ক্রুড্ অয়েল আনীত হইয়া একটা প্রায় ২০ হস্ত ব্যাস বিশিষ্ট চক্রাকার এবং তদনুরূপ উচ্চ সুবৃহৎ আধারের (tank) মধ্যে রক্ষিত হয়। ক্রমে তাহা বয়লারে উত্তপ্ত হইয়া পাইপ্ সংযোগে ভিন্ন স্থানে যায়। উত্তাপে গলিয়া গিয়া উপরাংশস্থিত ঘন তৈল paraffin tank মধ্যে আসে, আর নিম্নস্থিত অপরিস্কৃতাংশ হইতে পিচ্, আলকাতারা, বেনজিন প্রভৃতি তৈয়ার হয়। পরে উল্লিখিত ঘন তৈলকে চটের থলিতে (glunny bag) পুরিয়া (pressing machine) মধ্যে দেওয়া হয়। উক্ত মেসিনের চাপে তৈলাংশ বাহির হইয়া যায়, আর অবশিষ্টাংশ চাপ বাঁধিয়া যায়। সেই চাপ সকল পুনরায় রিফাইন হইয়া শ্লেটের ন্যায় চৌকা এবং এক বা দেড় ইঞ্চ স্থূল থান তৈয়ার হয়। থান সকল বর্ণ বিশেষে এক দুই ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

প্যারাফিন হইতে বাতি প্রস্তুত হয়। বাতিগুলি বিলাতি বাতি অপেক্ষা কিছুতে নিকৃষ্ট নহে এবং অপেক্ষাকৃত দামে সস্তা। অনেকের ধারণা যে চর্ব্বি ব্যতীত বাতি তৈয়ার হইতে পারে না, কিন্তু স্বচক্ষে দেখিলাম বিনা চর্ব্বিতে বাতি তৈয়ার হইতেছে। কল কারখানা স্বচক্ষে না দেখিলে সকল ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

কেরোসিন তৈল যাহা উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও আমেরিকা বা রুষিয়ার তৈলেরই স্থায়, তবে এখন অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না বলিয়া বাঙ্গালাদেশ বা অন্যত্র রপ্তানী হইতেছে না। সম্প্রতি তৈল বিভাগ রেলী কোম্পানীর হাত হইতে স্বতন্ত্র হইতেছে এবং নূতন বন্দোবস্তে ইহার কারখানা বিস্তৃত হইবে। তখন ইহার উৎপন্ন তৈল ও বাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। আপাততঃ জেলার মধ্যে নানাস্থানে মার্গেরিট র তৈল জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে; ইয়ুরোপ বা আমেরিকার তৈল যেরূপ টীনের চতুষ্কোণ কানস্তায় আমদানী হইয়া থাকে, এখানকার তৈল বোঝাই জন্য সেরূপ কানস্ত্রা ব্যবহার না হইয়া জিঙ্কের (zinc) পিপা ব্যবহার হয়। এই ক্ষুদ্র রিফাইনারি মধ্যে কত রকমের কল চলিতেছে, কত রকম কাজ হইতেছে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। বাতি প্রস্তুত করিবার জন্য যে প্যারাফিন প্রস্তুত হয়, তাহা বিলাতে রপ্তানি হয়; সেখানকার বাতিনির্ম্মাণকারীগণ উহা হইতে বাতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই বাতিতে চর্ব্বির 'চ' বর্গ পর্য্যন্ত নাই।

টিকক্, লিডু ও নামডাং—এই তিন স্থানে কোম্পানীর কয়লার খাদ আছে। সর্ব্ব প্রথমে টিকক্ খাদে কাজ আরম্ভ হয়,—সে প্রায় আজ পনর বৎসরের কথা এবং সে খাদ এখনও চলিতেছে এবং কত কাল চলিবে, তাহার ঠিকানা কি? এ স্থানের খনি ও রানিগঞ্জ অঞ্চলের খনির মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়—রানিগঞ্জের খনি ভূগর্ভের ভিতর নিম্নদেশে চলিয়া গিয়াছে, আর এখানকার খাদ ভূপৃষ্ঠের উপর পাহাড়ের মধ্যে। উপরে সমুদয় পর্ব্বতশ্রেণী তরুলতাপরিবৃত এবং মধ্যে মধ্যে একস্থানে ছিদ্র কাটিয়া তদভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ চলিয়া গিয়াছে।

সময়াভাবে সকল খাদগুলি দেখিতে যাইতে পারি নাই। একদিন টিককে গেলাম। টিকক্ এস্থান হইতে ৩।৪ মাইল হইবে এবং রেলে চাপিয়া যাইতে হয়। গাড়ি হইতে নামিয়া ৪।৫ মিনিট পদব্রজে যাইয়া পাহাড়টার উপর কয়লার খাদ, তাহা নিম্নভূমি হইতে ৭০০ ফুট উচ্চ এবং এতই খাড়াভাবে অবস্থিত যে, হাঁটিয়া উঠিতে নামিতে চেষ্টা করা অসম্ভব। সকলস্থানেই পাহাড়ের উপর উঠিবার বা উপর হইতে নামিবার জন্য যে রাস্তা বা পথ থাকে, তাহা পাহাড়কে বারম্বার বেষ্টন করিয়া গিয়াছে, কিন্তু উক্ত কোলিয়ারিতে উঠিবার জন্য সে ব্যবস্থা নাই। নিম্নতল হইতে প্রথম একদফা উঠিয়া কিয়ৎপরিমাণ

স্থান সমতল পাওয়া যায় এবং সেখান হইতে আর একদফা উঠিলে যথাস্থানে পৌঁছিছিতে পারা যায়। দুইটীরই উচ্চতা প্রায় সমান, তবে প্রথমটীর বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া তত খাড়া বোধ হয় না; কিন্তু শেষোক্ত অর্থাৎ উপরের পাহাড়টী বিস্তৃত অতি অল্প, এজন্য উহাকে বেশী খাড়া দেখায়, অধিক কি একটা হেলা দেওয়ালের ন্যায় বোধ হয়। পাহাড় দুইটীর অবস্থা ত এই। ইহার পরে, উঠিবার ব্যবস্থাও ততোধিক ভয়াবহ। পাহাড়ের যেমন খাড়াভাব, তাহার উপরের রেলপথও খাড়াভাবে উঠিয়াছে। রেলপথ সঙ্কীর্ণ, ২০ ইঞ্চ চওড়া; গাড়ীও অতি ক্ষুদ্র। মানুষ যাতায়াতের জন্য গাড়ীর কোন বন্দোবস্ত নাই; সব মালগাড়ী, উপরিভাগ খোলা, লোহার চাদরের বাক্স। বাক্সগুলির আকার লম্বভাগে পাঁচ ফুট, প্রস্থে তিন ফুট, এবং উচ্চতায়ও তিন ফুট, এবং বাক্সের নিম্নে চারিখানি চক্র আছে। ইহাই কয়লার গাড়ী; মানুষেও এই বাক্সে যাতায়াত করে। টিকক্ যাইবার সঙ্কল্প করিলে বন্ধু-বান্ধবগণ আমাকে গাড়ীতে উঠিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং অতি সহজে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কথাবার্ত্তায় আমার কুতূহল অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং বলা বাহুল্য বিপদের গুরুত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য আমার চেষ্টাও হইল,—বৃথা ভীত হইয়া ফল কি? আর এই পথটী যে বিশেষ নূতন ব্যাপার সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সুতরাং বাক্স মধ্যে বসিয়া উপরে উঠিব ইহাই স্থির করিলাম।

এই ক্ষুদ্র রেলপথে ইঞ্জিনের কোন সম্বন্ধ নাই; গাড়ী দড়ি কলে উঠে ও নামে। উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত পাহাড়ের গায়ে দুইটা পাশাপাশি স্বতন্ত্র লাইন আছে। তাহার একটীর উপর দিয়া কয়লা বোঝাই গাড়ী নামে ও অপরটীর উপর দিয়া নিম্ন হইতে খালি গাড়ী অথবা অপরাপর মাল পত্র বোঝাই গাড়ী উপরে উঠে। পাহাড়ের উপরে একস্থানে এক খানা চক্র ( wheel ) আছে এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া এক গাছি মোটা তারের দড়ি বা কাছি আছে। দড়ির ব্যাস এক ইঞ্চ হইবে ও উহার দুই মুখ দুই লাইনের গাড়িতে সংযুক্ত। উপরে চাকা খুলিয়া বা আলগা করিয়া দিলে, উপরের বোঝাই গাড়ী আপনা হইতে যেমন এক লাইন দিয়া হুহু করিয়া নামিয়া আসিতে থাকে, সেই টানে নিম্নাংশের পার্শ্বের রেলস্থিত খালি বা বোঝাই গাড়ী উপরে উঠিতে থাকে। উপর

হইতে বোঝাই গাড়ী যেমন বেগে নামিতে থাকে, নীচেকার গাড়ীও তেমনি বেগে উঠিতে থাকে। নূতন কোন ব্যক্তি খাদ দেখিতে গেলে তথাকার বাবুগণ যত্ন করিয়া উপরে লইয়া যান এবং আসিবার কালে সঙ্গে আসিয়া নিম্নে রাখিয়া যান। গাড়ীতে প্রথম যখন উঠি, তখন মনে মনে একটু যে শঙ্কা হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু সেটা পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ। নূতন ব্যক্তিগণ যখন যান, তখন চাকাওলাকে ( wheel man ) বলিয়া দেওয়া হয়, যেন সে ধীরে ধীরে দড়ি ছাড়ে। কাজেই সে ধীরে ধীরে দড়ি ছাড়িতে লাগিল, আর উপর হইতে ৭।৮ খানি বোঝাই গাড়ী গড় গড় করিয়া আসিতে লাগিল, আর আমরাও হুড় করিয়া উঠিতে লাগিলাম। আমি পাছে পড়িয়া যাই বা ভয় পাই, এজন্য সঙ্গের বাবুটী আমাকে বাক্সের মধ্যে বসিতে বলিলেন; আমি একটী গুড়ের নাগরী বৎ উচু হইয়া বসিলাম। গাড়ী চলিতে চলিতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'খুব জোরে চালাইতে বলুন, ব্যাপারের শেষ পর্য্যন্ত দেখা উচিত'। তিনি তথাস্তু বলিয়া হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করিলেন, উপর হইতে দড়ি অতি দ্রুত বেগে নামিতে লাগিল। ক্ষণকাল বসিয়া অসুবিধা অনুভব করায় এবং একটু ভরসা হওয়ায় বাক্সের কিনারা ধরিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পথিমধ্যে মস্তকের টুপিটা বাতাসের জোরে উড়িয়া পড়িয়া গেল। বাবুটী তখন হৈ হৈ শব্দে চীৎকার করতঃ হস্তসঞ্চালন দ্বারা রশি বাঁধিতে বলিলেন—গাড়ি থামিল, একটা লোক কুলি টুপিটা কুড়াইয়া দিয়া গেল। গাড়ি আবার চলিল—একস্তর উপরে আসিয়া থামিল। এইখানে খানিকটা সমতল ভূমি আছে, সুতরাং সেখানটা গাড়ীগুলাকে এঞ্জিনে টানাটানি করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিল। আমরা সেইটুকু—২০০ হাত আন্দাজ—ভূমি পদব্রজে গিয়া পুনরায় অন্য গাড়ীতে উঠিলাম। এখানেও সেইরূপ বন্দোবস্ত, কিন্তু এবারকার উচ্চতা অধিকতর খাড়া ( steep )। গাড়ীতে দাঁড়ান যায় না, কাজেই বসিয়া থাকিলাম। দুই মিনিটের মধ্যে দড়িকল আমাদিগকে টানিয়া উপরে তুলিল—'ইহাকেই বলে নাকে দড়ি দিয়া টানা'। ক্রমশঃ—

---

"নিজে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি কর ও যতদূর পার, অপরকে করাও,"—ইহাই মনুষ্যত্ব। আর যা কিছু কর, সমুদ্রের ফেণা মাত্র। তবে যা না ক'রলে স্থির থাকতে পার না, তা ক'রে সেরে ফেল্‌বাই ভাল।

অমঙ্গল দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা নহে। এই সংসারে এমন একটী বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ মঙ্গল বা সম্পূর্ণ অমঙ্গল বলিয়া অভিধেয় হইতে পারে। একই ঘটনা, যাহা অদ্য শুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কল্য অশুভ বোধ হইতে পারে। একই বস্তু, যাহা একজনকে অসুখী করিতেছে, তাহাই আবার অপরে সুখ উৎপাদন করিতে পারে। যে অগ্নি শিশুকে দগ্ধ করে, তাহা অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির উত্তম ভক্ষ্যান্নও রন্ধন করিতে পারে। যে স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা দুঃখবোধ অন্তরে প্রবাহিত হয়, সুখবোধও তাহারই দ্বারা অন্তরে নীত হয়। অমঙ্গল নিবারণ করিতে হইলে, মঙ্গল নিবারণই একমাত্র উপায়; উপায়ান্তর আর নাই; ইহা নিশ্চিত। মৃত্যু বারণ করিতে হইলে, জীবনও বারণ করিতে হইবে। মৃত্যুহীন জীবন ও অসুখহীন সুখ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, উভয়ের কোনটীই সত্য নহে। কারণ উভয়ই একই বস্তুর বিকাশ। গত কল্য যাহা শুভদায়ক মনে করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা করি না। যখন আমার বিগত জীবন পর্যালোচনা করি, বিভিন্ন সময়ের আদর্শ সকল বিলোকন করি, তখনই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হয়। এক সময়ে তেজঃ-শালী অশ্বযুগল চালনা করাই আমার আদর্শ ছিল। এখন এরূপ ভাবনা হয় না। শৈশবাবস্থায় মনে করিতাম, একবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারিলে আমি সম্পূর্ণ সুখী হই। অপর সময়ে মনে হইত, স্ত্রীপুত্রপরিবৃত ও প্রচুরঅর্থসম্পন্ন হইলে সম্পূর্ণ সুখী হইব। এখন এ সকল বালোচিত বুদ্ধিহীনতা জানিয়া হাস্য করি। বেদান্ত বলেন, যে সকল আদর্শ আমাদিগের দৈহিক ব্যক্তিত্ব পরিহার করিতে ভয় প্রদর্শন করে, সময়ে তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করিব। সকলেই স্ব স্ব দেহ রক্ষণ করিতে ব্যগ্র, কেহই ইহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই দেহ যথেচ্ছ কাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব, আমরা এইরূপই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু সময়ে এ বিষয়ও স্মরণ করিয়া হাস্য করিব। অতএব, যদি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সৎও নয়, অসৎও নয়, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ, অসুখও নয়, সুখও নয়, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ, এইরূপ বিষমবিরুদ্ধভাবাপন্ন হইল, তবে বেদান্তের আবশ্যকতা কি? অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মমত সকলেরই বা আবশ্যকতা কি? বিশেষতঃ, শুভকর্ম্মাদি করিবারই বা প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, কারণ লোকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিবে, যদি শুভকর্ম্ম সম্পাদনে যত্নবান্ হইলে, একই অমঙ্গল বর্ত্তমান থাকে এবং সুখোৎপাদনে

যত্নবান্ হইলে, পর্ব্বত সদৃশ অশ্রুরাশি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এ সকলের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যায়—প্রথমতঃ, দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যে তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে, কারণ স্বয়ং সুখী হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব জীবনে শীঘ্র বা বিলম্বে হউক ইহার যথার্থতা বুঝিয়া থাকি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকে কিছু সত্বর, মলিনবুদ্ধি কিছু বিলম্বে ইহা বুঝিতে পারেন। মলিনবুদ্ধি লোক উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্প যন্ত্রণা পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়তঃ, ইহা না হইলেও, যদিও আমরা জানি, এ জগৎ কেবল সুখপূর্ণ হইবে, দুঃখ থাকিবে না, এরূপ সময় কখনই আসিবে না, তথাপি আমাদিগকে এই কার্য্যই করিতে হইবে। যদি দুঃখ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তথাপিও আমরা সে সময়ে আমাদের কার্য্য করিব। এই উভয় শক্তি জগৎ জীবন্ত রাখিবে, যতদিন না আমরা স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হইব এবং এই মৃৎপুত্তলিকা-নির্ম্মাণ পরিত্যাগ করিব। সত্যই আমরা চিরকাল মৃৎপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিতেছি। আমাদের এ শিক্ষা লাভ করিতে হইবে; ইহা শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল যাইবে। বেদান্ত বলিতেছেন—অনন্তই সান্ত হইয়াছেন। জর্ম্মনদেশে, এই ভিত্তির উপর দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ চেষ্টা এখনও ইংলণ্ডে হইতেছে। কিন্তু এই সকল দার্শনিকদিগের মত বিশ্লেষণ করিলে এই পাওয়া যায় যে, অনন্তস্বরূপ আপনাকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে, অনন্ত যথাকালে আপনাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব, নিরপেক্ষাবস্থা বিকশিতাবস্থা অপেক্ষা নিম্নতর, কারণ বিকশিতাবস্থায় নিরপেক্ষস্বরূপ আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। যতকাল অনন্তস্বরূপ আপনাকে সম্পূর্ণ বহিঃনিক্ষেপ করিতে না পারিতেছেন, আমাদিগকে ততকাল এই অভিব্যক্তির উত্তরোত্তর সাহায্য করিতে হইবে। ইহা অতি শ্রুতিমধুর এবং অনন্ত, বিকাশ, ব্যক্ত প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সান্ত কিরূপে অনন্ত হইতে পারে, এক কিরূপে দুই কোটী হইতে পারে, এ সিদ্ধান্তের ন্যায়ানুগত মূলভিত্তি কি, তাহা দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা সোপাধিক হইয়া এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এ স্থলে সকলই সীমাবচ্ছিন্ন থাকিবেই। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে, তাহাকেই স্বতঃই সীমাবৃত হইতে হইবে, অতএব সসীমের অসীমত্ব-প্রাপ্তি নিতান্ত মিথ্যা। ইহা হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, বেদান্ত বলিতেছেন, সত্য বটে নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা আপনাকে সান্তস্বরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এরূপ সময় আসিবে, যখন এই উদ্যোগ অসম্ভব বুঝিয়া ইহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। এই পশ্চাৎপদ হওয়াই যথার্থ ধর্ম্মের আরম্ভ। বৈরাগ্যই ধর্ম্মের সূচনা। আধুনিক ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্য বিষয়ে কথা কহা অত্যন্ত কঠিন। আমেরিকাতে আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আগমনপূর্ব্বক বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। ইংলণ্ডীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ এইরূপই হয়ত বলিবেন। কিন্তু বৈরাগ্য ও ত্যাগ এ জীবনের কেবল একমাত্র সত্য বস্তু। প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি উপায়ান্তর প্রাপ্ত হইতে পার। অনন্তর কালসমাগমে অন্তরাত্মা জাগরিত হন, এই দীর্ঘ বিষাদময় স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হইয়া উঠেন; শিশু খেলা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার জননীর নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হয়। ইহা বুঝিতে পারে, "কামনার উপভোগে বাসনার নিবৃত্তি হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কেবল বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে।" "ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"* এইরূপ কি ইন্দ্রিয়বিলাস, কি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাজনিত আনন্দ, কি মানবাত্মা উপভোগ্য সর্ব্ববিধ সুখ, সমস্তই মিথ্যা, সকলই মায়াধীন। সকলই পাশবদ্ধ, আমরা ইহা অতিক্রম করিতে পারি না। ইহার মধ্য দিয়া অনন্ত কাল ধাবিত হইতে পারি, কিন্তু শেষ পাইব না; এবং যখনই সুখকণা পাইবার জন্য চেষ্টা করিব, দুঃখরাশি আমাদের পৃষ্ঠদেশ পীড়িত করিবে। ইহা কি ভয়ানক অবস্থা! যখন আমি ইহা ভাবিতে চেষ্টা করি, আমার নিঃসংশয় অনুভূতি হয়, এই মায়াবাদ, সকলই মায়া—এই বাক্যই ইহার কেবল মাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা। এ সংসারে কি দুঃখরাশিই বর্ত্তমান রহিয়াছে! যদ্যপি আপনারা বিবিধ জাতিদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, একজাতি তাহার দোষভাগ এক উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অপরে স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সেই একই দোষ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যদ্যপি ইহাকে ক্রমশঃ স্বল্প করিয়া একাংশে নিবদ্ধ করা যায়, অপরাংশে রাশি রাশি অশুভ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার এইরূপই গতি। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে কথঞ্চিৎ সতীত্বধর্ম্ম উৎপাদনার্থ,

তাঁহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতীকে বাল্যবিবাহ দ্বারা অধো-গামী করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না এই যে, বাল্য-বিবাহ হিন্দুজাতীকে সতীত্বধর্ম্মে ভূষিত করিয়াছে। তুমি কি ইচ্ছা কর? যদ্যপি জাতীকে সতীত্বধর্ম্মে সমধিক ভূষিত করিতে চাও, তাহা হইলে এই ভয়ানক বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রী পুরুষকে শরীর সম্বন্ধে অধোগামী করিতে হইবে। অপরদিকে তুমিও কি নিজপক্ষে বিপদশূন্য? কখনই না। কারণ সতীত্বই জাতীর জীবনী-শক্তি। তুমি কি ইতিহাসে দেখ নাই যে, জাতীর মৃত্যুচিহ্ন অসতীত্বের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। যখন ইহা প্রবেশ করে, জাতীর অবসানও সম্মুখে দেখা যায়। এই সকল দুঃখের মীমাংসা কোথায় পাইব? যদি পিতা মাতা নিজ সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করেন, তাহা হইলে এই অনুরাগ-দোষ নিবারিত হয়। ভারতের দুহিতৃগণ ভাবুকতা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকুশলা। তাহাদের জীবনে কল্পনাপ্রিয়তা অধিক স্থান পায় না। অপিচ, যদ্যপি লোকে আপনারা স্বামী ও স্ত্রী নির্ব্বাচন করে, তাহাতে অধিক সুখ আনয়ন করে না। ভারতীয় নারীগণ বেশ সুখী। স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরের মধ্যে কলহ প্রায়ই হয় না। পক্ষান্তরে ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌ প্রদেশে, যেখানে স্বাধীনতার আতিশয্য বিরাজমান, সুখী পরিবার প্রায় নাই। এরূপ সামান্য সংখ্যক বিদ্যমান থাকিলেও, অসুখী পরিবার ও অসুখকর বিবাহের সংখ্যা এত অধিক, যে বর্ণনাতীত। আমি যে সভায় গমন করিয়াছি, উপস্থিত তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক তাঁহাদের স্বামী ও সন্তানকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এইরূপই সর্ব্বত্র। ইহা কি প্রকাশ করিতেছে? প্রকাশ করিতেছে যে, এই সকল আদর্শ দ্বারা অধিক সুখ উপার্জ্জিত হয় নাই। আমরা সকলই সুখের জন্য উৎকট চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু প্রাপ্ত না হইতেই, অপর দিকে দুঃখ উপস্থিত হইতেছে।

তবে কি আমরা শুভকর কর্ম্ম করিব না? হাঁ, পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উৎসাহান্বিত হইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান-শিক্ষা আমাদের উদ্ধত বাড়াবাড়ি ও এক-ঘেয়েমি (Fanaticism) দূর করিবে। ইংরাজ আর উত্তেজিত হইয়া হিন্দুকে, "ওঃ পৈশাচিক হিন্দু! নারীগণের প্রতি কি অসৎ ব্যবহার করে", বলিয়া অভিশপ্ত করিবেন না। তিনি বিভিন্ন জাতির প্রথা সকল মান্য করিতে শিক্ষা করিবেন। এক ঘেয়েমি অল্প হইবে। কার্য্য অধিক হইবে। একঘেয়ে

লোকেরা কার্য্য করিতে পারে না। তাহারা শক্তির তৃতীয়াংশ বৃথা ব্যয়িত করে। যাঁহাকে ধীর প্রশান্তচিত্ত 'কাজের লোক' বলিয়া অবিহিত করা যায়, তিনিই কর্ম্ম করেন। নিরর্থকবাক্যপটু এক-ঘেয়ে লোকেরা কিছুই করিতে পারে না। অতএব, এই সংস্কার হইতে কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ঘটনাচক্র এইরূপ জানিয়া তিতিক্ষা অধিক হইবে। দুঃখ ও অমঙ্গলের দৃশ্য আমাদিগকে সমতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না ও ছায়ার পশ্চদ্ধাবিত করাইবে না। সুতরাং, সংসার-গতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাউক, সকল মনুষ্যই দোষশূন্য হইবে, তার পর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং সেই সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে; উদ্ভিদদিগেরও গতি ঐরূপ। ইহাই কেবল কিন্তু সুনিশ্চিত—এই মহতী নদী সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে; তৃণ ও পত্র খণ্ড সকল স্রোতে ভাসমান রহিয়াছে এবং ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন প্রত্যেক খণ্ড সেই অনন্ত বারিধি বক্ষে সঙ্ঘিত হইবে। অতএব, এই জীবন সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ, হাস্য ও ক্রন্দনের সহিত যে সেই অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা নিশ্চিত এবং ইহা কেবল সময় সাপেক্ষ যখন তুমি, আমি, জীব উদ্ভিদ ও সামান্য জীবনকণা পর্য্যন্ত, যে যেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সকলই সেই অনন্ত জীবন সমুদ্রে—মুক্তি ও ঈশ্বরে আসিয়া পড়িবে।

আমি পুনরায় বলিতেছি, বেদান্ত সুখাশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে। এ সংসার কেবল মঙ্গলময় বা কেবলই অমঙ্গলময়, এরূপ মত ইহা ব্যক্ত করে না। ইহা বলিতেছে, আমাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয়েরই সমান মূল্য। ইহারা এইরূপে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সংসার এরূপ জানিয়া তুমি সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম্ম কর। কি জন্য কর্ম্ম করিব? যদি ঘটনাচক্রই এইরূপ, আমরা কি করিব? অজ্ঞেয়বাদী হই না কেন? বর্ত্তমান অজ্ঞেয়বাদীরাও জানেন, এ রহস্যের মীমাংসা নাই, বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে—এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই। অতএব সন্তুষ্ট হইয়া সকল উপভোগ কর। এস্থলেও অতি অসঙ্গত মহাভ্রম রহিয়াছে। তুমি যে জীবন দ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই জীবন বিষয়ক জ্ঞান কিরূপ? তুমি কি জীবন বলিতে ইন্দ্রিয় বুঝ? ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানে আমরা পশু হইতে সামান্যই ভিন্ন। আমি

বিশ্বাস করি, এ স্থানে উপস্থিত কাহারও আত্মা ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ নহে। অতএব আমাদের বর্ত্তমান জীবন ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানাপেক্ষা আরও কিছু অধিক বুঝায়। আমাদের সুখদুঃখানুভাবক মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গস্বরূপ; আর সেই মহাদর্শ ও পূর্ণতার অভিমুখ কঠোর চেষ্টা কি আমাদিগের জীবনের উপাদান নহে? অজ্ঞেয়বাদীদিগের মতে আমাদের বর্ত্তমান জীবনরক্ষায় যত্নবান্ থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু জীবন বলিলে, আমাদিগের সামান্য সুখ দুঃখের সহিত আমাদিগের জীবনের অস্থি-মজ্জাস্বরূপ এই আদর্শ অন্বেষণের, এই পূর্ণতাভিমুখ প্রবল চেষ্টাই বুঝায়। আমাদিগের ইহাই প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব আমরা অজ্ঞেয়-বাদী হইতে পারি না এবং অজ্ঞেয়বাদীর প্রত্যক্ষ সংসার লইতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদী জীবনের শেষোক্ত উপাদান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশিষ্টাংশই সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এই আদর্শ জ্ঞানের অগোচর জানিয়া, ইহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করেন। এই স্বভাব, এই জগৎ, ইহাকেই মায়া বলে। বেদান্তমতে ইহাই প্রকৃতি। কিন্তু কি দেবোপাসনা, প্রতীকো-পাসনা, বা দার্শনিক চিন্তা অবলম্বন পূর্ব্বক আচরিত, অথবা, কি দেবচরিত, পিশাচচরিত, প্রেতচরিত, সাধুচরিত,ঋষিচরিত,মহাত্মাচরিত বা অবতারচরিতের সাহায্যে অনুষ্ঠিত, অপরিণত বা উন্নত ধর্ম্মমত সকলের একই উদ্দেশ্য। সকল ধর্ম্মই ইহাকে, এই বন্ধ কে অতিক্রম করিতে অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতেছে। এক কথায় সকলেই স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্টা করি-তেছে। জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক মানব জানিয়াছেন, তিনি বন্দী। তিনি যাহা হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা নন। যে সময়ে যে মুহূর্ত্তে তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেই কালে তিনি ইহা শিক্ষা করিয়া-ছেন। তখনই তিনি অনুভব করিয়াছেন—তিনি বন্দী। তিনি আরও বুঝিয়াছেন, এই সীমা-শৃঙ্খলিত হইয়া তাঁহার অন্তরে কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহেরও অগম্য স্থানে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছেন। দুর্দ্দান্ত, নৃশংস, আত্মীয়-গৃহসমীপে গুপ্তাবস্থিত, হত্যা ও তীব্র সুরাপ্রিয় মৃত পিতৃ বা অন্য ভূত-যোনিতে শ্রদ্ধাবান্, অতি নিম্নতম ধর্ম্মমত সকলেও আমরা সেই একরূপ স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাই। যাঁহারা দেবতার উপাসন প্রিয়, তাঁহারা সেই সকল দেবতাতে আপনাপেক্ষা সমধিক স্বাধীনতা দেখিতে পান। দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও, দেবতারা গৃহপ্রাচীর মধ্য দিয়া আসিতে পারেন;

প্রাচীর তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। এই স্বাধীনতা ভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে সগুণ ঈশ্বরাদর্শে উপনীত হয়। ঈশ্বর মায়াতীত —ইহাই আদর্শের কেন্দ্রস্বরূপ। আমি যেন সম্মুখে কোন স্বর উত্থিত হইতে শুনিতেছি, যেন অনুভব করিতেছি, ভারতের সেই প্রাচীন আচার্য্যগণ অরণ্যাশ্রমে এই সকল প্রশ্ন বিচার করিতেছেন, বৃদ্ধ ও পবিত্রতম ঋষিশ্রেষ্ঠগণ উহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছেন—কিন্তু একটী বালক সেই সভামধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ পাইয়াছি, যিনি অন্ধকারের অতীত তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায়।"—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ ৫ ॥

২য় অধ্যায়।

*　　*　　*

*　　*　　*

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্,
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ৮ ॥

৩য় অধ্যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

একই উপনিষদ্ হইতে আমরা এই উক্তিও পাইতেছি। মায়ার কথা ইহাতেই রহিয়াছে। ভয়ঙ্কর কথা! মায়ার মধ্য দিয়া কার্য্য করা অসম্ভব। যিনি বলেন, আমি এই নদীতীরে বসিয়া থাকি, যখন সমস্ত জল সমুদ্রে গিয়া মিশিবে, তখন আমি নদী পার হইব, তাঁহার বাক্য যেমন মিথ্যা, যিনি বলেন যতদিন না পৃথিবী পূর্ণ মঙ্গলময় হয়, ততদিন কার্য্য করিয়া অনন্তর পৃথিবী সম্ভোগ করিব, তাঁহার কথাও তদ্রূপ মিথ্যা। উভয়ের কোনটীই হইবে না। মায়ার মধ্য দিয়া পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধ গমনই পথ। এ কথাও শিক্ষা করিতে হইবে। আমরা প্রকৃতির সাহায্যকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাহার প্রতিবাদী হইয়াই জন্মিয়াছি। আমরা বন্ধনের কর্ত্তা হইয়া, আপনাদিগকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিতেছি। ইএবাটী কোথা হইতে আসিল? প্রকৃতি ইহা প্রদান করে নাই। প্রকৃতি

বলিতেছে—‘যাও বনে গিয়া বাস কর।’ মানব বলিতেছে, ‘আমি বাটী নির্ম্মাণ করিব, প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিব।’ সে তাহাই করিতেছে। মানবজাতির ইতিহাস প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত যুদ্ধই প্রদর্শন করে এবং মনুষ্যই অবশেষে বিজয়ী হয়। অন্তর্জগতে আসিয়া দেখ, সেখানেও সেই যুদ্ধ চলিয়াছে; ইহা পাশব মানব ও আধ্যাত্মিক মানবের সংগ্রাম; আলোক ও অন্ধকারে সংগ্রাম। মানব এখানেও বিজেতা। মানব এই স্বাধীনতা পদবী প্রাপ্ত হইতে প্রকৃতির মধ্য দিয়া আপনার গন্তব্য পথ পরিষ্কার করেন। আমরা এতদূর মায়ার বর্ণনাই দেখিয়াছি। এই মায়া অতিক্রম করিয়া বেদান্তবিদ্ পণ্ডিতেরা এমন কিছু জানিয়াছেন, যাহা মায়াধীন নহে এবং যত্মপি আমরা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারি, আমরাও মায়াপারে যাইব। ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্ম্মেরই ইহা সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু বেদান্তমতে ইহা ধর্ম্মের আরম্ভ, পর্য্যবসান নহে। যিনি বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, যিনি মায়াধিষ্ঠিত, মায়া বা প্রকৃতির কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই সগুণ-ঈশ্বর-বিজ্ঞান এই বেদান্তমতের শেষ নহে। এই জ্ঞান ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়াছে, অবশেষে বেদান্ত দেখিয়াছেন, যাঁহাকে বহিঃস্থিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি নিজেই সেই, তিনি প্রকৃত অন্তরেই ছিলেন। যিনি আপনাকে বদ্ধভাবাপন্ন মনে করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মুক্তস্বরূপ।

---

# মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

(লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা।)

মানুষ এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে এতদূর আসক্ত যে, সে সহজে উহা ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু সে এই বাহ্য-জগৎকে যতদূর সত্য ও সার বলিয়া বোধ করুক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন সময় আইসে, যখন তাহাদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়—জগৎ কি সত্য? যে ব্যক্তি তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্রও সময় পান না, যাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই কোন না কোনরূপ বিষয়-ভোগে নিযুক্ত, মৃত্যু তাঁহারও নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়

'ব্রহ্মার্পণং' ইত্যাদি শ্লোকের সম্যগ্‌দর্শনরূপ যজ্ঞের উপক্ষেপ করা যাইতেছে, (ইহার প্রয়োজন) 'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা এই জ্ঞানযজ্ঞের স্তুতি (ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে) ॥ ২৫ ॥

---

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—অন্যে শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি, অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ।—যোগিগণ সংযমরূপ অগ্নিসমূহে ইন্দ্রিয় সকলের হবন করিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়ের হবন করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

ভাষ্য।—শ্রোত্রাদীনীতি। শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি অন্যে যোগিনঃ সংযমাগ্নিষু প্রতীন্দ্রিয়ং সংযমোভিদ্যত ইতি বহুবচনং। সংযমা এব অগ্নয়স্তেষু জুহ্বতি ইন্দ্রিয়-সংযমমেব কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ। শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি, ইন্দ্রিয়াণ্যেব অগ্নয়স্তেষু ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং হোমং মন্যন্তে ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"শ্রোত্রাদীনি" ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) অপর যোগীগণ সংযমরূপ অগ্নিসমূহে (প্রতি ইন্দ্রিয় সংযম ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া সংযমাগ্নিষু এইস্থানে বহুবচন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে) শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের হবন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়সংযমই করিয়া থাকেন। অপর ব্যক্তিগণ শব্দ প্রভৃতি বিষয় সমূহের ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নি সকলে হবন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ) শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিবহের দ্বারা অনিষিদ্ধ বিষয়সমূহের ভোগকে হোম বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

---

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—অপরে সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জ্ঞানদীপিতে আত্ম-সংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ।—অপর যোগিগণ জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত আত্মসমাধিযোগরূপ

অগ্নিতে সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার এবং প্রাণবায়ুর ব্যাপার সকলের হবন করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চসর্ব্বাণীতি। সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণি ইন্দ্রিয়-কর্ম্মাণি,তথা প্রাণকর্ম্মাণি প্রাণোবায়ুরাধ্যাত্মিকস্তৎকর্ম্মাণি আকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি তানি চ অপরে আত্মসংযমযোগাগ্নাবাত্মানি সংযম আত্মসংযমঃ সএবযোগাগ্নিঃ তস্মিন্ আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি জ্ঞানদীপিতে স্নেহেনেব প্রদীপিতে বিবেকবিজ্ঞানেন উজ্জলভাবমাপাদিতে প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সর্ব্বাণীত্যাদি শ্লোকের অর্থ। ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়াকে ইন্দ্রিয়কর্ম্ম বলা যায়, আধ্যাত্মিক বায়ুই প্রাণশব্দের অর্থ, সেই প্রাণের কর্ম্ম ( অর্থাৎ ) আকুঞ্চন প্রসারণ প্রভৃতিকেই প্রাণের কর্ম্ম বলা যায়। সেই সকল ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্ম নিচয়ের আত্মাতে সংযমরূপ যোগাগ্নিতে, অপর যোগিগণ হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই আত্ম-সংযম যোগাগ্নি জ্ঞানের দ্বারা দীপিত ( অর্থাৎ ) তৈলের ন্যায় বিবেকবিজ্ঞানের দ্বারা উজ্জলীকৃত ( তাহারা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নিচয়কে জ্ঞানপ্রদীপিত আত্মসমাধিতে প্রকৃষ্টরূপে বিলীন করিয়া দেন ইহাই তাৎপর্য্য ) ॥ ২৭ ॥

---

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—( কেঽপি ) দ্রব্যযজ্ঞাঃ, ( কেঽপি ) তপোযজ্ঞাঃ। তথা অপরে যোগযজ্ঞাঃ, ( তথা কেচন ) সংশিতব্রতা যতয়ঃ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ ( ভবন্তি ) ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ।—কোন কোন তীব্রব্রত যতিগণ দ্রব্যত্যাগকেই যজ্ঞ বোধ করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদিগকে "দ্রব্যযজ্ঞ" বলা যায়। যাহারা যজ্ঞবুদ্ধিতে তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই তপস্বীগণকে "তপোযজ্ঞ" বলা যায়। প্রাণায়ামপ্রভৃতি যোগকেই যজ্ঞ বুদ্ধিতে যাহারা অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে "যোগযজ্ঞ" বলা যায়। যথাবিধি বেদাভ্যাসকে যজ্ঞ বুদ্ধিতে যাহারা অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে "স্বাধ্যায়যজ্ঞ' বলা যায়। এই প্রকার যাহারা শাস্ত্রীয় অর্থের জ্ঞানকেই যজ্ঞবুদ্ধিতে অনুশীলন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে "জ্ঞানযজ্ঞ" বলা যায় ॥ ২৮ ॥

ভাষ্য।—দ্রব্যেতি। দ্রব্যযজ্ঞাস্তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্ব্বন্তি যে

তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তপোযজ্ঞা, যে তপস্বিনস্তে তপোযজ্ঞা, যোগযজ্ঞাঃ প্রাণায়াম-প্রত্যাহারাদিলক্ষণো যোগো যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, তথাপরে স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ, স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসোযজ্ঞোযেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, জ্ঞানযজ্ঞাঃ জ্ঞানং শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাস্তে জ্ঞানযজ্ঞা, যতয়ো যতনশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ সম্যক্‌শিতানি তনূকৃতানি তীক্ষ্ণীকৃতানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ।। ২৮।।

ভাষ্যানুবাদ।—দ্রব্যযজ্ঞ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। 'দ্রব্যযজ্ঞ' তীর্থসমূহে যজ্ঞবুদ্ধিতে যাহারা দ্রব্য দান করিয়া থাকে, তাহারাই দ্রব্যযজ্ঞ ( শব্দের দ্বারা এইস্থলে বোধিত হইতেছে ), 'তপোযজ্ঞ' যাহারা তপস্বী তাহারা তপোযজ্ঞ (শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে ), 'যোগযজ্ঞ' প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার প্রভৃতি যোগই যাহাদের যজ্ঞ, তাহারা যোগযজ্ঞ ( শব্দের প্রতিপাদ্য। ) এই প্রকার অপর (কতকগুলি) "স্বাধ্যায়যজ্ঞ" ও "জ্ঞানযজ্ঞ"; স্বাধ্যায় ( অর্থাৎ ) ঋগ্‌, যজুঃ প্রভৃতি বেদের যথাবিধি অভ্যাসই যাহাদের যজ্ঞ তাহারাই স্বাধ্যায়যজ্ঞ, এই প্রকার শাস্ত্রার্থের জ্ঞানই যাহাদের যজ্ঞ, তাহারা জ্ঞান-যজ্ঞ; ( ইহারা সকলেই ) যতি অর্থাৎ বিহিতফলের জন্য যথাবিধি প্রযত্ন-পরায়ণ এবং সংশিতব্রত, যাহাদের ব্রত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাহারাই সংশিতব্রত ( শব্দের প্রতিপাদ্য )॥ ২৮॥

---

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯॥

অন্বয়।—অপরে প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (তথা অপরে) অপানে প্রাণং, ( তথা অপরে ) প্রাণে অপানং ( চ ) জুহ্বতি॥ ২৯॥

মূলানুবাদ।—অপর যোগীগণ প্রাণ ও অপানের গতিকে রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হন এবং অপর যোগীগণ অপানে প্রাণের হবন করিয়া থাকেন, এই প্রকার কেহ প্রাণে অপানের হবন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ) রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই অবয়বত্রয়ে বিভক্ত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন॥ ২৯॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ অপান ইতি। অপানে অপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি প্রাণং প্রাণবৃত্তিং পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। প্রাণেঽপানং তথাপরে জুহ্বতি, রেচকাখ্যং চ প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যেতৎ। প্রাণাপান-গতী মুখনাসিকাভ্যাং বায়োর্নির্গমনং প্রাণস্যগতিস্তদ্বিপর্য্যয়েণ অধোগমন-

মপানস্তু তে প্রাণাপানগতী এতে রুদ্ধা নিরুধ্য প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়াম-তৎপরাঃ কুম্ভকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও অপান ইত্যাদি। অপানে (অর্থাৎ) অপান বায়ুর বৃত্তিতে প্রাণ (অর্থাৎ) প্রাণবায়ুবৃত্তির হবন (অর্থাৎ) প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন, পূরক নামক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন, ইহাই অর্থ। এই প্রকার অপর যোগীগণ প্রাণে অপানের হবন করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপ (অপর কেহ কেহ) প্রাণ ও অপানের গতির নিরোধ করিয়া প্রাণায়ামতৎপর হইয়া থাকেন, কুম্ভক নামে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহাই অর্থ। মুখ ও নাসিকার দ্বারা (অভ্যন্তরস্থিত) বায়ুর নির্গমনকেই প্রাণের গতি কহে, তাহারই বিপরীতভাবে বায়ুর অধোগমনকে অপানের গতি কহে। (এই দ্বিবিধ গতিরই নিরোধ করিয়া কুম্ভক প্রাণায়াম করিতে হয়) ॥ ২৯ ॥

---

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—অপরে (যোগিনঃ) নিয়তাহারাঃ (সন্তঃ) প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি। এতে সর্ব্বেঽপি যজ্ঞবিদঃ (অতএব) যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ (ভবন্তি) ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ।—অপর (কোন যোগীগণ, আহারের নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাণবায়ুতে প্রাণের (বায়ু বিশেষের) হবন করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্ এবং যজ্ঞের দ্বারা পাপ সকলের বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ অপর ইতি। অপরে নিয়তাহারাঃ নিয়তঃ পরিমিত আহারো যেষাং তে নিয়তাহারাঃ সন্তঃ প্রাণান্ বায়ুভেদান্ প্রাণেষ্বেব জুহ্বতি। যস্য যস্য বায়োর্জয়ঃ ক্রিয়তে ইতরান্ বায়ুভেদান্ তস্মিন্ তস্মিন্ জুহ্বতি, তে তত্র প্রবিষ্টা ইব ভবন্তি। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ যজ্ঞৈর্যথোক্তৈঃ ক্ষপিতাঃ নাশিতাঃ কল্মষাঃ যেষাং তে যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও অপরে ইত্যাদি। "নিয়তাহার" নিয়ত অর্থাৎ পরিমিত আহার যাহারা করে, তাহারাই নিয়তাহার, অপর যোগিগণ নিয়তাহার হইয়া প্রাণনামক বায়ু বিশেষকে প্রাণবায়ুসমূহে হবন করিয়া থাকে। যে যে বায়ুকে বশীভূত করে, সেই সেই বায়ুতে অন্যান্য বায়ুর হবন করিয়া থাকে,

(অর্থাৎ) সেই সকল বায়ু সেই বশীভূত বায়ুর মধ্যে প্রবিষ্টবৎ হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্‌ এবং যজ্ঞক্ষপিতকল্মষ অর্থাৎ যথোক্ত যজ্ঞ সমূহের দ্বারা ইহাদের সকল পাপ বিনাশিত হইয়াছে॥ ৩০॥

---

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজোযান্তি ব্রহ্মসনাতনম্।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১॥

অন্বয়।—যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি, হে কুরুসত্তম! অযজ্ঞস্য অয়ং লোকো নাস্তি, অন্যঃ কুতঃ (স্যাৎ)?॥ ৩১॥

মূলানুবাদ।—যাহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করিয়া থাকে, তাহারা সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। হে কুরুসত্তম! যে ব্যক্তি (এই কয়প্রকার যজ্ঞের মধ্যে একটী যজ্ঞও) করে না, তাহার এই লোকই শুভ হয় না, উৎকৃষ্ট পরলোক তাহার কি প্রকারে হইতে পারে?॥ ৩১॥

ভাষ্য।—এবং যথোক্তান্‌ যজ্ঞান্‌ নির্ব্বর্ত্ত্য যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যজ্ঞানাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং চ তদমৃতঞ্চেতি যজ্ঞশিষ্টামৃতং তদ্‌ভুঞ্জতইতি যজ্ঞশিষ্টামৃত-ভুজো, যথোক্তান যজ্ঞান কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন কালেন যথাবিধিচোদিতমমৃতাখ্যমন্নং ভুঞ্জতইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজোযান্তি গচ্ছন্তি ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনং মুমুক্ষব-শ্চেৎ কালাতিক্রমাপেক্ষয়া ইতি সামর্থ্যাদবগম্যতে। নায়ং লোকঃ সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণোঽপ্যস্তি যথোক্তানাং যজ্ঞানামেকোঽপি যজ্ঞোযস্য নাস্তি সোঽযজ্ঞস্তস্য কুতোঽন্যো বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকার যথোক্ত যজ্ঞ সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া (যাহারা) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুক্‌ (হয়), (অর্থাৎ) যজ্ঞ সকলের অবশিষ্টকে যজ্ঞশিষ্ট বলা যায়, তাহাই অমৃত, সেই অমৃততুল্য যজ্ঞশিষ্টামৃত যাহারা ভোজন করে, তাহারাই যজ্ঞশিষ্টামৃতভুক্‌। (অর্থাৎ) যথোক্ত যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিয়া অবশিষ্টকালে যথাবিধি বিহিত অন্ন যাহারা ভোজন করিয়া থাকে, তাহারা "সনাতন" চিরন্তন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (অর্থাৎ) তাহারা যদি মোক্ষকামী হয়, তাহা হইলে বিহিতকাল অতিক্রম করিয়া ক্রমে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে, ইহা যোগ্যতাবলে বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই পূর্ব্বোক্ত যথোক্ত যজ্ঞসমূহের মধ্যে কোন একটী যজ্ঞের যে ব্যক্তি অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে অযজ্ঞ কহে, হে কুরুসত্তম! অযজ্ঞব্যক্তির এই সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ

লোকই নাই, বিলক্ষণ যজ্ঞাদি দ্বারা যাহার অর্জ্জন হয়, সেই স্বর্গাদি লোক তাহার হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ॥ ৩১ ॥

---

এবং বহুবিধাযজ্ঞাবিততা ব্রহ্মণো মুখে।

কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্ এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—ব্রহ্মণঃ (বেদস্য) মুখে (দ্বারেণ) এবং (যথোক্তাঃ) বহুবিধাঃ যজ্ঞা বিততাঃ (প্রকাশিতাঃ), তান্ সর্ব্বান্ (যজ্ঞান্) কর্ম্মজান্ (ক্রিয়াসম্ভবান্) বিদ্ধি, এবং জ্ঞাত্বা (বিদিত্বা) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তিং প্রাপ্স্যসে) ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ।—বেদের দ্বারা এইপ্রকার বহুবিধ যজ্ঞ প্রকাশিত হইয়াছে, এই সকল যজ্ঞই কর্ম্মজ, ইহা জান; এই প্রকার জানিয়া অশুভ হইতে মোক্ষলাভ করিতে পারিবে ॥ ৩২ ॥

ভাষ্য।—এবমিতি। এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞা বিততা বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে দ্বারে বেদদ্বারেণাবগম্যমানা ব্রহ্মণোমুখে বিততা উচ্যন্তে। তদ্‌যথা বাচিহি প্রাণং জুহুম ইত্যাদয়ঃ। কর্ম্মজান্ কায়িকবাচিক-মানসিককর্ম্মোদ্‌ভবান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্ অনাত্মজান্। নির্ব্ব্যাপারোহ্যাত্মা। অতএবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে অশুভাৎ। ন মদ্‌ব্যাপারাইমে নির্ব্ব্যাপারোহহমুদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বা অস্মাৎ সম্যগ্‌দর্শনাৎ মোক্ষ্যসে সংসারবন্ধনা-দিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এবমিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। এইরূপ যথোক্ত বহুপ্রকার যজ্ঞ, "ব্রহ্ম" বেদের "মুখে বিতত" দ্বারে বিস্তীর্ণ আছে। বেদের মুখে বিতত আছে, ইহার তাৎপর্য্য এই হইতেছে যে, বেদের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তমী বিভক্তির এই প্রকার হেতুতারূপ বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন "বাচি প্রাণং জুহুম" ইত্যাদি, (বাক্যে প্রাণের হবন করিয়া থাকি)। এই সকল যজ্ঞকেই কর্ম্মজ (বলিয়া) জানিবে (অর্থাৎ) কায়িক, বাচিক ও মানসক্রিয়া দ্বারাই ঐ সকল যজ্ঞের সিদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং এ সকল যজ্ঞ আত্মজন্য নহে, কারণ আত্মা নিষ্ক্রিয়। এই কারণেই (বলিতেছেন যে), এই প্রকার জানিয়া অশুভ হইতে মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। এই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান আমার ব্যাপার নহে, আমি নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, এই

প্রকার জানিয়া এই সম্যগ্ দর্শনের প্রসাদে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, ইহাই অর্থ ॥ ৩২ ॥

---

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—হে পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ (হবিরাদিসাধ্যাৎ) যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্, হে পার্থ! সর্ব্বং কর্ম্ম অখিলং (অপ্রতিবন্ধং যথাস্যাৎ তথা) জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ।—হে শত্রুতাপন! দ্রব্যদ্বারা নিষ্পাদিত যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, কারণ হে পার্থ! সকলপ্রকার কর্ম্মই সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য।—ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি শ্লোকেন সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদিতং, যজ্ঞাশ্চানেক উপদিষ্টাস্তৈঃ সিদ্ধপুরুষার্থপ্রয়োজনৈর্জ্ঞানং স্তূয়তে। কথং? শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ দ্রব্যসাধনসাধ্যাৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞো হে পরন্তপ, দ্রব্যময়োহি যজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকো, জ্ঞানযজ্ঞোন ফলারম্ভকঃ, অতঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ। কথং যতঃ সর্ব্বং কর্ম্ম সমস্তমখিলমপ্রতিবদ্ধং পার্থ জ্ঞানে মোক্ষসাধনে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে পরিসমাপ্যতেঽন্তর্ভবতি ইত্যর্থঃ। "যথাকৃতায় বিজিতাধরেয়াঃ সংযন্ত্যেব মেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ ইতি" শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মার্পণং ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানের যজ্ঞরূপতা সম্পাদিত হইয়াছে। যজ্ঞ ও অনেক প্রকার কথিত হইয়াছে, অধিকারী পুরুষগণের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অপেক্ষণীয় সকল যজ্ঞের দ্বারা জ্ঞানের স্তুতি করা হইতেছে যে, শ্রেয়ানিত্যাদি।

"দ্রব্যময়" (অর্থাৎ) দ্রব্যরূপ সাধনের দ্বারা সাধ্য যজ্ঞ হইতে জ্ঞানরূপ যজ্ঞ শ্রেয়ান্, (অর্থাৎ) প্রশস্ততর, হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ (অনিত্য) ফলের উৎপাদক, (কিন্তু) জ্ঞানরূপ যজ্ঞ (অনিত্য) ফলের উৎপাদক নহে। কেন (এরূপ বলা হইতেছে?) যে কারণ, সকল সাধনের সহিত সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত সকলপ্রকার কর্ম্মই সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক (মহাসমুদ্র) বৎ অনন্তফলহেতু জ্ঞানেতেই পরিসমাপ্ত হয় (অর্থাৎ) অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও এই বিষয়টী (দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভাবে) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে,

যেমন দ্যুতক্রীড়াতে চৌওয়ানামক দান যাহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাহার তিয়া, দুয়া, প্রভৃতি দানের ফলসকলও আয়ত্ত হয়। সেই প্রকার লোকে যাহা কিছু সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে সেই সকল কর্ম্মের ফলই অন্তর্ভুক্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

---

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—তৎ ( জ্ঞানলাভকারণং ) বিদ্ধি ( জানীহি ) (কথমিত্যাহ) প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া চ ( আচার্য্যাণাং ) তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—( আচার্য্যগণের ) সেবা প্রণিপাত এবং ( যথাবসরে ) তত্ত্ববিষয়ে বিনীত প্রশ্নের দ্বারা, জ্ঞানলাভের উপায় কি তাহা জান; তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ ( এইপ্রকার হইলে ) তোমাকে সম্যগ্ জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য।—তদেতদ্বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হি কেন প্রমাণেন প্রাপ্যত ইত্যুচ্যতে তদ্বিদ্ধীতি। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি যেন বিধিনা প্রাপ্যত ইতি আচার্য্যানভিগম্য প্রকর্ষেণ নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারস্তেন কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষঃ কা বিদ্যা কা চাবিদ্যা ইতি পরিপ্রশ্নেন সেবয়া গুরুশুশ্রূষণয়া এবমাদিনা প্রশ্রয়েণ আবর্জ্জিতা আচার্য্যা উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি তে জ্ঞানং যথোক্তবিশেষণং জ্ঞানবন্তোঽপি কেচিদ্ যথাবৎ তত্ত্বদর্শনশীলা, অপরে ন, অতো বিশিনষ্টি তত্ত্বদর্শিন ইতি, যে সম্যগ্ দর্শিনস্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্য্যক্ষমং ভবতি নেতরাদিতি ভগবতো মতম্ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই সেই বিলক্ষণ জ্ঞান তবে কি উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে? ( তাহারই উত্তর দেওয়া হইতেছে যে ) তদ্বিদ্ধীত্যাদি।

যে উপায়ের দ্বারা সেই জ্ঞান পাওয়া যাইতে পারে, তাহা জান, আচার্য্যগণের নিকটে যাইয়া "প্রণিপাত" (প্রকৃষ্টভাবে নিম্নে পতন) অর্থাৎ দীর্ঘ নমস্কার, কি প্রকার ( সংসার ) বন্ধ? কি প্রকার মোক্ষ? বিদ্যা কাহাকে বলে? অবিদ্যা কি? ইত্যাদি প্রশ্ন এবং গুরুশুশ্রূষা ইত্যাদি বিনয়ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া আচার্য্যগণ তোমাকে যথোক্তপ্রকার জ্ঞানবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন। ( যাঁহারা উপদেশ দিবেন, তাঁহারা কি প্রকার, তদ্বিষয়ে

# পরমহংসদেবের উপদেশ।

( স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত। )

১। এক রকম বাদ্‌লে পোকা আছে, তারা আলো দেখ্‌লে ছুটে যায়, তারা তাতে প্রাণ দেয়, তবু অন্ধকারে আর যায় না ; তেমনি যারা ভগবানের ভক্ত, তারা যেখানে সাধু থাকে ও ঈশ্বরীয় কথা হয়, সেখানে ছুটে যায়, সাধনভজন ছাড়া সংসারের অসার পদার্থে আর বদ্ধ হয় না।

২। একটী লোক পরমহংসদেবের নিকট এসে বল্লে, "মহাশয়, অনেকদিন সাধন ভজন কর্‌লুম, কিছুই ত বুঝতে সুঝতে পারলুম না, আমাদের সাধন ভজন করা মিছে।" পরমহংসদেব ঈষৎ হাস্য করে বল্লেন, "দেখ যারা খানদানী চাষা, তারা বার বৎসর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ দিতে ছাড়ে না ; আর যারা ঠিক চাষা নয়, চাষের কাযে বড় লাভ শুনে কারবার করতে আসে, তারাই এক বৎসর বৃষ্টি না হলেই চাষ ছেড়ে দিয়ে পালায় ; তেমনি যারা ঠিক ঠিক ভক্ত ও বিশ্বাসী, তারা সমস্ত জীবন তাঁর দর্শন না পেলেও তাঁর নাম গুণানুকীর্ত্তন কর্‌তে ছাড়ে না।

৩। যার তৃষ্ণা পায়, সে কি গঙ্গার জল ঘোলা ব'লে তখনি একটা পুকুর কেটে জল পান কর্‌তে যায় ; তেমনি যার ধর্ম্মতৃষ্ণা পায় নি, সে এ ধর্ম্ম ঠিক নয়, ও ধর্ম্ম ঠিক নয়, এইরূপ বলে গোলমাল করে বেড়ায়। তৃষ্ণা থাকলে অত বিচার চলে না।

৪। যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ কর্‌তে চায় না, তার হবিষ্যান্ন গোমাংস তুল্য হয়, আর যে গোমাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা করে, তার পক্ষে গোমাংস হবিষ্যান্নের তুল্য হয়।

৫। ভগবান্ সকলকার ভিতর কিরূপে বিরাজ করেন জান ? যেমন চিকের ভিতর বড় লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখ্‌তে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখ্‌তে পায় না ; ভগবান ঠিক সেইরূপে বিরাজ কর্‌ছেন।

৬। সংসারে সুখের লোভে অনেকে ধর্ম্ম কর্ম্ম করে থাকে, একটু দুঃখ কষ্ট পেলে কিম্বা মরবার সময় তারা সব ভুলে যায় ; যেমন টিয়া পাখী এম্‌নে সমস্ত দিন রাধাকৃষ্ণ বলে, কিন্তু বেরালে যখন ধরে, তখন রাধাকৃষ্ণ ভুলে গিয়ে নিজের বোল ক্যাঁ ক্যাঁ কর্‌তে থাকে।

# পারিস্ প্রদর্শনী।

## প্রেরিত পত্রের অনুবাদ।

"সম্পাদক মহাশয়েষু।—

এই মাসের প্রথমাংশে কয়েক দিবস যাবং পারিস (Paris)-মহাদর্শনীতে "কংগ্রে দ'লিস্তোয়ার-দে রিলিজি অঁ" অর্থাৎ ধর্ম্মেতিহাস নামক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় অধ্যাত্মবিষয়ক এবং মতামতসম্বন্ধী কোনও চর্চ্চার স্থান ছিল না, কেবল মাত্র বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গ সকলের তথ্যতানুসন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এ বিধায়, এ সভায় বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রচারক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির একান্ত অভাব। চিকাগো মহাসভা এক বিরাট্ ব্যাপার ছিল। সুতরাং সে সভায় নানা দেশের ধর্ম্মপ্রচারক মণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় জন কয়েক পণ্ডিত, যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ক চর্চ্চা করেন, তাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন। এবার এখানে ধর্ম্মসভা না হইবার কারণ এই যে, চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়, বিশেষ উৎসাহে, যোগদান করিয়াছিলেন;—মনে করিয়াছিলেন প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার বিস্তার করিবেন, এবং সমগ্র কৃষ্টান জগৎ, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্বমহিমা নির্ব্বিঘ্নে ও সুন্দররূপে কীর্ত্তন করতঃ বিশেষ ফললাভ করিবেন। কিন্তু ফল অন্যরূপ হওয়ায়, কৃষ্টান্-সম্প্রদায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছেন; ক্যাথলিকরা এখন ইহার বিশেষ বিরোধী। ফ্রাঁন্স—ক্যাথলিক-প্রধান; অতএব, যদিও কর্ত্তৃপক্ষদের যথেষ্ট বাসনা ছিল, তথাপি সমগ্র ক্যাথলিক-জগতের বিপক্ষতায়, ধর্ম্মসভা করা হইল না।

যে প্রকার, মধ্যে মধ্যে Congress of orientalist অর্থাৎ সংস্কৃত, পালী, আরব্যাদি ভাষাভিজ্ঞ বুধমণ্ডলীর মধ্যে মধ্যে উপবেশন হইয়া থাকে, সেইরূপ, উহার সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রত্নতত্ত্ব যোগ দিয়া, প্যারিসে এ ধর্ম্মেতিহাস সভা আহূত হয়।

জম্বুদ্বীপ হইতে কেবল মাত্র দুই তিন জন জাপানি-পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ।

বৈদিক ধর্ম্ম ও অগ্নি সূর্য্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ জড় বস্তুর আরাধনা সমুদ্ভূত, এইটি অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞের মত।

স্বামী বিবেকানন্দ, উক্ত মত খণ্ডন করিবার জন্য, প্যারি-ধর্ম্মেতিহাস সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি উক্ত বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক প্রবল অসুস্থতা নিবন্ধন প্রবন্ধাদি লেখা ঘটিয়া উঠে নাই; কোনও মতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন মাত্র। উপস্থিত হইলে ইউরোপ অঞ্চলের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; এবং উঁহারা ইতি-পূর্ব্বেই স্বামীজির রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

সে সময় উক্ত সভায় ওপর্ট নামক এক জর্ম্মান্ পণ্ডিত শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শালগ্রামের উৎপত্তি "যোনি" চিহ্ন বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার মতে শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন এবং তদ্বৎ শালগ্রাম শিলা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন। শিবলিঙ্গ এবং শাল-গ্রাম উভয়ই লিঙ্গ-যোনি পূজার অঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত মত দ্বয়ের খণ্ডন করিয়া বলেন যে, শিবলিঙ্গের নরলিঙ্গতা সম্বন্ধে অবিবেক মত প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু শালগ্রাম সম্বন্ধে এ নবীন মত অতি আকস্মিক।

স্বামীজি বলেন যে শিবলিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি অথর্ব্ববেদ সংহিতার প্রসিদ্ধ যূপ-স্তম্ভের স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে। এবং উক্ত স্কম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি, ধূম, ভস্ম, শিখা, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ, যে প্রকার মহাদেবের অঙ্গ-কান্তি, পিঙ্গজটা, নীলকণ্ঠ, বৃষবাহনত্বাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপ স্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় তদ্বৎ যজ্ঞোচ্ছিষ্টেরও ব্রহ্মত্বে মহিমা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

লিঙ্গ পুরাণে উক্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা করিয়া মহাস্তম্ভের মহিমা ও মহাদেবের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পরে হইতে পারে যে, বৌদ্ধাদির প্রাদুর্ভাব কালে বৌদ্ধস্তূপসমাকৃতি দরিদ্রার্পিত ক্ষুদ্রাবয়ব স্মারক স্তূপও সেই স্তম্ভে অর্পিত হইয়াছে। যে প্রকার, অদ্যাপিও ভারতখণ্ডে কাশ্যাদি তীর্থস্থলে অপারক ব্যক্তি অতিক্ষুদ্র মন্দিরাকৃতি উৎসর্গ করে, সেই প্রকারে বৌদ্ধরাও ধনাভাবে অতিক্ষুদ্র স্তূপাকৃতি বুদ্ধদেবের উদ্দেশে অর্পণ করিত।

বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তূপমধ্যে শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রাম শিলা উক্ত অস্থি-ভস্মাদি রক্ষণ-শিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পূজিত হইয়া, বৌদ্ধ মতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নর্ম্মদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধপ্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল। প্রাকৃতিক নর্ম্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও নেপাল-প্রসূত শালগ্রামই যে বিশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য। *

শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা অতিঅশ্রুতপূর্ব্ব এবং প্রথম হইতেই অপ্রাসঙ্গিক; শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতি অর্ব্বাচীন এবং উক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘোর অবনতির সময় সংঘটিত হয়। ঐ সময়ের ঘোর বৌদ্ধ তন্ত্র সকল এখনও নেপালে ও তিব্বতে খুব প্রচলিত।

অন্য এক বক্তৃতা স্বামীজি ভারতীয় ধর্ম্মমতের ধর্ম্মবিস্তার বিষয়ে দেন। তাহাতে বলা হয় যে, বৌদ্ধাদি সমস্ত ভারতীয় ধর্ম্ম-মতের উৎপত্তি বেদে। সকল মতের বীজ তন্মধ্যে প্রোথিত আছে। সেই বীজকে বিস্তৃত ও উন্মালিত করিয়া বৌদ্ধাদি মতের সৃষ্টি, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মও ঐ সকলের বিস্তার। সমাজের বিস্তার ও সঙ্কোচের সহিত সে বীজ কোথাও বিস্তৃত, কোথাও সঙ্কুচিত হইয়া বিরাজমান আছে। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেন। এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বলেন যে, যে প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাজকুলাদির ইতিহাস ক্রমশঃ প্রত্নতত্ত্বোদ্ঘাটনের সহিত প্রামাণীকৃত হইতেছে, সেই প্রকার ভারতের

* এতৎ সমস্ত পাশ্চাত্য ধরণের শুষ্ক প্রত্নতত্ত্বান্তর্গত, এতদ্দেশীয় সুমধুর বিশ্বাসপ্রসঙ্গামৃত নহে। স্বামীজির যে, অবশ্য, শালগ্রামে নারায়ণ-জ্ঞান নাই, এমত যেন কেহ বিবেচনা না করেন। প্যারিস-সভা ধর্ম্ম-সভা নহে—উপরে সংবাদদাতাও বলিয়াছেন। তথায় কোনও সম্প্রদায়বিশেষের বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রচলিত প্রাচ্য প্রথানুযায়ী চর্চ্চা করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কোনও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কার্য্যকারণসম্বন্ধবিচার কথঞ্চিৎ করিতে পারা গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও বা আধুনিক বিজ্ঞানমতে, এবং ঐতিহাসিক উপায়ে, প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। স্বীয় বা স্বদেশীয় বিশ্বাসনেত্র মধ্য দিয়া সে কার্য্যকারণ সভাস্থগণকে দেখাইলে, তথায় তাহা গ্রহণীয় হইবার সম্ভব অতি স্বল্পই ছিল। অস্মদ্দেশীয় বিশ্বাস যে বিশ্বতোমুখ, কল্পতরু তুল্য ফলদায়ক, এবং অতি প্রশান্ত গভীর ও প্রশস্ত হৃদয়গম্য, এবং তদ্রূপ মস্তিষ্কালোচ্য, তাহা পাশ্চাত্যাঞ্চলের অনেকস্থলে আধুনিক বা সাম্প্রদায়িক (তথাকথিত) বুধমণ্ডলীর মধ্যে প্রকটিত হইতে এখনও কিছু সময়সাপেক্ষ। এই সম্প্রতি ইহার সূত্রপাত মাত্র।—সম্পাদক।

কিম্বদন্তী সমস্ত সত্য। বৃথা প্রবন্ধ কল্পনা না করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেন উক্ত কিম্বদন্তীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলর এক পুস্তকে লিখিতেছেন যে, যতই সৌসাদৃশ্য থাকুক না কেন, যতক্ষণ না ইহা প্রমাণিত হইবে যে, কোনও গ্রীক্ সংস্কৃত ভাষা জানিত, ততক্ষণ সপ্রমাণ হইল না যে ভারতবর্ষের সাহায্য প্রাচীন গ্রীস্ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিত, ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটী সংজ্ঞা, গ্রীক্ জ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া, এবং গ্রীক্‌রা ভারতপ্রান্তে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, সমগ্র ভারতের উপর, ভারতের সাহিত্যে, জ্যোতিষে, গণিতে, গ্রীক্ সহায়তা দেখিতে পান। শুধু তাহাই নহে, একজন অতি সাহসিক লিখিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিদ্যা গ্রীক্‌দের বিদ্যার ছায়া!!

এক "ম্লেচ্ছা বৈ যবনাঃ তেষু এষা বিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে......"

এই শ্লোকের উপর কতই না পাশ্চাত্যেরা কল্পনা চালাইয়াছেন। উক্ত শ্লোকে কি প্রকারে প্রমাণীকৃত হইল যে আর্য্যেরা ম্লেচ্ছের নিকট শিখিয়াছেন; ইহাও বলা যাইতে পারে যে, উক্ত শ্লোকে আর্য্যশিষ্য-ম্লেচ্ছদিগকে উৎসাহবান্ করিবার জন্য বিদ্যার আদর প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, "গৃহে চেৎ মধু বিন্দেত, কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ?" আর্য্যদের প্রত্যেক বিদ্যার বীজ বেদে রহিয়াছে। এবং উক্ত কোনও বিদ্যার বৈদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদই দেখান যাইতে পারে। এ অপ্রাসঙ্গিক যবনাধিপত্যের আবশ্যকতাই নাই।

তৃতীয়তঃ, আর্য্য জ্যোতিষের প্রত্যেক গ্রীক্‌সদৃশ শব্দ সংস্কৃত হইতে সহজেই ব্যুৎপন্ন হয়; উপস্থিত ব্যুৎপত্তি ত্যাগ করিয়া, যাবনিক ব্যুৎপত্তি গ্রহণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের যে কি অধিকার, তাহাও বুঝি না।

ঐ প্রকার কালিদাসাদিকবিপ্রণীত নাটকে যবনিকা শব্দের উল্লেখ দেখিয়া, যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্য নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে আর্য্যনাটক গ্রীক্‌নাটকের সদৃশ কি না? যাঁহারা উভয় ভাষার নাটক রচনা প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঐ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনাজগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিন্‌কালেও বর্ত্তমানত্ব নাই। সে গ্রীস্ কোরস্ কোথায়? সে

গ্রীক্ যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্য্যনাটকে তাহার ঠিক বিপরীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্য্য নাটকের আর এক।

আর্য্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীক্ নাটকে আদৌ ত নাই, বরং সেক্সপীয়রপ্রণীত নাটকের সহিত ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে।

অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, সেক্সপীয়র সর্ব্ব বিষয়ে কালিদাসাদির নিকট ঋণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া।

শেষ, পণ্ডিত মোক্ষমুলরের আপত্তি তাঁহার নিজের উপরই প্রয়োগ করিয়া ইহাও বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে কোনও হিন্দু কোনও কালে গ্রীক্ ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণ ও গ্রীক্ প্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।

তদ্বৎ আর্য্য-ভাস্কর্য্যে গ্রীক্ প্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রম মাত্র।

স্বামীজি শ্রীকৃষ্ণারাধনা যে বৌদ্ধাপেক্ষা অতি প্রাচীন তাহাও বলেন, এবং গীতা যদি মহাভারতের সমসাময়িক না হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষাও প্রাচীন, নবীন কোনও মতে নহে। গীতার ভাষা, মহাভারতের ভাষা, এক। গীতায় যে সকল বিশেষণ অধ্যাত্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই বনাদি পর্ব্বে বৈষয়িক সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ঐ সকল শব্দের প্রচুর প্রচার না হইলে, এমন ঘটা অসম্ভব। পুনশ্চ সমস্ত মহাভারতের মত আর গীতার মত একই; এবং গীতা যখন, তৎসাময়িক সমস্ত সম্প্রদায়েরই আলোচনা করিয়াছেন, তখন বৌদ্ধদের উল্লেখমাত্রও কেন করেন নাই?

বৌদ্ধপর যে কোনও গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধোল্লেখ নিবারিত হইতেছে না। কথা, গল্প, ইতিহাস বা কটাক্ষের মধ্যে কোথাও না কোথাও বৌদ্ধমতের বা বুদ্ধের উল্লেখ প্রকাশ্য বা লুক্কায়িত রহিয়াছে,—গীতার মধ্যে কে সে প্রকার দেখাইতে পারেন? পুনশ্চ গীতা ধর্ম্মসমন্বয় গ্রন্থ, সে গ্রন্থে কোনও মতের অনাদর নাই, সে গ্রন্থকারের সাদর বচনে এক বৌদ্ধ মতই বা কেন বঞ্চিত হইলেন, ইহার কারণ প্রদর্শনের ভার কাহার উপর?

গীতায় উপেক্ষা কাহাকেও করা হয় নাই। ভয়?—তাহারও একান্ত অভাব। যে ভগবান্ বেদপ্রচারক হইয়াও বৈদিক হঠকারিতার উপর কঠিন ভাষা প্রয়োগেও কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহার বৌদ্ধমতে আবার কি ভয়?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে প্রকার গ্রীক্ ভাষার এক এক গ্রন্থের উপর সমস্ত জীবন দেন, সেই প্রকার এক এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উপর জীবন উৎসর্গ

করুন; অনেক আলোক জগতে আসিবে। বিশেষতঃ এ মহাভারত ভারত-ইতিহাসের অমূল্য গ্রন্থ। ইহা অত্যুক্তি নহে যে এ পর্য্যন্ত উক্ত সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ পাশ্চাত্য জগতে উত্তমরূপে অধীতই হয় নাই।

বক্তৃতার-পর অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন। অনেকেই বলিলেন, স্বামীজি যাহা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের সম্মত এবং স্বামীজিকে আমরা বলি যে সংস্কৃত-প্রত্নতত্ত্বের আর সে দিন নাই। এখন নবীন সংস্কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের মত অধিকাংশই স্বামীজির সদৃশ এবং ভারতের কিম্বদন্তী পুরাণাদিতে যে বাস্তব ইতিহাস রহিয়াছে, তাহাও আমরা বিশ্বাস করি।

অন্তে বৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় অন্য সকল বিষয়ে অনুমোদন করিয়া, এক গীতার মহাভারত-সমসাময়ত্বে দ্বৈধমত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু প্রমাণ-প্রয়োগ এইমাত্র করিলেন যে অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে গীতা মহাভারতের অঙ্গ নহে।

অধিবেশনের লিপি পুস্তকে উক্ত বক্তৃতার সারাংশ ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হইবে।"

---

# শ্রীরামানুজ চরিত।

## শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাপ্রভাব।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [১০৫ পৃষ্ঠার পর।

'আমি আপনার ন্যায় মহানুভবের কথঞ্চিৎ ভৃত্যকার্য্য করিতেছি বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আপনার পিতামহ ভগবদ্ভৃত্য-গণের অগ্রগণ্য। আপনি সেই মহাকুলীন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য আপনাতে আমি আমার প্রভু মহাত্মা নাথমুণির আবির্ভাব দেখিতেছি। আজ আমি ধন্য হইলাম।' এই বলিয়া নম্বি নিরস্ত হইলে আল্‌ওয়ান্দার গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, 'হে গুরো! আপনি আমার ওরূপে আর প্রশংসা করিবেন না। আমি বাস্তবিকই জীবনের অবশিষ্টাংশ আপনার অনুবর্ত্তী হইয়া সংসার প্রলোভনের হস্ত অতিক্রম করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এই সংসাররূপ ভয়ঙ্কর তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্রে আপনার ন্যায় কর্ণধার না থাকিলে আমার দুর্ব্বল তরণী মগ্ন হইয়া যাইবে, ও পরিশেষে আমার বিষয় নক্র কবলিত করিয়া ফেলিবে। অতএব আপনি সদয় হউন।'

নম্বি অন্য কোনও উত্তর না করিয়া সুস্বরে অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি গীতার চরম শ্লোকে আসিয়া উপনীত হইলেন। যখন তিনি চরম শ্লোক পরমভক্তিসহকারে আল্‌ওয়ান্দারকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

বলিয়া কিন্নরবিনিন্দিতস্বরে গাহিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমন্নারায়ণবদনচন্দ্র-বিনিঃসৃত সেই আশাবাক্যামৃত তাঁহার হতাশাপরিম্লান অন্তরাত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। তিনি কিরূপে ইন্দ্রিয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এক্ষণে পরিত্রাণের উপায় শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, তাঁহার বদনের কালিমা অপসৃত হইল। তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার নম্বিকে বন্দনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তা দূর হইল।

পাঠ শেষ করিয়া নম্বি কহিলেন, 'মহারাজ! চলুন কল্য আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে গমন করি।' ইহাতে আল্‌ওয়ান্দার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, 'আপনি আর আমায় মহারাজ বলিয়া ডাকিবেন না। আমাকে আপনার দাস ও শিষ্য করিয়া লউন।' নম্বি কহিলেন, 'হে সৎপুরুষ! অগ্রে আমায় আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে দিন। আমি আপনার পিতামহের ধন যতদিন না আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিব, ততদিন অনৃণী হইতে পারিব না।' নম্বি এরূপ গম্ভীর ভাবে এই কথাগুলি বলিলেন যে, আল্‌ওয়ান্দার আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না।

পরদিন তাঁহারা আপনাদের গন্তব্য দিকে চলিলেন। চারি দিনের পর তাঁহারা কাবেরীতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন ও তথায় স্নানাদি করিয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করিলেন। পরে দক্ষিণ ও উত্তর দিয়া কাবেরী ও কোল্লিডম্ (coleroon) প্রবাহিতা হইয়া যাহাকে দ্বিপাকারে পরিণত করিয়াছে এবং সপ্ত প্রাকারবিশিষ্ট শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের বিশাল মন্দির যাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার স্বরূপ, কাবেরী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা সেই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। নম্বি অগ্রবর্ত্তী। আল্‌ওয়ান্দার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুক্তকরে, প্রেমমদিরোন্মত্ত হৃদয়ে শেষশয়ান লক্ষ্মীদ্বিতীয়, জগদাদি, বিশ্বোদর, বিশ্ববীজ নারায়ণের সর্ব্বশোভাসম্পন্ন শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কে সংসারবন্ধন অতিক্রম করিয়া চিরশান্তি লাভ করিবার আশাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে? এই জন্য অভাব দূর করাই শান্তিপ্রিয় জড়চৈতন্যাত্মক ভাববস্তু সমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য,—এইজন্যই অনাদিকাল হইতে ভাবাভাবের যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। ইহারই নাম সংসার। পরিণামে, এ যুদ্ধে জয়লাভ কাহার হয়? ভাবের না অভাবের? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এ প্রশ্নের উত্তর "অভাব" শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেই অনায়াসে পাওয়া যাইবে। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ", অসৎ বা অভাব পদার্থের সত্তাই নাই, কেবল ভাবপদার্থই চিরস্থায়ী। সুতরাং, হে মানব, তুমি যে "সংসার, সংসার" করিয়া ভয় পাইতেছ, উহা তোমার ভ্রম, কারণ যাহা অভাবমূলের উপর দণ্ডায়মান, তাহা অভাব ভিন্ন কখনই ভাব হইতে পারে না। শূন্যের উপর শূন্যই থাকিতে পারে। তোমার যত যুদ্ধ বিগ্রহ কেবল শূন্যের সহিত, ইহা যে দিন বুঝিতে পারিবে, সেদিন আর তোমার ওরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্তি হইবে না, সেই দিনই তুমি চিরশান্তি নিকেতনে গমন করিবার অধিকার পাইবে, সেই দিনই তোমার সমুদয় অভাব দূর হইবে, সেই দিনই তুমি আপনার পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে, সেই দিনই তুমি প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হইবে, কারণ "উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ, তত্ত্বদর্শিগণই ভাবাভাবের পার্থক্য অবগত হইতে পারেন।

অভাবকে বিদূরিত করাই প্রাণিমাত্রের ধর্ম্ম। অভাব হইলেই তাহার পূর্ত্তি বিধানের চেষ্টা প্রাণিজগতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। জীব ভাব পদার্থ বলিয়াই অভাবের প্রতি নিরন্তর বিষদৃষ্টি, ক্ষণমাত্রও অভাবকে স্বীয় অন্তরে স্থান দিতে সম্মত নয়। সর্ব্বদাই পূর্ণাবস্থায় থাকা তাহার স্বভাব, সুতরাং সে অক্ষর-নামের নামী, আরম্ভ ও সমাপ্তি-পরিশূন্য, অনাদি এবং অনন্ত। ইহাই জীবের পরমার্থ তত্ত্ব।

বিচার সহায়ে তো জীব সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল। এখন দেখা যাউক, সেই জীব আপনাকে কিরূপ মনে করে। প্রত্যেক জীবই যে আপনাকে দেহস্বরূপ বলিয়া ভাবে, ইহা এত স্পষ্ট যে আর প্রমাণান্তরের আবশ্যক করে না। এই জন্যই সে দেহের জন্ম ও লয়ের সহিত আপনার জন্ম ও লয় হইল এরূপ বিবেচনা করে। এই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন,

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥

আসিবার জন্য, বলিষ্ঠশরীরসাধ্য কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে একান্ত অনুপযোগী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাঁহার অমোঘ ইচ্ছাই যেন শ্রীশ্রীরামানুজ বিগ্রহ ধারণ করিয়া অব্যবহিত পরেই তাঁহার সেই কামনা চরিতার্থ করিয়া দিয়াছিল। শ্রীশ্রীরামানুজ আল্‌ওয়ান্দারের পূর্ণ বিকাশ মাত্র।

# শ্রীরামানুজ চরিত।

## দ্বিতীয় ভাগ।

### প্রথম অধ্যায়—অবতরণ হেতু।

শ্রী-সম্প্রদায়প্রণেতা মহানুভবের চরিতামৃত পান করিবার পূর্ব্বে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নেত্রী শ্রীদেবীর শ্রীচরণপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হই।

আকারত্রয়সম্পন্নামরবিন্দনিবাসিনীম্।
অশেষজগদীশিত্রীং বন্দে বরদবল্লভাম্॥

শ্রীদেবী, লীলাদেবী, ও ভূদেবী, এই আকারত্রয়ে যিনি নিত্য বিরাজমানা, প্রস্ফুটিতকমলমধ্যই যাঁহার নিবাসভূমি, নিখিলভুবনপতির যিনি সহধর্ম্মিণী, আমি সেই বিশ্ববন্ধুর হৃদয়বিলাসিনীর শ্রীপাদপদ্মযুগলকে বন্দনা করি। তাঁহার প্রসাদে গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি হউক।

চৈত্রার্দ্রাসম্ভবং বিষ্ণোর্দর্শনস্থাপনোৎসুকম্।
তুণ্ডীরমণ্ডলে শেষমূর্ত্তিং রামানুজং ভজে॥

যিনি চৈত্রমাসের আর্দ্রা নক্ষত্রে তুণ্ডীরদেশে বা চোলরাজ্যে বিষ্ণুভক্তি-প্রধান শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্যপ্রচারবাসনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমি সেই অনন্তাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীরামানুজের পূজা ও বন্দনা করি।

বিশ্বরাজ্যের যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই ভাব ও অভাবের বিষম মিলন প্রত্যক্ষ গোচর হয়। অভাব তাড়নায় ভাবরাশি ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল হইয়া বিবিধোচ্ছ্বাসময়ী সংসারমরীচিকার বিকাশ করিতেছে। জীবকুল অন্ন, পান, আচ্ছাদনাদির অভাব ভয়ে ভীত হইয়া তত্তৎ-সংগ্রহবাসনায় কত প্রকার শারীরিক ও মানসিক উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন-পূর্ব্বক তাহার দমনে সচেষ্ট হইতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? পরমাণুকুল শীতোষ্ণরূপ দ্বন্দ্বের তাড়নায় সাম্যাবস্থার অভাবে অনন্ত আকাশ-গর্ভে নিরন্তর যে কতদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা কে ধারণা করিতে পারে? অভাবই সতত সঞ্চরণশীল সংসার তরুর মূল। অভাব দূর না হইলে,

কে সংসারবন্ধন অতিক্রম করিয়া চিরশান্তি লাভ করিবার আশাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে? এই জন্য অভাব দূর করাই শান্তিপ্রিয় জড়চৈতন্যাত্মক ভাববস্তু সমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য,—এইজন্যই অনাদিকাল হইতে ভাবাভাবের যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। ইহারই নাম সংসার। পরিণামে, এ যুদ্ধে জয়লাভ কাহার হয়? ভাবের না অভাবের? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এ প্রশ্নের উত্তর "অভাব" শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেই অনায়াসে পাওয়া যাইবে। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ", অসৎ বা অভাব পদার্থের সত্তাই নাই, কেবল ভাবপদার্থই চিরস্থায়ী। সুতরাং, হে মানব, তুমি যে "সংসার, সংসার" করিয়া ভয় পাইতেছ, উহা তোমার ভ্রম, কারণ যাহা অভাবমূলের উপর দণ্ডায়মান, তাহা অভাব ভিন্ন কখনই ভাব হইতে পারে না। শূন্যের উপর শূন্যই থাকিতে পারে। তোমার যত যুদ্ধ বিগ্রহ কেবল শূন্যের সহিত, ইহা যে দিন বুঝিতে পারিবে, সেদিন আর তোমার ওরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্তি হইবে না, সেই দিনই তুমি চিরশান্তি নিকেতনে গমন করিবার অধিকার পাইবে, সেই দিনই তোমার সমুদয় অভাব দূর হইবে, সেই দিনই তুমি আপনার পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে, সেই দিনই তুমি প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হইবে, কারণ "উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ, তত্ত্বদর্শিগণই ভাবাভাবের পার্থক্য অবগত হইতে পারেন।

অভাবকে বিদূরিত করাই প্রাণিমাত্রের ধর্ম্ম। অভাব হইলেই তাহার পূর্ত্তি বিধানের চেষ্টা প্রাণিজগতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। জীব ভাব পদার্থ বলিয়াই অভাবের প্রতি নিরন্তর বিষদৃষ্টি, ক্ষণমাত্রও অভাবকে স্বীয় অন্তরে স্থান দিতে সম্মত নয়। সর্ব্বদাই পূর্ণাবস্থায় থাকা তাহার স্বভাব, সুতরাং সে অক্ষর-নামের নামী, আরম্ভ ও সমাপ্তি-পরিশূন্য, অনাদি এবং অনন্ত। ইহাই জীবের পরমার্থ তত্ত্ব।

বিচার সহায়ে তো জীব সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল। এখন দেখা যাউক, সেই জীব আপনাকে কিরূপ মনে করে। প্রত্যেক জীবই যে আপনাকে দেহস্বরূপ বলিয়া ভাবে, ইহা এত স্পষ্ট যে আর প্রমাণান্তরের আবশ্যক করে না। এই জন্যই সে দেহের জন্ম ও লয়ের সহিত আপনার জন্ম ও লয় হইল এরূপ বিবেচনা করে। এই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন,

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥

"ধনদুর্ম্মদান্ধ, প্রমাদগ্রস্ত মূঢ় মানব পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। 'ইহ লোকই সত্য, পরলোক নাই,' এরূপ ধারণা বশতঃ সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়।" বস্তুতঃ, মৃত্যুভয় কোন প্রাণীর নাই? মৃত্যুকে কেহই ভালবাসে না, কারণ মৃত্যুশব্দে সাধারণ লোক ভাবের অভাব, বা জীবনের পরিসমাপ্তি, এইরূপই বুঝিয়া থাকে। এই জন্যই অভাববিদ্বেষী ভাবরূপ জীব সর্ব্বদাই মৃত্যুকে ভীতি ও ঘৃণার চক্ষে দেখে। ইহাও একটি জীবের নিত্যত্বের প্রমাণ। জীব স্বভাবতঃ অনিত্য বা অভাবরূপ হইলে মৃত্যুর প্রতি তাহার ঈদৃশী ভীতি ও ঘৃণার উদয় হইত না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অতি সুন্দর ও সরল উপমায় এই ভীতি যে নিতান্ত অমূলক, তাহা সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। হরির পিতা একটি বাঘের মুখোস আনিয়া হরিকে দিলেন। সে তাহা পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইল, এবং মুখোসটি পরিয়া তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী সরলাকে ভয় দেখাইতে চলিল। সরলা সেই সময় পুত্তলিকার বিবাহ উপলক্ষে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। হরি সেই অবসরে সহসা বিকট চীৎকার করিয়া তাহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল। বালিকা সেই ভীষণ চীৎকার ও বিভীষণ বদন দেখিয়া একবারে ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া 'মা, মা' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিল এবং পলাইবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হরি গৃহের দ্বার চাপিয়া বসিয়াছিল। সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া ভয়কম্পিতকলেবরে অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে মাতাকে আহ্বান করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরি ভগ্নীকে সাতিশয় ভীতা দেখিয়া তখনই মুখোসটি খুলিয়া ফেলিল। সরলা ব্যাঘ্রের পরিবর্ত্তে আপনার ভ্রাতাকে দেখিয়া তাহার অঙ্কে লাফাইয়া পড়িল, এবং ভয়বেগ মন্দীভূত হইলে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার সমস্ত ভয় ব্যাকুলতা দূরে গেল এবং নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় ক্রীড়াপরবশ হইল। হে মানব, ত্রিতাপহারী হরিও সেইরূপ ভীষণ মায়ার মুখোস পরিধান করিয়া মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া থাকেন। তুমি তখন আপনাকে দুঃসহ দুর্দ্দিনগ্রস্ত বলিয়া মনে করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হও। এ উৎকণ্ঠা কেবল অজ্ঞানজন্য, অভ্যন্তরে স্নেহময় হরির সস্মিত বদন দেখিতে পাও না বলিয়া। সময়ে সময়ে দুঃখে কষ্টে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া যাইতেছে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িতেছ, তথাপি কেন প্রাণত্যাগ করিতে চাও না? তাহার কারণ, মধ্যে মধ্যে কৌতুকপ্রিয় হরি 'বাঘের মুখোস' খুলিয়া ফেলেন, রুদ্রমূর্ত্তি তিরোহিত করিয়া স্বীয় দক্ষিণ মূর্ত্তির বিকাশ করেন এবং তোমার

প্রাণমনকে পুলকিত করিয়া চিরদিনের জন্য তোমায় বাঁধিয়া রাখেন। ইহারই নাম মায়া। এই জন্যই বেদবিভাগকর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেব কহিয়াছেন, "হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া" অর্থাৎ মায়া তাঁহার নিখিলমানবমনোমোহনকারী মধুর হাস্য। শিশুর প্রফুল্লবদনে অমৃতময় হাস্য কোন্ পিতা মাতার মন আনন্দোন্মত্ত না করে? যুবতীর কমনীয় স্মিতবিকশিত ওষ্ঠাধর কোন্ যুবকের অন্তরকে বিক্ষিপ্ত না করিতে পারে? পার্থিব সৌন্দর্য্যেরই যদি এতাদৃশী শক্তি, ঈশ্বরের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য যে তদপেক্ষা অনন্ত গুণে বলবতী হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহার মাধুর্য্য নিরন্তর উপলব্ধি করিতেন, ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তির পশ্চাতেও তাঁহার মনোহর, প্রফুল্ল, নিত্য স্নেহময়, পরম মধুর মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার করিতে চাহিতেন ও পরিশেষে সফলকাম হইতেন। বিশ্বনিয়ন্তার শ্রীচরণে তাঁহারা এই বলিয়া অহরহঃ প্রার্থনা করিতেন, "মধু বাতা ঋতায়তে॥ মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ॥ মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ॥ মধু নক্তমুতোষসি॥ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ॥ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ॥ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥" অর্থাৎ "হে বিশ্বনিধান, বায়ু যেমন মাধুর্য্য বর্ষণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সাগর ও নদনদীগণ যেমন মধুক্ষরণ করিতেছে, সেইরূপ ব্রীহিযবাদি সুফল প্রসব করিয়া আমাদের উপর মাধুরী বিস্তার করুক, রাত্রিকাল ও উষাকাল মধুময় হউক, পৃথিবীর ধূলিগুলিও মধুময় হউক, পিতার ন্যায় উচ্চ ও গরীয়ান্ আকাশ আমাদের উপর মধুবর্ষণ করিতে থাকুন, উন্নত বৃক্ষরাজি নানা ফলে সুশোভিত হইয়া মধুময় হউক, সূর্য্যদেব মধু বিকীর্ণ করিতে থাকুন, আমাদের গাভীকুল সুমধুর দুগ্ধ প্রদান করিয়া মধুময় হউক।"

মনুষ্য স্বভাবতঃ আনন্দময়, তাই আনন্দলাভ প্রত্যাশায় পরমানন্দময় বিরাট্ পুরুষের শরণাগত হয়। বলিতে পার, স্বভাবতঃ আনন্দময়ের নিরানন্দ কোথা হইতে আইসে? সত্য বটে, আলোকের নিকট অন্ধকার থাকিতে পারে না, কিন্তু যেমন চক্ষুহীনতার দোষে আলোক অন্ধকার বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জ্ঞানহীনতারদোষে আনন্দময় পুরুষ আপনাকে নিরানন্দ বলিয়া মনে করেন। অজ্ঞানবলে উক্তরূপ ভ্রমবুদ্ধি উপস্থিত হইলেও, তাহাতে বস্তুশক্তির কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না; আনন্দময় আনন্দময়ই থাকেন, রজ্জু রজ্জুই থাকে, সর্পের ন্যায় বোধ হইতেছে বলিয়া কখনও সর্প হয় না।

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যতদিন মানবমন অজ্ঞান আবরণে আবৃত থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে স্বস্বরূপ উপলব্ধির জন্য নিরন্তর সচেষ্ট হইতে

হইবে, তিনি একমুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিবেন না। এই অস্থিরতার নামই জীবন। যে মানবে এই প্রাণস্পন্দন সাতিশয় বলবান্, তিনিই অচিরকাল মধ্যে স্বীয় নিত্যত্ব ও আনন্দময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন। যাঁহার প্রাণস্পন্দন অতি মৃদু, তিনি অজ্ঞানবলে অভিভূত, সুতরাং তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে তিনি স্বস্বরূপকে কখনও প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইবেন না। রজো-বলে তমঃকে দূর করিতে হইবে। এবং শেষে রজঃ, তমঃ, উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বালোকে আপনার পূর্ণতা উপলব্ধিপূর্ব্বক জন্মমৃত্যুজরাধ্যাধিরূপ সংসারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ. "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" তমসাচ্ছন্ন মানব তাপত্রয়ের ক্রীড়াসামগ্রী। ত্রিতাপের আধিপত্য তাঁহার উপরই এত প্রবল কেন? তাহার কারণ, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে, অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ণ আপনাকে অজ্ঞানপ্রভাবে অপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছেন। সুতরাং রাজা আপনাকে ভিক্ষুক ভাবিয়া ভিক্ষুকোচিত আহার বিহার করিলে, যেমন তাঁহার কষ্টের পরিসীমা থাকে না, সেইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ মানব আপনাকে জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিগ্রস্ত মনে করিয়া যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। রজঃপ্রভাবে তমোনাশ হইলে সত্ত্বের উদয় হয়। তখন আপনার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মানব পরমানন্দ উপলব্ধি করেন। বিরাট্ পুরুষ বাঘের মুখোস পরিয়া তাঁহাকে আর ভয়ব্যাকুলিত করেন না। তখন সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট মধুময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

দুঃখই তামসিক জনের প্রকৃত বন্ধু। দুঃখতাড়নায় অস্থির হইলেই তন্নিবৃত্তি কিসে হয়, তিনি তখন তাহারই আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন। যাঁহার প্রসাদে তিনি এই যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন, তিনি তখন তাঁহারই অন্বেষণ করেন। অন্ধ যেরূপ চক্ষুষ্মানের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় পথ আবিষ্কার করিতে অক্ষম, সেইরূপ তিনিও আপনাকে নিরতিশয় দুর্ব্বল ও নিঃসহায় বলিয়া কোনও বলবান্ মহানুভবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে সচেষ্ট হয়েন। ক্ষুধায় যেমন মনুষ্যকে আহার অন্বেষণ করায়, তৃষ্ণায় যেমন তাঁহাকে উদক অন্বেষণ করায়, দারিদ্র্য যেরূপ তাঁহাকে অর্থ অন্বেষণ করায়, সেইরূপ ত্রিতাপ তাঁহাকে সুখশান্তি অন্বেষণ করায়। ইহাও দেখা যায় যে, অভাবের সঙ্গে সঙ্গে অভাবনাশক ভাববস্তুসমূহও জগতের সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ রহিয়াছে। ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে আহার, তৃষ্ণার সঙ্গে

সঙ্গে জল, দারিদ্র্যের সঙ্গে ধন ধান্য, দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে সুখও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে। অভাব হইলেই ভাব আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। উত্তাপসহযোগে বায়ুর লঘুত্ব সম্পাদিত হইলে, তাহা উর্দ্ধে গমন করিয়া নিম্নপ্রদেশে তদভাবের আবির্ভাব করায়, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে সবেগে বায়ুমণ্ডল আসিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হয়। তাহাতেই বিষম ঝটিকার উৎপত্তি। অতএব অভাব হইলেই যে তাহার প্রতিবিধান সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ। জড় জগতে যেরূপ, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ,—অভাব হইলেই তাহার প্রতিবিধান আছে। ইহা উক্ত জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিশেষ উপলব্ধি হইবে।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে জ্ঞান ও কর্ম্মের যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। অধিকারী না হইলে কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডে কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যপালনই কর্ম্মকাণ্ডপ্রবেশের দ্বার এবং পূর্ণরূপে নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সংযমই জ্ঞানকাণ্ডপ্রবেশের দ্বার, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন ও তদনুসারে কর্ম্মে বা জ্ঞানে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিতেন। কর্ত্তব্যপালন কামনাত্যাগ অপেক্ষা যে অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য, তাহা সকলেই জানেন। মানব কামনা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনাদি কাল হইতে ইহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া আসিতেছেন; সুতরাং কামনাশূন্য হওয়া কি কখনও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয়? কামনা লইয়াই সংসার। কামনার পূর্ত্তিতেই তাঁহার পরম আনন্দ। যদিও কামনা তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করে, করিলই বা। চঞ্চলতা তো চিত্তের ধর্ম্ম বা স্বভাব। স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মে দুঃখ হয় না, অস্বাভাবিক কর্ম্মই দুঃখের কারণ। অতএব কামনা দুঃখজনক না হইয়া বরং সুখজনক। এইরূপ সাধারণ মানবমাত্রেরই ধারণা। স্বর্গসুখই কামনার চরম লক্ষ্য।

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচগ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্॥"

"যাহা দুঃখসংস্পর্শলেশশূন্য, যাহা ভবিষ্যতেও কখন দুঃখগ্রস্ত হইবে না, যাহা কামনার সর্ব্বোচ্চ পরিপূর্ত্তি, তদ্বিধ সুখই স্বর্গপদবাচ্য", ইহা জৈমিনীয় স্মৃতি কহিতেছেন। "স্বর্গকামো যজেত", উক্ত স্বর্গ কামনা করিয়া মনুষ্য যাগ

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই কর্ম্মকাণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুখপ্রিয় মনুষ্য ইহাপেক্ষা আর অধিক কিছু চাহেন না।

কিন্তু এই সুখ সুখকর হইলেও সর্ব্ব প্রকারে সুখকর নহে, কারণ তাহা সংস্পর্শজন্য। অতএব সুখের সামগ্রী বহির্দ্দেশে থাকায় তাহা কাহারও সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তাধীন নহে। এদিকে আবার মনুষ্যের সুখলিপ্সার অন্ত নাই, কিন্তু সংস্পর্শজন্য সুখ আদ্যন্তবান্; তদ্রূপ সুখে কি তাঁহার অনন্ত পিপাসা মিটিতে পারে? সে পিপাসা মিটাইতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন সুখের আবশ্যক, তাহার সুখ সামগ্রী বাহিরে থাকিলে চলিবে না, আপনার ভিতরেই উপলব্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মারাম না হইলে নিত্য সুখের অধিকারী হওয়া যাইবে না। শ্রীগীতায় ভগবান্ ইহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আত্মারাম হইতে হইলে বাসনাত্যাগ করিতে হইবে, কারণ বাসনা বহির্বস্তুরই হইয়া থাকে। বহিঃ সম্বন্ধ ত্যাগ না করিলে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হওয়া যায় না; তাহা না হইলে অভাবও মিটিবে না; অভাব থাকিলে দুঃখও দূর হইবে না। অতএব বাসনাত্যাগই পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায়। সাধারণ মানব ইহা ধারণা করিতে সক্ষম নহেন। সুখের সামগ্রী নাই অথচ সুখ হয়, ইহা তাঁহার বোধগম্য হয় না। এইজন্যই অধিকাংশ লোকেরই কর্ম্মকাণ্ডে রুচি।

কর্ম্মময় মনুষ্য চিরকালই কর্ম্মপরবশ। অতএব যদিও এখন বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির প্রাচীন কালের ন্যায় তাদৃশ বহুল প্রচার নাই, তথাপি মনুষ্যসমাজে কর্ম্মের কিছুই লাঘব দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ম্মকাণ্ড অক্ষুণ্ণভাবে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে। তবে, কর্ম্মের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। পূর্ব্বে পরমপবিত্র দ্যুতিমান্ আহবনীয় অগ্নি স্থণ্ডিলোপরি প্রজ্জলিত করিয়া তন্মধ্যে স্বাহা স্বধা মন্ত্রে দেবপিতৃগণকে হব্যকব্য সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা বিধান করা হইত; এক্ষণে বিবিধ আকারের মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদিসহযোগে সর্ব্বত্র তাঁহাদের পূজা চলিতেছে। সমাজের রুচি অনুসারে কর্ম্মেরও আকার এবং গতি পরিবর্ত্তিত হয়, এই জন্য বৈদিক সময়ের কর্ম্মরীতি বর্ত্তমান কালে প্রায়ই দেখা যায় না। বর্ত্তমান রীতি বর্ত্তমান কালের উপযোগী। কর্ম্মের উদ্দেশ্য এক হইলেও কালভেদে পথ বহুবিধ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

এবং তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়, জগৎ কি সত্য? এই প্রশ্নই ধর্ম্মের আরম্ভ এবং উহার উত্তরেই ধর্ম্মের পর্য্যাপ্তি। এমন কি, সুদূর অতীত কালে, যথায় প্রণালীবদ্ধ ইতিহাসের অনধিকার, সেই রহস্যময় পৌরাণিক যুগেও, সেই সভ্যতার অস্ফুট উষাকালেও আমরা দেখিতে পাই, এই একই প্রশ্ন তখনও জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—'জগৎ কি সত্য?'

কবিত্বময় কঠোপনিষদের প্রারম্ভে আমরা এই প্রশ্ন দেখিতে পাই, 'মানুষ মরিয়া গেলে কেহ কেহ বলেন, তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না, কেহ কেহ আবার বলেন, না, তখনও তাহার অস্তিত্ব থাকে, ইহার মধ্যে কোন্‌টী সত্য?' (যেয়ম্ প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।) জগতে এসম্বন্ধে অনেক প্রকার উত্তর বিদ্যমান আছে। জগতে যত প্রকার দর্শন বা ধর্ম্ম আছে, তাহা বাস্তবিক এই প্রশ্নেরই বিভিন্নরূপ উত্তরে পরিপূর্ণ। অনেকে আবার এই প্রশ্নকে—প্রাণের এই গভীর আকাঙ্ক্ষাকে—এই জগদতীত পরমার্থ সত্তার অন্বেষণকে—বৃথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন মৃত্যু বলিয়া জগতে কিছু থাকিবে, ততদিন এই সকল উড়াইয়া দিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে। আমরা মুখে খুব সহজে বলিতে পারি, জগতের অতীত সত্তার অন্বেষণ করিব না, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই আমাদের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা আবদ্ধ রাখিব; আমরা ইহার জন্য খুব চেষ্টা করিতে পারি, আর বহির্জ্জগতের সকল বস্তুই আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের সীমার ভিতরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে; সমুদয় জগৎ মিলিয়া বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে নিবারণ করিতে পারে; কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু থাকিবে, ততদিন এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ আসিবে,—আমরা এই যে সকল বস্তুকে সত্যের সত্য, সারের সার বলিয়া তাহাতে ভয়ানক আসক্ত, মৃত্যুই কি ইহাদের চরম পরিণাম? জগৎ ত এক মুহূর্ত্তেই ধ্বংস হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী পর্ব্বত—নিম্নে গভীর গহ্বর, যেন বদন ব্যাদান করিয়া জীবকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, যত কঠোর অন্তঃকরণই হউক, নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবে, আর জিজ্ঞাসা করিবে,—এসব কি সত্য? কোন তেজস্বী হৃদয় সারা জীবন ধরিয়া মহান্ আগ্রহের সহিত হৃদয়ে যে আশা পোষণ করিলেন, এক মুহূর্ত্তে তাহা উড়িয়া গেল। তবে কি ঐ সকল আশাকে সত্য বলিব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

কালে কখন প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষার, হৃদয়ের এই গভীর প্রশ্নের শক্তি হ্রাস হইবে না, বরং যতই কালস্রোত চলিবে, ততই উহার শক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই উহা হৃদয়ের উপর গভীর বেগে আঘাত করিবে। মানুষের সুখী হইবার ইচ্ছা। আপনাকে সুখী করিবার জন্য মানুষ সর্ব্বত্র ধাবমান হয়—ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া থাকে—উন্মত্তের ন্যায় বহির্জ্জগতে কার্য্য করিয়া যায়। যে যুবাপুরুষ জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, এই জগৎ সত্য—তাঁহার সমস্তই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। হয়ত সেই ব্যক্তিই, যখন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, যখন সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বঞ্চনা করিতে থাকিবেন—সেই ব্যক্তিই হয়ত জিজ্ঞাসিত হইলে বলিবেন, 'সবই অদৃষ্ট'। তিনি এতদিনে দেখিতে পাইলেন—বাসনার পূরণ হয় না। তিনি যেখানেই যান, তথায়ই যেন এক বজ্রদৃঢ় প্রাচীর দেখিতে পান; তাহা অতিক্রম করিয়া যাইবার তাঁহার সাধ্য নাই। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। সুখ দুঃখ উভয়ই ক্ষণস্থায়ী। বিলাস, বিভব, শক্তি, দারিদ্র্য, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

এই প্রশ্নের দুইটী উত্তর আছে। একটী—শূন্যবাদীদের মত বিশ্বাস কর যে, সবই শূন্য, আমরা কিছুই জানিতে পারি না, আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান সম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারি না। কারণ, যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিয়া কেবল বর্ত্তমানে লাগিয়া থাকিতে চাহে, সে ব্যক্তি বাতুল। তাহা হইলে, সে পিতামাতাকে অস্বীকার করিয়া সন্তানের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে পারে! উহাও তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গত হইয়া পড়ে। ভূত ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিলে, বর্ত্তমানও অস্বীকার করিতে হইবে। এই এক ভাব—ইহা শূন্যবাদীদের মত। কিন্তু আমি এমন লোক দেখিলাম না, যে এক মুহূর্ত্তও শূন্যবাদী হইতে পারে;—মুখে বলা অবশ্য খুব সহজ।

দ্বিতীয় উত্তর এই,—এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরের অন্বেষণ কর—সত্যের অন্বেষণ কর—এই নিত্যপরিণামশীল নশ্বর জগতের মধ্যে কি সত্য আছে, অন্বেষণ কর। এই দেহ, যাহা কতকগুলি ভৌতিক অণুর সমষ্টিমাত্র, ইহার মধ্যে কি কিছু সত্য আছে? মানব-জীবনের ইতিহাসে সর্ব্বদাই এই তত্ত্ব অন্বেষিত হইয়াছে, দেখা যায়। আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালেই মানবের মনে এই তত্ত্বের অস্ফুট আলোক প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই, তখন হইতেই মানুষ স্থূলদেহের অতীত আর একটী দেহের জ্ঞানলাভ করিয়াছে—উহা অনেকাংশে ঐ দেহেরই মত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে; উহা স্থূল দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ—শরীর ধ্বংস হইয়া গেলেও উহার ধ্বংস হইবে না। আমরা ঋগ্বেদের সূক্তে একটী মৃতশরীর-দাহনকারী অগ্নিদেবের উদ্দেশে নিম্নলিখিত স্তব দেখিতে পাই,—"হে অগ্নি, তুমি ইহাকে তোমার হস্তে করিয়া মৃদুভাবে লইয়া যাও—ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, জ্যোতির্ম্ময়দেহসম্পন্ন কর—ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও,যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, যেখানে দুঃখ নাই, যেখানে মৃত্যু নাই।" তুমি দেখিবে, সকল ধর্ম্মেই এই একরূপ ভাব বিদ্যমান, আর তাহার সহিত আমরা আর একটী তত্ত্বও পাইয়া থাকি। আশ্চর্য্যের বিষয় সকল ধর্ম্মই,সমস্বরে,ঘোষণা করেন,মানুষ প্রথমে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিলেন, এক্ষণে তিনি অবনত হইয়া পড়িয়াছেন—এ ভাব তাঁহারা রূপক ভাষায়, কিম্বা দর্শনের সুস্পষ্ট ভাষায়, অথবা সুন্দর কবিত্বের ভাষায় আবৃত করিয়া প্রকাশ করুন না, তাঁহারা সকলেই ঐ এক তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্র এবং সকল পুরাণ হইতেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে অবনত-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। য়াহুদীদের শাস্ত্র বাইবেলের পুরাতন ভাগে আদমের পতনের যে গল্প আছে, তাহার মধ্যে সার কথা এই। হিন্দুশাস্ত্রে ইহা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সত্যযুগ বলিয়া যে যুগের বর্ণনা করিয়াছেন, যখন মানুষ ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন, যখন মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীর রক্ষা করিতে পারিতেন, যখন লোকের মন শুদ্ধ ও দৃঢ় ছিল, তাহাতেও এই সার্ব্বভৌমিক সত্যের ইঙ্গিত দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, তখন মৃত্যু ছিল না এবং কোনরূপ অশুভ বা দুঃখ ছিল না, আর বর্ত্তমান যুগ সেই উন্নত অবস্থার অবনতভাব মাত্র। এই বর্ণনার সহিত আমরা সর্ব্বত্রই জলপ্লাবনের বর্ণনা দেখিতে পাই। এই জলপ্লাবনের গল্পেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সকল ধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগকে প্রাচীন যুগের অবনত অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জগৎ ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দ হইতে আরম্ভ হইল। অবশেষে জলপ্লাবনে অধিকাংশ লোক জলমগ্ন হইল, আর আবার উন্নতি আরম্ভ হইল। আবার উহা সেই পূর্ব্ব পবিত্র অবস্থা লাভের জন্য ধীরে ধীরে চলিতেছে। আপনারা সকলেই ওল্ড টেষ্টামেণ্টের জলপ্লাবনের গল্প জানেন। ঐ একই প্রকার গল্প প্রাচীন বাবিল, ঈজিপ্সিয়ান, চাইনিজ এবং হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত

ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে জলপ্লাবনের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:—মহর্ষি মনু একদিন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।' মনু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সন্নিহিত একটা জলপাত্রে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কি চাও?' মৎস্যটী বলিল, 'এক বৃহৎ মৎস্য আমার বিনাশাভিপ্রায়ে আমার অনুসরণ করিতেছে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' মনু উহাকে গৃহে লইয়া গেলেন, প্রাতঃকালে দেখেন, সে ঐ পাত্রপ্রমাণ হইয়াছে। সে বলিল, 'আমি এ পাত্রে আর থাকিতে পারি না।' মনু তখন তাহাকে এক চৌবাচ্চায় স্থাপন করিলেন। পরদিন সে ঐ চৌবাচ্চাপ্রমাণ হইল, আর বলিল, 'আমি এখানেও থাকিতে পারিতেছি না।' তখন মনু তাহাকে নদীতে স্থাপন করিলেন। প্রাতে যখন দেখিলেন, তাহার কলেবরে নদী পূর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি উহাকে সমুদ্রে স্থাপন করিলেন। তখন মৎস্য বলিতে লাগিলেন, 'মনু, আমি জগতের সৃষ্টিকর্তা। আমি জলপ্লাবন দ্বারা জগৎ ধ্বংস করিব; তোমাকে সাবধান করিবার জন্য আমি এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছি। তুমি একখানি সুবৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রাণী, এক এক জোড়া করিয়া, রক্ষা কর এবং স্বয়ং সপরিবারে উহাতে প্রবেশ কর। সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে, তাহার মধ্যে তুমি আমার শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে। তাহাতে নৌকাখানি বাঁধিবে। তার পর, জল কমিয়া আসিলে নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া প্রজাবৃদ্ধি কর।' এইরূপে ভগবানের কথানুসারে জলপ্লাবন হইল এবং মনু নিজ পরিবার এবং সর্ব্বপ্রকার জন্তুর এক এক জোড়া এবং সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের বীজ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিলেন, এবং উহার অবসানে তিনি ঐ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া জগতে প্রজা উৎপন্ন করিতে লাগিলেন— আর আমরা মনুর বংশধর বলিয়া মানব নামে অভিহিত (মন্ ধাতু হইতে মনু শব্দ সিদ্ধ; মন্ ধাতুর অর্থ মনন অর্থাৎ চিন্তা করা)। এক্ষণে দেখ, মানবভাষা সেই অভ্যন্তরীণ সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা মাত্র। আমার স্থির বিশ্বাস—এই সকল গল্প আর কিছুই নয়, একটী ছোট বালক—অস্পষ্ট অস্ফুট শব্দরাশিই যাহার একমাত্র ভাষা—সে যেন সেই ভাষায় গভীরতম দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কেবল শিশুর উহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় অথবা অন্য কোনরূপ উপায়ও নাই। উচ্চতম দার্শনিক এবং শিশুর ভাষায় কোন প্রকার-গত ভেদ নাই, কেবল গ্রামগত ভেদ

আছে মাত্র। আজকালকার বিশুদ্ধ, প্রণালীবদ্ধ, গণিতের তুল্য সঠিক কাটাছাঁটা ভাষা, আর প্রাচীনদিগের অস্ফুট রহস্যময় পৌরাণিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল গ্রামের উচ্চতা নিম্নতা। এই সকল গল্পেরই পশ্চাতে এক মহান্ সত্য আছে, প্রাচীনেরা উহা যেন প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক সময় এই সকল প্রাচীন পৌরাণিক গল্পগুলিরই ভিতরে মহামূল্য সত্য থাকে, আর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিকদিগের চাঁচা ছোলা ভাষার ভিতরে অনেক সময় কেবল ভুষীমাল পাওয়া যায়। অতএব রূপকের আবরণে আবৃত বলিয়া, আর আধুনিক কালের রাম শ্যামের মনে লাগে না বলিয়া প্রাচীন সব জিনিষই একেবারে ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। 'অমুক মহাপুরুষ এই কথা বলিয়াছেন, অতএব ইহা বিশ্বাস কর,' ধর্ম্মসকল এইরূপ বলাতে যদি তাহারা উপহাসের যোগ্য হয়, তবে আধুনিকগণকে অধিক উপহাস করা আবশ্যক। এখনকার কালে যদি কেহ মুশা, বুদ্ধ বা ঈশার উক্তি উদ্ধৃত করে, সে হাস্যাস্পদ হয়, কিন্তু হাক্সলি (Huxley), টিণ্ডাল (Tyndall) বা ডারুইনের (Darwin), নাম করিলেই লোকে সে কথা একেবারে অকাট্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লয়। 'হাক্সলি এই কথা বলিয়াছেন,' অনেকের পক্ষে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট! আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছিই বটে! আগে ছিল ধর্ম্মের কুসংস্কার, এখন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার; তবে আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিকভাব আসিত, এই আধুনিক কুসংস্কারের ভিতর দিয়া কেবল কাম ও লোভ আসিতেছে। সে কুসংস্কার ছিল ঈশ্বরের উপাসনা লইয়া, আর আধুনিক কুসংস্কার—অতিঘৃণিত ধন যশ বা শক্তির উপাসনা। ইহাই প্রভেদ। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক গল্পগুলি সম্বন্ধে আবার আলোচনা করা যাউক। এই সমুদয় গল্পগুলির ভিতরেই এই এক প্রধান ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, তাহা হইতে এক্ষণে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। আধুনিক কালের তত্ত্বান্বেষিগণ বোধ হয় যেন এই তত্ত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ বোধ হয় যেন এই সত্য একেবারে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে মানুষ ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষের (Mollusc) ক্রমবিকাশমাত্র, অতএব পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না। ভারতীয় পুরাণ কিন্তু উভয় মতেরই সমন্বয় করিতে সমর্থ। ভারতীয় পুরাণ

মতে, সকল উন্নতিই তরঙ্গাকারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক তরঙ্গই একবার উঠিয়া আবার পড়ে, পড়িয়া আবার উঠে, আবার পড়ে, এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে। প্রত্যেক গতিই চক্রাকারে হইয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলেও দেখা যাইবে, মানুষ কেবল ক্রমবিকাশে উৎপন্ন, এ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। ক্রমবিকাশ বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াকেও ধরিতে হইবে। বিজ্ঞানবিৎই তোমায় বলিবেন, কোন যন্ত্রে তুমি যে পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করিবে, উহা হইতে তুমি সেই পরিমাণ শক্তিই পাইতে পার। অসৎ (কিছু না) হইতে সৎ (কিছু) কখন হইতে পারে না। যদি মানব—পূর্ণ মানব—বুদ্ধ মানব, খ্রীষ্ট-মানব, ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে ঐ জন্তুকেও ক্রমসঙ্কুচিত বুদ্ধ বলিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে এই মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন? অসৎ হইতে ত কখন সতের উদ্ভব হয় না। এইরূপে আমরা শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পারি। যে শক্তি ধীরে ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিণত হয়, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। উহা কোথাও না কোথাও বর্ত্তমান ছিল; আর যদি তোমরা বিশ্লেষণ করিতে করিতে গিয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষ বা জীবাণু (Protoplasm) পর্য্যন্ত গিয়া উহাকেই আদিকারণ স্থির করিয়া থাক, তবে ইহা নিশ্চয় যে, ঐ জীবাণুতে ঐ শক্তি কোন না কোন রূপে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান কালে এই এক মহা বিচার চলিতেছে যে, এই ভূতসমষ্টি দেহই কি আত্মা, চিন্তা প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত শক্তির বিকাশের কারণ, অথবা চিন্তাশক্তিই দেহোৎপত্তির কারণ? অবশ্য জগতের সকল ধর্ম্মই বলেন, চিন্তা বলিয়া পরিচিত শক্তিই শরীরের প্রকাশক—তাঁহারা ইহার বিপরীত মতে আস্থা প্রকাশ করেন না। আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মত,—চিন্তাশক্তি কেবল শরীর নামক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষরূপ সন্নিবেশে উৎপন্ন। এই দ্বিতীয় মতটীতে, যাহাতে বলে, আত্মা এই জড়দেহরূপ যন্ত্রের যে সকল ভূত মস্তিষ্ক ও শরীর গঠন করিতেছে, তাহাদের রাসায়নিক বা ভৌতিক যোগে উৎপন্ন, তাহাতে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া যায়। শরীর গঠন করে কে? কোন্ শক্তি এই ভৌতিক অণুগুলিকে শরীররূপে পরিণত করে? কোন্ শক্তি প্রকৃতিস্থ জড়বস্তুরাশি হইতে কিয়দংশ লইয়া, তোমার শরীর একরূপে, আমার শরীর আর এক

রূপে, গঠন করে? এই সকল বিভিন্নতা কিসে হয়? আত্মানামক শক্তি শরীরস্থ ভৌতিক পরমাণুগুলির বিভিন্ন সন্নিবেশে উৎপন্ন বলিলে 'গাড়ীর পেছনে ঘোড়া জোতার' ন্যায় হয়। কিরূপে এই সন্নিবেশ উৎপন্ন হইল? কোন্ শক্তি উহা করিল? যদি তুমি বল, অন্য কোন শক্তি এই সংযোগ সাধন করিয়াছে, আর আত্মা ঐ ভূত হইতেই উৎপন্নমাত্র, যে আত্মা কতকগুলি জড়রাশিকে একত্র করিয়াছে, তাহাই আবার ঐ জড় পরমাণু সকলের সংযোগের ফলস্বরূপ, তাহা হইলে কোন উত্তর হইল না। যে মত, অন্যান্য মতকে খণ্ডন না করিয়া, সমুদয় না হউক, অধিকাংশ ঘটনা—অধিকাংশ বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহাই গ্রহণীয়। সুতরাং ইহাই বেশী যুক্তিসঙ্গত যে, যে শক্তি জড়রাশি গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে শরীর গঠন করে, তাহা, যে শক্তি শরীরের ভিতরে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহার সহিত অভেদ। অতএব, 'চিন্তাশক্তি কেবল জড়াণুর সংযোগোৎপন্ন, সুতরাং তাহার অস্তিত্বই নাই,' এই কথার কোন অর্থ নাই; আর শক্তি কখন জড় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। বরং ইহা প্রমাণ করা অধিক সম্ভব যে, যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহার অস্তিত্বই নাই। উহা কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থামাত্র। কাঠিন্য প্রভৃতি জড়ের গুণ সকল বিভিন্নরূপ গতির ফল, প্রমাণ করা যাইতে পারে। জড়ীয় পরমাণুর ভিতর প্রবল কম্পন উৎপাদন করিলে, উহা কঠিন হইয়া যাইবে। যদি খানিকটা বায়ুরাশির ভিতরে প্রবল কম্পন উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে উহা একটী টেবিলের মত কঠিনাকার ধারণ করিবে। মাকড়শার জালের একটী সূতাতে যদি অত্যন্ত অধিক বেগ দেওয়া যায়, তবে উহা একটী লৌহ শৃঙ্খলের মত কঠিন ও দৃঢ় হইয়া যাইবে—এত দৃঢ় হইবে যে, উহা একটী ওক-বৃক্ষকে পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া যাইবে—গতিরদ্বারা উহার ভিতরে এতদূর শক্তি সঞ্চারিত হইবে। এইরূপ ভাবে বিচার করিলে ইহা বরং প্রমাণ করা সহজ হইবে যে, আমরা যাহাকে ভূত বলি, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই, কিন্তু অপর মত প্রমাণ করা যায় না।

শরীরের ভিতরে এই যে শক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, ইহা কি? আমরা সকলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারি ঐ শক্তি যাহাই হউক, উহা জড়পরমাণুগুলিকে লইয়া তাহা হইতে আকৃতি-বিশেষ—মনুষ্য-দেহ—গঠন করিতেছে। আর কেহ আসিয়া তোমার আমার জন্য শরীর গঠন করে না। অপরে আমার হইয়া খাইতেছে, এরূপ আমি কখন দেখি নাই। আমাকেই ঐ খাদ্যের সার

শরীরে গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি সমুদয়ই গঠন করিতে হয়। এই অদ্ভুত শক্তিটী কি? ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত মানুষের পক্ষে ভয়াবহ বোধ হয়; অনেকের পক্ষে উহা কেবলমাত্র আনুমানিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা সুতরাং বর্ত্তমানে কি হয়, সেইটীই বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা বর্ত্তমান বিষয়টীই গ্রহণ করিব। সে শক্তিটী কি, যাহা এক্ষণে আমাদের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছে? আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন কালে সকল প্রাচীন শাস্ত্রেই এই শক্তিকে লোকে এই শরীরেরই মত শরীরসম্পন্ন একটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বলিয়া চিন্তা করিত, উহা ঐ শরীর যাইলেও থাকিবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাই, ঐ জ্যোতির্ম্ময় দেহমাত্র বলিয়া সন্তোষ হইতেছে না—আর একটী উচ্চতর ভাব লোকের মন অধিকার করিতেছে। তাহা এই যে, কোনরূপ শরীর শক্তির স্বাভিব্যক্ত হইতে পারে না। যাহারই আকৃতি আছে, তাহাই কতকগুলি পরমাণুর সংহতিমাত্র, সুতরাং উহাকে পরিচালিত করিতে আর কিছুর প্রয়োজন। যদি এই শরীরকে গঠন ও পরিচালন করিতে এই শরীরাতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই কারণেই ঐ জ্যোতির্ম্ময় দেহের গঠন ও পরিচালনে তদ্দেহাতিরিক্ত আর কিছুর প্রয়োজন হইবে। এই 'আর কিছুই' আত্মা শব্দে অভিহিত হইল। আত্মাই ঐ জ্যোতির্ম্ময় দেহের মধ্য দিয়া যেন স্থূল শরীরের উপর কার্য্য করিতেছেন। ঐ জ্যোতির্ম্ময় দেহই মনের আধার বলিয়া বিবেচিত হয়, আর আত্মা উহার অতীত। আত্মা মন নহেন, তিনি মনের উপর কার্য্য করেন এবং মনের মধ্য দিয়া শরীরের উপর কার্য্য করেন। তোমার একটী আত্মা আছে, আমার একটী আত্মা আছে, প্রত্যেকরই পৃথক্ পৃথক্ একটী একটী আত্মা আছে এবং একটী একটী সূক্ষ্ম শরীরও আছে; ঐ সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যে আমরা স্থূল দেহের উপর কার্য্য করিয়া থাকি। এক্ষণে এই আত্মা ও উহার স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। শরীর ও মন হইতে পৃথক্ এই আত্মার স্বরূপ কি? অনেক বাদ প্রতিবাদ হইতে লাগিল, নানাবিধ সিদ্ধান্ত ও অনুমান হইতে লাগিল, নানাপ্রকার দার্শনিক অনুসন্ধান হইতে লাগিল,—আমি আপনাদের সমক্ষে এই আত্মা সমন্ধে তাঁহারা যে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের এই এক বিষয়ে মতৈক্য দেখা যায় যে, আত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, উহার কোন আকৃতি নাই, আর যাহার আকৃতি নাই, তাহা

বলা যাইতেছে যে) জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শী। অনেক ব্যক্তি (শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু বিষয়ে) জ্ঞানসম্পন্ন, অথচ যথাযথ ভাবে তত্ত্ববস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন না, এই জন্যই এখানে জ্ঞানী এই কথা বলিয়াও ঐ সকল অসম্যগ্‌দর্শী জ্ঞানীগণের প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য আবার তত্ত্বদর্শী এই প্রকার বিশেষণের উপাদান করিয়াছেন। যাঁহারা সম্যগ্‌দর্শী, তাঁহারা যে জ্ঞানের উপদেশ দেন, তাহাই কার্য্যক্ষম হয়, তদ্বিপরীত জ্ঞান কার্য্যক্ষম হয় না, ইহাই ভগবানের মত॥ ৩৪॥

---

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫॥

অন্বয়।—হে পাণ্ডব! যজ্‌জ্ঞাত্বা পুনরেবং মোহং ন যাস্যসি, যেন চ (জ্ঞানেন) অথো অশেষেণ ভূতানি আত্মনি ময়ি দ্রক্ষ্যসি॥ ৩৫॥

মূলানুবাদ।—হে পাণ্ডুপুত্র! যে জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি আর এই প্রকার মোহের বশ হইবে না এবং যে জ্ঞানের প্রসাদে তুমি সকলের আশ্রভূত আমাতে সকল ভূতই (প্রবিষ্ট আছে ইহা) দেখিতে পাইবে॥ ৩৫॥

ভাষ্য।—তথাচ সতি ইদং অপি সমর্থং বচনং যদিতি। যজ্‌ জ্ঞাত্বা যজ্‌ জ্ঞানং তৈরুপদিষ্টমধিগম্য প্রাপ্য পুনর্ভূয়ো মোহমেবং যথেদানীং মোহং গতোঽসি পুনরেবং ন যাস্যসি হে পাণ্ডব। কিঞ্চ যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষেণ ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি দ্রক্ষ্যসি আত্মনি মত্‌সংস্থানীমানি ভূতানি ইতি অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চেমানি ইতি ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্ব্বোপনিষৎসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ হইলে এই বচনটী সার্থক হইয়া উঠে যে, যদিত্যাদি। যে জ্ঞানকে জানিয়া (অর্থাৎ) সেই সকল আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া, হে পাণ্ডব! তুমি এক্ষণে যে প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইয়াছ, আর এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না। আরও বলি যে জ্ঞানের বলে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ নিজ আত্মাতে ব্রহ্মাদিস্থাবর পর্য্যন্ত সকল ভূতকেই সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে এবং বাসুদেব পরমেশ্বর স্বরূপ আমাতেও সকল ভূত দেখিতে পাইবে। সকল উপনিষৎ সিদ্ধ জীব ও পরমেশ্বরের একত্ব তুমি সাক্ষাৎ করিবে, ইহাই অর্থ॥ ৩৫॥

---

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬॥

অন্বয়।—সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি পাপকৃত্তমঃ চেদসি, (তথাপি) জ্ঞানপ্লবেনৈব সর্ব্বং বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬॥

মূলানুবাদ।—তুমি যদি সকল পাপীগণ হইতেও অধিক পাপকারী হও, তাহা হইলেও জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে (সকল) পাপ-সমুদ্র পার হইতে পারিবে॥ ৩৬॥

ভাষ্য।—কিঞ্চৈতস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যং। অপীতি পাপেভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ অতিশয়েন পাপকৃৎ পাপকৃত্তমঃ সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানমেব প্লবং কৃত্বা বৃজিনং বৃজিনার্ণবং পাপং সন্তরিষ্যসি ধর্ম্মোঽপীহ মুমুক্ষোঃ পাপমুচ্যতে॥ ৩৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও এই জ্ঞানের মাহাত্ম্য বলা যাইতেছে যে, অপিচেদিত্যাদি। "পাপ" অর্থাৎ সকল পাপকারিগণ হইতেও যদি তুমি "পাপকৃত্তম অধিক পাপকারী হও, তাহা হইলেও জ্ঞানপ্লব (অর্থাৎ) জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে বৃজিন অর্থাৎ বৃজিন রূপ অর্ণব (পাপ সমুদ্র) পার হইতে পারিবে, মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মও পাপ বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

---

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন! সমিদ্ধোঽগ্নি যথা এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে॥ ৩৭॥

মূলানুবাদ।—হে অর্জ্জুন। প্রদীপ্ত অগ্নি যে প্রকার কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, সেই প্রকারে জ্ঞানাগ্নিও সকল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে॥ ৩৭॥

ভাষ্য।—জ্ঞানং কথং নাশয়তি পাপমিতি সদৃষ্টান্তমুচ্যতে যথেতি। যথা এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ সম্যগিদ্ধঃ দীপ্তোঽগ্নিঃ ভস্মসাৎ ভস্মীভাবং কুরুতে অর্জ্জুন জ্ঞানমেবাগ্নির্জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে নির্ব্বীজীকরোতি ইত্যর্থঃ। নহি সাক্ষাদেব জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীন্ধনবৎ ভস্মীকর্ত্তুং শক্নোতি তস্মাৎ সম্যগ্‌দর্শনং সর্ব্বকর্ম্মণাং নির্ব্বীজত্বে কারণমিত্যভিপ্রায়ঃ। সামর্থ্যাৎ যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎপ্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে-

হতো যান্যপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্‌কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চ অতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্যেব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—জ্ঞান কি প্রকারে পাপ নাশ করিয়া থাকে, তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা যাইতেছে যে যথেতি।

সম্যক্ প্রদীপ্ত অগ্নি যে প্রকার কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে, হে অর্জ্জুন! সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নিও সকল কর্ম্মকেই ভস্মীভূত করিয়া থাকে (অর্থাৎ) কর্ম্মসমূহের বীজভাবকে নষ্ট করিয়া থাকে (তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞান হইলে কর্ম্মের ভোগসম্পাদিকা শক্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে), জ্ঞানাগ্নি সাক্ষাৎ ইন্ধনের ন্যায় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করিতে পারে না, এই কারণে বলিতে হইবে যে, জ্ঞান (অজ্ঞানরূপ সহকারি কারণের বিনাশ করিয়া) কর্ম্মনিকরের নির্ব্বীজতার প্রতি কারণ হইয়া থাকে। যে কর্ম্মের দ্বারা এই শরীর আবদ্ধ হইয়াছে, তাহার ফল প্রবৃত্তই হইয়াছে, সুতরাং ফলের উপভোগ হইলেই তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। এই কারণে যোগ্যতানুসারে কল্পনা করিতে হইবে যে, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে এই জন্মে যে সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছে এবং যে সকল কর্ম্মফলের আরম্ভও হয় নাই, সেই সকল কর্ম্ম এবং জ্ঞানোৎপত্তিকালে কৃত কর্ম্ম সকল ও অতীত বহুতর জন্মকৃত কর্ম্মই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীকৃত হইয়া থাকে॥ ৩৭ ॥

---

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—ইহ (সংসারে) জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ন (হি) বিদ্যতে। স্বয়ং এব (মুমুক্ষুঃ) যোগসংসিদ্ধঃ সন্ কালেন (মহতা) আত্মনি তজ্ জ্ঞানং বিন্দতি॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদ।—এই সংসারে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই, (মোক্ষার্থী) পুরুষ স্বয়ং সমাধিসিদ্ধ হইয়া সেই জ্ঞান আপনাতেই লাভ করিতে সমর্থ হয়॥ ৩৮ ॥

ভাষ্য।—যত এবমতঃ নহীতি। নহি জ্ঞানেন সদৃশং তুল্যং পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরমিহ বিদ্যতে। তজ্জ্ঞানং স্বয়মেব যোগসংসিদ্ধঃ যোগেন কর্ম্মযোগেণ সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতঃ যোগ্যতামাপন্নঃ মুমুক্ষুঃ কালেন মহতা আত্মনি বিন্দতি লভতে ইত্যর্থঃ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে হেতু এই প্রকার (জ্ঞানের স্বভাব), এই জন্য নহি জ্ঞানেন ইত্যাদি। জ্ঞানের "সদৃশ" তুল্য "পবিত্র" পাবন (অর্থাৎ) শুদ্ধিকর বস্তু এই জগতে নাই। স্বয়ংই কর্ম্মযোগ ও সমাধিযোগের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি, বহুকালের পর আত্মাতেই সেই জ্ঞানকে লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৩৮ ॥

---

শ্রদ্ধাবাল্ল ভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ (সন) শ্রদ্ধাবান জ্ঞানং লভতে, (তথা) জ্ঞানং লব্ধা অচিরেণ পরাং শান্তিং অধিগচ্ছতি॥ ৩৯ ॥

মূলানুবাদ —তৎপর জিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন (যোগী) জ্ঞানলাভ করে, জ্ঞানলাভের পর শীঘ্রই পরম শান্তি (মোক্ষ) লাভ করিতে সমর্থ হয়॥ ৩৯ ॥

ভাষ্য।—যেন একান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তির্ভবতি সউপায় উপদিশ্যতে শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধালুঃ লভতে জ্ঞানং। শ্রদ্ধালুত্বেঽপি ভবতি কশ্চিন্মন্দপ্রস্থানঃ, অতআহ তৎপরঃ গুরূপাসনাদৌ অভিযুক্তো জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ে শ্রদ্ধাবান্ তৎপরোঽপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ ইত্যত আহ সংযতেন্দ্রিয়ঃ সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতানি যস্যেন্দ্রিয়াণি স সংযতেন্দ্রিয়ঃ য এবং ভূতঃ শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ সোঽবশ্যং জ্ঞানং লভতে। প্রণিপাতাদিস্তু বাহ্যোঽনৈকান্তিকোঽপি ভবতি মায়াবিত্বাদিসম্ভবাৎ নতু তচ্ছ্রদ্ধাবত্ত্বাদৌ ইতি একান্ততোজ্ঞানলব্ধ্যুপায়ঃ। কিং পুনর্জ্ঞানলাভাৎ স্যাৎ ইত্যুচ্যতে জ্ঞানং লব্ধা পরাং মোক্ষাখ্যাং শান্তিং উপরতিং অচিরেণ ক্ষিপ্রমেব অধিগচ্ছতি। সম্যগ্ দর্শনাৎ ক্ষিপ্রমেব মোক্ষোভবতীতি সর্ব্বশাস্ত্রযুক্তিশিচতোঽর্থঃ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে উপায় দ্বারা নিশ্চয়ই জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, সেই উপায়ের উপদেশ করা হইতেছে, জ্ঞানং লব্ধা ইত্যাদি। শ্রদ্ধাবান্ (অর্থাৎ শ্রদ্ধালু জ্ঞান লাভ করে। শ্রদ্ধালু হইয়াও কেহ কেহ সাধনানুষ্ঠানে একাগ্র হয় না। এই কারণ বলিতেছেন যে, তৎপর (হইতে হইবে); জ্ঞানলাভের উপায়ে বিশ্বাসযুক্ত হইয়া গুরুর উপাসনা প্রভৃতি (জ্ঞানলাভের) উপায়ের অনুষ্ঠান (নিয়ত) যে করে, তাহাকেই তৎপর বলা যায়। তৎপর হইয়া (যদি কেহ অজিতেন্দ্রিয় হয় (সে জ্ঞানলাভ করিতে পারে না), ইহাই প্রকারান্তরে বলিতেছেন যে সংযতেন্দ্রিয় (হইতে হইবে); সংযত

(অর্থাৎ) বিষয়সমূহ হইতে নিবর্ত্তিত যাহার ইন্দ্রিয় সকল (এই প্রকার) হয়, তাহাকেই সংযতেন্দ্রিয় বলে। যে ব্যক্তি এইরূপ শ্রদ্ধাবান্, তৎপর, ও সংযতেন্দ্রিয় সেই ব্যক্তি অবশ্য জ্ঞানলাভ করে। প্রণাম প্রভৃতি উপায় বাহ্য এবং উহা দ্বারা সকল সময়ে ফলও হয় না, কারণ ইহাতে প্রতারণা প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শ্রদ্ধা প্রভৃতি আন্তরিক উপায়ে প্রতারণাদির সম্ভাবনা নাই বলিয়া এই সকল আন্তর উপায়ে ফল অবশ্যই হয় সুতরাং এই কয়টীই জ্ঞানলাভের অব্যভিচরিত উপায়। জ্ঞানলাভে কি হয় তাহাই বলিতেছেন যে জ্ঞানলাভ করিয়া পরম শান্তিকে অচিরে (অর্থাৎ) শীঘ্রই লাভ করিয়া থাকে; পরম শান্তি অর্থাৎ আত্যন্তিক সংসার নিবৃত্তি ইহারই নাম মোক্ষ। সম্যগ্ দর্শনলাভের পরেই মোক্ষলাভ ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সুনিশ্চিত অর্থ॥ ৩৯॥

---

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০॥

অন্বয়।—(যঃ) অজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা চ (স) বিনশ্যতি। সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকোনাস্তি, ন পরঃ (লোকোঽস্তি), ন সুখং (অপি) অস্তি॥ ৪০॥

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি অজ্ঞ শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা (বিশ্বাসহীন), সে ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, তাহার এই লোক, পরলোক এবং সুখ নাই॥ ৪০॥

ভাষ্য। অত্র সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ পাপিষ্ঠোহি সংশয়ঃ কথমুচ্যতে অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞশ্চানাত্মজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি অজ্ঞাশ্রদ্দধানৌ যদ্যপি বিনশ্যতঃ তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্ম সংশয়াত্মা তু পাপিষ্ঠঃ সর্ব্বেষাম্। কথং নায়ং সাধারণোঽপি লোকোঽপি তথা পরো লোকো ন সুখং তত্রাপি সংশয়োপপত্তেঃ সংশয়াত্মনঃ সংশয়চিত্তস্য। তস্মাৎ সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ॥ ৩০॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই বিষয় সংশয় করা উচিত নহে, সংশয় অতিশয় পাপের হেতু, কি প্রকারে তাহাই বলা যাইতেছে যে অজ্ঞ ইত্যাদি।

অজ্ঞ (অর্থাৎ) অনাত্মজ্ঞ, অশ্রদ্দধান (শ্রদ্ধাহীন) ও সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন এই দুইজনও যদ্যপি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তথাপি সংশয়াত্মা যে প্রকার বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই দুইজন সে প্রকার বিনষ্ট হয় না, সংশয়াত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ। কেন এই প্রকার (বলা হইতেছে, তাহা বলিতেছেন), এই (পরিদৃশ্যমান) সাধারণ লোক এবং

সেইপ্রকার পরলোক সংশয়াত্মার পক্ষে (শুভকর হয় না। তাহার পরলোকেও সংশয় প্রযুক্ত সুখ হইবার সম্ভাবনা নাই। সংশয়াত্মা এই শব্দের অর্থ সন্দিগ্ধচেতা! সেই জন্য (বলা হইতেছে যে) সংশয় (কখনই) কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪০ ॥

---

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মাণি যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং আত্মবন্তং ন নিবধ্নন্তি।৪১॥

মূলানুবাদ।—হে ধনঞ্জয়! যে ব্যক্তি জ্ঞানযোগের প্রভাবে কর্ম্ম সকলের সংন্যাস করিয়াছে এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি অপ্রমত্ত, তাহাকে কর্ম্ম সমুহ বদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না ॥৪১॥

ভাষ্য।—কস্মাৎ যোগেতি। যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সংন্যস্তানি কর্ম্মাণি যেন পরমার্থদর্শিনা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যানি তং যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং কথং যোগসংন্যস্তকর্ম্মেত্যাহ জ্ঞানেন আত্মেশ্বরৈকত্বদর্শনলক্ষণেন সংছিন্নঃ সংশয়ঃ যস্য সজ্ঞানসংছিন্নসংশয়ঃ যএবং যোগসংন্যস্তকর্ম্মা তমাত্মবন্তং অপ্রমত্তং গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি অনিষ্টাদিরূপং ফলং নারভন্তে, হে ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কেন (সংশয় কর্ত্তব্য নহে) তাহা প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে যোগেত্যাদি।

পরমার্থদর্শনরূপ যোগের দ্বারা যে ব্যক্তি কর্ম্ম সকলের সংন্যাস করিয়াছে সেই পরমার্থদর্শীই যোগ সংন্যস্তকর্ম্মা, এই স্থলে কর্ম্ম শব্দের অর্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; যোগসংন্যস্তকর্ম্মা কি প্রকার তাহাই বলিতেছেন যে জ্ঞানসংছিন্নসংশয়। জীব ও ঈশ্বরের একত্ব দর্শনরূপ জ্ঞানের উদয়ে যাহার সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন হয়, তাহারই নাম জ্ঞানসংছিন্নসংশয়। যে ব্যক্তি এই প্রকার যোগসংন্যস্তকর্ম্মা এবং (জ্ঞানসংছিন্নসংশয়) সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে, গুণের চেষ্টা রূপে পরিদৃষ্ট কর্ম্মসমূহ বন্ধন করিতে পারে না। (অর্থাৎ) কোন প্রকার অনিষ্টাদি ফলের আরম্ভ করে না। হে ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

---

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—তস্মাৎ হে ভারত! জ্ঞানাসিনা আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং এনং সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগং আতিষ্ঠ (সাধনানুষ্ঠানং কুরু), উত্তিষ্ঠ (ইদানীং যুদ্ধং কর্ত্তুং) ॥ ৪০ ॥

মূলানুবাদ।—হে ভারত! তত্ত্বজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা আত্মার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই হৃদয়স্থিত সংশয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানলাভের উপায় অনুষ্ঠান কর এবং এক্ষণে যুদ্ধের জন্য উত্থান কর ॥ ৪২ ॥

ভাষ্য।— যস্মাৎ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়হেতুকজ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ঃ ন নিবধ্যতে কর্ম্মভির্জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাদেব যস্মাচ্চ জ্ঞানকর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্যতি তস্মাৎ ইতি।

তস্মাৎ পাপিষ্ঠমজ্ঞান সম্ভূতমজ্ঞানাদবিবেকাজ্জাতং হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতং জ্ঞানাসিনা শোকমোহাদিদোষহরং সম্যগ্‌দর্শনং জ্ঞানং তদেবাসিঃ খড়্গান্তেন জ্ঞানাসিনা আত্মনঃ স্বস্য অবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ সংশয়স্য। নহি পরস্য সংশয়ঃ পরস্য চ্ছেত্তব্যতাং প্রাপ্তো যেন স্বস্যেতি বিশেষ্যতে অত আত্মবিষয়োঽপি স্বস্যৈব ভবতি ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং স্ববিনাশহেতুভূতং, যোগং সম্যগ্দর্শনোপায়কর্ম্মানুষ্ঠানং আতিষ্ঠ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। উত্তিষ্ঠ ইদানীং যুদ্ধায় ভারতেতি ॥৪২॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানের উদয় হয় ও জ্ঞানের দ্বারা যাহার সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে, সে ব্যক্তি আর কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, কারণ তাহার কর্ম্মবীজ জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, এবং যে কারণে জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা, তাহার বিনাশ হয় সেই কারণেই।

পাপিষ্ঠ অজ্ঞানসম্ভূত (অর্থাৎ) অবিবেকজ, হৃদয় (অর্থাৎ) বুদ্ধিতে স্থিত, এই সংশয়কে জ্ঞানাসি দ্বারা ছিন্ন করিয়া, হে ভারত তুমি সম্যক্ দর্শনলাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এই সংশয়েতে আত্মনঃ এই বিশেষণটি আছে, ইহার অর্থ আত্মার সংশয়; (এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে) কেহ আত্মপ্রয়োজন সাধন করিতে যাইয়া পরের সংশয় মোচন করে না, তবে এখানে আত্মনঃ এই প্রকার বিশেষণ কেন দেওয়া হইল? ইহার উত্তর এই হইতেছে যে, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে সংশয়ী পুরুষের সংশয়বিষয়বস্তু তাহার আত্মা হইতে পৃথক্, যেমন কোন পুরুষের

সংশয় হয়, "এইটী শুষ্ক বৃক্ষ কি পুরুষ", এস্থলে কিন্তু যে সংশয় হইতেছে তাহার বিষয় সংশয়ী পুরুষের আত্মা হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংশয় করিতেছে, সে নিজের আত্মাকে সংশয়ের বিষয় করিতেছে, ইহাই সংসারের দুঃখের হেতু সংশয় ইহাই বুঝাইবার জন্য আত্মনঃ এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে তুমি নিজের নিজস্বরূপ বিষয়ে সংশয় পরিত্যাগ করিয়া যোগের অনুষ্ঠান কর, ইহাই বিশদরূপে অর্জ্জুনকে বুঝান হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থান কর॥ ৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি জ্ঞানকর্ম্মসংন্যাসযোগোনাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি মহাভারতান্তর্গতভগবদ্গীতার জ্ঞানকর্ম্ম-
সংন্যাসযোগনামক চতুর্থ অধ্যায়।

---

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।*

শ্রীম কথিত।

## শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন।



### প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দিরে।]

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। শুক্রবার, ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও হরলালের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। এমন সময়ে একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। কিয়ৎক্ষণ পরে কেশবের শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, জাহাজ আসিয়াছে, আপনার যাইতে হইবে, চলুন একটু বেড়াইয়া আসিবেন, কেশব বাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন।"

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন—সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সমাধিস্থ।

মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থ চিত্র দেখিতেছেন। তিনি বেলা ৩ টার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিতেছেন। বড় সাধ দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন, তাঁহাদের আনন্দ। বড় সাধ শুনিবেন, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা। কেশব তাঁহার সাধু চরিত্রে ও বক্তৃতা বলে মাষ্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকদিগের মনহরণ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয় বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন, কেশব ইংরাজী পড়া লোক—ইংরাজী, দর্শন, সাহিত্য পড়িয়াছেন। তিনি আবার দেবদেবী-পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন। এইরূপ লোক ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল কোনখানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে মাষ্টারাদি অনেকেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু তিনি আবার সাকার-বাদী—নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল, চন্দন দিয়া পূজাও করেন ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন।

* প্রথমভাগ, ছাপা হইতেছে।

আবার খাট-বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন ; কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্তই সন্ন্যাসীর মত। তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী ; স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরাজিতে লেক্‌চার দেন, সংবাদপত্র লেখেন ও বিষয় কর্ম্ম করেন।

জাহাজে সমবেত কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্ম-ভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুরবাড়ীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জাহাজের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বাঁধাঘাট ও ঠাকুরবাটীর চাঁদ্‌নি। জাহাজের আরোহিদের বামপার্শ্বে চাঁদনীর উত্তরে দ্বাদশ শিবমন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির। আরোহিদের দক্ষিণ পার্শ্বেও ছয় শিব মন্দির। শরতের-নীল-আকাশ চিত্রপটে ভবতারিণী-মন্দিরের চূড়া ও উত্তর দিকে পঞ্চবটী ও ঝাউ গাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটী নহবৎখানা ও কালীবাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তভাগে আর একটী নহবৎখানা দেখিতেছেন ; ও দুই নহবৎখানার মধ্যবর্ত্তী উদ্যানপথ ; ও তাহার ধারে ধারে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবীজলে প্রতিভাষিত হইতেছিল। বহির্জগতে কোমল ভাব—ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়মধ্যে কোমল ভাব। ঊর্দ্ধে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ী, নিম্নে পবিত্র-সলিলা গঙ্গা—যাঁহার তীরে আর্য্যঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন ; আবার আসিতেছেন একটী মহাপুরুষ, যিনি সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন! এইরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্ব্বদা ঘটে না। এরূপ স্থলে সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়, কোন্ পাষাণ হৃদয় না বিগলিত হয় ?

কেশব! তুমি দাঁড়াইয়া নৌকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ। তুমি স্থিরনেত্র হইয়া না জানি কি ভাবিতেছ! তুমি কি ভাবিতেছ যে সংসারে বড় ভয়, নির্লিপ্ত গৃহস্থ হওয়া বড় কঠিন? জীবনে তুমি অনেক পরীক্ষায় পড়িয়াছ, আত্মীয় বিচ্ছেদ, কন্যার বিবাহের পর শিষ্য বিচ্ছেদ, লোকনিন্দাদি নানা কষ্ট তুমি পাইয়াছ। তাহাই কি দাঁড়াইয়া ভাবিতেছ—"গৃহস্থাশ্রম বড় কঠিন? এই সাধু মহাত্মার ন্যায় জীবন যাপন করা কিরূপ হয়? আর দলে প্রয়োজন কি, অনেক হইল! ইনি ত বলেন, গেড়ে ডোবায় দল হয়। আর গুরুগিরি করা ভাল নয়। আহা এ মহাপুরুষের কি জীবন! যিশু পিতা পিতা করিয়া পাগল হইয়াছিলেন, ইনিও মা মা করিয়া পাগল! সদা প্রেমে বিহ্বল! তাঁহারি ন্যায় শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তাঁহারি ন্যায় সর্ব্বত্যাগী,

তাঁহারই ন্যায় সর্ব্বভূতহিতে রত, তাঁহারি ন্যায় জীবের মঙ্গলের জন্য ফিরিতেছেন, তাঁহারই ন্যায় সদাযোগী, ভাবস্থ হইয়া ঈশ্বরের সহিত কথা কন। শুনিয়াছিলাম—প্রত্যক্ষ দর্শন ও ভগবৎবাণীশ্রবণকথা। এই মহাপুরুষের জীবনেও তাহাই দেখিলাম। আর প্রার্থনা করেন, ভাষা কি সরল! যেন পাঁচ বৎসরের ছেলে মার সহিত কথা কহিতেছেন। ঈশ্বরকে কি ভালবাসা! এঁকে দেখিয়া গৌরাঙ্গের প্রেম, তাঁহার মহাভাব ইত্যাদিতে বিশ্বাস হইল।"

কেশব! এই মহাপুরুষের আর একটী কথা কি ভাবিতেছ, 'গভীর বনে ফুল ফুটিলে মৌমাছি আপনি সন্ধান করিয়া যায়, ফুল কাহাকেও ডাকে না; মৌমাছি আপনি যায়'। এ কথা স্মরণ করিয়া তাহাই বুঝি ভাবিতেছ, "সেজে গুজে লেক্‌চার দেওয়া আর কেন? যাহাতে দেবদুর্লভ ভক্তিমধু হৃদয়-কুসুম মধ্যে জন্মায়, তাই চেষ্টা করি।" এই মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরের আদেশ না পাইয়া লেক্‌চার বিড়ম্বনা মাত্র।' হয়ত আবার ভাবিতেছ, 'রামের ইচ্ছা' সেই কথা; যে কথা একদিন শুনে তুমি বলেছিলে, 'মহাশয়, অত দূর নয়, তাহা হলে সত্য সত্যই আর দলটল থাকে না'। কেশব, কেন ঠাকুরকে এত শুদ্ধ ভাবিতেছ?—বুঝি ভাবিতেছ ইঁহার কথা, 'মৌমাছি কেবল ফুলে বসে মধুপানের জন্য. এ সব মাছি মধুতেও বসে, সন্দেসেও বসে, ও পচাঘায়ে ও বিষ্ঠাতেও বসে।' এ মহাপুরুষ মৌমাছির থাক্, গৃহস্থ ভক্তেরা সামান্য মাছির থাক্।

আবার কি ভাবিতেছ, "এ পুরুষ সমাধিস্থ, আমাদের এইরূপ সমাধি হয় না কেন? বটে বটে নানা কর্ম্ম করিতে গেলে কেমন করে সমাধি হবে? ইনি বলেন, 'নেউলের ন্যাজে ইঁট বাঁধা; পাঁচিলের গর্ত্তে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় বটে; কিন্তু ন্যাজে ইঁট বাঁধা রয়েছে, ইঁটের ভারে গর্ত্ত থেকে নিচে নেমে আস্‌তে হয়'। 'বিষয়ীর মন ভিজে দেশলাইয়ের মত'। ইনি যা বলেন ঠিক। যত ঘসো কাটিগুলি লোকসান হয়, কখনও জ্বলিবে না।"

কেশব! ইনি সাকার বিশ্বাস করেন বলিয়া তোমার কি মনে খট্‌কা হইয়াছে? এককালে হইয়াছিল বটে। কিন্তু আজ তুমি সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় নীল চিত্রপটে যে দেবমন্দিরশ্রেণীর ছবি দেখিতেছ, তাহা অন্য চক্ষে দর্শন করিতেছ। তুমি দেখিতেছ, 'মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী'—'আগে উপমা, তার পর প্রতিমা, তার পর মা'। ধন্য তুমি! এই মহাপুরুষের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছ। মানুষ কতটুকু, আর তার বুদ্ধিই বা কতটুকু। প্রাকৃত লোকের

আবার বুদ্ধি! আর সেই বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণ! বামন উদ্বাহু হইয়া চন্দ্র ধরিবে! ধন্য তুমি! ঠাকুরের কথা গ্রহণ করিয়াছ—এক সের ঘটিতে চার সের দুগ্ধ ধরে না। ভগবানের পাদপদ্ম সমাধি লাভ না করিলে তাঁহার তত্ত্বের আভাস কে দিতে পারে? 'হে Alcibiades * যদি মোকদ্দমার কথা বুঝতে চাও, তাহা হইলে উকিলের কাছে যেতে হয়; যদি রোগের কথা জানতে হয়, ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হয়; ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিবে, তবে মহাপুরুষের সঙ্গ কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর'। এ কথা Socrates শিষ্যদের বলেছিলেন। আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণও এই কথা বলিতেছেন। কেশব, তুমি আশ্চর্য্য গণিতে বিশ্বাস করিয়াছ! দুই আর তিনে সাত হতে পারে, বিশ্বাস করিয়াছ! যে পুরুষ নিরাকার, তিনি আবার সাকার, এই কথা বিশ্বাস করিয়াছ! যিনি অব্যক্ত, তিনি আবার ব্যক্তিরূপে প্রত্যক্ষ হন, যিনি অবাঙ্মনসোগোচরং, তিনিই আবার শুদ্ধ মনের গোচর। 'আমি যা বুঝিতেছি তাই সত্য, অন্যে যা বুঝিতেছে, তাহা মিথ্যা', এই মতুয়ার বুদ্ধি তুমি ঠাকুরের উপদেশে ত্যাগ করিয়াছ। কেশব, ধন্য তুমি! ঐ দেখ, যাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছ, তিনি নিজে তোমাকে দর্শন দিতে আসিতেছেন! যিনি তোমার অসুখের সময় রাত্রে নিদ্রা যাইতেন না, আর কাতর হয়ে গভীর রাত্রে বলিতেন, 'মা' কেশবকে ভাল করে দাও, কেশব না থাকলে আমি কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব'; ঐ দেখ, সমাধিস্থ—তাঁহার নৌকা আসিতেছে। যাঁর রাতুল চরণ একদিন কমল কুটীরে উপাসনার ঘরে পুষ্পপাত্রস্থ বিবিধ কুসুম লইয়া ভক্তিভরে পূজা করিয়াছিলে। সেই একদিন! যে শুভদিনে মানুষে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলে। 'নরহরি' রূপ দেখে মোহিত হয়েছিলে! সেই এক দিন! যে দিন সন্তানভাব (sonship) কাহাকে বলে প্রত্যক্ষ করেছিলে। ঐ নৌকা আসিয়া লাগিল; কেশব! তুমি ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য শশব্যস্ত হইয়াছ!

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভীড় হইতেছে। ঠাকুরকে অনেক কষ্টে হুঁস করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। এখনও ভাবস্থ, এক জন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। জাহাজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হুঁস নাই। ঘরের মধ্যে একটী টেবিল, খান কতক চেয়ার। এক খানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল।

* Plato's Dialogues.

কেশব একখানিতে বসিলেন, বিজয়ও বসিয়াছিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেজেতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না, তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ, সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। সকলে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। কেশব ঘরের মধ্যে অনেক লোক হইয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে দেখিলেন। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন ও তাঁহার কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই বিজয়কে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, ঘরের জানলা খুলিয়া দিবেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### [কেশবাদি ভক্ত সঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গ ও ভজনানন্দ]

ব্রাহ্ম ভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। সমাধি ভঙ্গ হইল।

এখনও ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। ঠাকুর আপনা আপনি অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, "মা আমায় এখানে আনিলে কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?"

ঠাকুর কি দেখিতেছিলেন যে, সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভিতরে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না? সকলের হাত পা বাঁধা। তাহারা কেবল বাড়ীর ভিতরের জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেছে, আর মনে করিতেছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহসুখ ও বিষয় কর্ম্ম, 'কামিনী ও কাঞ্চন'। তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, মা আমায় এখানে আন্‌লে কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?

সভামধ্যে গাজীপুরের নীলমাধব বাবু ছিলেন। ঠাকুরের ক্রমে বাহ্য জ্ঞান হইতেছে দেখিয়া, তিনি ও আর একজন ব্রাহ্ম ভক্ত পাউহারি বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্ম ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, এঁরা সব পাউহারি বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন। আপনার মত আর একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্ম ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, পাউহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"খোলটা।"

'বালিস ও তার খোলটা'—দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না। দেহের ভিতর যিনি দেহী, তিনিই অবিনাশী, অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর করে কি হবে? বরং যে ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে মানুষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই পূজা করা উচিত।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—

"তবে একটী কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁহার আবাসস্থান। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে তিনি বিশেষ রূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তাঁহার জমিদারীর সকল স্থানে থাকিতে পারেন। তবে অমুখ বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

## ( এক রাম—তাঁহার ভিন্ন নাম )

"জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলেন, আর ভক্তেরা তাঁকে ভগবান্ বলেন।

একই ব্রাহ্মণ। যখন সে পূজা করে, তাহার নাম পূজারি; যখন রাঁধে, তখন তার নাম রাঁধুনি বামুন, যখন রুটী বিস্কুট ব্যাচে, তখন নাম রুটিবিস্কুটওয়ালা।

"যিনি জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছেন, তিনি নেতি নেতি এই বিচার করেন। ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। এই রূপ বিচার করিতে করিতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, আর সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানীর ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নাম রূপ এই সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম কি যে তা বলা যায় না; তিনি যে একজন ব্যক্তি (Person) তাও বল্‌বার যো নাই।

"জ্ঞানীরা ঐরূপ বলে, যেমন বেদান্তবাদী। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়; জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে লয়, জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা

নামরূপ মানে। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, মানুষ, জীব, জন্তু, এ সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁহারই ঐশ্বর্য্য। তিনি অন্তরে, হৃদয় মধ্যে, আবার বাহিরে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—জীবজগৎ—হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হতে ভালবাসে না (সকলের হাস্য)।

"ভক্তের ভাব কিরূপ জান? 'হে ভগবান, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস, 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান', আবার 'তুমি আমার সন্তান, আমি তোমার পিতা বা মাতা' 'তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ'। ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম'।

"যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য—জীব আত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে।

"কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদ মাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান্।"

এদিকে আগ্নেয় পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতে লাগিল, ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন করিতেছিলেন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহারা জাহাজ চলিতেছে কিনা এ কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভন্ ভন্ করে? ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্যপথের বহির্ভূত হইল। পোতচক্র-বিক্ষুব্ধ-নীলাভ-গাঙ্গবারি তরঙ্গায়িত, ফেনিল, কল্লোলপূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পৌঁছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন সহাস্যবদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিত-নয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্ব্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী; ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না।

[ God Personal or Impersonal ]

## ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, 'সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয়, জীব জগৎ এ সব শক্তির খেলা। আর বলে যে বিচার করতে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ; অবস্তু।'

"কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি' 'আমি চিন্তা করছি', এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে। শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ. একেকে মানলেই তার একটীকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি, আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। সেইরূপ আবার সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না ; আবার সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না। দুধ কেমন ? না, ধোবো ধোবো ; দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না ; আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে ভাবা যায় না, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না ; নিত্য (Absolute)কে ছেড়ে লীলা ভাবা যায় না ; লীলা (Relative)কে ছেড়ে নিত্য (Absolute)কে ভাবা যায় না।

আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁহারই আর একটী নাম কালী।

কেশব (সহাস্যবদনে)। কালী কতভাবে লীলা করিতেছেন, সেই কথা-গুলি আর একবার বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )। হাঁ তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনি মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা ; মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করেছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব। বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁহারি পূজা হয়। যখন মহামারি, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্ত্তি ; শব, শিবা, ডাকিনী যোগিনীমধ্যে ও শ্মশানের উপর থাকেন ; গায়ে রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কোটীতে নরহস্তের কোটীবন্ধ।

"যখন জগৎনাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতা ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখেন ( সকলের হাস্য )।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )। হাঁ গো ! গিন্নিদের ঐ রকম একটা

হাঁড়ি থাকে। তার ভিতর সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুঁটলিবাঁধা শশা-বীচি, কুমড়ো বীচি, লাউ-বীচি এই সব রাখে; দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন।

(ঈশ্বর কি জগতের বাহিরে ?)

"আবার সৃষ্টির পর সেই আদ্যাশক্তি এ জগতের ভিতরেই থাকেন। তিনি জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে ঊর্ণনাভির কথা। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা নিজের ভিতর থেকে জাল বাহির করে, আবার সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর এই জগতের আধান আধেয় দুই।

"কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ।

"যেমন জল, Water, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়; তারা বলে জল। আর এক ঘাটে মুসলমানরা জল খায়; তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরেজরা জল খায়, তারা বলে Water.

"তিনি একই; কেবল নামে তফাত। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা', কেউ বলছে 'God', কেউ বলছে 'ব্রহ্ম'; কেউ বলছে 'কালী', কেউ কেউ বলছে রাম, হরি, যিশু, দুর্গা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কালী কি কালো ? যতক্ষণ দূরে, ততক্ষণ কালো; তাঁকে জানতে পারলে, আর কাল নয়।

"আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়, কাছে দ্যাখো কোন রং নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে করে তুলে দ্যাখো, কোন রং নাই।"

এই কথা বলে প্রেমোন্মত্ত হয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান ধরিলেন,—

মা কি আমার কালোরে।

কালরূপ দিগম্বরী, হৃৎপদ্ম করে আলো রে॥

## (ভববন্ধের বন্ধনহারিণী তারিণী)

"বন্ধন আর মুক্তি, এই দুইয়ের কর্ত্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারে জীব কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ; আবার তাঁর দয়া হলেই ঐ সংসারী জীব মুক্ত হয়ে যায়।"

এই বলিয়া ঠাকুর গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত কণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাইতে লাগিলেন—

গান : মহামায়া—বন্ধনমুক্তিদায়িনী।

শ্যামা মা উড়াচ্চো ঘুড়ি, সংসারবাজারের মাঝে।
(ঐ যে) আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ী॥
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, (তাতে) পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নিম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ী।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে, ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার বাজার মাঝে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥

"তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী, লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"

একজন ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়, তিনিতো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সকলকে সংসারে বদ্ধ করে রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাক্‌তে ছুঁলে আর দৌড়াদৌড়ি হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, তা হলে খেলা হয় কেমন করে? সকলেই ছুঁয়ে ফেল্‌লে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চল্‌লে বুড়ীর আহ্লাদ হয়।

"তাই লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেঁসে দাও মা হাতচাপড়ি।

"তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা করে বলে দিয়েছেন, 'যা এখন সংসার করগে যা'। মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তা হলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।" এই বলিয়া ঠাকুর আবার গান গাইতে লাগিলেন,—

গান।

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগাঘরে চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি আশয় পেয়েছি, এসব তোমারি চাতুরী॥
কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে, খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশ, অপযশ, সুরস কুরস, সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন রসেশ্বরি॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরি আঁকেঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরি॥

"তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। 'প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরি আঁকেঠারি'।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### কর্ম্মযোগ। সংসার ও নিষ্কাম কর্ম্ম॥

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছো। সারে মাতে। (সকলের হাস্য)। তোমরা বেশ আছো। নক্স খেলা জান? আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব শেয়ানা। কেউ পাঁচে আছো, কেউ ছয়ে আছো, কেউ দশে আছো। বেশী কাটাও নাই; তাই আমার মত জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে। এতো বেশ! (সকলের হাস্য)

"সত্য বল্‌ছি, তোমরা যে সংসার করছো, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙ্গে ছোপাবে, সেই রঙ্গে ছুপ্‌বে। যেন ধোপা-ঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ। যে রঙ্গে ছোপাও,

সেই রঙ্গই হবে। দেখনা, যদি একটু ইংরাজি পড় তো অমনি মুখে ইংরাজি কথা এসে পড়ে। ফুট ফাট, গড়ের মাঠ। ( সকলের হাস্য )। আবার পায়ে বুট্ জুতা; শিষ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুট্‌বে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, তা হলে অমনি শ্লোক ঝাড়্‌বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্ত্তা চিন্তা হয়ে হবে। যদি ভক্ত সঙ্গে রাখো, তাহা হলে ঈশ্বরচিন্তা, হরি কথা এই সব হবে।

"মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, আর এক পাশে সন্তান; একজনকে একভাবে আদর করে, আবার সন্তানকে আর একভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন!

## ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ।

"মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। 'আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার আবার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে—আমায় আবার বাঁধে কে?' যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' জোর ক'রে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই' আমি বদ্ধ নই', 'আমি মুক্ত', এই কথাটি রোক করে বলতে বলতে তাহাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

"খ্রীষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে। আমি শুনাতে বল্লাম। তাতে কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'!

"( কেশবের প্রতি ) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ', 'আমি বদ্ধ', বার বার বলে, সে শ্যালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাত্‌দিন 'আমি পাপী', 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—'কি! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি!' কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু; সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিছলো, একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে তার জল তৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, এক জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে, ওরে তুই এক ঘটি জল তুলে দিতে পারিস্? তুই কি জাত? সে বল্লে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত মুচি। কৃষ্ণকিশোর বল্লে, তুই বল শিব। ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

"কেবল 'পাপ' আর 'নরক'।—এই সব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় কর্ম্ম যাহা করেছি, আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।" এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গান গাহিতে লাগিলেন—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী,
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, (ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

"আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম, আর বলেছিলাম, মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

"(ব্রাহ্ম ভক্তদের প্রতি) একটি রামপ্রসাদের গান শোনো।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুমূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিরে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হবি॥

"সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনক রাজার হয়েছিল। এই সংসার 'ধোঁকার টাটি', রাম প্রসাদ বলেছিল। কিন্তু হরিপাদপদ্মে ভক্তি

লাভ করলে ' এই সংসারই আবার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।

"জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটী॥

( সকলের হাস্য )

## ব্রাহ্ম সমাজ ও জনক রাজা। গৃহস্থের সাধন।

"কিন্তু ফস্ করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জ্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক একবার নির্জ্জনে বাস করতে হয়। একলা সংসারের বাহিরে গিয়ে যদি ভগবানের জন্যে তিন দিনও কাঁদা যায়, সেও ভাল। এমন কি এক দিনও অবসর পেয়ে নির্জ্জনে তাঁহার চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। লোকের মাগ ছেলের জন্যে এক ঘটি কাঁদে ; ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে বল ? নির্জ্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়। সংসারের ভিতর বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়। যেমন ফুট্‌পাথের গাছ যখন চারা গাছ থাকে, তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয় ; গুড়ি হ'লে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

" রোগটী হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করাতে চাও, তাহা হলে, ওকে ওঘর থেকে ঠাইনাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী ; বিষয় জলের জালা ; বিষয়ভোগতৃষ্ণা জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে করলেই, মুখে জল সরে। কাছে আন্‌তে হয় না। এরূপ জিনিস ও ঘরে রয়েছে। যোষিৎসঙ্গ। তাই নির্জ্জনে চিকিৎসা দরকার।

" বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে তবে সংসার কত্তে হয়। সংসারসমুদ্রে কাম ক্রোধাদি অনেক কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নাম্‌লে আর কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎবিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ নিত্য বস্তু, আর সব অসৎ অনিত্য, দুই দিনের জন্য। এইটী বোধ।

" আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান্—ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান্ ছিল। একটা গান শোন—

বংশী বাজিল ঐ বিপিনে।
( আমার তো না গেলে নয় )
( শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে )
তোরা যাবি কি না যাবি বল্‌গো॥
তোদের শ্যাম কথার কথা।
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যাথা (সই)॥"

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণনয়নে সেই মধুর কণ্ঠে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাদি-ভক্তদের বল্লেন, "রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টান টুকু নাও। ভগবানের জন্য কি সে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, তার জন্য চেষ্টা করো।

"ব্যাকুলতা হলেই তাঁকে লাভ করা যায়।"

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### [ সর্ব্বভূতহিতে রত। ]

ভাঁটা পড়িয়াছে। আগ্নেয় পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতি চলিতেছে। তাই কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে, পোল্ পার হইয়া কোম্পানির বাগানের দিকে আরো খানিকটা বেড়িয়া আসিতে। কতদূর পর্য্যন্ত জাহাজ গিয়াছে, অনেকের তাহা জ্ঞানই নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন্ দিক্ দিয়ে সময় যাইতেছে হুঁস নাই।

এই বার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতে লাগিল। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতে লাগিলেন। আনন্দের হাট্। কেশব মুড়ি নারিকেল আয়োজন করে এসেছিলেন।

এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন যে বিজয় ও কেশব দুজনেই সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া আছেন। তখন ঠাকুর উভয়ের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। যেন দুজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়ে দিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেশবের প্রতি )। ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ কেমন জানো, যেমন শিবরামে যুদ্ধ। ( সকলের হাস্য )। শিব রামের গুরু। যুদ্ধও হলো, আবার ভাবও হলো। কিন্তু শিবের ভূত প্রেত গুলো, আর রামের বানর গুলো, ওদের ঝগড়া কিচ্‌কিচী আর মেটে না ( সকলের উচ্চ হাস্য )

"আপনার লোক। তবে এরূপ হয়ে থাকে। লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

"আবার জানো, মায়ে ঝীয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে; যেন মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল, দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এঁর একটী সমাজ আছে, আবার ওঁরও একটী দরকার (সকলের হাস্য)।

"তবে এসব চাই। যদি বলো ভগবান্ লীলা করছেন,তাতে জটিলে কুটিলের কি দরকার। জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না (সকলের হাস্য) জটিলে কুটিলে না থাক্‌লে রগড় হয় না। (উচ্চ হাস্য)।

"রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দুজনে অমিল। গুরু শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগ্‌ল। এরূপ হয়েই থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক।"

## গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজ।

সকলে আনন্দ করিতেছেন। আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেশবকে সম্বোধন করিয়া বল্লেন,—তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করো না, তাই এই রূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

"মানুষ গুলি দেখ্‌তে সব এক রকম। কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারুর ভিতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ। পুলি গুলি দেখ্‌তে সব এক রকম। কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর, কারুর ভিতর নারকেলের ছাঁই, কারুর ভিতর কলাইয়ের পোর। (সকলের হাস্য)

"আমার কি ভাব জানো? আমি খাই দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে—গুরু, কর্ত্তা আর বাবা।

"গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ্ লাখ্। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়?

(ক্রমশঃ)

অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে। কাল মনের অন্তর্গত, দেশও মনের অন্তর্গত। কাল-ব্যতীত কার্য্যকারণভাব থাকিতেই পারে না। ক্রমবর্ত্তিতার ভাব ব্যতীত কার্য্য-কারণ ভাবও থাকিতে পারে না। অতএব,দেশকালনিমিত্ত মনের অন্তর্গত, আর এই আত্মা মনের অতীত ও নিরাকার বলিয়া, উহাও অবশ্য দেশকালনিমিত্তের অতীত। অবশ্য, যদি উহা দেশকাল নিমিত্তের অতীত হয়, তাহা হইলে উহা অবশ্য অনন্ত হইবে। এইবারে হিন্দুদর্শনের চূড়ান্ত বিচার আসিল। অনন্ত কখন দুইটী হইতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে কেবল একটী মাত্র আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে,—তোমার এক আত্মা, আমার আর এক আত্মা—এগুলি সত্য নহে। অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী। আর এই ব্যবহারিক জীব মানুষের এই প্রকৃত স্বরূপের সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র। এই হিসাবে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক তত্ত্বগুলিও সত্য হইতে পারে যে, এই ব্যব-হারিক জীব, তিনি যতদূর বড় হউন না কেন, এই অতীন্দ্রিয়—মানুষের প্রকৃত স্বরূপের অস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র। অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা—কার্য্য কারণের অতীত বলিয়া, দেশকালের অতীত বলিয়া—অবশ্যই মুক্ত-স্বভাব। তিনি কখন বদ্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে বদ্ধ করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। এই ব্যবহারিক জীব, এই প্রতিবিম্ব, দেশকালনিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তিনি বদ্ধ। অথবা আমাদের কোন কোন দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'বোধ হয়, তিনি যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, বাস্তবিক তিনি বদ্ধ নন।' আমাদের আত্মার ভিতরে ইহাই সত্য—এই সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, চৈতন্যস্বভাব; আমরা স্বভাবতই উহা—উহা চেষ্টা করিয়া আর আমাদিগকে হইতে হয় না। প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত—সুতরাং জন্মমৃত্যুর প্রশ্ন আসিতেই পারে না। কতকগুলি বালক পরীক্ষা দিতেছিল। পরীক্ষক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল—'পৃথিবী কেন পড়িয়া যায় না?' তিনি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রভৃতি উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। অধিকাংশ বালকবালিকাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেহ কেহ মাধ্যাকর্ষণ বা আর কিছু বলিয়া উত্তর দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একটী বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটী প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিল, 'কোথায় উহা পড়িবে?' এই প্রশ্নই যে ভুল। পৃথিবী পড়িবে কোথায়? পৃথিবীর পক্ষে পতন বা উত্থান কিছুই নাই। অনন্ত দেশে উপর নীচু বলিয়া

কিছু নাই। উহা কেবলমাত্র আপেক্ষিকের অন্তর্গত। অনন্ত কোথায়ই বা যাইবে, কোথা হইতেই বা আসিবে? যখন মানুষ ভূতভবিষ্যতের চিন্তা—তাহার কি হইবে—এই চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে, যখন সে দেহকে সীমাবদ্ধ, সুতরাং উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া দেহাভিমান ত্যাগ করিতে পারে, তখনই মানুষ এক উচ্চতর আদর্শে উপনীত হয়। দেহও আত্মা নহেন, মনও নহেন, কারণ উহাদের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। কেবল জড় জগতের অতীত আত্মাই অনন্ত কাল ধরিয়া থাকিতে পারেন। শরীর ও মন প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। ইহারা পরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি ঘটনা-শ্রেণীর নামমাত্র। ইহারা যেন নদীস্বরূপ, উহার প্রত্যেক জল পরমাণুই নিয়ত চঞ্চলভাবাপন্ন। তথাপি আমরা দেখিতেছি, উহা সেই একই নদী। এই দেহের প্রত্যেক পরমাণুই নিয়ত পরিণামশীল; কোন ব্যক্তিরই কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়াও একরূপ শরীর থাকে না। তথাপি মনের উপর এক প্রকার সংস্কারবশতঃ আমরা উহাকে এক শরীর বলিয়াই বিবেচনা করি। মনের সম্বন্ধেও এইরূপ; এক মুহূর্ত্ত সুখী, এক মুহূর্ত্ত দুঃখিত; এক মুহূর্ত্ত সবল, পরক্ষণেই দুর্ব্বল! নিয়ত পরিণামশীল ঘূর্ণি বিশেষ! উহাও আত্মা হইতে পারে না; আত্মা অনন্ত। পরিবর্ত্তন কেবল সসীম বস্তুতেই সম্ভব। অনন্তের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয়, ইহা অসম্ভব কথা। তাহা কখন হইতে পারে না। শরীর-হিসাবে তুমি আমি একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারি, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুই নিত্য পরিণামশীল; কিন্তু জগৎকে সমষ্টিরূপে ধরিলে, উহাতে গতি বা পরিবর্ত্তন অসম্ভব। গতি সর্ব্বত্রেই আপেক্ষিক। আমি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাই, তাহা একটী টেবিলের অথবা অপর একটী বস্তুর সহিত তুলনায় বুঝিতে হইবে। জগতের কোন পরমাণু অপর একটী পরমাণুর সহিত তুলনায় পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সমুদয় জগৎকে সমষ্টিভাবে ধরিলে কাহার সহিত তুলনায় উহা স্থান পরিবর্ত্তন করিবে? ঐ সমষ্টির অতিরিক্ত ত আর কিছু নাই। অতএব এই অনন্ত, একমেবাদ্বিতীয়ং অপরিণামী, অচল ও পূর্ণ এবং উহাই পারমার্থিক সত্তা। অতএব সর্ব্বব্যাপীর ভিতরেই সত্য আছে, সান্তের ভিতর নহে। যতই আরামপ্রদ হউক না কেন, আমরা ক্ষুদ্র সান্ত সদাপরিণামী জীব, ইহা প্রাচীন ভ্রমজ্ঞানমাত্র। যদি লোককে বলা যায়, তুমি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত পুরুষ, তাহারা ভয় পাইয়া থাকে। সকলের ভিতর দিয়া তুমি কার্য্য করিতেছ, সকল চরণের

দ্বারা তুমি চলিতেছ, সকল মুখের দ্বারা তুমি কথা কহিতেছ, সকল নাসিকা দ্বারাই তুমি শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছ। লোককে ইহা বলিলে তাহারা ভয় পাইয়া থাকে। তাহারা তোমায় পুনঃপুনঃ বলিবে, এই 'অহং' জ্ঞান কখন যাইবে না। লোকের এই 'আমিত্ব' কোন্‌টী, তাহা ত আমি দেখিতে পাই না। দেখিতে পাইলে সুখী হই।

ছোট শিশুর গোঁফ নাই; বড় হইলে তাহার গোঁফ দাড়ি হয়। যদি 'আমিত্ব' শরীরগত হয়, তবে ত বালকের 'আমিত্ব' নষ্ট হইয়া গেল। যদি 'আমিত্ব' শরীরগত হয়, তবে আমার একটী চক্ষু বা একটী হস্ত নষ্ট হইলে 'আমিত্ব'ও নষ্ট হইয়া গেল। মাতালের মদ ছাড়া উচিত নয়, তাহা হইলে তাহার 'আমিত্ব' যাইবে! চোরের সাধু হওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে সে তাহার 'আমিত্ব' হারাইবে! কাহারও তাহা হইলে এই ভয়ে নিজ নিজ অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত নয়! অনন্ত ব্যতীত আর 'আমিত্ব' কিছুতেই নাই। এই অনন্তেরই কেবল পরিণাম হয় না। আর সবই ক্রমাগত পরিণামশীল। 'আমিত্ব' স্মৃতিতেও নাই। তাহা হইলে যদি মস্তকে প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আমার অতীত স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ত আমার 'আমিত্ব' লোপ হইল, আমি একেবারে গেলাম! ছেলেবেলার দুই তিন বৎসর আমার স্মরণ নাই; যদি স্মৃতির উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে ঐ দুই তিন বৎসর আমার অস্তিত্ব ছিল না বলিতে হইবে। তাহা হইলে আমার জীবনের যে অংশ আমার স্মরণ নাই, সেই সময়ে আমি জীবিত ছিলাম না বলিতে হইবে। ইহা অবশ্য 'আমিত্ব' সম্বন্ধীয় খুব সঙ্কীর্ণ ধারণা। আমরা এখনও 'আমি' নহি। আমরা এই 'আমিত্ব' লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি—উহা অনন্ত; উহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। যাঁহার জীবন সমুদয় জগদ্ব্যাপী, তিনিই জীবিত, আর যতই আমরা আমাদের জীবনকে শরীররূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সান্ত পদার্থে বদ্ধ করিয়া রাখি, ততই আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই। আমাদের জীবন যে মুহূর্ত্তে সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত থাকে, যে মুহূর্ত্তে উহা অপরে ব্যাপ্ত থাকে, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা জীবিত, আর যে সময় আমরা এই ক্ষুদ্র জীবনে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখি, সেই মুহূর্ত্তই মৃত্যু, এবং এই জন্যই আমাদের মৃত্যুভয় আইসে। মৃত্যুভয় তখনই জয় করা যাইতে পারে, যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, যতদিন এই জগতে একটী জীবনও রহিয়াছে,

ততদিন সেও জীবিত। এরূপ লোক উপলব্ধি করিয়া থাকেন, 'আমি সকল বস্তুতে, সকল দেহে বর্ত্তমান; সকল জন্তুর মধ্যেই আমি বর্ত্তমান। আমিই এই জগৎ, সমুদয় জগৎই আমার শরীর। যতদিন একটী পরমাণু পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ততদিন আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কি? কে বলে, আমার মৃত্যু হইবে?' তখন এরূপ ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া যান, তখনই নির্ভীক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। নিয়ত পরিণামশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে অবিনাশিত্ব আছে বলা বাতুলতা মাত্র। একজন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, আত্মা অনন্ত, সুতরাং আত্মাই 'আমি' হইতে পারেন; অনন্তকে ভাগ করা যাইতে পারে না—অনন্তকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে না। এই এক অবিভক্ত সমষ্টি-স্বরূপ অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, তিনিই মানুষের যথার্থ 'আমি', তিনিই 'প্রকৃত মানুষ।' মানুষ বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে, তাহা কেবলমাত্র ঐ 'আমি' কে ব্যক্ত জগতের ভিতর প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফলমাত্র; আর আত্মাতে কখন 'ক্রমবিকাশ' থাকিতে পারে না। এই যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, পশু মানুষ হইতেছে, এ সকল কখন আত্মাতে হয় না। মনে কর, যেন একটী যবনিকা রহিয়াছে; আর উহার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে, উহার ভিতর দিয়া আমি আমার সম্মুখস্থ কতকগুলি—কেবল কতকগুলি মুখমাত্র দেখিতে পাইতেছি। এই ছিদ্র যতই বড় হইতে থাকে, ততই সম্মুখের দৃশ্য আমার নিকট অধিকতর প্রকাশিত হইতে থাকে, আর যখন ঐ ছিদ্রটী সমুদয় যবনিকা ব্যাপিয়া যায়, তখন আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকি। এ স্থলে তোমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তুমি যাহা, তাহাই ছিলে। ছিদ্রেরই ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রকাশ হইতেছিল। আত্মা-সম্বন্ধেও এইরূপ। তুমি মুক্তস্বভাব ও পূর্ণই আছ। উহা চেষ্টা, করিয়া পাইতে হয় না। ধর্ম্ম, ঈশ্বর বা পরকালের এই সকল ধারণা কোথা হইতে আসিল? মানুষ ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া বেড়ায় কেন? কেন সকল জাতির ভিতরে, সকল সমাজেই মানুষ পূর্ণ আদর্শের অন্বেষণ করে—তাহা মনুষ্যে, ঈশ্বরে বা অন্য কিছুতেই হউক? তাহার কারণ—উহা তোমার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। তোমার নিজের হৃদয়ই ধক্ ধক্ করিতেছে, তুমি মনে করিতেছ, বাহিরের কোন বস্তু এইরূপ শব্দ করিতেছে। তোমার আত্মার অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরই তোমাকে তাঁহাকে অনুসন্ধান

করিতে, তাঁহার উপলব্ধি করিতে, প্রেরণ করিতেছেন। এখানে, সেখানে, মন্দিরে গির্জ্জায়, স্বর্গে মর্ত্ত্যে, নানা স্থানে এবং নানা উপায়ে অন্বেষণ করিবার পর অবশেষে আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম অর্থাৎ আমাদের আত্মাতেই বৃত্তাকারে ঘুরিয়া আসি এবং দেখিতে পাই, যাঁহার জন্য আমরা সমুদয় জগতে অন্বেষণ করিতেছিলাম, যাঁহার জন্য আমরা মন্দির গির্জ্জা প্রভৃতিতে কাতর হইয়া প্রার্থনা এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলাম, যাঁহাকে আমরা সুদূর আকাশে মেঘরাশির পশ্চাতে লুক্কায়িত অব্যক্ত রহস্যময় বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম, প্রাণের প্রাণ, তিনিই আমার দেহ, তিনিই আমার আত্মা,—তুমিই আমি—আমিই তুমি। ইহাই তোমার স্বরূপ—উহাকে প্রকাশ কর। তোমাকে পবিত্র হইতে হইবে না—তুমি পবিত্র-স্বরূপই আছ। তোমাকে পূর্ণস্বরূপ হইতে হইবে না, তুমি পূর্ণস্বরূপই আছ। সমুদয় প্রকৃতিই যবনিকার ন্যায় তাঁহার অন্তরালবর্ত্তী সত্যকে ঢাকিয়া রহিয়াছেন। তুমি যে কোন সৎ চিন্তা বা সৎকার্য্য কর, তাহাই কেবলমাত্র যেন আবরণকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিতেছে, আর সেই প্রকৃতির অন্তরালস্থ শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর প্রকাশিত হইতেছেন। ইহাই মানুষের সমগ্র ইতিহাস। ঐ আবরণ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, তখন প্রকৃতির অন্তরালস্থ আলোক নিজ স্বভাববশতঃই ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দীপ্তি পাইতে থাকেন, কারণ তাঁহার স্বভাবই এইরূপ ভাবে দীপ্তি পাওয়া। উঁহাকে জানা যায় না; আমরা উঁহাকে জানিতে বৃথাই চেষ্টা করিয়া থাকি। যদি উনি জ্ঞেয় হইতেন, তাহা হইলে উহার স্বভাবেরই বিলোপ হইত, কারণ ইনি নিত্য জ্ঞাতা। জ্ঞান ত সসীম; কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উহাকে জ্ঞেয় বস্তুরূপে, বিষয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি ত সকল বস্তুর জ্ঞাতা-স্বরূপ, সকল বিষয়ের বিষয়িস্বরূপ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ, তোমারই আত্মস্বরূপ। জ্ঞান যেন একটী নিম্ন অবস্থা—অবনত ভাবমাত্র। আমরাই সেই আত্মা; উহাকে আবার জানিব কিরূপে? প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই আত্মা এবং সকলেই বিভিন্ন উপায়ে ঐ আত্মাকে জীবনে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিতেছে; তা না হইলে এত নীতিপ্রণালী কোথা হইতে আসিল? সমুদয় নীতিপ্রণালীর তাৎপর্য্য কি? সকল নীতিপ্রণালীতেই একটী ভাবই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া বর্ত্তমান—অপরের উপকার করা। মানবজাতির সমুদয়

সংকর্ম্মের মূল অভিসন্ধি—মানুষ, জন্তু, সকলের প্রতি দয়া। কিন্তু এই সকল গুলিই "আমিই জগৎ; এই জগৎ এক অখণ্ড স্বরূপ," এই সনাতন সত্যের বিভিন্ন ভাব মাত্র। তাহা না হইলে অপরের হিত করিবার যুক্তি কি? কেন আমি অপরের উপকার করিব? কিসে আমায় অপরের উপকার করিতে বাধ্য করে? এই সর্ব্বত্রে সমদর্শন-জনিত সহানুভূতির ভাব হইতেই ইহা হইয়া থাকে। অতি কঠোর অন্তঃকরণও কখন কখন অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি, যে ব্যক্তি, এই আপাতপ্রতীয়মান 'অহং' প্রকৃতপক্ষে ভ্রমমাত্র, এই ভ্রমাত্মক "অহং" এ আসক্ত থাকা অতি নীচ কার্য্য, এই সকল কথা শুনিলে ভয় পায়, সেই ব্যক্তিই তোমাকে বলিবে, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই সমস্ত নীতির ভিত্তি। কিন্তু পূর্ণ আত্মত্যাগ কি? সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ হইলে কি অবশিষ্ট থাকে? আত্মত্যাগ অর্থে এই আপাতপ্রতীয়মান 'অহং' এর ত্যাগ, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতার পরিত্যাগ। এই অহঙ্কার ও মমকার পূর্ব্ব কুসংস্কারের ফলস্বরূপ, আর যতই এই অহং ত্যাগ হইতে থাকে, ততই আত্মা নিত্যস্বরূপে, নিজ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হন। ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ—ইহাই সমুদয় নীতিশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ—কেন্দ্রস্বরূপ। মানুষ উহা জানুক আর নাই জানুক, সমুদয় জগৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে চলিয়াছে—অল্পাধিক পরিমাণে তাহাই অভ্যাস করিতেছে। কেবল অধিকাংশ লোক উহা অজ্ঞাতভাবে করিয়া থাকে মাত্র। তাহারা উহা জ্ঞাতসারে করুক। ইহা প্রকৃত আত্মা নহে জানিয়া, তাহারা এই ত্যাগ-যজ্ঞ আচরণ করুক। এই ব্যবহারিক জীব সসীম জগতের ভিতরে আবদ্ধ। এক্ষণে যাহাকে মানুষ বলা যাইতেছে, তাহা সেই জগতের অতীত অনন্ত সত্তার সামান্য আভাস মাত্র, সেই সর্ব্বস্বরূপ অনন্ত অনলের এক কণামাত্র। কিন্তু সেই অনন্তই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ।

এই জ্ঞানের ফল—এই জ্ঞানের উপকারিতা কি? আজকাল সব বিষয়ই, এই ফল—এই উপকার—দেখিয়াই, পরিমাণ করা হয়। অর্থাৎ মোট কথাই এই, উহাতে কত টাকা, কত আনা, কত পয়সা হয়। লোকের জিজ্ঞাসা করিবার কি অধিকার আছে যে, সত্য—উপকার বা অর্থের মাপকাটি লইয়া বিচারিত হইবে? মনে কর, উহাতে কোন উপকার নাই, উহা কি কম সত্য হইয়া যাইবে? উপকার বা প্রয়োজন সত্যের

নির্ণায়ক হইতে পারে না। তা না হইলেও ইহাতে মহৎ উপকার আছে। আমরা দেখিতেছি, সকলেই সুখের অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে নশ্বর মিথ্যা বস্তুতে উহা অন্বেষণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ে কেহ কখন সুখ পায় নাই। সুখ আত্মাতেই কেবল পাওয়া যায়। অতএব এই আত্মাতে সুখলাভ করাই মানুষের সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজন। আর এক কথা এই যে, অজ্ঞানই সকল দুঃখের জননী, এবং মূল অজ্ঞান এই যে আমরা মনে করি, সেই অনন্তস্বরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সান্ত মনে করিয়া কাঁদিতেছেন; সমস্ত অজ্ঞানের মূলভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি যে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র; ইহাই সমুদয় স্বার্থপরতার জননী। যখনই আমি আপনাকে একটী ক্ষুদ্র দেহ বলিয়া বিবেচনা করি, তখনই আমি উহাকে, অন্যান্য শরীরের সম্বন্ধে কোন বিবেচনা না করিয়াই উহাকে রক্ষা করিতে এবং উহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি। তখন তুমি আমি ভিন্ন হইয়া যাই। যখনই এই ভেদজ্ঞান আইসে, তখনই উহা সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের দ্বার খুলিয়া দেয় এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখে লইয়া যায়। ইহাতে ইহাই উপকার হয় যে, যদি বর্ত্তমান কালের মনুষ্য জাতির খুব সামান্য অংশও এই ক্ষুদ্রভাব ত্যাগ করিতে পারে, তবে কালই এই জগৎ স্বর্গরূপে পরিণত হইবে, কিন্তু নানাবিধ যন্ত্র এবং বাহ্যজগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতিতে উহা কখন হইবে না। যেমন অগ্নির উপর তৈল প্রক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা আরও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ উহাতে দুঃখই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যতই ভৌতিক জ্ঞান উপার্জ্জিত হইতে থাকে, তাহা কেবল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি মাত্র। উহাতে কেবল স্বার্থপর লোকের হস্তে অপরের কিছু লইবার জন্য, অপরের জন্য নিজের জীবন না দিয়া অপরের স্কন্ধে খাইবার জন্য আর একটী যন্ত্র দেওয়া হয় মাত্র।

আবার জিজ্ঞাস্য এই, ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব? বর্ত্তমান সমাজে ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা যাইতেপারে। তাহার উত্তর এই,—সত্য, প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান প্রদর্শন করে না। সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংশ হউক, কিছু ক্ষতি নাই। সমাজ এবং সকল প্রাণীই সত্যে গঠিত, সুতরাং সত্য কখন সমাজের মত আপনাকে গঠিত করিবে না। যদি নিঃস্বার্থপরতার ন্যায়

মহৎ সত্য সমাজে কার্য্যে পরিণত না করা যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ কর, বনে গিয়া বাস কর। তাহা হইলেই সাহসীর মত কার্য্য করিলে। সাহস দুই প্রকারের আছে, এক প্রকারের সাহস—কামানের মুখে যাওয়া। ইহা যদি প্রকৃত সাহস হয়, তাহা হইলে ত ব্যাঘ্রগণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। কিন্তু আর এক রকমের সাহস আছে, তাহাকে সাত্ত্বিক সাহস বলা যাইতে পারে। একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে ভারতীয় সাধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সাধু এক প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্রাট্ তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সুতরাং তিনি ঐ সাধুকে সঙ্গে করিয়া নিজদেশে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সাধু তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, "আমি এই বনে বেশ আনন্দে আছি।" সম্রাট্ বলিলেন,—"আমি সমুদয় জগতের সম্রাট্। আমি আপনাকে অসীম ঐশ্বর্য্য ও উচ্চ পদমর্য্যাদা প্রদান করিব।" সাধু বলিলেন,—"ঐশ্বর্য্য পদমর্য্যাদা প্রভৃতি কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।" তখন সম্রাট্ বলিলেন,—"আপনি যদি আমার সহিত না যান, তবে আমি আপনার বিনাশসাধন করিব।" সাধু তখন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, তুমি যত কথা বলিলে, তন্মধ্যে ইহাই দেখিতেছি, মহা অজ্ঞানের মত কথা। তুমি আমাকে সংহার কর, সাধ্য কি? সূর্য্য আমায় শুষ্ক করিতে পারে না, অগ্নি আমায় পোড়াইতে পারে না, কোন যন্ত্রও আমাকে সংহার করিতে পারে না, কারণ আমি জন্মরহিত, অবিনাশী, নিত্যঅস্তিত্বশালী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মা।" ইহা আর এক প্রকারের সাহসিকতা। ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের সময় একজন মহাত্মা সন্ন্যাসী ছিলেন। একজন মুসলমান বিদ্রোহী ইঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রায় হত্যা করিয়াছিল। হিন্দু-বিদ্রোহিগণ ঐ মুসলমানকে স্বামীজির নিকট ধরিয়া আনিয়া বলিল, 'বলেন ত ইহাকে হত্যা করি' কিন্তু স্বামীজি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—'ভাই, তথাপি তুমিই সেই, তুমিই সেই,' এবং তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলেন। এও একপ্রকার সাহসিকতা। যদি তুমি সত্যের আদর্শে সমাজ গঠন না করিতে পার, যদি এমন ভাবে সমাজ গঠন না করিতে পার, যাহাতে সেই সর্ব্বোচ্চ সত্য স্থান পাইতে

হয়)। আচ্ছা তবে, এইস্থলে যেন দুইবার, ষ ও ট এতে আবৃত্তি দ্বারা এক স্বর (অকার) প্রযুক্ত কার্য্য পরিত্যক্ত হয়; (অর্থাৎ দুই স্বর প্রযুক্ত ঠন্ প্রত্যয় প্রাপ্তি হয়); কিন্তু কিরিণা, গিরিণা (কিরি ও গিরি শব্দের তৃতীয়ার এক বচনের রূপ,) এইস্থলে ত (কিরি এই উভয় বর্ণে, ও গিরি এই উভয় বর্ণে, একই ইকার, উচ্চারণ দুইবার করিলেও) নিশ্চয়ই এক স্বর লক্ষণ নিমিত্ত অন্তস্বরে উদাত্তত্বই প্রাপ্ত হইবে।

না, এইস্থলে দোষ হইবে না, এইস্থলেও প্রয়োগসিদ্ধ হইবে। কিরূপে? লৌকিক ব্যবহার অনুসারে। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন, সহস্র ঋষি, একটী কপিলা গাভীকে, একজন একজন করিয়া (একটী ঋষি অন্য ঋষিকে, সে তৃতীয় ঋষিকে, সে আবার চতুর্থ ঋষিকে দান করেন; এরূপে একটী গাভীকে সহস্রবার সহস্র ঋষি দান করেন), একটী মাত্র গাভীদ্বারা সেই সকল ঋষিই দক্ষিণাসম্পন্ন হন, সেইরূপ এইস্থলেও একটী মাত্র 'অ'কার বা 'ই' কার অনেক বার উচ্চারণ করাতে অনেক স্বরত্ব (অচ্ত্ব) প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূল।—যদপ্যুচ্যতে। দ্রব্যবচ্চোপচারাঃ প্রাপ্নুবন্তীতি। ভবেদ্যদসম্ভবি কার্য্যং তন্নানেকো যুগপৎ কুর্য্যাৎ। যত্তু খলু সংভবি কার্য্যমনেকোঽপি তদ্যুগপৎ করোতি। তদ্যথা। ঘটস্য দর্শনং স্পর্শনং বা, সম্ভবি চেদং কার্য্যমকারস্যোচ্চারণং নামানেকোঽপি তদ্যুগপৎ করিষ্যতি।

বঙ্গানুবাদ।—যে হেতু ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, (অকারাদিবর্ণের) উপচার (ব্যবহার)ও, দ্রব্যের (ঘটাদির) ন্যায়ই হয়। (অর্থাৎ যেমন একটী মাত্র ঘট [দ্রব্য] দ্বারা এক কালে অনেক কায সম্ভব হয় না; সেরূপ 'অ'কার যদি একটী মাত্র হইত, তবে তদ্দ্বারা এক কালে বহু কার্য্য সম্ভব হইত না। এই জন্যই অকারকে বহুস্বর মানিতে হইবে।)

আচ্ছা, হউক্ যে স্থলে কার্য্য অসম্ভব, সেই স্থলেই অনেক কার্য্য যুগপৎ (এককালে) করা যায় না; পরন্তু যে স্থলে নিশ্চয়ই কার্য্য সম্ভব, সেই স্থলে ত অনেক কার্য্যও যুগপৎ হইয়া থাকে। যেমন, ঘটের দর্শন বা স্পর্শন, অনেকের এক কালেই হয়, সেরূপ সম্ভাবিত এই 'অ'কার উচ্চারণ রূপ কর্ম্ম, অনেকেও যুগপৎই করিবে।

আনাভাব্যং তু কালশব্দব্যবায়াৎ। * (১)

(১) এইরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট অংশকে কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিক বলিয়া জানিবে। তাই ভাষ্যকারের উক্তিতে পুনরুক্তি দোষ হয় নাই।

হইবে . এক

বলিয়া

বঙ্গানুবাদ।—পুনঃ, যদি এই সকল বর্ণ শকুনির ন্যায় হয়; যেমন শকুনি সকল শীঘ্র গমনশীল বলিয়া, সম্মুখভাগে উড়িল, (কিন্তু তখনই) পাছে দেখা গেল; সেইরূপ, এই স্থলেও 'অ'কার (এইমাত্র) 'দ' এতে দেখা গেল, (পরক্ষণেই) 'ও' এতে, দেখা যাইতেছে।

ভাষ্যমূল।—নৈবং শক্যম্। অনিত্যত্বমেবং স্যাৎ। নিত্যাশ্চ শব্দাঃ। নিত্যেষু চ শব্দেষু কূটস্থৈরবিচালিভির্বর্ণৈর্ভবিতব্যমনপায়োপজনবিকারিভিঃ। যদি চায়ং দইত্যত্র দৃষ্টো ও ইত্যত্র দৃশ্যেত নায়ং কূটস্থঃ স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ হইতে পারে না। কেন না, এইরূপ বলিলে, শব্দের অনিত্যত্ব হয়। শব্দ সমূহ নিত্য পদার্থ। সুতরাং নিত্যশব্দ সমূহে, কূটস্থ (নির্বি-কার), অবিচালি (স্থির,) প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকা কর্ত্তব্য, যেন অপায় (লোপ) উপজন (আগম), ও বিকার (আদেশ) প্রভৃতি না হয়। যদি এই 'অ' কার, 'দ' এতে একবার দেখিলাম, আবার সেই 'অ'কারই 'ও' এতে আবার দেখা যায়, তবে ইহা কূটস্থ হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল।—যদি পুনরিমে বর্ণা আদিত্যবৎস্যুঃ। তদ্যথা। এক আদিত্যো-হনেকাধিকরণস্থো যুগপদ্দেশপৃথক্ত্বেষূপলভ্যতে। বিষম উপন্যাসঃ। নৈকো-দ্রষ্টা আদিত্যমনেকাধিকরণস্থং যুগপদ্দেশপৃথক্ত্বেষূপলভতে। অকারং পুনরুপ-লভতে। অকারমপি নোপলভতে, কিং কারণম্। শ্রোত্রোপলব্ধিবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ-প্রয়োগেণাভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ। একঞ্চ পুনরাকাশম্। আকাশ-দেশা অপি বহবঃ। যাবতা বহবঃ তস্মাদাস্থভাব্যমকারস্য।

বঙ্গানুবাদ।—পুনঃ, যদি এই সকল বর্ণ আদিত্যের ন্যায় হয়, যেমন, একই আদিত্য (সূর্য্য) অনেক অধিকরণস্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দেশেতে, যুগপৎই উপলব্ধি হয়, অকারও পুনঃ সেইরূপই উপলব্ধি হয়।

'অকার'ও সেইরূপ উপলব্ধি হয় না। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি-সম্পন্ন বুদ্ধির গ্রহণযোগ্য, প্রয়োগ করিবার সময়ে অভিব্যক্ত, আকাশদেশ (আকাশে অবস্থিত) শব্দ। আকাশও আবার একটী। (অর্থাৎ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও একটীমাত্র আম্রফলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি গুণ থাকা হেতু, এককালেই বিবিধ গুণ উপলব্ধি হইতে পারে; কিন্তু একই মাত্র আকাশে, কেবল একমাত্র শব্দগুণই বর্ত্তমান থাকা হেতু, আশ্রয় এক বলিয়া, 'অ'কারও একই মাত্র বর্ণ বলিব। [বিশেষতঃ শব্দ আবার একমাত্র কর্ণ ভিন্ন অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি হয় না, এজন্য অধিকরণও ভিন্ন নহে।]

পুনঃ কথা এই যে, এইরূপ হইতে পারে না। কেন না, আকাশ এক হইলেও আকাশের দেশ (অবস্থিতি স্থান) বহু। যে হেতু বহুস্থান, সেই হেতুই (অতুল্য দৃষ্টান্ত বলিয়া) 'অ'কারের (অন্য অকার হইতে,) অন্ত ভাবনা কর্ত্তব্য। (এবং এইজন্যই 'অ'কারের বহুস্বর মানিতে হইবে।)

ভাষ্যমূল।—আকৃতিগ্রহণাৎ সিদ্ধম্। *

অবর্ণাকৃতিরুপদিষ্টা সর্ব্বমবর্ণকুলং গ্রহীষ্যতি। তথেবর্ণাকৃতিস্তথোবর্ণাকৃতিঃ। তদ্বচ্চ তপর করণম্। *

এবং চ কৃত্বা তপরাঃ ক্রিয়ন্তে আকৃতিগ্রহণেনাতিপ্রসক্তমিতি। ননু চ সবর্ণ-গ্রহণেনাতিপ্রসক্তমিতি কৃত্বা তপরাঃ ক্রিয়েরন্ প্রত্যাখ্যায়তে তৎ সবর্ণেহণ্-গ্রহণমপরিভাষামাকৃতিগ্রহণাদনন্যত্বাচ্চেতি।

বঙ্গানুবাদ।—(যদি বহুস্বরই মানিতে হইবে তবে 'অ' 'ই' 'উণ্' প্রভৃতিসূত্রে একটীমাত্র 'অ'কার 'ই'কার বা 'উ'কার গ্রহণ করিলেন কেন? তাহাতে দোষ হইবে না, কেন না, একটী 'অ'কারেরই আকৃতি বিশিষ্ট অন্যান্য 'অ'কার বলিয়া) আকৃতিগ্রহণহেতুই সিদ্ধ হইবে। *

'অ'বর্ণকে আকৃতি বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে জানিতে হইবে; এবং সেই হেতুই যত 'অ'বর্ণের কুল (বংশ) আছে, সেই সমস্তই (একমাত্র 'অ'বর্ণ গ্রহণে) গৃহীত হইবে। সেই রূপ 'ই'বর্ণ ও আকৃতি, 'উ'বর্ণ ও আকৃতি। অর্থাৎ একটী মাত্র 'ই'বর্ণ 'উ'বর্ণ গ্রহণের দ্বারাই, যাবতীয়'ই'বর্ণ 'উ'বর্ণ গৃহীত হইয়াছে জানিবে। এবং আকৃতিবান্ বলিয়াই 'ত'পর করা হইয়াছে। *

এরূপ 'অ'কারাদি বর্ণকে, আকৃতি বিশিষ্টমনে করিয়াই 'ত'পর (ত কারের পরে বা তকার পরে থাকিলে তাহার সমকাল বিশিষ্ট বর্ণেরই গ্রহণ হয়, যেমন অৎগ্রহণে, হ্রস্ব 'অ'কারের, আৎগ্রহণে কেবলমাত্র দীর্ঘ 'আ'কারের ইত্যাদি) সমূহও করা হইয়াছে, আকৃতিগণে অতি প্রসঙ্গ না হয় (যেন অৎগ্রহণে'অ'কার আৎগ্রহণে 'আ'কার গ্রহণ না হয়)।

যদি বল সবর্ণ গ্রহণে (অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ ১।১।৬৯ অন্ প্রত্যাহার (১) স্থিত বর্ণ' এবং উকার ইৎ অর্থাৎ কু কবর্গ, চু চবর্গ, টু টবর্গ, তু তবর্গ, পু পবর্গ, ইহারা পরস্পর সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। অণ্ প্রত্যাহার এখানে পরের ণকারের সহিত জানিবে। এই সূত্রানুসারে 'অ' 'ই' 'উ' ইত্যাদি

(১) অইউণ্। ঋ৯ক্। এওঙ্। ঐঔচ্। প্রভৃতি সূত্রের প্রথম বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত হল্ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বর্ণ, তাহাদিগের আদি বর্ণ এবং অন্ত বর্ণ লইয়া প্রত্যাহার সংজ্ঞা হয়। যথা, অণ্, অচ্, এঙ্, এচ্, হল্ ইত্যাদি।

গ্রহণে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতাদি, অষ্টাদশ 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতির গ্রহণ হয়।) হ্রস্ব 'অ' বর্ণ গ্রহণে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতাদি যাবতীয় 'অ' বর্ণের গ্রহণ হয় বলিয়া যাহাতে অতিপ্রসঙ্গ না হয়, তজ্জন্যই, 'ত'পর সমূহ করা হইয়াছে। (আকৃতি গ্রহণ প্রযুক্ত অতিপ্রসঙ্গ নিবারণ জন্য নহে।)

এই মত প্রত্যাখ্যান (খণ্ডন) করা হইয়াছে যে, "সবর্ণ সংজ্ঞাতে অণ্ প্রত্যাহার গ্রহণ, কথনীয় নহে; কেন না, আকৃতিগ্রহণ হেতু এবং অনন্যত্ব (যাবতীয় 'অ'কার 'ই'কারাদি বর্ণ সমূহ হইতে অভিন্নত্ব) হেতু।"

ভাষ্যমূল।—হল্ গ্রহণেষু চ। *

কিম্। আকৃতিগ্রহণাৎ সিদ্ধমিত্যেব। ঝলো ঝলি অবাত্তাম্ অবাত্তম্ অবাত্ত। যত্রৈতন্নাস্তি অণ্ সবর্ণানগৃহ্ণাতীতি।

বঙ্গানুবাদ —হল্ মধ্যেও আকৃতির গ্রহণ হইয়াছে। *

কি রূপে? (অর্থাৎ হল্ প্রত্যাহার মধ্যে ত অন্ নাই যে, [অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ, এই সূত্রানুসারে] 'ত'কারের সবর্ণ 'ত'কার, 'প'কারের সবর্ণ 'প'কার এবং 'স'কারের 'স'বর্ণ 'স'কার হইবে। কিন্তু হল্ মধ্যেও যখন 'স'কারে 'স'কারে, 'ত'কারে 'ত' কারে, সবর্ণ দেখা যায়, তখনই জানিতে হইবে যে, হল্ প্রত্যাহার মধ্যে আর "অণুদিৎ * * *" সূত্রানুসারে, সবর্ণ সংজ্ঞার গ্রহণ হয় নাই, যে হেতু হল মধ্যে অণ্ প্রত্যাহারের প্রবেশ নাই; এই হেতুই জানিতে হইবে যে, আকৃতিগ্রহণ হেতুই সূত্রস্থিত [অ ই উ ণ্, ইত্যাদি সূত্রস্থিত] 'ত'কারের ন্যায়, সূত্রের বহিঃস্থিত ও যাবতীয় 'ত'কারের গ্রহণ হইয়াছে) আকৃতি গ্রহণ হেতুই হল বর্ণ সমূহ, নিশ্চিত সিদ্ধ হইবে। যথা,—ঝলোঝলি। ৮।২।২৬। (ঝল্ প্রত্যাহারের পরস্থিত 'স'কারের লোপ হয়, ঝল্ প্রত্যাহার পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে আবাৎস্তাম্ এর সকারের লোপ হইল) অবাত্তাম, অবাত্তম্, অবাত্ত। ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইল। যে স্থলে অণ্ প্রত্যাহার, সবর্ণ বর্ণ সমূহকে গ্রহণ করে নাই, সেই স্থলে (অণ্ সংজ্ঞার অপ্রাপ্তি স্থলে) ও প্রয়োগসিদ্ধি (আকৃতি গ্রহণ, বা অভেদ গ্রহণ হেতুই) হইল।

ভাষ্যমূল।—রূপসামান্যাদ্বা। *

রূপসামান্যাদ্বা সিদ্ধমেতৎ। তদ্যথা। তানেব শাটকানাচ্ছাদয়ামঃ যে মথুরায়াম্। তানেব শালীন্ ভুঞ্জ্মহে যে মগধেষু। তদেব ভবতঃ কার্ষাপণং যন্মথুরায়াং গৃহীতম্। অন্যস্মিংশ্চান্যস্মিন্ রূপসামান্যাত্তদেবেদমিতি

ভবতি। এবমিহাপি রূপ সামান্যাৎ সিদ্ধম্।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা রূপসামান্যহেতু। *

অথবা (যাবতীয় 'অ'কার 'ই'কার 'উ'কারাদিরই) এক রকম রূপ (মূর্ত্তি) বলিয়া (একই 'অ'কার গ্রহণে) কার্য্যসিদ্ধি হইবে। যেমন, সেই শাড়ীই আমরা গায়ে দিতেছি (আচ্ছাদন করিতেছি), যাহা মথুরাতে গায়ে দিয়াছিলাম। সেই শালিই (শ্বেততণ্ডুলবিশিষ্ট হৈমন্তিক ধান্য বিশেষ) আমরা ভোজন করিতেছি, যাহা মগধে ভোজন করিয়াছিলাম। এই (নেও) তোমার সেই কড়িকাহণ, যাহা মথুরাতে গৃহীত হইয়াছিল। এই সকল স্থলে প্রকৃত পক্ষে সেই সকল জিনিষ না হইলেও, এক বস্তুতে অন্য বস্তু, রূপের সমানতা হেতু, তাহাই ইহা, এই রূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ('অ'কারাদি) স্থলেও, সেইরূপ রূপের সমানতা হেতু (এক 'অ'কার উচ্চারণেই) সিদ্ধ হইবে।

ভাষ্যমূল।—ঋ ৯ ক্ ॥ ২ ॥ অথ ৯ কারোপদেশঃ কিমর্থঃ। কিং বিশেষেণ ৯কারোপদেশশ্চোদ্যতে ন পুনরন্যেষামপি বর্ণানামুপদেশশ্চোদ্যতে। যদি কিঞ্চিদন্যেষামপি বর্ণানামুপদেশে প্রয়োজনমস্তি ৯কারোপদেশস্যাপি তদ্ ভবিতুমর্হতি। কোবা বিশেষঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অতঃপর শঙ্কা এই যে, ঋ ৯ ক্, এই সূত্রে ৯কার, কি নিমিত্ত (মহাদেব কর্ত্তৃক) উপদেশ করা হইয়াছে?

'৯'কারেতে এমন কি বিশেষ আছে যে, অন্য বর্ণসমূহের কথা না বলিয়া '৯'কার উপদেশের বিষয় প্রশ্ন হইল? যদি অন্যবর্ণসমূহেরও উপদেশে কোন প্রয়োজন থাকে, তবে ৯কার উপদেশেরও তাহাই প্রয়োজন হওয়া উচিত। ইহাতে (৯কারে) আর (অন্য বর্ণাপেক্ষা) বিশেষই বা কি?

ভাষ্যমূল।—অয়মস্তি বিশেষঃ। অস্যহি ৯কারস্যাল্পীয়াংশ্চৈব প্রয়োগবিষয়ঃ। যশ্চাপি প্রয়োগবিষয়ঃ সোহপিক্৯পিস্থস্যৈব। ক্৯পেশ্চ লত্বমসিদ্ধম্ তস্যাসিদ্ধত্বা-দৃকারস্যৈবাচ্ কার্য্যাণি ভবিষ্যন্তি। নার্থ ৯কারোপদেশেন।

বঙ্গানুবাদ।—ইহাতে বিশেষ এই;—এই যে '৯'কার, তাহার প্রয়োগের বিষয় (স্থল) অতি অল্প। আর যাহা কিছু প্রয়োগের বিষয় তাহাও কেবল 'ক্৯পি' (ধাতু)র স্থলেই দৃষ্ট হয়। (সেই ক্৯পি, ধাতু আবার, কৃপোরোলঃ ৮।২।১৮' এই সূত্রানুসারে, কৃপি ধাতুর 'ঋ'কারস্থানে '৯'কার আদেশ হয়; কিন্তু অচ্ নিমিত্তক "ইকোযণ চি" প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য, তাহা 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' এই সূত্রানুসারে

অসিদ্ধ। কারণ, "কৃপোরোলঃ" সূত্র অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদস্থিত। অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্র হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে সমস্ত সূত্র, তাহার নিকট তৎপূর্ব্ব সূত্রসমূহ অসিদ্ধ।) 'কৃপি'র দৃষ্টিতে, লত্ব অসিদ্ধ; সুতরাং তাহার অসিদ্ধতা হেতু, 'ঋ'কারত্ব মানিয়াই 'ঌ'কারে, অচ্ প্রযুক্ত ("ইকো যণ চি," প্রভৃতি 'য'কারাদি আদেশরূপ কার্য্য সিদ্ধি হইবে; অতএব "ঌ"কার উপদেশের কোন প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূল।—অত উত্তরং পঠতি। ঌকারোপদেশো। যদৃচ্ছাশক্তিজানুকরণ-প্লুত্যাদ্যর্থঃ। *

ঌকারোপদেশঃ ক্রিয়তে যদৃচ্ছাশব্দার্থোঽশক্তিজানুকরণার্থঃ প্লুত্যর্থশ্চ। যদৃচ্ছাশব্দার্থস্তাবৎ। যদৃচ্ছয়া কশ্চিদ্ ঌতকোনাম, তস্মিন্নচ্ কার্য্যাণি যথা স্যুঃ। দধ্য্ ঌতকায়দেহি। মধ্বঌতকায়দেহি। উদঙ্ঙ্ ঌতকোঽগমৎ। প্রত্যঙ্ঙ্ঌতকোঽগমৎ। চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ। জাতিশব্দাগুণশব্দাঃ ক্রিয়াশব্দাঃ যদৃচ্ছাশব্দাশ্চতুর্থাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—এই (শঙ্কা নিবারণ) জন্যই (বার্ত্তিককার) উত্তর দিতেছেন। 'ঌ'কার উপদেশ, যদৃচ্ছা, অশক্তিজানুকরণ ও প্লুতাদির নিমিত্ত কর্ত্তব্য। *

'ঌ'কার উপদেশ করা হইতেছে, যদৃচ্ছাশব্দের অর্থবোধের নিমিত্ত, অশক্তিজানুকরণের নিমিত্ত, এবং প্লুত্যাদি অর্থের নিমিত্ত। যদৃচ্ছা শব্দের তাৎপর্য্যার্থ এই;—যথেচ্ছা হেতু (অর্থাৎ নামের কোনও ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন না থাকাতে, নিজের খুসিতে, ইচ্ছামত, কাহারও পুত্রের কি ভ্রাতার "ঌতক" নাম রাখিয়াছে) কেহও "ঌতক" নাম বিশিষ্ট; সেই নামস্থিত 'ঌ' কারেতে, অচ্ত্ব ধর্ম্ম মানিয়া তৎপ্রযুক্ত (যণাদি) কার্য্য যাহাতে হয়। (এইরূপে, অচ্ মধ্যে পাঠ হইলে, বিবিধ প্রয়োগও সিদ্ধি হইবে।) যেমন;—"দধ্য্ ঌতকায় দেহি।" (ঌতককে দধি দেও)। "মধ্ব্ ঌতকায় দেহি।" (ঌতককে মধু দেও। "উদঙ্ঙ্ ঌতকোঽগমৎ।" (ঌতক উত্তরদিকে গমন করিয়াছে।) প্রত্যঙ্ঙ্ ঌতকোঽগমৎ (ঌতক পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছে।)

শব্দ সমূহের প্রবৃত্তি (প্রেরণা) চারি প্রকার। যথা;—জাতিশব্দ, গুণ শব্দ, ক্রিয়া শব্দ এবং চতুর্থ যদৃচ্ছা শব্দ। (অতএব যদৃচ্ছা শব্দ অমূলক নহে)।

ভাষ্যমূল।—অশক্তিজানুকরণার্থঃ। অশক্ত্যা কয়াচিদ্ব্রাহ্মণ্যা ঋতক ইতি

প্রয়োক্তব্যে, ঌতক ইতি প্রযুক্তং তস্যানুকরণং ব্রাহ্মণ্যৢতক ইত্যাহ কুমার্য্যৢতক ইত্যাহেতি।

বঙ্গানুবাদ।—অশক্তি হেতু উৎপন্ন বর্ণের অনুকরণের নিমিত্ত, (অশক্তিজানু করণার্থ)। (শব্দোচ্চারণে) অসমর্থা কোনও ব্রাহ্মণী, 'ঋতক' শব্দ প্রয়োগ করা উচিত হইলেও (অসমর্থ হইয়া, 'ঌ তক' প্রয়োগ করিলেন; তাহার (সেই ব্রাহ্মণীর) অনুকরণ করিতে গিয়া, "ব্রাহ্মণ্যৢতক ইত্যাহ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণী 'ঌতক' এই কথা বলেন; "কুমার্য্যৢতক ইত্যাহেতি" অর্থাৎ কুমারী 'ঌ তক' এই কথা বলিয়া থাকেন, (এইরূপ প্রয়োগ কেহ কেহ করেন। যদি 'ঌ' কার অচ্ মধ্যে, পাঠ না হইত, তবে 'ব্রাহ্মণ্যৢতক ইত্যাহ' ইত্যাদি স্থলে, 'য' কারাদি আদেশরূপ সন্ধি হইত না।

প্লুতাদ্যর্থশ্চ 'ঌ'কারোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। কে পুনঃ প্লুতাদয়ঃ! প্লুতিদ্বির্বচনস্বরিতাঃ। কৢপ্তশিখঃ, কৢপ্তঃ, প্রকৢপ্তঃ। প্লুত্যাদিষু কার্য্যেষু কৢপের্লত্বং সিদ্ধং তস্য সিদ্ধত্বাদচ্ কার্য্যাণি ন সিধ্যন্তি। তস্মাদ্ঌকারোপদেশঃ ক্রিয়তে। নৈতানি সন্তি প্রয়োজনানি।

ন্যায্য ভাবাৎ কল্পনং সংজ্ঞাদিষু। *

ন্যায্যস্য ঋতকশব্দস্য তাবৎ কল্পনং সংজ্ঞাদিষু সাধুমন্যন্তে ঋতক এবাসৌ ন ঌতক ইতি।

প্লুতি প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যও 'ঌ' কার উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

সেই প্লুত্যাদি কি কি?

প্লুতি, দ্বির্ব্বচন, এবং স্বরিত। (প্লুতি, যথা;—কৢপ্তশিখঃ (কল্পিত-শিখাবিশিষ্ট)। (দ্বির্ব্বচন যথা;)—কৢপ্তঃ (কল্পিত)। (স্বরিত যথা;—প্রকৢপ্ত (বিশেষ সমর্থ)।

এই সকল স্থানে প্লুত্যাদি কার্য্যে, কৢপ ধাতুর স্থানে, 'ল'ত্বসিদ্ধ হইয়েছে; এবং লত্ব সিদ্ধ হওয়াতে, ('ঋ' স্থানে 'ঌ' হওয়াতে,) 'ঌ' কারে অচ্ত্ব ধর্ম্ম মানিয়া (যণাদি) কার্য্য সকল সিদ্ধ হইবে না। (কেন না 'ঌ'কার অচ্ প্রত্যাহারে পাঠ নাই)। এই জন্যই (মহেশ্বর 'ঋ ঌ ক্' সূত্রে,) 'ঌ'কারের উপদেশ করিয়াছেন।

এই সমুদয় (ঌ উপদেশের) প্রয়োজন হইতে পারে না। কেন না;—ন্যায্য (শাস্ত্র সঙ্গত শুদ্ধ শব্দ যুক্ত) ভাব, সংজ্ঞাদিতেও করা কর্ত্তব্য। *

(কেহ অজ্ঞতা প্রযুক্ত 'ঌ তক' নাম রাখিলেও, শব্দ শাস্ত্রজ্ঞগণের উচিত,

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত *

শ্রীম—কথিত।] [৬৫৬ পৃষ্ঠার পর।

## (ব্রাহ্মসমাজ ও আদেশবাদ।)

"লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। তবে যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন, আর আদেশ দেন, তা হলে হতে পারে। নারদ, শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ্ তো জানো। যতক্ষণ কাঠে জাল, ততক্ষণ দুধ ফোঁস ক'রে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে আর কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক হুজুগে। এই এখানটা কুয়া খুঁড়চে। বলে জল চাই। সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিলে। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল, আবার ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। এই রকম! আবার, মনে মনে 'আদেশ' হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত? পর্ব্বত টলে যায়। শুধু লেক্‌চার? ঐ দিন কতক লোকে শুনবে, তার পর ভুলে যাবে। সে কথা অনুসারে কাজ করবে না।

"ও দেশে হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে রোজ সকালবেলা লোকে বাহ্যে করে রাখ্‌তো। যারা সকালবেলা আসে, তারা খুব গালাগালি দেয়। কিন্তু আবার তার পর দিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না (সকলের হাস্য)। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না', তখন সব বন্ধ হলো। (হাস্য)।

"যে লোক শিক্ষা দেবে, তার চাপরাস্ আঁটা চাই। তা না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে লয়ে যাচ্ছে (হাস্য)। তাতে হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্ লাভ হলে তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়। তবেই কার কি রোগ বোঝা যায়।

"আদেশ না থাকলে, 'আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয় 'আমি কর্ত্তা'। † 'ঈশ্বর কর্ত্তা',

* প্রথমভাগ—ছাপা হইতেছে।

† "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে"।

'ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না,' এ বোধ যদি হয় তা হলে তো সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্ত্তা,' 'আমি কর্ত্তা', এই বোধ থেকেইতো যত দুঃখ অশান্তি।

(কর্ম্মযোগ ও ব্রাহ্মসমাজ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি)। তোমরা বলো 'জগতের উপকার' করা! জগৎ কি এতটুকু। আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎ করো, তাকে লাভ করো, তিনি শক্তি দিন, তবে সকলের হিত করতে পারো। নচেৎ নয়।

একজন ভক্ত। যতদিন না ঈশ্বর লাভ হয়, ততদিন কি সব কর্ম্ম ত্যাগ করবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, কর্ম্মত্যাগ করবে কেন? তাঁর চিন্তা, তাঁর নাম গুণ গান, নিত্য কর্ম্ম এ সব কর্ত্তেই হবে।

ব্রাহ্মভক্ত। সংসারের কর্ম্ম? বিষয় কর্ম্ম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ তাও করবে, সংসার যাত্রার জন্য যে টুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ঐ কর্ম্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আর বলবে, 'হে ঈশ্বর, আমার বিষয় কর্ম্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখ্‌ছি যে বেশী কর্ম্ম জুট্‌লে তোমায় ভুলে যাই, মনে করছি নিষ্কাম কর্ম্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে'। হয়তো দান সদাব্রত বেশী করতে গিয়ে লোকমান্য হতে ইচ্ছা হয়ে পড়ে।

"শম্ভুমল্লিক হাঁসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করণীর কথা বলেছিল। আমি বল্লাম, সম্মুখে যেটা পড়্‌লো, না করলে নয়, সেই টাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কায জড়ানো ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে গিয়ে দানই কর্ত্তে লাগলো, কালী দর্শন আর হলো না। দেরী হওয়াতে আর মন্দিরের কপাট পড়ে গেল। (সকলের হাস্য)। আগে যো সো করে, ধাক্কা ধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন কর্ত্তে হয়, তার পর দান যত কর আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব কোরো। কেননা ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম্ম। শম্ভুকে তাই বল্লুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি তুমি বল্‌বে, আমায় কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিস্পেনসারী করে দাও? (সকলের হাস্য)। ও সব কাজ করবার আলাদা থাকের লোক আছে। ভক্ত কখনও তা বলে না; বরং বল্‌বে, 'ঠাকুর আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্ব্বদা রাখো, পাদ-পদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম করতে বলেছে, তাও কলি-কালে করা বড় কঠিন। এখন অন্নগত প্রাণ। বেশী কর্ম্ম চলে না। জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগীর হয়ে যায়। বেশী দেরি সয় না। তাই এখন ডি, গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুন গান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।

"(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিযোগ। তোমরা হরিনাম কর, মায়ের নাম গুন গান কর, তোমরা ধন্য। তোমাদের ভাবটী বেশ। বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলো না। তোমরা ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। আর তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলো, এও বেশ। তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক্‌লে তাঁকে অবশ্য পাবে।"

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### (ভক্তমন্দিরে—ভক্তসঙ্গে।)

জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ভাগীরথীবক্ষ কৌমুদীর লীলাভূমি হইয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের গাড়ী আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাষ্টার ও দু একটী ভক্ত সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়ীতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন।

গাড়ীতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈ, তিনি কৈ?' অর্থাৎ কেশব কৈ?—দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে কে এঁর সঙ্গে যাবে?' সকলে প্রস্তুত হইলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ইংরাজটোলা। সুন্দর রাজপথ; পথের দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছেন। অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। তাহাদের দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ—কক্ষমধ্যে দীপমালা; স্থানে স্থানে হারমোনিয়াম্‌, পিয়ানো সংযোগে ইংরাজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। এমন সময়ে হঠাৎ বল্লেন, 'আমার জল তৃষ্ণা পাচ্ছে, কি হবে?'

তখন কি করা যায়! নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের ( India club ) নিকট গাড়ী থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন। কাঁচের গ্লাসে করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গ্লাসটী ধোয়াতো'। নন্দলাল বল্লেন, হাঁ। তখন সেই গ্লাসেই জল খাইলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ী চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোকজন, গাড়ী ঘোড়া, চাঁদের আলো দেখিতে লাগিলেন। সকলতাতেই আনন্দ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন। ঠাকুরের গাড়ী সিমুলিয়ার শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে আসিয়া লাগিল। সুরেশ ঠাকুরের পরম ভক্ত।

কিন্তু সুরেশ বাড়ী ছিলেন না, নূতন বাগানে গিয়াছিলেন। বাড়ীর লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিল।

গাড়ীভাড়া দিতে হবে। কে দিবে? সুরেশ থাকিলে সেই দিত। ঠাকুর বল্লেন একজন ভক্তকে, 'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে লেনা। ওরা কি জানে না ওদের ভাতাররা যায় আসে?' (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র ঐ পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে একজন ভক্তকে পাঠালেন।

এ দিকে বাড়ীর লোকেরা দুতালার ঘরে ঠাকুরকে লইয়া বসাইলেন। ঘরের মেজেতে চাদর পাতা, দুচারটা তাকিয়া তার উপর পড়িয়া ছিল। কক্ষ প্রাচীরে সুরেশের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত Oil painting; যাহাতে কেশবকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখাইয়া দিতেছেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মের সমন্বয়, আর বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল। তিনি বল্লেন,—

"আজ কেশব সেনের সঙ্গে জাহাজে করে বেড়াতে গিছলাম। বিজয় ছিল, এরা সব ছিল"। মাষ্টারকে নির্দ্দেশ করিয়া বল্লেন, "একে জিজ্ঞাসা কর, কেমন বিজয় আর কেশবকে বল্লুম, মায়ে ঝীয়ে মঙ্গলবার, আর জাটলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না, এই সব কথা।" "( মাষ্টারের প্রতি ) কেমন গা?" মাষ্টার বল্লেন, আজ্ঞা হাঁ।

রাত্রি হইল, তবু সুরেশ ফিরিলেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাইবেন, আর দেরী করা যায় না, রাত সাড়ে দশ হইয়াছে।

রাস্তায় চাঁদের আলো। গাড়ী আসিল। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলে নরেন্দ্র ও মাষ্টার প্রণাম করিয়া কলিকাতাস্থিত স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

( সেবক হৃদয়ে। )

লক্ষ্মী পূর্ণিমা—জগৎ হাসিতেছে। কি সুন্দর রাত্রি! একজন ভক্ত ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথ দিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। আর ভাবিতেছেন—

"বড় হাসি পাচ্ছে—হালদার পুকুরের চাপরাসীর নোটিসের কথা মনে করে। তবে ঈশ্বরের কাছে আদেশ না পেয়ে লোকশিক্ষা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ঠাকুর কেশবকে উপদেশ দিলেন কেমন ভাবে! 'আমি খাই দাই থাকি, সব আমার মা জানেন।' অথচ গুরুগিরিকে নিন্দা করা হলো; বল্লেন, 'গুরু, কর্ত্তা আর বাবা, এই তিন কথাতে আমার গায়ে কাঁটা বিঁধে'। আবার কেউ যে মনে গড়ে বলবেন, আমার আদেশ হয়েছে, আমি এইবার উপদেশ দিতে আরম্ভ করি, তাও হবে না। সে কেবল আপনাকে ঠকানো। মনে মনে একটা ভাব কি বিশ্বাস জন্মালো—তাতে আদেশ হয় না। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর যথার্থ সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন! তিনি দেখা দিয়ে যদি বলেন, তুমি লোক শিক্ষা দাও, তার নাম আদেশ। আর ঈশ্বরকে না জেনেই বা lecture দিতে যাওয়া কেন? সত্যই তো এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। অন্তর্দৃষ্টি নাই—যাদের lecture দিচ্ছি, তাদের কি প্রকৃতি, কি রোগ জানি না। 'যদি ছিল রোগী বসে, বদ্যিতে শোয়ালে এসে!' কাণা কাণাকে পথ দেখাবেন! না দেখিয়ে ছাড়বেন না! আর দশ জনে যাই বাহবা দিয়েছে, অমনি lecturer মনে করেছেন, 'ঠিক বলেছি'। কি ভুল! ঠাকুর ঠিক বলেছেন, কলকাতার লোকগুলো হুজুগে, এই একজনকে বড় বলছে, আবার দুদিন পরে আর একজনকে বড় বলছে, আর তাকে ভুলে গেছে। এই হুজুগে যে ভোলে, তার দফা রফা দেখছি।

"কেশবকে বল্লেন, 'তোমরা এতো 'পাপ' 'পাপ' করো কেন'? এতদিনে একটা চট্‌কা ভাঙলো। স্কুলে যখন পড়ি, তখন থেকেই ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে বসি। বরাবর শুনছি 'পাপ' 'পাপ'। আজকাল কেশবের মুখে একটু কম পড়েছে। আমাদের আজকালের ধর্ম্ম দেখ্‌ছি সব খ্রীষ্টানদের কাছে

শেখা। তাও ভাল করে শেখা নয়। যিশু সেকালের আর নিজের দেশের লোকের যা দরকার তাই বলেছিলেন। 'অনুতাপ করো, তা না হলে পাপের শাস্তি পাবে—নরক হবে'। খ্রীষ্টানধর্ম্ম দাঁড়িয়েছে এই, যিশুকে ধরো, তবে 'উদ্ধার' হবে, 'পরিত্রাণ' হবে। হিন্দুধর্ম্ম ঠাকুরের মুখে শুনছি, সনাতন ধর্ম্ম! এতে পাপের কথা আছে, পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথাও আছে। কিন্তু কেবল 'পাপ' 'পাপ' এই কথা নেই। প্রধান কথা, ঈশ্বরকে ভক্তি করো, সব অন্য আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ভালবাসো। যেমন শুকদেব, নারদ, প্রহ্লাদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ ভাল বেসেছেন। যেমন ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ভাল বেসেছেন।

"সনাতন ধর্ম্মের কি শিক্ষা! ঠাকুর বল্লেন, 'ভক্তে বলে, তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ!'—ভগবানের নামে দেহ মন শুদ্ধ হয়, পাপ পালিয়ে যায়—পাপের পাহাড় তুলার পর্ব্বতের ন্যায় নামাগ্নিতে একক্ষণে পুড়ে যায়। আহা কি গান!

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি
বিনাশি নারী।
এসব পাতক না ভাবি তিলেক, (ওমা) ব্রহ্মপদ
নিতে পারি॥

"কৈ শ্রীগৌরাঙ্গও তো পাপের কথা তুলতেন না। কেবল তাঁর নাম সংকীর্ত্তন। কেবল ঈশ্বরকে ভাল বাসিবার কথা। কেবল ভজনানন্দ, প্রেমানন্দ; নিশিদিন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। ঠাকুরও জীবকে শিখাচ্ছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসা, এরি নাম 'ধর্ম্ম' (religion), তাঁর প্রেমে ডুব দাও, মরবে না, সে প্রেমসাগর অমৃতের সাগর। অমৃতে পড়িলে অমর হয়; মরে না।

"আবার মনে হচ্ছে উপনিষদের কথা—কে এ সোম্য! ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি মানুষ না দেবতা! এঁর কাছে হিন্দু, মুসলমান ব্রহ্মজ্ঞানী, সকলেই আসে দেখছি; শাক্ত, বাউল, বৈষ্ণব, সকলেই বলে, ইনি আমাদের লোক। ব্রাহ্ম-সমাজে দলাদলি, কিন্তু সব দলের লোকেরা—দলপতিরা—আসে, আর বলে, ইনি আমাদের। ইনি কেশবের, আবার ইনি বিজয়ের।

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।"

এ সৌম্য কে! রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত সর্ব্বভূতহিতেরত ইনি কে? সাকারবাদীরা জানে, ইনি পাকা সাকারবাদী। নিরাকারবাদী ইদানীন্তন ব্রহ্মজ্ঞানীরা জানেন, ইনি নিরাকারবাদী। যদি সাকারবাদী, নিরাকারবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীকে বলেন, 'দেখ ঠাকুর রামকৃষ্ণ কালী মানেন', তখন ব্রহ্মজ্ঞানী বলেন, 'সে কালী মানে কি আপনি জানেন, তাঁর 'কালী' মানে আলাদা; সে গভীর তত্ত্ব; আপনারা বুঝবেন না।' এরই নাম কি যিশু যা বলেছিলেন, "Be perfect as your Father in heaven is perfect"? ঈশ্বরের সূর্য্য সুহৃৎ-মিত্র-অরি-উদাসীন-নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর আলো দিতেছেন! এ বিশ্বজনীনভাব কি সামান্য মানুষের হতে পারে! সামান্য মানুষ ধর্ম্ম প্রচার করে, কিন্তু লোক রঞ্জন করিতে—লোক-মান্য হবার জন্য—ব্যতিব্যস্ত, দলাদলি করে ফেলে।

আবার এই মহাপুরুষের কি নিরহঙ্কার! সামান্য লোকে শিক্ষা দিতে গেলেই 'আমি শিক্ষা দিতেছি,' এই অভিমান এনে ফেলে। এঁর ভাব 'আমি যন্ত্র, ঈশ্বর যন্ত্রী'—গুরু একমাত্র তিনি।

"কিরূপে লোকশিক্ষা দিতে হয়, সেইটী দেখাবার জন্য, কিরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হয়, এইটী জীবকে দেখাবার জন্য, ঈশ্বর নিজে কি নরদেহ ধারণ করে এলেন নাকি? ব্রাহ্মভক্তদের গানে যে আছে 'নরহরি', ইনি কি তাই?

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। এ কি তাই?

"ঈশ্বর কি মানুষ হন? অনন্ত ঈশ্বর সাড়ে তিন হাত মানুষ? হিন্দুরা তো বলেন। অবতার। খ্রীষ্টানরাও বলেন—যিশুর কথা। শুনেছি ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। তা হলে তাঁর শক্তিতো সব তাতেই অবতীর্ণ। তবে একটা কথা আছে। জল সব জায়গায় আছে বটে—মাটী খুঁড়ে গেলেই জল বেরোয়। কিন্তু সকলে মাটী খুঁড়ে জল নিতে চায় না, পারেও না। তাই নদী, পুষ্করিণী, কূপের কাছে যায়। ঠাকুর বলছেন যে ভক্তের হৃদয় ঈশ্বরের বৈটকখানা। তবে উত্তম ভক্তও আছে, মধ্যম ভক্তও আছে, অধম ভক্তও আছে। যদি ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ দেখতে হয়, তবে এরূপ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতহিতে রত, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, প্রেমিক বৈরাগী, আবার সর্ব্বদা-সমাধিস্থ আদর্শমানব মহাপুরুষেই দেখা সুবিধা। তাই বুঝি পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে* লিখেছেন,

* পাতঞ্জল-দর্শন।

'হয় যমনিয়মাদি ষড়াঙ্গ যোগ অভ্যাস কর, নয় কোন মহাপুরুষের সর্ব্বদা ধ্যান চিন্তা কর। দুইয়ের মধ্যে একটী উপায় অবলম্বন করিলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হবে, ঈশ্বর দর্শন হবে।'

"অহেতুক কৃপাসিন্ধু! সংসারী লোক বলে ঘৃণা নাই! মার কাছে সাশ্রু-নয়নে বলছিলেন, 'মা' আমি কি এদের ব্যাড়ার ভিতর থেকে বাঁচাতে পারি'! 'ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু', এই কথা বোলে সংসার ত্যাগ করতে বল্লে কোন্ সংসারী শুন্‌বে বা করবে? ঠাকুর জানেন তাদের 'Problem' বড় কঠিন। 'Fool! here is thy ideal or no where'.* তাই বল্‌ছেন, "সংসারেই থাকো মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক্‌বে; 'শুদ্ধাভক্তি দাও, দেখা দাও' এই বলে।" আর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন। গীতার সেই কথা, 'হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করো' বলেছেন। বলেছেন, "'আমি অধম', 'আমি পাপী' 'আমি বদ্ধজীব' এ সব কথা দূর করে দাও, তাঁর নামে বিশ্বাস করো, অমনি শুদ্ধ হবে; দুর্ব্বলের ন্যায় মিউ মিউ কোরো না; বল আমি মুক্ত, আমি মায়ের ছেলে, রাজরাজেশ্বরীর ছেলে, আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি, আমার কি ভয়; আর নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌বার শক্তির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করো"। আহা কি অভয় দান! গৃহস্থের পথ কঠিন বটে, কিন্তু ভয় নাই। ঠাকুর যা শিখালেন, এই ধর্ম্মের এতটুকুও মহৎ ভয় থেকে ত্রাণ করে।† আবার, 'তোমাদের সংসার ত্যাগ করতে হবে না, তবে মন রেখো তাঁর পাদপদ্মে; নির্জ্জনে ব্যাকুল হয়ে ভেবো, সময় হলে তাঁর দর্শন পাবে।'

"ঈশ্বর দর্শন কি? ঈশ্বর দর্শন কর্‌লে কি হয়? কি অবস্থা হয়?

"বোধ হয় এই মহাপুরুষের অবস্থা হয়!

'ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু'! কি সুন্দর রাত্রি!—,

(এইবার ভক্তটী গান ধরিলেন—নরেন্দ্রের গান)—

কি সুখ জীবনে ওহে নাথ দয়াময় হে।
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে॥
অগণন ধনরাশি তায়, কিবা ফলোদয় হে।
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে॥
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে।

* Carlyle. † নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে॥
কি ছার শশাঙ্ক জ্যোতি দেখি আঁধারময় হে।
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেমচাঁদ নাহি হয় উদয় হে॥

"কি সুন্দর রাত্রি! (আবার গান)—

গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে
তারকামণ্ডিত চমকে মোতিরে।

"চন্দ্রতারামণ্ডিত সুনীল নভোমণ্ডল—যেন বৃহৎ পুষ্পপাত্রে ফুলন্ত-জ্যোতিঃ অসংখ্য কুসুম। বুঝি চরাচর বিশ্বের এক সঙ্গে পূজা হচ্ছে। শীতল শারদ সমীরণ—'পওন চৌরি করে'—গ্রহগণের নৃত্য গীত। Pythogoras বলেছিলেন। সকল লোক গায় 'ধন্য! তুমি ধন্য! এই গীতি অনিবার'। সাধু, মহাত্মারা কেউ সমুদ্রপ্লাবিত নদীকূলে, কেউ প্রান্তরে, কেউ গিরি-গুহার বাহিরে আসিয়া, কেহ বা মানসসরোবরে এই পূজা দেখিতেছেন, আর কত স্তব স্তুতি করিতেছেন। মা সাক্ষাৎকার হয়ে পূজা গ্রহণ করছেন, সন্তানদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করছেন, বরাভয় দিবেন। মা বিপদনাশিনী, ব্রহ্মময়ী, ভক্তিদায়িনী—

নমস্তে ভুবনেশানি নমস্তে প্রণবাত্মকে।
সর্ব্ববেদান্তসংসিদ্ধে নমোহ্হংকারমূর্ত্তয়ে।

"মধুমান্ আকাশ, মধুমান্ চন্দ্র, মধুমৎ নক্ষত্র, মধুমৎ জগৎ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। সব মধুময়। সুন্দর নগরী, সুন্দর সৌধধবলিত গৃহ, সুন্দর রাজপথ, সুন্দর মানুষ, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা! জগৎপ্রসবিনী আবার জগতেই রয়েছেন। সর্ব্বব্যাপিনী। মাকড়সার জাল মাকড়সা বার করেছে, আবার মাকড়সা সেই জালের উপর আছে। শুধু উপরেই বা কেন?—উপরে, অন্তরে, বাহিরে।

"কিন্তু মাকড়সা আবার জাল নষ্ট করে;—খেয়ে ফেলে। এসব কিছুই থাক্‌বে না। জীবের বিনাশ তো রোজ দেখা যাচ্ছে। আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্লেন, প্রলয় হয় মাঝে মাঝে। এই চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, জীব, জগৎ, কিছুই থাকবে না। আকাশ, কাল, এ সবও থাকবে না? ঐ যা! সব গোল হয়ে গেল! কে বুঝ্‌বে! বুদ্ধির অতীত!

"এই সুন্দর লীলারসতরঙ্গ—হয় যায়! মা লীলাময়ী জগৎ সৃষ্টি করেন। আমাদের মন, বুদ্ধি, অহং, এ সব সৃষ্টি করেন। আবার পালন করেন।

জগৎ স্বপ্নে জনপালিনি জনমোহিনি জগৎজননি।

বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারাবতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস! শুনিতে পাই কতই লীলা হইল। গোপীপ্রেম। দুষ্টের দমন; শিষ্টের পালন। ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন। নিষ্কাম ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে ফলসমর্পণ। রাজ্যশাসন। কত কাণ্ড হলো! কিন্তু লীলা সাঙ্গও হলো। 'হে উদ্ধব। এ সংসার মিথ্যা, এই যে সব লীলা দেখলে, এ সব মায়া। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। তুমি আমার বড় প্রিয়, তাই তোমায় বল্‌ছি। এখানে আর থেকো না। যাও বদরিকাশ্রমে। সেখানে পরব্রহ্মের চিন্তা করগে। আমি লীলা সম্বরণ করবো। যদুবংশ ধ্বংস হবে।*

"কে সেই পরব্রহ্ম? ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাঁকে মহাকালী, নিত্যকালী বলেন? যিনি প্রলয়ের সময় 'ন্যাতাকাতার হাঁড়িতে' ব্রহ্মাণ্ডের বীজ তুলে রেখে দেন। যিনি দেশকালের অতীত, যিনি গুণের অতীত, যিনি জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির সাক্ষীস্বরূপ! প্রলয়ের পর সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। কেবল তিনি। নরেন্দ্রের সেই গান—

রূপ, অরূপনামবরণ, অতীতআগামীকালহীন,
দেশহীন, সর্ব্বহীন, নেতি নেতি বিরাম যথায়।

"নিবিড় আঁধার—মা নিরাকারা। এই সুন্দর চন্দ্র নাই, শারদকৌমুদী নাই, সূর্য্য নাই, মন নাই, বুদ্ধি নাই, অহং নাই! মহাকালী মহাকাল!

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুন অহং-স্রোতে নিরন্তর।
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা নিরন্তর;—
সে ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিশাইল,
অবাঙ্মনসোগোচর বোঝে প্রাণ বোঝে যার॥

"নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গেল। একটু নেমেই গলে গেল—কে তার খবর দেয়! ওমা এতো সব মিথ্যা! কেবল তুমি, তুমি। সে দিন কবে হবে, ঠাকুরের গান মনে পড়ছে,—

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ।

কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসারবাসনা মনে।
উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে॥

"কিন্তু যতদিন দেহ বুদ্ধি রাখবে, ততদিন যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি থাকে। আর যেন তোমার শ্যামাকালী, রক্ষাকালী, বরাভয়দায়িনী চিন্ময় রূপ দেখতে পাই। যতদিন এই মায়াময় সংসার সত্য বলে বিশ্বাস করাবে, ততদিন যেন এ সমস্তই তোমার সত্তায় সত্ত্বাবান্ এইটী বোধে বোধ হয়। দেহবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি, যখন তুমি দূর করবে, তখন যা তোমার ইচ্ছা তাই হবে। কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর।"

ভক্তটী অনেক রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

লক্ষ্মী পূর্ণিমা। এমন রাত্রে জাগরণ বিধি। কি মনোহর রাত্রি! এই মহাপূজাকালে কে নিদ্রা যাইবে? তিনি দেহবুদ্ধি অহংবুদ্ধি রেখে দিয়েছেন, অতএব আমি কেন না এই মহাপূজায় যোগদান করিব? আমি তো মায়া দেখছি না; স্বপ্নবৎ দেখছি না; জীব জগৎ সব সত্য দেখ্ছি। এই মহালক্ষ্মীপূজা আমারই জন্য।

অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার।
কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, নাহি অন্ত তার॥
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, (হায়) পূর্ণ তোমারি ভাণ্ডার।
হে মহেশ অগণন লোক গায় ধন্য! ধন্য! এই গীতি অনিবার!

---

# আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।]  [ ৫৯২ পৃষ্ঠার পর।

উপরে উঠিয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করিবামাত্র দেখি একটী বাবু আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কেন না ইতিপূর্ব্বেই তিনি খবর পাইয়াছিলেন যে কলিকাতার একটী বাঙ্গালী বাবু সেই দিন খাদ দর্শন করিতে যাইবেন। যে বাবুটী অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে আমি চক্ষে কখন দেখি নাই,কিন্তু চিটি পত্রে তাঁহার সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল এবং আমি জানিতাম যে তিনি ঐ স্থানে থাকেন। আমি গাড়ি হইতে নামিয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার নাম কি অমুক?' তিনি বিস্মিত হইয়া

বলিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ'। এই বলিয়া তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিতেছেন বুঝিয়া আমি তাঁহাকে কোন অবসর না দিয়া অন্য কথা পাড়িলাম। ক্রমে খনি দেখিতে যাইবার কথা পাড়িলাম। চা পান করিয়া পরে খাদ দেখা হইবে বলিয়া তিনি আমাদিগকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। মার্গেরেটার অনবরত বৃষ্টি আর প্রখর শীতের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই ভিজে শীতে 'গরম গরম চা আর ফুলকা লুচি!' পানাহার দূরে থাক, দেখিয়াই পরিতৃপ্ত, আঘ্রাণেই পরিতুষ্ট! তুষারসুবিমল সসারোপরি (Saucer) আরোহণ করতঃ 'ফরগেট-মি-নট্' (forget-me-not)-বিচিহ্নিতপাত্রপূর্ণবাষ্পাকুল-'চা-পানি' * সমভিব্যাহারে ভিন্নপাত্রাসীনা জনমনোমোহিনী হবির্বাসবিস্তারিণী জিহ্বোদরপরিতোষকারিণী লুচি মহোদয়া খানসামাকরদ্বয় সুশোভিত করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ স্থলে বলিয়া রাখি 'লুচি' শব্দটা অতি অনিচ্ছার সহিত ব্যবহার করিলাম, কেননা ইহার আর অন্য নাম খুজিয়া পাইলাম না—ইহা বাঙ্গালাভাষার দোষ, আর অকৃতজ্ঞ লুচিখাদকদিগের দোষ। ইহা কোন ইয়ুরোপীয় খাদ্য সামগ্রী হইলে নানা ভাষায় ইহার তর্জ্জমা হইত এবং একশত আট কি একাধিকসহস্র নাম থাকিত। দুঃখী বাঙ্গালীজাতির আহারীয় সুতরাং তদুপযোগী অতি দুঃখী নাম—লুচি—চিরদিনই থাকিল। "সাহিত্য-পরিষৎ" যাহাতে অবিলম্বে এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েন, সেজন্য সম্পাদক মহাশয় যেন প্রখর লেখনীচালনা করেন।

প্রামাণিক মহাশয় জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আত্মপরিচয় না দিয়া আতিথ্যগ্রহণ করা নিতান্ত বেয়াদবি ভাবিয়া নিজের নাম ধাম বলিলাম। তিনি তখন অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন—ইহা ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের অঙ্গ আমি বিশেষ সঙ্কুচিত ভাবে বলিলাম যে নয় শত মাইল দূরে বিজন জঙ্গলের ভিতর পাহাড়ের উপর আসিয়া তাঁহার সহিত যে আমার পরিচয় হইল, সেটা তাঁহার বিবেচনার মধ্যেই আসিল না, ইহাই আশ্চর্য্য! তাহা ব্যতীত এই শীতে গরম চা ও লুচি এবং সাদর সম্ভাষণ আগন্তুক ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। অনেকের মত—দাতার ভাগ্যে গ্রহীতা বা অতিথি ভিক্ষুক জুটে। মনে মনে দানের ইচ্ছা থাকিলেই তাহাকে দাতা বলা যায় না। গ্রহীতাকে দান করিলে তবে দাতার দান কার্য্য সফল

* এদেশে ইতর শ্রেণী ও আসামীগণের মধ্যে চাকে চা-পানি কহে।

হয়; এইজন্ত দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এই জন্তই হিন্দুদাতাগণ দানের পাত্র অন্বেষণ করেন এবং এই কারণেই হিন্দু সহজে অপরের দান গ্রহণ করেন না, করিলেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে তাহা পরিশোধ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সংসারে দান কার্য্য যত সহজ মনে করা যায়, উহা তত সহজ নহে। দান করিতে অনেকের প্রবৃত্তি নাই; যাহার প্রবৃত্তি আছে, তাহার উপায় নাই অথবা গ্রহীতার সহিত সংযোগ ঘটে না। তাহাতেই হিন্দুমতে অতিথিকে নারায়ণসদৃশ সেবা করিবার ব্যবস্থা আছে এবং যে দিন গৃহস্থ অতিথিসৎকার করিতে পারেন, সেদিন তাঁহার নারায়ণ-সেবার ফল হয়।

ক্ষণকাল আলাপ পরিচয় করিবার পর প্রামাণিক মহাশয় আমাকে সঙ্গে লইয়া খাদ দেখাইতে চলিলেন। পাহাড়ের গায়ে একটী গহ্বর বা মনুষ্য যাতায়াতের পথ আছে। এই সুড়ঙ্গ পাহাড়ের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। সুড়ঙ্গটী ৩।৪ হাত উচ্চ এবং ৫।৬ হাত প্রশস্ত। ভিতর হইতে কয়লা বাহির করিবার জন্য বাষ্পগাড়ী যাতায়াত করে, সুতরাং তাহার ভিতরে পথও আছে। ৮।১০ হাত পথ সোজা ছিল, সুতরাং বাহিরে কিঞ্চিৎ আলোতে খনির ভিতর কিছু দেখা গেল, তারপর যেমন একটা মোড় ফিরিলাম, অমনি ঘোর অন্ধকার; একে আলোকপ্রবেশের পথ নাই, তাহাতে আবার কয়লার বর্ণের আভা—উভয়ে মিলিত হইয়া যেন যমালয়স্বরূপ ধারণ করিয়া আগন্তুককে গ্রাস করিতে আসিতেছে। যমালয়ের রূপ যে ঘোর অন্ধকারময়, লেখকের সে জ্ঞান শ্রুতিলব্ধ। সেই অনুপমেয় অন্ধকার মধ্যে অন্ধের ন্যায় সুড়ঙ্গের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথি মধ্যে স্থানে স্থানে উপর হইতে চুয়াইয়া জল পড়িতেছে;—কোথাও পার্শ্বদেশের চাপ খসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ইত্যাদি। খাদের মধ্যে প্রবেশ করার অনেক ভয় আছে—উপর হইতে, কখন পার্শ্বদেশ হইতে, প্রায়ই চাপ খসিয়া পড়ে, যাতায়াত কালে মানুষের ঘাড়ে পড়িলে মানুষ মারা পড়ে। আর এক দফা ভয়ের কথা—গ্যাস। যে সকল স্থান গ্যাসপরিপূর্ণ, তথায় যাওয়া নিষিদ্ধ এবং কর্ত্তৃপক্ষরা সেই সকল স্থানে আশঙ্কা (Danger) জ্ঞাপক কাষ্ঠনির্ম্মিত একটা ক্রশ (Cross) দিয়া রাখেন। খাদের ভিতর আলোক লইয়া যাইতে হয়। যে সকল স্থানের গ্যাস বাহির হইয়া গিয়াছে, তথায় যাতায়াতে গ্যাসের ভয় নাই, কিন্তু গ্যাসময় স্থানে যাওয়া

নিষিদ্ধ। তবে কর্ম্মচারী ও কুলিদিগকে সে সব স্থানেও সময়ে সময়ে যাইতে হয়। এরূপ স্থানে যাইতে হইলে Safety lamp নামক আলো লইয়া যাওয়া বিধি। অপর আলো লইয়া গেলে তাহার উত্তাপ সংযোগে গ্যাস বিচলিত ( burst, ) হয় এবং তাহারই আঘাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। সে দিন কোম্পানীর সর্ভেয়ার বাবু ৩।৪ জন কুলি সমভিব্যাহারে এইরূপ এক স্থান মাপ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না সে স্থানটা বিপদজনক এবং সেখানে ক্রশও ছিল না। সমভিব্যাহারী দুই জন কুলি সম্মুখে Safety lamp হস্তে যাইতেছে—এমন সময় সহসা দুম্ করিয়া আওয়াজ হইল, আর কুলি দুইজন 'জলে গেলাম শব্দে' চীৎকার করিয়া উঠিল। সর্ভেয়ার বাবু শব্দ শুনিয়াই বিপদ বুঝিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া পড়িলে আর তত ভয় থাকে না, কারণ গ্যাসটা মৃত্তিকাসংলগ্ন না থাকিয়া কিঞ্চিৎ উপরে থাকে। ক্ষণপরেই সর্ভেয়ার বাবু অন্ধকারে হাতড়াইয়া আহত কুলিদ্বয়কে বগলে ধরিয়া বাহিরে আনিলেন। একটা কুলি তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল, অপরটীকে দেখা গেল অর্দ্ধহত, তাহার শরীরের প্রায় সমুদায় চামড়া উঠিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরকৃপায় এ ব্যক্তি বাঁচিয়া গেল। আবার এক এক স্থানে এমন গ্যাস আছে যে, তথায় অন্ধকারে গেলেও মানুষ মরিয়া যায়। এই শেষোক্ত গ্যাসকে Black gas কহে। খাদের যে অংশ নূতন কাটা হয়, সেইখানে গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্যাস বিদূরিত করিবার জন্য ভিতরে ক্রমাগত বাতাস পুরিতে হয়। নূতন বাতাস পুরিবার জন্য এবং ভিতরের বাতাস সকল নিকাশ করিবার জন্য খাদের বাহিরে স্থানে স্থানে হাওয়া-কল আছে। এই হাওয়াকলের নাম Fan machine। ইহার কোনটী ভিতরে বায়ু প্রবেশ করাইতেছে, আর কোনটী ভিতরের গ্যাস ও দূষিত বায়ু টানিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। হাওয়াকল একখানি বৃহৎ চক্র মাত্র—ক্রমাগত ঘুরিতেছে। সুড়ঙ্গ যে প্রণালীতে কাটা গিয়াছে, তাহা সোজা নহে ;—আঁকা বাঁকা, শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, আবার কোথাও সোপান বা গ্যালারির ন্যায় স্তরে স্তরে উপরে উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। এইরূপ কাটিয়া বহুদূর, এক মাইল, কোনদিকে দুই মাইল গিয়াছে। কুলিদিগের সকলের হস্তেই একটা করিয়া আলোক থাকে।

সময়ে সময়ে খাদে আগুন লাগে, এবং অগ্নি সহজে নির্ব্বাপিত হয় না, সুতরাং সে স্থানটাকে ইষ্টকপ্রাচীর দ্বারা একবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়,

তাহা হইলে সে অগ্নি আর অধিক দূর আসিতে পারে না। এমনও কোন কোন স্থান আছে, যেখানে দুই পাঁচ কি দশ বৎসর ক্রমান্বয়ে আগুন জলিতেছে ও পাহাড় ভেদ করিয়া ধূম উদ্গিরিত হইতেছে। যতক্ষণ বা যত দূর পর্য্যন্ত কয়লার সংযোগ থাকে, তাবৎ আগুন ক্রমাগত জলিবে; মানুষ একদিক বন্ধ করে, অগ্নি আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লইয়া নিজের শক্তি অন্য দিকে বিস্তারিত করিতে থাকে।

খাদের মধ্যে স্থানে স্থানে ক্রমাগত টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। সেই জল ও স্থানীয় মৃত্তিকার লক্ষণ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহার মধ্যে লৌহের বিশেষ প্রাচুর্ভাব আছে; কালক্রমে যে সেখানে কোন লৌহের কারখানা স্থাপিত হইবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।

আসামের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, পূর্ব্বসঞ্চিত অনেক ভ্রম বিদূরিত হইল, আবার অনেক নূতন বিষয়ের অভিজ্ঞতা জন্মিল। পূর্ব্বে জানিতাম যে আসাম প্রদেশ চার জন্য বিখ্যাত, চা-বাণিচার জন্য পরিচিত, আর চা বাগানের অত্যাচারের জন্য জগদ্বিখ্যাত। প্রথমোক্ত দুইটী বিষয় লইয়া আলোচনার কোন আবশ্যকতা দেখি না, কারণ উহা স্বতঃসিদ্ধ। অত্যাচারসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক এবং তাহা না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সচরাচর সংবাদ পত্র মহলে যে আসামীর অত্যাচারের কথা লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দুইটী প্রধান;—১ম, সাহেবকর্ত্তৃক কুলিনীদিগের সতীত্বহরণ; ২য়, কুলির প্রতি উৎপীড়ন।

প্রথমতঃ দেখা যাউক কুলিনীগণ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত। সামাজিক হিসাবে এই সকল কুলিনীগণ যে কেবল অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা নহে; এই শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব বলিয়া কোন জিনিষ আছে বলিয়া ত আমার ধারণা হয় না। পশু জগতে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন, এই তিনটী জিনিষই যেমন জীবনধারণের একমাত্র কারণ স্বরূপ বলিয়া মনে হয়, এই নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যেও তাহা ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না। রমণীর সতীত্বকে আমরা যেরূপ পবিত্র ভাবে দেখি, কুলিনীগণ কিন্তু তাহার মর্ম্ম বুঝে না। ইহারা সতীত্বকে ক্রীড়ার সামগ্রী, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার উপকরণ মাত্র বলিয়া মনে করে। যে স্থানে ইতর শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষের এত ঘনিষ্ঠ সমাবেশ, তথায় সতীত্বের স্থিতি অসম্ভব। যাহা দেখিলাম তাহাতে

বুঝিলাম সমগ্র আসাম দেশে কুলিশ্রেণীমধ্যে প্রায় সকল কুলিরই একটা দুইটা রক্ষিতা 'মাইকী' আছে এবং সকল কুলিনীরই দুই একটা 'মোটা' আছে, আর সকলেই বেশ যেন সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকান্না করিতেছে। তবে মধ্যে মধ্যে সাহেবদিগের নিকট কুলিদিগের মামলা মোকদ্দমাও হয়; মামলার বিষয় আর কিছুই নহে, হয় কোন 'মোটা' কাহার 'মাইকী' লইয়া গিয়াছে, না হয় কোন 'মাইকী' স্বীয় 'মোটা'কে ছাড়িয়া অপর 'মোটা'কে গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ মামলা উপস্থিত হওয়ায় বাগানের কর্ত্তৃপক্ষের সুবিধা আছে। মোটার অধিকদিন এগ্রিমেণ্ট না থাকিলে মাইকীর প্রেমলোভে তাহাকে ২।৩ বৎসরের জন্য নূতন গিরিমেণ্ট দিতে হয় অথবা মাইকীকে ঐরূপ করিতে হয়। এইরূপে এগ্রিমেণ্ট ক্রমাগত চলিতে থাকে। এ লাগাদ মাইকী মোটা মধ্যে সতীত্বহরণদাবীতে কোন মামলা মোকদ্দমা হয় নাই; ইহা হইতে স্বতঃই বুঝিয়া লইতে হইবে যে তথাকথিত কুলিরমণীর সতীত্বের মূল্য কত! তবে কোন কোন সাহেবকর্ত্তৃক যে কুলিনীর উপর অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেটা প্রকৃতপক্ষে অত্যাচার কি না তাহার তদন্ত না করিয়া কেবল ঈর্ষাপরবশ ব্যক্তির কথায় নির্ভর করতঃ লেখনী চালনা করা নিতান্ত অন্যায়। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা, তদনুসারে বিশ্বাস যে, কোন সাহেব—অভাবে কোন বাবু—অনুগ্রহ করিয়া কোন কুলিনীকে আশ্রয় প্রদান করিলে সে চরিতার্থ হয়—ইহজন্ম সার্থক হয় বলিয়া তাহার বিশ্বাস! (ক্রমশঃ)

---

মিঃ জে, এইচ্ সেভিয়ার হিমালয়ে অদ্বৈতাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে ইঁহার অদ্বৈতবাদের উপর বিশেষ নিষ্ঠা হওয়ায়, ইনি সস্ত্রীক স্বদেশ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজির সহিত ভারতবর্ষের নানা স্থান ভ্রমণের পর শেষ হিমালয়ে একটী আশ্রম স্থাপন করেন। আশ্রম-স্থানের নাম তাঁহার সাধের নাম 'মায়াবতী'। মনে করিয়াছিলেন হিমালয়ের শান্তিময় ক্রোড়ে লালিত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাবে অনুপ্রাণিত গুটিকতক বীরসন্তান ভবিষ্যৎ ভারতের দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিবে। ১২ই কার্ত্তিক রবিবার ঋষিপূজিত হিমালয়ের অঙ্গধূলিতে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত "হরি ওম্ তৎ সৎ" মন্ত্রে পূত এই সন্ন্যাসিস্বজন মহাত্মার দেহভস্ম মিলিয়া গিয়াছে—বুঝি ভারতের দুঃখে দুঃখী কেউ এ মর জগতে থাকে এ বিধাতার ইচ্ছা নয়! "হরি ওম্ তৎ সৎ" মন্ত্রে তাঁহার অতীব শ্রদ্ধা ছিল। হরি ওম্ তৎ সৎ।

পারে; তাহা হইলে তোমরা আর বাহুবলের কি গৌরব কর?—তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পাশ্চাত্য মণ্ডলী-সকলের কি গৌরব কর? তোমাদের মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি গৌরব কর, যদি সব জিনিষ ছাড়িয়া তোমরা কেবল বলিতে থাক, 'ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব।' পয়সা কড়ি ছাড়া আর কিছুই কি কার্য্যকর নহে? যদি তাই হয়, তবে তোমাদের সমাজের এত অহঙ্কার কর কেন? সেই সমাজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্ব্বোচ্চ সত্য কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহাই আমার মত, আর যদি সমাজ উচ্চতম সত্যকে স্থান দিতে অপারক হয়, তবে উহাকে সক্ষম করিয়া লও। উহাকে সক্ষম করিয়া লও, আর যত শীঘ্র তুমি উহাতে কৃতকার্য্য হইবে, ততই মঙ্গল। হে নরনারিগণ, আত্মাতে জাগ্রত হইয়া উঠ, সত্যে বিশ্বাসী হইতে সাহসী হও, সত্যের অভ্যাসে সাহসী হও। জগতে কতকগুলি সাহসী নরনারীর প্রয়োজন। সাহসী হওয়া বড় কঠিন। শারীরিক সাহস বিষয়ে ব্যাঘ্র মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। উহাদের স্বভাবতই ঐরূপ সাহসিকতা আছে। এ বিষয়ে বরং পিপীলিকা অন্য জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ। এই শারীরিক সাহসিকতার কথা কেন কও? সেই সাহসিকতার অভ্যাস কর, যাহা মৃত্যুর সমক্ষেও ভয় পায় না, যাহা মৃত্যুকে স্বাগত বলিতে পারে, যাহাতে মানুষ জানিতে পারে, সে আত্মা, আর সমুদয় জগতের মধ্যে কোন অস্ত্রেরই সাধ্য নাই, তাহাকে সংহার করে, সমুদয় বজ্র মিলিলেও তাহাদের সাধ্য নাই, তাহাকে সংহার করে,—জগতের সমুদয় অগ্নির সাধ্য নাই, উহাকে দগ্ধ করিতে পারে— যে সাহসিকতা সত্যকে জানিতে সাহসী হয় এবং জীবনে সেই সত্য দেখাইতে পারে। সেই ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে আত্মস্বরূপ হইয়াছেন। ইহা এই সমাজে—প্রত্যেক সমাজেই—অভ্যাস করিতে হইবে। 'আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ করিতে হইবে, তার পর মনন করিতে হইবে, তাহার পর নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।'

আজকালকার সমাজে একটা গতি দেখা দিয়াছে—কার্য্যের দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া এবং সর্ব্বপ্রকার মনন, ধ্যান ধারণা প্রভৃতিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া। কার্য্য খুব ভাল বটে, কিন্তু তাহাও চিন্তা হইতে প্রসূত। মনের ভিতর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি বিকাশ হয়, তাহাই যখন শরীরের ভিতর দিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই কার্য্য বলে। চিন্তা ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। মস্তিষ্ককে উচ্চ উচ্চ চিন্তা, উচ্চ উচ্চ

[illegible] ঐ [illegible] হৃদয় [illegible]
[illegible] হইবে [illegible]
[illegible] না, কিন্তু হৃদয়ে [illegible] আমরা [illegible]
[illegible] আমরা [illegible] আমরা [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ছিল, [illegible] ছিল। [illegible]
[illegible] ছিল, [illegible]
[illegible] দেখিতে [illegible] এই
[illegible] একটী [illegible]
[illegible] থাকিত। [illegible]
[illegible] হইতে [illegible]
[illegible]
[illegible] দিতে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] আমি [illegible]
[illegible]
[illegible] হইতে [illegible]
[illegible] তাহার
[illegible] ছিল।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] তোমার
[illegible]
[illegible] তাহার
[illegible]

এই ধারণা আসিল যে, আমি সিংহ। তখন সে সিংহগর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহার মেষবৎ চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল! তোমরা সিংহস্বরূপ— তোমরা আত্মা, শুদ্ধস্বরূপ, অনন্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতরে। "হে বন্ধু, কেন রোদন করিতেছ? জন্ম মৃত্যু তোমারও নাই, আমারও নাই। কেন কাঁদিতেছ? তোমার রোগদুঃখ কিছুই নাই, তুমি অনন্ত আকাশস্বরূপ, নানাবর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে, এক মুহূর্ত্ত খেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে; কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবর্ণই রহিয়াছে।" এইরূপে অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা—জগতে পাপ তাপ দেখি কেন? কারণ, আমরা নিজেরাই অসৎ। পথের ধারে একটী স্থাণু রহিয়াছে। একটা চোর সেই পথ দিয়া যাইতে ছিল, সে ভাবিল, এ একজন পাহারাওয়ালা। নায়ক উহাকে তাহার নায়িকা ভাবিল। একটী শিশু উহাকে দেখিয়া ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এইরূপে উহাকে ভিন্ন ভিন্নরূপ দেখিলেও, উহা সেই স্থাণু ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

আমরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও তদ্রূপ দেখিয়া থাকি। একটী টেবিলের উপর এক থলে মোহর রাখিয়া দাও, আর মনে কর, সেখানে যেন একজন শিশু রহিয়াছে। একজন চোর আসিয়া ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ করিল। শিশুটী কি বুঝিতে পারিবে, ইহা অপহৃত হইল? আমাদের ভিতরে যাহা, বাহিরেও তাহা দেখিয়া থাকি। শিশুটীর মনেও চোর নাই, সে বাহিরেও সুতরাং চোর দেখে না। সকল জ্ঞানসম্বন্ধেও তদ্রূপ। জগতের পাপ অত্যাচারের কথা বলিও না। বরং তোমাকে যে জগতে এখনও পাপ দেখিতে হইতেছে, তজ্জন্য রোদন কর। নিজে কাঁদ যে তোমাকে এখনও সর্ব্বত্রে পাপ দেখিতে হইতেছে, আর যদি তুমি জগতের উপকার করিতে চাও, তবে আর জগতের উপর দোষারোপ করিও না। উহাকে আরও অধিক দুর্ব্বল করিও না। এই সকল পাপ দুঃখ প্রভৃতি আর কি?—এগুলি ত দুর্ব্বলতারই ফল। জগৎ এতদ্রূপ শিক্ষা দ্বারা দিন দিন দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়াছে। লোকে ছেলেবেলা হইতেই শিক্ষা পায় যে, সে দুর্ব্বল ও পাপী। তাহাদিগকে শিখাও যে, তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান—এমন কি, যাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাহাদিগকেও উহা শিখাও। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহাতে তাহা-

[illegible] তোমার [illegible]

[illegible] রহিয়াছে [illegible]

[illegible] জীবন [illegible]

[illegible] হইতে [illegible]

---

[illegible]

[illegible] হইয়াছে, [illegible]

[illegible] এবং [illegible]

[illegible]

বেদান্তদর্শনের এক উদ্দেশ্য—একত্বের অনুসন্ধান। হিন্দুগণ বিশেষের প্রতি বড় দৃষ্টি করেন না, তাঁহারা—সর্ব্বদাই সামান্যের—শুধু তাহাই নহে, সর্ব্বব্যাপী সার্ব্বভৌমিক বস্তুর অন্বেষণ করিয়াছেন। দেখা যায়, তাঁহারা এই সত্যেরই পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়াছেন, "এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে জানিলে সমুদয়ই জানা হয়?" যেমন একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারিলে, জগতের সমুদয় মৃত্তিকাকে জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে সমুদয় জগতের জ্ঞানলাভ হইবে? এই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধান, এই তাঁহাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা। তাঁহাদের মতে সমুদয় জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া একমাত্র "আকাশ" পদার্থে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে। আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাই, স্পর্শ করিতে পারি বা আস্বাদ করি, এমন কি, আমরা যাহা কিছু অনুভব করিতে পারি, সবই কেবলমাত্র এই আকাশেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র। এই আকাশ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী। কঠিন, তরল, বাষ্পীয় সকল পদার্থ, সর্ব্বপ্রকার আকৃতি, শরীর, পৃথিবী, সূর্য্য চন্দ্র তারা সবই [illegible]আকাশ হইতে উৎপন্ন।

এই আকাশের উপর কোন্ শক্তি কার্য্য করিয়া তাহা হইতে জগৎ সৃজন করিল? আকাশের সঙ্গে একটী সর্ব্বব্যাপী শক্তি রহিয়াছে। জগতের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এমন কি চিন্তা শক্তি পর্য্যন্ত প্রাণনামক এক মহাশক্তির বিকাশ। এই [illegible] আকাশের উপর কার্য্য করিয়া এই জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। [illegible]প্রারম্ভে এই প্রাণ যেন অনন্ত আকাশ সমুদ্রে প্রসুপ্ত থাকেন। আদিতে ওই আকাশ গতিহীন রূপে অবস্থিত ছিলেন। পরে প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ-সমুদ্রে গতি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণের যেমন গতি হইতে থাকে, তেমনই এই আকাশ-সমুদ্র হইতে নানা ব্রহ্মাণ্ড, নানা জগৎ, কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত তারা, পৃথিবী, মানুষ, জন্তু উদ্ভিদ্ এবং নানাশক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। অতএব হিন্দুদের মতে সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাণের এবং সর্ব্বপ্রকার ভূত আকাশের বিভিন্নরূপমাত্র। কল্পান্তে সমুদয় কঠিন পদার্থ দ্রব হইয়া যাইবে, তখন সেই তরল পদার্থটী বাষ্পীয় আকারে পরিণত হইবে। তাহা আবার তেজোরূপ ধারণ করিবে। অবশেষে সমুদয় যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই আকাশে লয় হইবে। আর আকর্ষণ, বিকর্ষণ গতি প্রভৃতি সমুদয় শক্তি

[illegible]

[illegible] পরিবর্তন [illegible] করিয়াছে।

[illegible] এই বিশেষত্ব [illegible] আধুনিক [illegible] উপায় [illegible] অনুভূতির আর [illegible] কিন্তু এই [illegible] এমন [illegible] না, [illegible] আর [illegible] প্রাচীন ভারতীয় [illegible] পরিণত করিয়াছি [illegible] উদ্ভিদের [illegible] আর [illegible] হইয়াছে।

[illegible] আমি তোমাকে দেখিতেছি [illegible] আমার [illegible] Romance [illegible]

[illegible] উদ্দেশ্য [illegible]

পশ্চাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, প্রথমে এই স্থূল শরীরে বাহ্যযন্ত্রগুলি অবস্থিত। তৎপশ্চাতে কিন্তু ঐ স্থূল শরীরেই ইন্দ্রিয়গণও অবস্থিত, কিন্তু তথাপি পর্য্যাপ্ত হইল না। মনে কর, আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক আমার কথা শুনিতেছ, এমন সময় এখানে একটী ঘণ্টা বাজিল, তুমি হয়ত সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেই পাইবে না। ঐ শব্দ-তরঙ্গ তোমার কর্ণে উপনীত হইয়া কর্ণপটহে লাগিল, স্নায়ু দ্বারা ঐ সংবাদ মস্তিষ্কে পঁহুছিল, কিন্তু তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? যদি মস্তিষ্কে সংবাদ বহন পর্য্যন্ত সমস্ত দর্শনপ্রক্রিয়াটী সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? তাহা হইলে দেখা গেল, এই দর্শনপ্রক্রিয়ার জন্য আরো কিছুর আবশ্যক —মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত ছিল না। যখন মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ থাকে, ইন্দ্রিয় উহাকে যে কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন তাহা গ্রহণ করিবে না। যখন মন উহাতে যুক্ত হয়, তখনই কেবল উহার পক্ষে কোন সংবাদ গ্রহণ সম্ভব। কিন্তু ইহাতেও বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। বাহিরের যন্ত্র সংবাদ বহন করিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে উহা বহন করিতে পারে, মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। আর একটী জিনিষের আবশ্যক। ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়ার আবশ্যক। প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বাহিরের বস্তু যেন আমার অন্তরে সংবাদ প্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন উহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির নিকট উহা অর্পণ করিল, বুদ্ধি পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত মনের সংস্কার অনুসারে উহাকে সাজাইল এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়া প্রবাহ প্রেরণ করিল। ঐ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে; মনের যে শক্তি এই প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে, তাহাকে বুদ্ধি বলে। তথাপি এই বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইল না। মনে কর একটী ক্যামেরা (Camera) রহিয়াছে, আর একটী বস্ত্রখণ্ড রহিয়াছে। আমি ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর একটী চিত্র ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি? আমি ক্যামেরা হইতে নানাপ্রকার আলোক কিরণ ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর ফেলিতে এবং ঐ স্থানে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটী অচল বস্তুর আবশ্যক, যাহার উপর চিত্র ফেলা যাইতে পারে। কোন সচল বস্তুর উপর চিত্র ফেলা অসম্ভব—কোন স্থির বস্তুর প্রয়োজন। কারণ আমি যে

[illegible] ক্রমশঃ [illegible]

[illegible] আছে [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]

[illegible]

[illegible] অবস্থায় [illegible] পরিণত হইয়াছেন [illegible] হইয়াছেন। [illegible]

[illegible] তাঁহারা [illegible]

[illegible] আমরা [illegible]

[illegible]

# অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১॥

অন্বয়। — হে কৃষ্ণ (ত্বং) কর্ম্মণাং সংন্যাসং পুনঃ [illegible] যোগঞ্চ শংসসি। এতয়োঃ [illegible] তদেকং মে সুনিশ্চিতং ব্রূহি॥ ১॥

অনুবাদ। — হে কৃষ্ণ! তুমি একবার [illegible] আবার [illegible] [illegible] এই দুইটী উপায়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়, তাহা [illegible] করিয়া [illegible] ১॥

[illegible] — "কর্ম্মণামনারম্ভাৎ [illegible]" ইত্যাদিনা [illegible] [illegible] [illegible] কেবলং "কুরু কর্ম্মৈব" [illegible] [illegible] "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" [illegible] [illegible] "যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং" ইত্যাদিবচনৈঃ সর্ব্বকর্ম্ম-[illegible] [illegible] ইতরেণ [illegible] কর্ম্মানুষ্ঠানং [illegible] তয়োরুভয়োঃ [illegible] কর্ম্মানুষ্ঠান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ [illegible] অর্থাৎ একযোগেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] — "[illegible] কর্ম্ম না করে" [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] করে) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "কর্ম্মত্যাগ [illegible] [illegible] (সেই সকল [illegible] কর্ম্ম [illegible] বলিয়া বোধ কর), [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়), [illegible]

সর্ব্বকর্ম্মাণি" (জ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্ম্মকেই) "যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং" (যোগের দ্বারা কর্ম্মের সংন্যাসকারী), এই পর্য্যন্ত বচন সমূহের দ্বারা ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠ" (এই সংশয় ছেদন করিয়া জ্ঞানলাভের উপায়ের অনুষ্ঠান কর) এই বচনের দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান কর, এই কথা বলিয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসংন্যাস এই দুইটী বস্তুর মধ্যে স্থিতি ও গতির ন্যায় পরস্পর বিরোধ থাকায়, একজন এককালে কোন প্রকারেই কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসংন্যাস করিতে পারে না, কালভেদে এই দুইটীর অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এ কথাও ভগবান্ এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন নাই। এই সকল দেখিয়া আপাততঃ বুঝা যায় যেন কর্ম্মানুষ্ঠান এবং কর্ম্মসংন্যাসের মধ্যে একটির অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য; তাহাই যদি হইল, তবে এই দুইটীর মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত তাহাই করা উচিত, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত মোক্ষলাভের উপায় বুঝিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ ইত্যাদি ॥১॥

ভাষ্য।—ননুচ আত্মবিদো জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং প্রতিপিপাদয়িষন্ পূর্ব্বোদাহৃতৈর্বচনৈঃ ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমবোচন্নত্বনাত্মজ্ঞস্য অতশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োঃ ভিন্নপুরুষবিষয়ত্বাদন্যতরস্য প্রশস্ততরত্ববুভুৎসয়া প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ। সত্যমেব ত্বদভিপ্রায়েণ প্রশ্নো নোপপদ্যতে প্রষ্টুঃ স্বাভিপ্রায়েণ পুনঃ প্রশ্নো যুজ্যত এবেতি বদামঃ। কথং? পূর্ব্বোদাহৃতৈঃ বচনৈঃ ভগবতা কর্ম্মসংন্যাসস্য কর্ত্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাৎ প্রাধান্যমন্তরেণ চ কর্ত্তারং তস্য কর্ত্তব্যত্বাসম্ভবাৎ। অনাত্মবিদপি কর্ত্তা পক্ষে প্রাপ্তোঽনূদ্যতে এব ন পুনরাত্মবিৎ কর্ত্তৃকত্বমেব সংন্যাসস্য বিবক্ষিতমিতি এবং মন্বানস্য অর্জ্জুনস্য কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োঃ অবিদ্বৎপুরুষকর্ত্তৃকত্বমপ্যস্তীতি পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ তয়োঃ পরস্পরবিরোধাৎ অন্যতরস্য কর্ত্তব্যত্বে প্রাপ্তে প্রশস্ততরং চ কর্ত্তব্যং নেতরৎ ইতি প্রশস্ততরবিবিদিষয়া প্রশ্নোনানুপপন্নঃ। প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাপি প্রষ্টুরভিপ্রায় এবমেবেতি গম্যতে ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যদি কেহ এপ্রকার শঙ্কা করে যে, যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহারই জ্ঞানযোগের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, ইহাই প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায় ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, অনাত্মজ্ঞ পুরুষের জন্য কর্ম্মসংন্যাসযোগ বিহিত হয় নাই, এই কারণে কর্ম্মানুষ্ঠান

ও কর্ম্মসংন্যাস এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় নহে, ইহার অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং ইহার মধ্যে একটীর অপরের অপেক্ষা প্রশস্ততরত্ব বুঝিবার জন্য প্রশ্ন (প্রকৃত পক্ষে) যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। ইহার উত্তরস্বরূপে বলি যে, সত্য বটে তোমার অভিপ্রায়ানুসারে প্রশ্ন উপপন্ন নহে, কিন্তু প্রশ্ন-কর্ত্তা অর্জ্জুনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রশ্ন যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কেন? (তাহা বলি) পূর্ব্বে উদাহৃত বচনসমূহের দ্বারা কর্ম্মসংন্যাসের কর্ত্তব্যত্ব বিবক্ষিত হওয়ায় তাহার প্রাধান্য আছে (ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য), কর্ত্তা না থাকিলে কর্ম্মসংন্যাসের কর্ত্তব্যত্বও অনুপপন্ন, আত্মবিদের ন্যায় অনাত্ম-বিদ্‌ও সামান্যতঃ কর্ত্তৃস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহার কর্ত্তৃস্বরূপে কথন অসঙ্গত নহে। অতএব সংন্যাস যে কেবল আত্মবিদের অনুষ্ঠেয় তাহা নহে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা অনুপপন্ন নহে, কারণ উক্ত বিবেচনানুসারে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসংন্যাস এই উভয়ই বিদ্বানের ন্যায় অবিদ্বানের পক্ষেও বিহিত, অথচ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসংন্যাসের বিরোধ হয় বলিয়া অন্যতরের কর্ত্তব্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং এই দুইটীর মধ্যে যেটী প্রশস্ততর তাহাই কর্ত্তব্য এবং অপরের আপেক্ষিক অপ্রাশস্ত্য নিবন্ধন অনুষ্ঠান উচিত নহে, এই প্রকার উৎকৃষ্টতর উপায় জানিবার ইচ্ছাতেই অর্জ্জুন এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছেন। ভগবান্ যে প্রতিবচনবাক্য বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য নিরূপণ করিলেও প্রশ্নকর্ত্তার এই প্রকার অভিপ্রায় ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় ॥১॥

ভাষ্য।—কথং সন্ন্যাসকর্ম্মযোগৌ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ তয়োস্তু কর্ম্ম-যোগো বিশিষ্যতে ইতি প্রতিবচনমেতন্নিরূপ্যং কিমনেনাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং প্রয়োজনমুক্তং তয়োরেব কুতশ্চিদ্বিশেষাৎ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে? আহোস্বিৎ অনাত্মবিৎ-কর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যতে ইতি কিঞ্চাতো যদ্যাত্মবিৎ-কর্ত্তৃকয়োঃ। সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে যদি বা অনাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়ো স্তদুভয়মুচ্যত ইতি?। অত্রোচ্যতে আত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ অসম্ভবাৎ তয়োঃ নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্ম-যোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানং ইত্যেতদুভয়মনুপপন্নম্। যদ্যনাত্মবিদঃ কর্ম্মসংন্যাসঃ

তৎপ্রতিকূলশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণঃ কর্ম্মযোগস্য সংভবেতাং তদা তয়োঃ নিঃশ্রেয়সকরত্বোক্তিঃ কর্ম্মযোগস্য চ কর্ম্মসংন্যাসাদ্বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মুপপদ্যতে। আত্মবিদস্তু সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ অসম্ভবাৎ তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বাভিধানং কর্ম্মসংন্যাসাচ্চ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে ইতি চানুপপন্নম্। অত্রাহ কিমাত্মবিদঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োরপ্যসম্ভবঃ আহোস্বিৎ অন্যতরস্যাসম্ভবঃ যদাচান্যতরস্যাসম্ভবঃ তদা কিং কর্ম্মসংন্যাসস্য উত কর্ম্মযোগস্যেতি অসম্ভবে কারণং চ বক্তব্যমিতি ।১॥

ভাষ্যানুবাদ।—কেন এই প্রকার বলা যাইতেছে? (তাহা বলি) সংন্যাস এবং কর্ম্মযোগ, এই উভয়ই নিঃশ্রেয়সকর, এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মযোগই বিশিষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রতিবচনবাক্যের দ্বারাই ইহা নিরূপণ করা যাইতেছে। (এক্ষণে দেখিতে হইবে যে) এই পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটী দ্বারা আত্মবিৎ পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সংন্যাস ও কর্ম্মযোগের নিঃশ্রেয়সকরত্ব এইরূপ প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়া ঐ উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত কর্ম্মযোগের প্রাধান্য উক্ত হইতেছে অথবা অনাত্মবিদ্ পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সংন্যাস ও কর্ম্মযোগের নিঃশ্রেয়সকরত্ব বলিয়া ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য উক্ত হইতেছে। যদি আত্মবিৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মযোগের নিঃশ্রেয়সকরত্ব হয় এবং এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মসংন্যাস হইতে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য উক্ত হয়, তাহা হইলেই বা কি হয়? অথবা যদি অনাত্মবিৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মযোগের নিঃশ্রেয়সহেতুত্ব বলিয়া পরে কর্ম্মসংন্যাস হইতে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য উক্ত হয়, তাহা হইলেই বা কি হইতে পারে? ইহার উত্তরস্বরূপে বলা যাইতেছে, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে কর্ম্মসংন্যাস এবং কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাহার পক্ষে কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়ই মোক্ষকারণ, এই প্রকার বলা সঙ্গত হইতে পারে না এবং তাহার পক্ষে কর্ম্মসংন্যাস হইতে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য কখনও একান্ত অনুপপন্ন হয়। যদি অনাত্মবিদের পক্ষে কর্ম্মসংন্যাস এবং সংন্যাসের প্রতিকূল কর্ম্মানুষ্ঠান, এই দুইটী সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সেই উপায়দ্বয়ের মোক্ষসাধনত্বকথন সঙ্গত হইতে পারে এবং কর্ম্মসংন্যাস হইতে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য প্রতিপাদনও উপপন্ন হইতে পারে। আত্মবিদের পক্ষে সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়ের অনুষ্ঠান একান্ত অসম্ভব এই কারণ তাহার পক্ষে

কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুইটীই মোক্ষের প্রতি কারণ এবং সেই উপায়-দ্বয়ের মধ্যে সংন্যাস হইতে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য আছে, এই প্রকার প্রতিপাদন করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ॥ ১ ॥

এই প্রসঙ্গে কেহ এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, আত্মবিদ্ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগ ও সংন্যাসযোগ এই উভয়ই অসম্ভব? অথবা এই দুইটীর মধ্যে একটীর অনুষ্ঠান অসম্ভব? যদি একটীর অসম্ভব হয়, তাহা হইলে কোনটীর অসম্ভব? কর্ম্মসংন্যাসের অসম্ভব অথবা কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের অসম্ভব? এবং কেন অসম্ভব? তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিতে হইবে ॥ ১ ॥

ভাষ্য।—অত্রোচ্যতে, আত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বাৎ বিপর্য্যয়জ্ঞান-মূলস্য কর্ম্মযোগস্য অসম্ভবঃ স্যাৎ, জন্মাদিসর্ব্ববিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়-মাত্মানং আত্মত্বেন যোবেত্তি তস্যাত্মবিদঃ সম্যগ্দর্শনেন অপাস্তমিথ্যাজ্ঞানস্য নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমুক্ত্বা তদ্বিপরীতস্য মিথ্যাজ্ঞান-মূলকর্তৃত্বাভিমানপুরঃসরস্য সক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানরূপস্য কর্ম্মযোগস্যেহ শাস্ত্রে তত্র তত্রাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাৎ অভাবঃ প্রতিপাদ্যতে যস্মাৎ তস্মাৎ আত্মবিদোনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানস্য বিপর্য্যয়জ্ঞান-মূলঃ কর্ম্মযোগো ন সম্ভবতি ইতি যুক্তমুক্তং স্যাৎ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহার উত্তরস্বরূপ বলা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি আত্মবিদ্ (অর্থাৎ) যাহার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার মিথ্যাজ্ঞানমূলক কর্ম্ম-যোগ (একান্ত) অসম্ভব হইয়া থাকে। "আত্মা নিষ্ক্রিয়, জন্ম প্রভৃতি বিকার আত্মার নহে", এই ভাবে আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব যে ব্যক্তি জানিতে পারিয়াছে, সেই আত্মবিদের সম্যগ্দর্শনের প্রভাবে সকল প্রকার মিথ্যাজ্ঞান উন্মূলিত হইয়াছে, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞব্যক্তির নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপেই অবস্থানরূপ সর্ব্ব-কর্ম্মসংন্যাস শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই প্রকার সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্র ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত যে মিথ্যা জ্ঞান, তাহাই আত্মাতে কর্তৃত্বাভিমানের মূল, এই কর্তৃত্বা-ভিমানের কার্য্য কর্ম্মযোগ, (অর্থাৎ) সক্রিয়রূপ আত্মার আরোপিত স্বরূপে অবস্থান সুতরাং এই কর্ম্মযোগ, জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই শাস্ত্রে যেই সেই আত্মস্বরূপনিরূপণার্থ অংশবিশেষে সম্যগ্জ্ঞানের সহিত, মিথ্যাজ্ঞান ও তাহার কার্য্যের বিরোধ সূচিত হইয়াছে, এই কারণে আত্ম-বিদের কর্ম্মযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই ইহা স্থির। এই জন্য বলিতে

হইবে যে, যাহার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই আত্মবিদের মিথ্যাজ্ঞান প্রসূত কর্ম্মযোগ সম্ভব নহে, এইরূপ বচন যুক্তি যুক্তই হইয়াছে ॥ ১ ॥

ভাষ্য।—কেষু কেষু পুনরাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু আত্মবিদঃ কর্ম্মাভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইতি ? অত্রোচ্যতে অবিনাশিতু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং ইতি প্রকৃত্য য এনং বেত্তি হন্তারং বেদাবিনাশিনং নিত্যং ইত্যাদৌ তত্র তত্র আত্মবিদঃ কর্ম্মাভাব উচ্যতে ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কোন্ কোন্ আত্মস্বরূপ প্রতিপাদক অংশে এই গীতা-শাস্ত্রে আত্মবিদের কর্ম্মাভাব উক্ত হইয়াছে ? ইহার উত্তর এই হইতেছে যে, অবিনাশিতু তদ্বিদ্ধি ( তাহাকে বিনাশশূন্য বলিয়া জান ), ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া য এনং বেত্তি হন্তারং ( যে ব্যক্তি আত্মাকে হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া জানে ) ও বেদাবিনাশিনং নিত্যং ( আত্মাকে অবিনাশী নিত্য বলিয়া যে জানে ) ইত্যাদি শ্লোকে সেই সেই স্থানে আত্মবিদের কর্ম্মা-ভাব উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ভাষ্য।—ননু চ কর্ম্মযোগোঽপি আত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু তত্র তত্র প্রতিপাদ্যত এব তদ্যথা "তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত", "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য", "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদৌ অতশ্চ কথমাত্মবিদঃ কর্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাদিতি। অত্রোচ্যতে সম্যগ্ জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান তৎকার্য্যবিরোধাৎ। "জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাম্" ইত্যনেন সাঙ্খ্যানাং আত্মতত্ত্ববিদাম্ অনাত্মবিৎকর্ত্তৃককর্ম্মযোগনিষ্ঠা-তো নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণায়া জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়া পৃথক্‌করণাৎ কৃতকৃত্যত্বেন আত্মবিদঃ প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ইতি কর্ত্তব্যান্তরা-ভাববচনাচ্চ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, গীতাশাস্ত্রে আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদক সেই সেই স্থানে, "কর্ম্মযোগও করিতে হইবে," ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যথা, "তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত" ( হে ভারত, সেই জন্য তুমি যুদ্ধ কর ), "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ( নিজ ধর্ম্ম এই প্রকার বিবেচনা করিয়া ), "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে", ( তোমার কর্ম্মতেই অধিকার ) ইত্যাদি শ্লোকে ( কর্ম্মযোগের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে ), তবে কি প্রকারে ইহা সঙ্গত হইতে পারে যে আত্মবিদের পক্ষে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে ? ইহার উত্তর এই যে, সম্যগ্ দর্শন ও তাহার কার্য্যের সহিত মিথ্যাজ্ঞান ও তাহার কার্য্যের অত্যন্ত বিরোধ আছে। "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং" ( সাংখ্য অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি-

পংশের জ্ঞানযোগের দ্বারাই নিঃশ্রেয়সলাভ হয়) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সাংখ্য অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থানকে, অনাত্মবিৎকৃত কর্মযোগনিষ্ঠা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ কৃতকৃত্য হয়, সুতরাং তাহার কর্ম্মযোগসাধ্য কোন প্রয়োজনেরই অপেক্ষা নাই এবং "তস্য কার্য্যং নবিদ্যতে" (তাহার পক্ষে কোন কার্য্যই নাই) ইত্যাদি বচনের দ্বারা আত্মবিদের কর্ম্মযোগের অভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই সকল হেতু দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আত্মবিদের পক্ষে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে ॥ ১ ॥

ভাষ্য।—"ন কর্ম্মণামনারম্ভা" "সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগত" ইত্যাদিবচনাচ্চ আত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন কর্ম্মযোগস্য বিধানাৎ। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে" ইত্যনেন উৎপন্নসম্যগ্দর্শনস্য কর্ম্মযোগাভাববচনাৎ। "শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্" ইতি চ শরীরস্থিতিকারণাতিরিক্তস্য কর্ম্মণোনিবারণাৎ। "নৈবকিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ" ইত্যনেন চ শরীরস্থিতিমাত্র প্রযুক্তেষ্বপি দর্শনশ্রবণাদিকর্ম্মসু আত্মযাথাত্ম্যবিদঃ করোমীতি প্রত্যয়স্য সমাহিতচেতস্তয়া সদা অকর্ত্তব্যত্বোপদেশাৎ আত্মতত্ত্ববিদঃ সম্যগ্-দর্শনবিরুদ্ধো মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ কর্ম্মযোগঃ স্বপ্নেঽপি ন সম্ভাবয়িতুং শক্যতে যস্মাৎ তস্মাৎ অনাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্ম্মসংন্যাসাৎ পূর্ব্বোক্তাত্মবিৎকর্তৃকসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিলক্ষণাৎ সত্যেব কর্তৃত্ববিজ্ঞানে কর্ম্মৈকদেশবিষয়াৎ যমনিয়মাদিসহিতত্বেন চ দুরনুষ্ঠেয়াৎ সুকর-ত্বেন কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেবং প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাপি পূর্ব্বোক্তঃ প্রষ্টুরভিপ্রায়ো নিশ্চীয়তে ইতি স্থিতম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—"ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ (কর্ম্মসমূহের আরম্ভ না করিলেই পুরুষ যে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করিবে তাহা নহে), "সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ" (যোগব্যতিরেকে সংন্যাসাশ্রমগ্রহণ কেবল দুঃখেরই কারণ হয়) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপায় স্বরূপে কর্ম্মযোগের বিধান করা হইয়াছে। "যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে" (জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইলে তাহার কর্ম্মনিবৃত্তিই মোক্ষলাভের কারণ হইয়া থাকে) এই বচনের দ্বারা যাহার সম্যগ্জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কর্ম্মযোগের অভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্" (কেবল শরীররক্ষার জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পাপভাক্ হয় না) এই বচনের দ্বারা শরীরস্থিতির

অনুকূল কর্ম্মভিন্ন অন্য যাবতীয় কর্ম্মের নিবারণও করা হইয়াছে। "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" (তত্ত্ববিদ্ দেহের ক্রিয়া হইলেও আমি কিছুই করিতেছি না এই প্রকার বোধ করিবে) এই বচনের দ্বারা ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শরীরস্থিতিনিবন্ধন অবশ্যম্ভাবি দর্শনশ্রবণাদি কার্য্য হইলেও ঐ সকল কার্য্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি চিত্তের সমাধান পূর্ব্বক 'আমি করিতেছি' এই প্রকার অভিমান কোন সময়ই করিবে না; এই সকল কারণে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্যগ্দর্শনের বিরুদ্ধ মিথ্যাজ্ঞানমূলক কর্ম্মযোগের সম্ভাবনা স্বপ্নেও করা যাইতে পারে না। এই কারণে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়েরই নিঃশ্রেয়সকরত্ব যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অবিদ্বানের পক্ষেই সঙ্গত হইতে পারে। সেই অবিদ্বানের সংন্যাস বিদ্বানের সংন্যাস,হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, কারণ অবিদ্বানের সন্ন্যাস আত্মার উপর কর্তৃত্বাভিমান সমকালীন এবং ঐ সংন্যাসকালে যম নিয়ম প্রভৃতি কতকগুলি ক্লেশকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য, এই কারণে অবিদ্বানের পক্ষে তাদৃশ সংন্যাস দুরনুষ্ঠেয়, তাহার পক্ষে কর্ম্মযোগ অল্পক্লেশকর, সুতরাং সংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই তাহার পক্ষে বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এই প্রকার প্রতিবচনের তাৎপর্য্য দেখিলে প্রশ্নকর্ত্তার পূর্ব্বোক্তপ্রকার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ইহা সিদ্ধই আছে ॥১॥

ভাষ্য।—"জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" ইত্যত্রজ্ঞানকর্ম্মণোঃ "সহাসম্ভবে যচ্ছ্রেয় এতয়োস্তন্মে ব্রূহি"ত্যেবং পৃষ্টোঽর্জ্জুনেন ভগবান্ সাংখ্যানাং সংন্যাসিনাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা পুনঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ নিষ্ঠা প্রোক্তেতি নির্ণয়ং চকার। নচ সন্ন্যসনাদেব কেবলাৎ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতীতি বচনাৎ জ্ঞানসহিতস্য সিদ্ধিসাধনত্বমিষ্টং কর্ম্মযোগস্য চ বিধানাৎ। জ্ঞানরহিতঃ সংন্যাসঃ শ্রেয়ান্ কিংবা কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ান্ ইত্যেতয়োর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া (অর্জ্জুন উবাচ) সংন্যাসং পরিত্যাগং কর্ম্মণাং শাস্ত্রীয়াণাম্ অনুষ্ঠানবিশেষাণাং শংসসি কথয়সীত্যেতৎ। পুনর্যোগঞ্চ তেষামেবানুষ্ঠানমবশ্যকর্ত্তব্যং শংসসি অতো মে কতরচ্ছ্রেয় ইতি সংশয়ঃ কিং কর্ম্মানুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ কিংবা তদ্ধানং প্রশস্যতরং চানুষ্ঠেয়মতশ্চ যচ্ছ্রেয়ঃ প্রশস্যতরমেতয়োঃ কর্ম্মসংন্যাসকর্ম্মানুষ্ঠানয়োর্যদনুষ্ঠানাচ্ছ্রেয়োবাপ্তির্মমস্যাদিতি মন্যসে তদেকমন্যতরং সহৈকপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবান্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতমভিপ্রেতং তবেতি ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে (কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি যদি শ্রেষ্ঠ) ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞান ও কর্ম্মের এককালীন অনুষ্ঠান হওয়া অসম্ভব বলিয়া এই দুইটীর